গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন

মুহাম্মদ ইউনূস

সাফল্য ও গৌরবগাথার অপর নাম মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক। বিশ্বের সবচেয়ে গরিব দেশের একজন মানুষের উদ্ভাবিত একটি পদ্ধতি আজ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল দেশের কাছে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে এক অনুসরণযোগ্য মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে ছাত্রদের নিয়ে কাছাকাছি জোবরা গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে যে-কাজটি তিনি শুরু করেছিলেন, তা-ই আজ এক বিশাল মহীরুহ হয়ে পৃথিবীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এটুকু তথ্য আমরা অনেকেই হয়তো জানি। কিন্তু সেদিন সে-উদ্যোগটি গ্রহণের পেছনে কী ছিল মুহাম্মদ ইউনূসের স্বপ্ন বা প্রেরণা, সংগ্রামের কতটা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তাঁকে সাফল্য ও সম্মানের এই শিখরে পৌঁছতে হয়েছে, তা কি আমরা জানি ?
ড. ইউনূসের আত্মজীবনীমূলক এই বইটিতে সে-কাহিনীই তাঁর নিজ জবানীতে বর্ণিত হয়েছে। আর সে-কাহিনী কোনোক্রমেই একজন মানুষের কেবল একা বড় হবার গল্প নয়, সবাইকে নিয়ে, সবার মধ্যে বড় হবার স্বপ্ন সঞ্চার করে, বড় হবার স্বপ্ন।
অধ্যাপক ইউনূস বিশ্বাস করেন দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাবার ভাগ্য নিয়ে কেউ আসলে জন্মগ্রহণ করে না, মানুষকে দরিদ্র করে রাখা হয়। তিনি আরও বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে সীমাহীন সৃজনশীলতা, অপার সম্ভাবনা। অপেক্ষা কেবল তাকে আবিষ্কার করার, বিকাশের পথ করে দেবার। আর এই প্রতীতীই তাঁর দারিদ্র্যবিরোধী সংগ্রামের পেছনে মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁক আজকের সাফল্য এনে দিয়েছে।
ড. ইউনূসের শৈশব, কৈশোর ও ছাত্রজীবনের কথা; শিক্ষক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা, দেশে-বিদেশে তাঁর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের কথা, প্রথম কাজ শুরুর অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ অভিযাত্রায় উপলব্ধির নানা সঞ্চয় সর্বপ্রথম এই বইয়েই সবিস্তারে বর্ণিত হল। মূল ফরাসী গ্রন্থ *VERS UN MONDE SANS PAUVRETE* -এর এই বাংলা অনুবাদটি আশা করি জাতির একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের সাধনা ও সাফল্যের 'রহস্য' সম্পর্কে তাঁর দেশবাসীর অনেক জাগ্রত কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটাবে।

ISBN : 984 410 407 6

www.pathagar.com

গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন

মুহাম্মদ ইউনূস

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা
নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের আত্মজীবনী

মাওলা ব্রাদার্স

www.pathagar.com

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক

পঞ্চম মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১৫
প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৪

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

ফরাসি ভাষায় রচিত মুহাম্মদ ইউনূস-এর আত্মজীবনী
VERS UN MONDE SANS PAUVRETE-এর বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক
ইলা লাহিড়ী
জয়ন্ত লাহিড়ী

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

অনলাইনে বই কিনুন
www.rokomari.com/mowlabrothers
www.porua.com.bd/mowlabrothers

ISBN 984 410 407 6

GRAMEEN BANK O AMAR JIBAN (Bangla translation of *VERS UN MONDE SANS PAUVRETE:* autobiography of Muhammad Yunus in Frence) Translations into Bangla by Illa Lahiri & Joyonto Lahiri. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers, 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka Five Hundred and Fifty only.

www.pathagar.com

আমার সকল সহকর্মী,
যাদের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে
গ্রামীণ ব্যাংকের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে,
তাদের উদ্দেশে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার মনে একটা প্রগাঢ় প্রতীতী জন্মেছে যে সকল মানুষের মধ্যে সীমাহীন সৃজনশীলতা লুকিয়ে আছে। এটা শুধু আবিষ্কারের অপেক্ষায় থাকে। ক্ষুধা ও দারিদ্রের মধ্যে জীবন কাটাবার ভাগ্য নিয়ে কোনও মানুষ জন্মগ্রহণ করেনি। যাঁরা দরিদ্র তাঁদের এই দারিদ্র আমরা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছি। দু'ভাবে আমরা এটা তাঁদের উপর চাপিয়ে রেখেছি। প্রথমত তাঁদের নিজস্ব সৃজনশীলতা সম্বন্ধে সন্ধান পাবার কোনও সুযোগ আমরা তাঁদের জন্য রাখিনি। দ্বিতীয়ত তাঁদের দারিদ্রের জন্য আমরা তাঁদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্বমুক্ত রাখার সুবন্দোবস্ত করে রেখেছি।

দৃঢ়ভাবে এবং গভীরভাবে আমার মনে এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে যে আমরা এমন একটি পৃথিবী তৈরি করতে পারি যেখানে একজন মানুষও দরিদ্র থাকবে না। এটা সম্পূর্ণ আমাদের সমবেত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। এই রকম একটা পৃথিবী সৃষ্টি করা সম্ভব হবে যদি সবাই মিলে এটা আমরা চাই। যা নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি, শুধুমাত্র তা-ই আমরা অর্জন করতে পারি। অর্জনের আগে স্বপ্ন দেখাটা একটা জরুরি শর্ত। দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী সৃষ্টি করা যে কোনও অলীক স্বপ্ন নয় সেটা গ্রামীণ ব্যাংকের কাজ করতে গিয়ে প্রতিদিন প্রমাণ পেয়েছি। সামান্য পুঁজি হাতে পেয়ে গরিব মহিলা কীভাবে নিজেকে বিকশিত করতে থাকে সেটা দেখে যাচ্ছি অবিরামভাবে। এতে আমার বিশ্বাস কেবল দৃঢ়তরই হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিশ্বাসে কখনও ফাটল ধরার কোন অবকাশ ঘটেনি।

শুধু ক্ষুদ্রপুঁজির ব্যবস্থা করলেই দারিদ্রের সমাধান হয়ে যাবে একথা মনে করলে বড় রকমের ভুল করা হবে। আমি বারেবারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি ক্ষুদ্রপুঁজি আসলে গরিব মানুষের জন্য একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করে। একে কেন্দ্র করে মানুষ নিজের দিকে তাকাবার সুযোগ পায়। নিজের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ পায়। টাকা মানুষকে পরিবর্তন করে না। মানুষ নিজে নিজেকে পরিবর্তন করে। কিন্তু তার হাতে একটা হাতিয়ার দরকার। যতদিন হাতে তলোয়ার আসেনি ততদিন বীরযোদ্ধা বুঝতে পারেননি তিনি কত বড় বীর। যতদিন হাতে রংতুলি আসেনি ততদিন শিল্পী বুঝতে পারেননি তিনি কত বড় শিল্পী। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে হলে অবশ্যই পুঁজির তলোয়ার দরকার। এই লড়াইয়ে তাঁর জেতা সহজ করার জন্য আরও আনুষঙ্গিক

www.pathagar.com

অনেক কিছু দরকার। যেমন প্রথম থেকে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে দারিদ্র গরিব মানুষের নিজের তৈরি জিনিস নয়। এটা তাদের উপর চাপানো একটা পরিস্থিতি। মানুষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, তার ভিত্তিতে তৈরি আমাদের নীতিমালা সব মিলে দারিদ্র সৃষ্টি করেছে। দারিদ্র দূর করতে হলে মানুষ ও তার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পালটাতে হবে, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রচনা করতে হবে, নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। তবেই সহজে এবং স্থায়ীভাবে দারিদ্র দূর হবে।

গরিব মানুষের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার মনে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। মানুষের সৃজনশীরতা এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারে এবং এই সম্পর্কের মধ্যে শুভ সম্ভাবনার ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত। প্রতিটি মানুষই অনন্য ও অতি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। প্রতিটি মানুষের মধ্যে অপার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। প্রতিটি মানুষ অন্য মানুষের, এমনকি সমগ্র জাতি বা তার বাইরের মানুষের, জীবনকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। নিজের মধ্যে কী শক্তি আছে তা পুরোপুরি আবিষ্কার করার সুযোগ আমরা পাই না। গরিব মানুষ একেবারে সামান্যতম সুযোগটুকুও পায় না বলে তারা তাদের অবস্থার মধ্যে গুটিয়ে থাকে। প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ সম্ভাবনাগুলি আবিষ্কার করার সুযোগ দেয়ার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সমাজের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল এই পরিবেশ সৃষ্টি করা। এর অভাবে একজন মানুষকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে এমন একটা ফুলের মতো যে পাপড়ি মেলার সুযোগ পাবার আগেই ঝরে পড়েছে।

আমাদের প্রত্যেককেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদের কীভাবে দেখতে চাই। মানবজাতি হিসেবে আমরা পৃথিবীতে কীভাবে বসবাস করতে চাই। আমরা যে-পৃথিবী দেখতে চাই তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী হবে। সে-পৃথিবী কবে নাগাদ সৃষ্টি করতে চাই। এ প্রশ্নগুলির জবাব স্থির করে আমাদেরকে সে পথে অগ্রসর হতে হবে। পৃথিবী নামক এই মহাশূন্যযানের আমরা যাত্রী নই, আমরা পাইলট। এর গন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। যে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা মন স্থির করেছি সেখানে পৌঁছানোর জন্য আমাদের সার্বক্ষণিকভাবে এর পরিচালনায় নিয়োজিত থাকতে হবে।

আমি এই বইয়ে গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে আমার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছি। এই অভিজ্ঞতা আপনার মনে দাগ কাটবে কি কাটবে না সেটা আমার জানা নেই। দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী গড়া যদি আপনার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়ে থাকে তবে যাঁরা এটাতে বিশ্বাস করেন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যাঁরা নিয়োজিত তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। আপনি সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী হতে পারেন, রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীল কিংবা উদারপন্থী হতে পারেন, আপনি বয়সে কিশোর, তরুণ, কিংবা বৃদ্ধ হতে পারেন—কিন্তু একটি লক্ষ্যে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। এই লক্ষ্য হল দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী গড়া। সে লক্ষ্যে প্রথম কাজ হল দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ, কিংবা নিজ জেলা বা নিজ গ্রাম গড়া। চেষ্টা করতে দোষ কী?

মুহাম্মদ ইউনূস

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সংস্করণের ভূমিকা

নব্বুইয়ের দশকের মাঝামাঝিতে তরুণ ফরাসি প্রকাশক লঁরা লাফোঁ আমাকে ধরে বসল — তোমার আত্মজীবনী লেখো, আমি প্রকাশ করতে চাই। আমিও রাজি হই না, সে-ও পিছু ছাড়ে না। আত্মজীবনী লেখার প্রস্তাবটি আমার কাছে খুবই উদ্ভট মনে হচ্ছিল। মানুষ অবসর জীবনে আত্মজীবনী লেখে। আমি কেন এ সময়ে আত্মজীবনী লিখতে যাব ? তাছাড়া আমার আত্মজীবনী পড়ার আগ্রহই বা হবে কেন মানুষের ? কিন্তু লঁরা নাছোড়বান্দা। বহু যুক্তি দেখাল সে। পুরো এক বছর ধরে আমার পেছনে লেগে রইল। আমি যেখানেই যাই, সে গিয়ে উপস্থিত হয় সেখানে, আমাকে রাজি করানোর জন্য।

অবশেষে তার কাছে হার মানলাম। আমি রাজি হলাম। আমেরিকার উঠতি লেখক এলেন জোলিসকে দেয়া হল আমার কথাগুলো একত্র করে একটা বইয়ের আকার দিতে। লঁরার খুব তাড়া। তাকে ফ্রাংকফুর্ট বইমেলা ধরতেই হবে। পাণ্ডুলিপি তৈরি হতে না হতেই সে ফরাসি অনুবাদ করিয়ে ওটা ১৯৯৭ সালের ফ্রাংকফুর্ট বইমেলায় নিয়ে গেল। বইমেলায় বইটি বহুদেশের প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে শুনে আমি খুব অবাক হলাম। মূল লেখা ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হল পরের বছরে, ১৯৯৮ সালে। এলেন জোলিস এর আগেই ক্যান্সারে মারা যায়। তার মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। অতি অল্প সময়ে তার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। সে প্রকাশনা উৎসবে থাকতে পারল না বলে আমার খুব দুঃখ লাগল।

এ পর্যন্ত এই বই বাংলাসহ ১৪টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা, ফরাসি, ইংরেজি (যুক্তরাজ্য), ইংরেজি (যুক্তরাষ্ট্র), ইংরেজি (দক্ষিণ এশিয়া), জার্মান, স্পেনিশ, পর্তুগিজ (ব্রাজিল), পর্তুগিজ (পর্তুগাল), চাইনিজ, জাপানি, তুর্কি, ইটালিয়ান, আরবি, গুজরাটি, ডাচ ও কোরিয়ান ভাষায় এটা প্রকাশিত হয়েছে। কোনও কোনও ভাষায় বইটির পর পর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

বহুদিন থেকে অনুরোধ আসছে এটার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হোক। আমি সায় দিই নি। আমার কাছে বরাবর মনে হয়েছে এই বইয়ের বাংলা অনুবাদ পড়লে পাঠক হোঁচট খাবে। মনে হবে তার সঙ্গে লেখক রসিকতা করছে। কারণ মূল বইটি লেখা হয়েছে বিদেশি পাঠকের জন্য — যাঁরা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছু জানেন না। তাঁদেরকে বাংলাদেশ বুঝাতে হয়েছে, বাংলাদেশের দারিদ্র সম্বন্ধে ধারণা দিতে

www.pathagar.com

হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে হয়েছে, বাংলাদেশের মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে বুঝাতে হয়েছে। বাংলাদেশের পাঠকের কাছে এগুলো বাড়াবাড়ি মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমি আশা করছিলাম যে বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য ভিন্নভাবে আরেকটি বই লিখব — গ্রামীণ ব্যাংকের কাহিনীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সে লেখাও হয়ে ওঠে না, বাংলাদেশের পাঠকের দাবিও থামে না।

কাজেই আবার হার মানলাম। মূল বইয়ের অনুবাদই প্রকাশ করতে রাজি হলাম। কলকাতার আনন্দ পাবলিশার্স নিজ উদ্যোগে অনুবাদ করে আমার সম্মতি চাইলে আমি শর্ত দিলাম অনুবাদটি বাংলাভাষী পাঠকদের যেন বিরক্তি উৎপাদন না-করে তার জন্য যথেষ্ট সম্পাদনা করে নিতে হবে। একই অনুবাদ বাংলাদেশেও ছাপার ব্যবস্থা হল। মাওলা ব্রাদার্স বাংলাদেশে প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে উভয় দেশে বাংলা সংস্করণটি একই সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

এই বই লেখা হয়েছে ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে। এরপর আরও ছয় বছর কেটে গেছে। ক্ষুদ্রপুঁজির গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে বিশ্বব্যাপী। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্ষুদ্রপুঁজির শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল ওয়াশিংটনে। তার বর্ণনা এই বইয়ে দেয়া আছে। নভেম্বর ২০০২ সালে তার পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্ক শহরে 'ক্ষুদ্রপুঁজির শীর্ষ সম্মেলন+৫' অনুষ্ঠিত হল। ১৯৯৭ সালের শীর্ষ সম্মেলনে তথ্য দেয়া হয়েছিল তখন পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ক্ষুদ্রপুঁজি পৌঁছানো গেছে মোট ৭২ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের কাছে। তার মধ্যে বাংলাদেশেরই ছিলেন ৫০ লক্ষ পরিবার। এবার নিউইয়র্কের শীর্ষ সম্মেলনে যে তথ্য নিয়ে আলোচনা হল তা হচ্ছে ২০০২ সাল পর্যন্ত সাড়ে তিন কোটি দরিদ্র পরিবারে ক্ষুদ্রপুঁজি পৌঁছেছে। ২০০৩ সালের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা ৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ১০ কোটি দরিদ্র পরিবারে ক্ষুদ্রপুঁজি পৌঁছাবার লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক পথ এখন অতিক্রম করে গেছে। এটা নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। কিন্তু যে গতিতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করছিলাম সে গতি এখনও অর্জন হয় নি বলে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। বহু দেশে অনেক গরিব মানুষ থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছে ক্ষুদ্রপুঁজি পৌঁছানোর ব্যাপারে কোনওদিকে তাগিদ দেখা যাচ্ছে না। ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় ক্ষুদ্রপুঁজির আঞ্চলিক শীর্ষ সম্মেলন হতে যাচ্ছে। সারা বিশ্ব থেকে এক হাজার প্রতিনিধি আসবে এই আঞ্চলিক শীর্ষ সম্মেলনে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রপুঁজির আরও প্রসার হয়েছে। সোয়া এক কোটিরও বেশি দরিদ্র পরিবারে ক্ষুদ্রপুঁজি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের ৩১ লক্ষ দরিদ্র পরিবারও রয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের এই ৩১ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৪৬ শতাংশ পরিবার দারিদ্রসীমা অতিক্রম করে গেছে বলে এক জরিপ থেকে জানা গেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের অঙ্গীকার হল সমুদয় ৩১ লক্ষ পরিবারকে দারিদ্রমুক্ত করা। দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে প্রথম ধাপ হিসেবে আমরা দেখি গ্রামীণ ব্যাংকের সকল সদস্যকে দারিদ্রমুক্ত করা। এতে সফল হলে তখন আরও বড়ো লক্ষ্য অর্জনে সকলের মনে সাহস আসবে।

গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৯৫ সাল থেকে নতুনভাবে বিদেশি কোনও সাহায্য নেয় নি। যে সাহায্য পাইপলাইনে ছিল তা ১৯৯৮ সনে শেষ হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক আমানত এবং

www.pathagar.com

নিজস্ব সম্পদের ওপর ভিত্তি করেই তার কার্যক্রম চালায়। ভবিষ্যতে আর কোনওদিন তাকে কোনো দেশি বা বিদেশি ঋণ গ্রহণ করতে হবে না। গ্রামীণ ব্যাংকের শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত ১৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ক্রমাগত ঋণ বিতরণের পরিমাণ জুলাই, ২০০৩ মাসে মার্কিন ডলারের হিসেবে ৪ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে গেছে। প্রথম বিলিয়ন ডলার পৌঁছতে ১৮ বছর সময় লেগেছিল। তারপর থেকে গড়ে ৩২ মাসে এক বিলিয়ন ডলার করে ঋণ বিতরণ বেড়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৯ শতাংশের ওপরে। ২০০৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২১ শত ৫০ কোটি টাকা। ২০০৩ সালের শেষে ব্যাংকে মোট আমানতের ব্যালেন্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ শত ৩১ কোটি টাকা। গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার সরকারি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সুদের চাইতে কম। গ্রামীণ ব্যাংকের গৃহঋণের টাকায় সদস্যরা প্রায় ৬ লক্ষ গৃহ নির্মাণ করেছেন। গৃহঋণের সুদের হার শতকরা আট টাকা (সরল সুদ)। গ্রামীণ ব্যাংক তার ঋণ গ্রহীতার সন্তানদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে এসেছে। তাদের উচ্চতর শিক্ষার দিকে আগ্রহী করার জন্য বছরে ছয় হাজার ছাত্রছাত্রীকে মাসিক বৃত্তি দিচ্ছে। যারা উচ্চতর শিক্ষায়তনে ভর্তি হচ্ছে তাদের লেখাপড়ার সমস্ত খরচ শিক্ষাঋণ বাবদ ব্যাংক দিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাঋণের সুদের হার শতকরা পাঁচ টাকা। এই ঋণ নিয়ে সদস্যদের দুহাজারের বেশি ছেলেমেয়ে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ৯৫ শতাংশই মহিলা। ঋণগ্রহীতা এই মহিলাদের মাধ্যমে মোবাইল ফোন গ্রামে গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছে। এখন তেতাল্লিশ হাজার ঋণগ্রহীতা মহিলার পরিবার মোবাইল ফোনের ব্যবসা করে সংসারে ব্যাপক উন্নতি আনতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক ভিক্ষুকদেরকেও ঋণ দিচ্ছে, বিনা সুদে। তাঁরা ফেরি ব্যবসা, ছাগল পালন, মুরগি পালনের জন্য ঋণ নিচ্ছেন। তাছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক তাঁদেরকে লেপ কেনার, মশারি কেনার, ঘর বানানোর ঋণও দিচ্ছে। নিজস্ব তহবিল এবং আমানতের অর্থ দিয়েই গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর জন্য দেশের ভেতর থেকে বা বাইরের কারও কাছ থেকে কোনও ঋণ বা অনুদান নিতে হয় না।

গ্রামীণ ব্যাংক গরিব মানুষের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। এটি একটি স্বপ্নও বটে। গ্রামীণ ব্যাংকের ১২ হাজার কর্মী এবং ৩১ লক্ষ সদস্য এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ স্বপ্ন যেন দ্রুত বাস্তবায়িত হয় এটাই আমাদের চেষ্টা।

ঢাকা
জানুয়ারি, ২০০৪

মুহাম্মদ ইউনূস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স চার্লসের মুখবন্ধ

মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় ঢাকায়, ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, মানুষটি ও তাঁর চিন্তাভাবনার কথা আমি ব্রিটেনে বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম, সেই থেকে ওঁর সঙ্গে আলাপ করার আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

আমি এক অসাধারণ মানুষকে দেখলাম। উনি নিজে শুধুমাত্র মহত্তর শুভবুদ্ধির কথা বলেন তাই নয়, নানান প্রতিকূল অবস্থা ও তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের ভয়ংকর তির্যক সমালোচনা উপেক্ষা করেও নিজের আদর্শকে অনুসরণ করে অভীষ্ট কাজ সফল করে তোলেন। আমি একজন প্রেরণাদায়ক, আমুদে ও আত্মবিশ্বাসী মানুষকে পেলাম, যিনি আমাকে অভিনব সজীব অনুভবে আবিষ্ট করলেন। শক্তি ও একাগ্রতার দ্বারা কত অসাধ্য সাধন করা যেতে পারে তিনি তার সার্থক পথপ্রদর্শক।

আমি তারপর থেকেই ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে গেছি, যা যে-কোনও উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার এক প্রয়োজনীয় অধ্যায়। মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশ সন্দেহাতীতভাবে তা করে দেখিয়েছেন। উন্নত দেশগুলিও এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সে সুদূর নরওয়ের গ্রামাঞ্চল অথবা কোনও ব্রিটিশ শহরতলিই হোক না কেন! এই প্রকল্প খুবই কম ব্যয়সাপেক্ষ। সামান্য পুঁজি নিয়েও এই উদ্যোগ শুরু করা যায়। এর একটা পরীক্ষিত সমীক্ষা রয়েছে যা এই বইটিতে সম্পূর্ণ ও চমৎকারভাবে লেখা রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা গরিব ও অনগ্রসর মানুষকে নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করবার সুযোগ দিয়ে, নিজেদের কিছু হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা এবং তাদের পরিবারের উন্নতিসাধনের আশার আলো তিনিই দেখিয়েছেন।

আমি আশা করি, এই বইটি ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের সুফল আরও বৃহত্তর মানব সমাজের কাছে পৌঁছে দেবে। বইটি খুবই উদ্দীপক ও মনোগ্রাহী। যাঁরা মনে করেন পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান তাঁদের করায়ত্ত, এটা হয়তো তাঁদেরকেও স্মরণ করিয়ে দেবে যে সমাজের একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা মানুষদের (যাদের জীবনের দুঃসহ অবস্থা তাঁরা পরিবর্তন করতে চান) কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করলে এই সব সমস্যার স্থান ও কালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সার্থক ও চিরস্থায়ী সমাধান করা সম্ভব।

এটাই আপনাদের কাছে আমার নিবেদন।

সেন্ট জেমস প্রাসাদ
১৯৯৮

চার্লস
প্রিন্স অব ওয়েল্‌স

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব
সূচনা (১৯৪০-৭৬)

১. জোবরা গ্রাম: পাঠ্যপুস্তকের পাতা থেকে বাস্তবে	৩
২. বিশ্বব্যাংক, ওয়াশিংটন ডি. সি.: নভেম্বর ১৯৯৩	১২
৩. ২০ বক্সিরহাট রোড, চট্টগ্রাম	২৬
৪. ক্যামেরার চোখ দিয়ে: ছেলেবেলার নানা শখ	৩২
৫. আমেরিকায় ক্যাম্পাসের দিনগুলি (১৯৬৫-৭২)	৩৭
৬. বিয়ে ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৬৭-৭১)	৪৩
৭. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২-৭৪)	৫৪
৮. কৃষিপ্রকল্প: তেভাগা খামারের অভিজ্ঞতা (১৯৭৪-৭৬)	৬০
৯. ব্যাংকিং: জামানতের লোহার গরাদে ভাঙন, ১৯৭৬	৬৮

দ্বিতীয় পর্ব
পরীক্ষামূলক অধ্যায় (১৯৭৬-৭৮)

১০. কেন ঋণদানের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার	৮১
১১. মহিলা গ্রহীতাদের কাছে পৌঁছনো	৮৬
১২. গ্রামীণ ব্যাংকের মহিলা কর্মীরা	৯২
১৩. গ্রামীণ ব্যাংক: যোগদানের নিয়ম	৯৭
১৪. ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি: নতুন পৃথিবীর সন্ধানে	১০৩
১৫. প্রথাগত ব্যাংকগুলির সঙ্গে তুলনা	১১০
১৬. গ্রামীণ প্রকল্প: কৃষি ব্যাংকের পরীক্ষামূলক শাখা	১১৪
১৭. ঈদ-উল্ ফিতর (১৯৭৭)	১২০

তৃতীয় পর্ব
সৃষ্টি (১৯৭৮-৯০)

১৮. প্রকল্প থেকে ব্যাংক (১৯৭৮-৮৩)	১২৭
১৯. মানসিকতার জগদ্দল পাথরের বিরুদ্ধে	১৩৭
২০. প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য অন্তরায়	১৪৪
২১. গ্রামীণ ব্যাংককর্মীদের প্রশিক্ষণ	১৪৮
২২. গ্রামীণ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক জন্ম (১৯৮২-৮৩)	১৫৬
২৩. গ্রামীণ ব্যাংকের বেসরকারিকরণ	১৬৩

www.pathagar.com

চ তু র্থ প র্ব
গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি

২৪. গ্রামীণ ব্যাংক: নানা দেশে ১৬৯
২৫. আমেরিকার শহরাঞ্চলের অভিজ্ঞতা ১৮৩
২৬. আমেরিকার গ্রামাঞ্চলের অভিজ্ঞতা ১৮৯

প ঞ্চ ম প র্ব
দর্শন

২৭. অর্থনীতিকে নবরূপে আবিষ্কার: সামাজিক চেতনাতাড়িত মুক্ত বাজার ২০১
২৮. স্বকর্মসংস্থান ২১০
২৯. গরিবদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ২১৩
৩০. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা ২১৭
৩১. দারিদ্র: অর্থনীতির এক উপেক্ষিত অধ্যায় ২১৯

ষ ষ্ঠ প র্ব
নতুন দিগন্ত (১৯৯০-১৯৯৭)

ভূমিকা: গ্রামীণ ব্যাংকের গণ্ডি পেরিয়ে ২২৫
৩২. গৃহনির্মাণ ঋণ: বিরাট সাফল্যের এক কাহিনী ২২৬
৩৩. স্বাস্থ্য এবং অবসর ২২৯
৩৪. গ্রামীণ চেক—ফ্যাশানের দুনিয়ায় তাঁতিদের প্রত্যাবর্তন ২৩৩
৩৫. গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন ২৩৮
৩৬. গ্রামীণ ফোন: দরিদ্রদের জন্য প্রযুক্তি ২৪৪
৩৭. গ্রামীণ ট্রাস্ট ২৪৮

স প্ত ম প র্ব
নতুন বিশ্ব

৩৮. হৃত-দরিদ্রদের সাহায্যে আগ্রহী নতুন পৃথিবী ২৫৫
৩৯. বিশ্ব ক্ষুদ্র-ঋণ শীর্ষ সম্মেলন: ২০০৫ সালের গন্তব্য ১০ কোটি গরিব পরিবার ২৬০
৪০. দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী: কখন? কীভাবে? ২৬৬
৪১. দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী কেমন চেহারা নেবে ২৭১

প রি শি ষ্ট

১. ২০০৩ সালের মাঝামাঝিতে গ্রামীণ ব্যাংক ২৭৫
২. গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের প্রধান কয়েকটি ঋণের বিশ্লেষণ ২৮৮
৩. সদস্যদের ব্যবসা কার্যক্রমের মূল খাতভিত্তিক ঋণ বিবরণের তালিকা ২৮৯
নির্ঘণ্ট ২৯১

www.pathagar.com

প্রথম পর্ব

সূচনা
১৯৪০-৭৬

গ্রামীণ ব্যাংক থেকে বিশ্বব্যাংক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১
জোবরা গ্রাম
পাঠ্যপুস্তকের পাতা থেকে বাস্তবে

১৯৭৪ হল সেই বছর যা আমার অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছিল। সেবার বাংলাদেশ ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে।

উত্তরের প্রত্যন্ত গ্রাম ও জেলা-শহরগুলি থেকে অনাহার ও মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হতে লাগল সংবাদপত্রগুলিতে। যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান ছিলাম তা ছিল দেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। প্রথমে আমি এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিইনি। ক্রমশ ঢাকার রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডগুলিতে কঙ্কালসার মানুষের দেখা মিলতে লাগল। অনতিবিলম্বে দু-চারটে মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর আসতে লাগল। ঢাকায় বুভুক্ষু মানুষের ঢল নামল, যা শুরু হয়েছিল এক ক্ষীণধারার মতো।

সর্বত্র অনাহারী মানুষের ভিড়। এমনকি মৃত ও জীবিত মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। পুরুষ নারী ও শিশুদের মধ্যে কোনও তফাত করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। বৃদ্ধদের দেখাচ্ছিল শিশুদের মতো। অন্যদিকে শিশুদের চেহারা বৃদ্ধদের মতো।

এসব মানুষকে শহরের এক জায়গায় জড়ো করে খাবার দেবার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ থেকে লঙ্গরখানা খোলা হল। কিন্তু এগুলির সামর্থ্য ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সে ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলি জনগণকে সতর্ক করে চলছিল। গবেষণা কেন্দ্রগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছিল কোথা থেকে এত ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল আসছে? তারা জীবিত থাকলে আবার কি নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে পারবে? তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা আছে?

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথা অনুযায়ী লাশ দাফনে তৎপর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই মৃতদেহগুলি সংখ্যায় এত বেড়ে যেতে লাগল যে তাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

চেষ্টা করলেও এদের না দেখে কারুর নিস্তার ছিল না। তারা সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল একেবারে নিথর, নিস্পন্দ হয়ে।

তারা কোনও স্লোগান উচ্চারণ করেনি। তারা আমাদের কাছে কিছু দাবিও পেশ করেনি। আমরা বাড়িতে অতিশয় তৃপ্তিকর আহার করছি বলে আমাদের ধিক্কারও দেয়নি। শুধু তারা নিশ্চলভাবে আমাদের দুয়ারে শায়িত ছিল।

মানুষের মৃত্যুর নানা উপায় আছে। কিন্তু অনাহারে মৃত্যু সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে করুণ। কী মর্মান্তিক উপায়ে মৃত্যু! এই পরিণতি খুব ধীরে ধীরে ঘটছিল। প্রতি মুহূর্তে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান কমে আসছিল।

এক পর্যায়ে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেল যে তাদের মধ্যে তফাত

www.pathagar.com

করাই দুষ্কর হয়ে উঠল। রাস্তায় অসহায়ভাবে পড়ে থাকা মা ও শিশু এই পৃথিবীর না অন্য গ্রহের মানুষ তাই যেন সন্দেহ হতে লাগল। মৃত্যু আসছিল এত নিঃশব্দে, এত নিষ্ঠুরভাবে, কেউ যেন তার হাহাকার শুনতেও পাচ্ছিল না।

এত সব ঘটছিল শুধু একজন দুবেলা একমুঠো খেতে পাচ্ছিল না বলে। এত প্রাচুর্যময় জগতে একজন মানুষের অন্নের অধিকার এত মহার্ঘ? চারপাশে আর সবাই যখন উদরপূর্তি করছে তখন তাকে অভুক্ত থাকতে হচ্ছে! ছোট্ট শিশু যে এখন বিশ্বের কোনও রহস্যেরই সন্ধান পায়নি সে শুধু একটানা কেঁদেই চলেছে—শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার প্রয়োজনীয় দুধটুকুর অভাবে। পরের দিন তার সেই কান্নার শক্তিটুকুও আর থাকল না।

* * *

অর্থনীতির তত্ত্বগুলি কীভাবে সব অর্থনৈতিক সমস্যার সহজ সমাধান করে দেয় এই বিষয় ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে আমি রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। এই সব তত্ত্বের সাবলীলতা ও চমৎকারিত্ব আমাকে অভিভূত করত। এখন আমার মনে এক অদ্ভুত শূন্যতার সৃষ্টি হল। যখন মানুষ ফুটপাতে ও ঘরের দুয়ারে অনাহারে মরে পড়ে থাকছে তখন এসব সুচারু তত্ত্বের মূল্য কী? ক্লাসঘরগুলো আমার কাছে মনে হতে লাগল সিনেমার মতো যেখানে অবাস্তব কল্পনাবিলাসে হারিয়ে যাওয়া যায়। কারণ আমরা নিশ্চিত জানি এখানে নায়ক অবশেষে জয়ী হবেই। এতদিন আমি জানতাম সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার একটা সুন্দর সমাধান রয়েছে। কিন্তু ক্লাসঘর থেকে বেরিয়েই আমি কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে থাকলাম। এখানে নিরীহ মানুষেরা নির্দয়ভাবে মার খাচ্ছে ও পিষ্ট হচ্ছে। প্রতিদিনের জীবন আরও দুঃসহ খারাপের দিকে যাচ্ছে। তাদের একমাত্র নিয়তি হচ্ছে অনাহারে মৃত্যুবরণ।

অর্থনীতির এইসব তত্ত্বে কঠোর বাস্তবের প্রতিফলন কোথায়? অর্থনীতির নামে আমি ছাত্রদের কী করে মনগড়া গল্প শোনাব?

এইসব পাঠ্যপুস্তক, গুরুগম্ভীর তত্ত্ব থেকে আমি নিষ্কৃতি পেতে চাইলাম, বুঝলাম শিক্ষার জগৎ থেকে আমাকে পালাতে হবে। দরিদ্র জনগণের অস্তিত্ব ঘিরে যে কঠিন বাস্তব তা আমি আন্তরিকভাবে বুঝতে চাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছের গ্রাম জোবরায় জীবনমুখী অর্থনীতিকে আবিষ্কার করতে উদ্যোগী হলাম।

কপাল ভাল, জোবরা গ্রাম একদম আমার বিশ্ববিদ্যালয় সীমানার লাগোয়া। ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন স্বৈরাচারী সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে। ছাত্রসমাজের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল অত্যন্ত বিরূপ। 'এরাই যত গণ্ডগোলের মূল' এই আশঙ্কায় সব বিশ্ববিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেছিলেন শহর থেকে বহু দূরে, যাতে ছাত্রদের রাজনৈতিক বিক্ষোভ জনবহুল শহর অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত না করে।

তাঁর শাসনকালে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি হল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল জোবরা গ্রামের কাছাকাছি পাহাড় ঘেরা এক অঞ্চল।

* * *

স্থির করলাম আমি আবার নতুন করে ছাত্র হব এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয় হবে জোবরা গ্রাম, গ্রামবাসীরা হবেন আমার শিক্ষক।

www.pathagar.com

প্রতিজ্ঞা করলাম গ্রাম সম্বন্ধে সব কিছু জানার ও শেখার ঐকান্তিক চেষ্টা করব। মনে হল একজন গরিব মানুষের জীবনও যদি আমি সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারি তো ধন্য হব। পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে এটাই হবে আমার মুক্তি। পাখির মতো দূর আসমান থেকে দেখার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এর ফলে ছাত্রদের জীবন ও বাস্তব জীবনের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। বহু দূর থেকে দেখে গোটা পৃথিবীর জ্ঞান হাতের মুঠোয় মনে করলে মানুষ স্পর্ধিত হবেই। সে অনুমান করতে পারে না যে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করলে সব জিনিসকেই ঝাপসা দেখায় এবং তখন প্রকৃত দৃষ্টির অভাব পূরণ করে কল্পিত ধারণা।

আমি চাইলাম সব কিছু একটি কীটের মতো খুব কাছ থেকে দেখতে ও তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে। সোজা পথে যদি কোনও বাধা আসে তো আমি একটি ছোট্ট কীটের মতোই বিকল্প পথের সন্ধান করব এবং ক্রমাগত চেষ্টায় লক্ষ্যে পৌঁছবই। আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে তুলব।

অসংখ্য অভুক্ত মানুষের যে ঢল নেমেছে ঢাকা শহরের বুকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে চরম অপদার্থ বলে মনে হতে লাগল। শহরের নানা স্থানে সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাগুলো খাবার দেবার ব্যবস্থা করেছিল। প্রতিবেশী অঞ্চলগুলো বুভুক্ষু মানুষদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্রতিদিন একজনের পক্ষে কতজনের অন্ন জোগানো সম্ভব? আমাদের চোখের সামনে দুর্ভিক্ষ তার করাল ছায়া নিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল।

আমার ভূমিকাকে অন্যভাবে সংজ্ঞা দিয়ে নিজেকে অপদার্থ ভাবার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করলাম। নিজেকে বোঝালাম যে বহু মানুষকে সাহায্য করতে না পারলেও মাত্র একদিন বা কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও একজন দুর্গতের প্রয়োজনে লাগার ক্ষমতা আমার আছে। সেটাই আমার পক্ষে হবে বিরাট প্রাপ্তি। শুধুমাত্র তত্ত্ব উচ্চারণ না করে যদি অন্তত একজন মানুষকেও সাহায্য করা যায় তাতেও সার্থকতা। এই ভাবনা আমাকে বিরাট শক্তি দিল। নিজেকে পুনরুজ্জীবিত মনে হল। আমি যখন জোবরা গ্রামে গরিব মানুষদের পারিবারিক অবস্থা পরিদর্শন করতে শুরু করলাম তখন আমি কী করতে চাই এবং কেমন করতে চাই এ সম্বন্ধে মনে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে নিয়েছিলাম। আমার চিন্তা এত প্রাঞ্জল এর আগে কখনও মনে হয়নি।

* * *

গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ কোনও সাহায্যে আসতে পারি কি না তা দেখার জন্য আমি জোবরা গ্রামে যাতায়াত শুরু করলাম। আমার সহকর্মী, অধ্যাপক লতিফী আমার সঙ্গে থাকতেন। গ্রামের প্রায় সব পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। গ্রামের মানুষজনকে অতি সহজেই আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর সহজাত।

গ্রামের তিনটি পাড়ায় মুসলমান, হিন্দু ও বৌদ্ধ পরিবারের বাস। বৌদ্ধদের সঙ্গে আলাপ করার সময় আমরা সঙ্গে নিতাম আমাদের ছাত্র দীপালচন্দ্র বড়ুয়াকে, জোবরা গ্রামের এক দরিদ্র বৌদ্ধ পরিবারের সন্তান সে। যে-কোনও কাজে লাগবার জন্য সে স্বেচ্ছায় প্রস্তুত থাকত।

একদিন লতিফী ও আমি জোবরা গ্রামে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটি জীর্ণ কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এক মহিলা বাঁশের মোড়া বানাচ্ছিলেন। জীবনধারণের জন্য কঠোর সংগ্রামের চিহ্ন তাঁর চোখে মুখে।

www.pathagar.com

লতিফীকে বললাম, "আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

গাছগাছালি এবং খাবারের সন্ধানে ব্যস্ত মুরগি ডিঙ্গিয়ে লতিফী আমাকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। "বাড়িতে কেউ আছেন?" লতিফীর গলায় আত্মীয়তার সুর।

মহিলাটি তাঁর নিচু খড়ের চাল দেওয়া, ধুলোভরা দাওয়ায় বসে সম্পূর্ণভাবে হাতের কাজে মগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর দুই হাঁটুর মধ্যে একটি অর্ধসমাপ্ত মোড়া। দুহাতে কঞ্চি মুড়ে মুড়ে তিনি বিনুনি করছিলেন। লতিফীর স্বর শোনামাত্র তিনি কাজ ফেলে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

লতিফী বলল, "ভয় পাবেন না। আমরা অচেনা কেউ নই। দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। আপনাদের প্রতিবেশী। আপনাদের শুধু ক'টা প্রশ্ন করব, আর কিছু না।"

লতিফীর উষ্ণ ও মমত্বপূর্ণ ব্যবহারে আশ্বস্ত হয়ে তিনি মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, "এখন বাড়িতে কেউ নেই।"

তিনি বোঝাতে চাইলেন সেই মুহূর্তে বাড়িতে পুরুষমানুষ অনুপস্থিত। বাংলাদেশের গ্রামে মহিলাদের অনাত্মীয় অচেনা পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ নিন্দনীয়।

দাওয়ায় উলঙ্গ শিশুরা দৌড়াদৌড়ি করছিল। প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে অবাক চোখে আমাদের জরিপ করছিল। ভাবছিল আমাদের আসার উদ্দেশ্য কী হতে পারে।

মুসলমান পাড়ায় মহিলাদের সাক্ষাৎকার নেবার সময় আমাদের কথোপকথন করতে হত চিকের আবডাল থেকে। পর্দা প্রথা অনুসারে বিবাহিতা নারীকে বাইরের জগৎ থেকে একদম নির্বাসিতের মতো থাকতে হত। এই নিয়ম চট্টগ্রাম জেলাতে খুব কড়াভাবে পালন করা হত। সেক্ষেত্রে দোভাষীর মতো কাজ করার জন্য আমি আমার ছাত্রীদের ব্যবহার করতাম।

আমি চট্টগ্রামের মানুষ। স্থানীয় ভাষা আমার জানা। তাই এদের বিশ্বাস অর্জন করা কোনও বাইরের লোকের তুলনায় আমার পক্ষে সহজ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কাজটা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল।

আমি বাচ্চাদের ভালবাসি। মায়ের কাছে তাঁর সন্তানের প্রশংসা করা তাঁকে সহজ হতে দেবার সবচেয়ে স্বাভাবিক উপায়। আমার মায়ের সন্তান সংখ্যা চৌদ্দ (যার মধ্যে ন জন জীবিত আছি)। মায়ের তৃতীয় সন্তান আমি। ভাইবোনদের খাওয়াতে খাওয়াতে ও কাঁথা পালটাতে পালটাতে বড় হয়েছি। বাড়িতে সামান্য অবসর পেলেই আমি ভাইবোনদের কোলে তুলে দোল দিতাম। এই অভিজ্ঞতা কার্যক্ষেত্রে উপকারী ভূমিকা পালন করছিল।

একইভাবে সেখানে শিশুদের একটিকে কোলে তুলে নিলাম। সে কাঁদতে শুরু করল ও প্রাণপণে মার কাছে দৌড় লাগাল। মা তাকে কোলে তুলে নিলেন।

লতিফী জিজ্ঞাসা করল, "আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?"

জবাব এল, "তিনজন।"

"চমৎকার ছেলেটি", আমি বললাম। আশ্বস্ত মা বাচ্চা কোলে করে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বয়স কুড়ির কাছাকাছি। রোগা শরীর, ময়লা রং, চোখদুটি গভীর ঘন কালো। পরনে তাঁর লাল একটি শাড়ি। লক্ষ লক্ষ মহিলা, যাঁরা অভাবের তাড়নায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতিনিধি মনে হল তাঁকে।

"আপনার নাম কী?"

"সুফিয়া বেগম।"

আমি কোনও নোটপ্যাড বা কলম সঙ্গে নিইনি পাছে তিনি সন্ত্রস্ত হন। পরের বার ছাত্রদের সেই ভার দিয়েছিলাম।

"এই বাঁশ কি আপনার নিজের?"

www.pathagar.com

"হ্যাঁ।"

"কী করে এগুলো জোগাড় করলেন?"

"কিনেছি।"

"কত দাম নিল?"

"পাঁচ টাকা।"

"আপনার পাঁচ টাকা আছে?"

"না। আমি পাইকারদের কাছ থেকে ধার করে আনি।"

"তার সাথে আপনার বন্দোবস্ত কী?"

"দিনের শেষে মোড়াগুলো তার কাছেই বেচতে হবে দেনা শোধ করার জন্য। তারপর যা বাঁচবে তাই আমার লাভ।"

"কত টাকায় একটা বেচেন?"

"পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।"

"তা হলে আপনার লাভ হল পঞ্চাশ পয়সা।"

তিনি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন। তার মানে মোট লাভ হল পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

"আপনি টাকা ধার করে নিজে কাঁচা মাল কিনতে পারেন না?"

"হ্যাঁ পারি। তবে মহাজন অনেক সুদ নেয়। যারা ধার নেওয়া শুরু করে তারা আরও গরিব হয়ে যায়।"

"মহাজন কত টাকা সুদ ধার্য করে?"

"ঠিক নেই। কখনও শতে দশ টাকা প্রতি সপ্তাহে। আমার এক প্রতিবেশী তো প্রতিদিন শতে দশ টাকা সুদ দিচ্ছে।"

"তা হলে এত চমৎকার মোড়া বোনার বিনিময়ে আপনার আয় এত কম? প্রতিটিতে পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।"

"হ্যাঁ।"

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুদের হার এত সুনির্দিষ্ট ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে গ্রহীতা পর্যন্ত খেয়াল করেন না এই রকম চুক্তি শোষণের নামান্তর মাত্র। গ্রাম বাংলায় ধান লাগাবার শুরুতে ধার করা এক মণ ধান ফসল কাটার সময় শোধ দিতে হয় আড়াই মণ ধান দিয়ে।

অন্য আরও পন্থাও আছে। জমিকে বন্ধকী হিসেবে ব্যবহার করলে তার পুরো মালিকানা ঋণদাতার দখলে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আসল শোধ হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ঋণদাতার অধিকার কায়েম করার জন্য বায়নানামা করা হয়। ধার শোধ কষ্টসাধ্য করে তোলার জন্য ঋণদাতা কিস্তিতে পরিশোধে রাজি থাকেন না। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার পর মহাজন সেই জমি পূর্ব নির্ধারিত দামে কিনে নেবার অধিকার লাভ করে। মহাজনের জমিতে বেগার খাটা টাকা পাবার আর এক উপায়।

দাদন পদ্ধতিতে চাষের জন্য মহাজন অগ্রিম ঋণ দান করেন এই শর্তে যে ফসল তাঁর নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী তাঁর কাছেই বিক্রি করতে হবে। বলা বাহুল্য সেই মূল্য বাজার দরের চেয়ে অনেক কম। (সুফিয়া বেগম তাঁর বাঁশের মোড়া দাদন পদ্ধতিতে পাইকারের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছিলেন।)

কখনও কখনও সামাজিক কারণে মানুষ দেনা করতে বাধ্য হন (যেমন মেয়ের বিয়ে, কোনও সরকারি কর্মচারীকে ঘুষ দেওয়া, মামলা লড়া, কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানের খরচ বহন করা)। কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও (যেমন খাদ্য ও ওষুধ জোগাড় বা জরুরি কোনও অবস্থা সামাল দেবার জন্য) মানুষকে ধার করতে হয়।

www.pathagar.com

এই সব পদ্ধতিতে গ্রহীতার পক্ষে ঋণের বোঝা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। হয় তাকে আবার কর্জ করতে হয় কেবল মাত্র ঋণশোধের জন্য। পরিণামে তাদের সামনে একটি পথই খোলা থাকে। তা হল মৃত্যু।

প্রত্যেক সমাজে মহাজনী কারবার রয়েছে। দরিদ্র জনগণকে এদের কবল থেকে উদ্ধার না করতে পারলে কোনও অর্থনৈতিক প্রকল্পই দারিদ্রের নিরবচ্ছিন্ন গতিকে রোধ করতে পারবে না।

সুফিয়া বেগম আবার তাঁর কাজ শুরু করলেন। আমাদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করার উপায় তাঁর ছিল না। তাঁর রোদে পোড়া শীর্ণ বাদামি হাত দুটি বাঁশের চাঁচরি বুনছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একইভাবে কাজ করে যান তিনি। আমি তাই দেখতে লাগলাম। এটাই তাঁর জীবনধারণের উপায়। খালি পায়ে, রুক্ষ কঠিন মাটির উপর তিনি উবু হয়ে বসেছিলেন। হাতের আঙুলে কড়া, নখগুলি কাদা মেখে কালো হয়ে গেছে।

তাঁর সন্তানেরা কি পারবে দারিদ্রের এই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে উন্নত কোনও জীবনের সন্ধান পেতে। এই নিদারুণ দুঃখ, যন্ত্রণা থেকে তাঁর শিশুরা মুক্তি পাবে এই চিন্তা একেবারে অর্থহীন। পেটের ভাত, মাথার উপর ছাদ ও পরনের কাপড় জোটাতেই যখন উপার্জনে কুলোয় না তখন কী উপায়ে তারা স্কুলে যাবে?

"তা হলে সারাদিনের খাটুনির বিনিময়ে এই হল আয়? পঞ্চাশ পয়সা মাত্র? আট আনা?"

"হ্যাঁ, তাও যেদিন কপাল ভাল থাকে।"

সুফিয়া দিনে মাত্র পঞ্চাশ পয়সা রোজগার করে এই ভাবনা আমার অনুভূতিকে অসাড় করে দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে আমরা অনায়াসে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কথাবার্তা বলি আর এখানে আমার চোখের সামনে জীবন-মৃত্যুর মতো সমস্যার হিসেবনিকেশ তৈরি হচ্ছে মাত্র ক'টা পয়সার দ্বারা? কোথাও ভীষণ ভুল হচ্ছে। কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে এই মহিলার বাস্তব জীবন প্রতিফলিত হয় না? নিজের উপর ভীষণ ধিক্কার জাগল আমার। রাগ হল গোটা পৃথিবীর উপর, যে এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। কোথাও আশার আলো নেই, সমাধানের কোনও সূত্র পর্যন্ত নেই।

সুফিয়া বেগম নিরক্ষর হলেও তার কর্মদক্ষতার অভাব নেই। তিনি যে জীবিত আছেন—আমাদেরই সামনে বসে দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ করছেন, শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন, সব রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নীরবে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন সেটাই প্রমাণ করে তিনি অন্তত একটি ক্ষমতার অধিকারী, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অসাধারণ দক্ষতা।

দারিদ্রের ইতিহাসও পৃথিবীর ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। সুফিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির কোনও সুযোগই নেই। কিন্তু কেন? উত্তর আমার জানা ছিল না। চারপাশে অগণিত গরিব মানুষের মধ্যেই আমরা বড় হই। অথচ কখনও প্রশ্ন করি না কেন তারা গরিব। আমার মনে হল চিরাচরিত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এমনভাবে তৈরি যে তা সুফিয়ার উপার্জন নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁর রোজগার নিয়মিতভাবে এমনই কম থাকে যাতে তার এক পয়সাও সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। তাঁর আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি কোনওক্রমে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন না। তাই তাঁর সন্তানেরা দারিদ্রের অভিশাপের মধ্যে কাল কাটায়। বাঁচার জন্য শুধু দুমুঠো অন্নসংস্থানের চেষ্টা করে যায়। যেমন তাঁর পূর্বপুরুষেরা যুগে যুগে করে এসেছে।

মাত্র পাঁচ টাকার অভাবে কেউ এত কষ্ট সহ্য করছে তা কখনও শুনিনি। এটা আমার কাছে অসম্ভব ও অসহনীয় মনে হল। আমি কি সুফিয়াকে মূলধনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিজের পকেট থেকে দেব? সেটা খুবই সহজ, একেবারেই জটিলতামুক্ত।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়, আমার অর্থনীতি বিভাগ, বিশ্বজুড়ে সমস্ত অর্থনীতি বিভাগ এবং

www.pathagar.com

হাজার হাজার বুদ্ধিদীপ্ত অর্থনীতির অধ্যাপকেরা কেন এই গরিবদের বুঝতে চেষ্টা করেননি? সত্যিই যাদের সাহায্যের দরকার তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি কেন?

সুফিয়াকে অর্থ সাহায্য দেবার অদম্য ইচ্ছা আমি সংবরণ করলাম। তিনি আমার দয়ার প্রত্যাশী নন। সেটা কোনও চিরস্থায়ী সমাধানও নয়।

* * *

চারদিকে মানুষ কাজ করছে। কেউ ক্ষেতে লাঙল চষছে, কেউ রিকশা সারাচ্ছে, কেউ লোহা পেটাই করছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মানুষের দৈহিক শ্রমের বিরাম নেই। তাদের শারীরিক শক্তি ও কর্মতৎপরতা আমাকে মুগ্ধ করে।

গাড়ি নিয়ে লতিফী ও আমি পাহাড়ের উপর আমার বাড়িতে ফিরে এলাম। শেষ বেলার নরম আলোয় আমরা বাগানে পায়চারি করতে লাগলাম।

পাহাড়ে ওঠানামা আমার স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। আমার পায়ের তলায় উপযুক্ত পরিমাণ খাঁজ না-থাকার কারণে কোনওদিনই আমি খেলোয়াড় হতে পারিনি। খুব ছোটবেলায় নেহাতই খেলার ছলে সাঁতার শিখেছিলাম। ডাক্তাররা বলতেন আমি যথেষ্ট ব্যায়াম করি না। সেইজন্য সর্বত্র আমি পায়ে হেঁটে চলতাম। বন্ধুরা কেবলই শরীরের প্রতি নজর দিতে উপদেশ দিত কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যয় করার মতো সময় বা উৎসাহ কোনওটাই আমার ছিল না।

আমি চিন্তা করছিলাম সরকারের আশ্বাস ও সত্যিকারের বাস্তবতার ফারাকের কথা।

বিশ্ব মানবাধিকার সনদ বলছে;

"প্রতি মানুষেরই তার ও নিজের পরিবারের সকলকে নিয়ে এক ন্যূনতম নির্দিষ্ট মানে সুস্থ সবল থাকার অধিকার আছে। এর অন্তর্গত হল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবার সুযোগ। বেকারত্ব, অসুখ, প্রতিবন্ধকতা, বৈধব্য, বার্ধক্য, জীবিকার অনিশ্চয়তা ও অপ্রতুলতা—ইত্যাদি যেসব অবস্থার উপর তার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই—সেই সব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পাবার অধিকার তার আছে।"

এই ঘোষণাটি এও দাবি করে যে এই অধিকার সম্বন্ধে সদস্য দেশগুলি অবহিত থাকবে।

দারিদ্র এমনই এক সামাজিক অবস্থা যা একটি দুটি নয়, সমস্ত মানবিক অধিকারকে নস্যাৎ করে দেয়। একজন দরিদ্র মানুষের জানার কোনও অধিকারই নেই সরকার কোন কাগজে সই করছেন বা কোন আমলা তার জাবদা খাতায় কী লিখছেন।

সুফিয়ার দৃষ্টি দিয়ে আমি সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম। নিজেকে একটি কীট হিসেবে কল্পনা করলাম আমি এবং আমার সামনে দাঁড়ানো বিপুল বাধা অতিক্রম করার পথ খুঁজলাম। একজন কীভাবে বাঁশ কেনার খরচ জোগাড় করবে? এই বাধা অতিক্রম করার জন্য যে-কোনও পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

সুফিয়ার সমস্যার কোনও সমাধান আমার জানা ছিল না। তাঁর কেন এত দুর্ভোগ তা আমি সহজভাবে বুঝতে চেষ্টা করলাম। তিনি কষ্ট পাচ্ছেন কারণ বাঁশের দাম পাঁচ টাকা এবং তাঁর প্রয়োজনীয় নগদ টাকা নেই। তাঁর যন্ত্রণাময় জীবন একটা কঠিন চক্রের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে—মহাজনের কাছে ধার নেওয়া ও তাকেই হাতের কাজ বিক্রি করা। এই চক্র থেকে তিনি কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছেন না। এইভাবে ভাবলে সমাধান বার করা খুবই সহজ। আমাকে শুধু তাঁকে পাঁচ টাকা ধার দিতে হবে।

এখনও পর্যন্ত তাঁর পরিশ্রম এক কথায় পারিশ্রমিকহীন। সোজা ভাষায় তিনি বেগার

www.pathagar.com

শ্রমিক বা ক্রীতদাস মাত্র। ব্যবসাদার বা মহাজন সবসময় চেষ্টা করছে কাঁচামালের দামের সঙ্গে যৎসামান্য পারিশ্রমিক সুফিয়াকে দিতে যাতে তিনি শুধুমাত্র মৃত্যুকে রুখতে পারবেন। কিন্তু আজীবন ধার তাঁকে করে যেতেই হবে।

আমি বিবেচনা করতে শুরু করলাম সুফিয়া যদি কাজ শুরু করবার জন্য মাত্র পাঁচ টাকা হাতে না পায় তো বেগার শ্রমিক হিসেবে তাঁর ভূমিকা কোনওদিনই পালটাবে না। ঋণই একমাত্র তাঁর সেই টাকা পাবার রাস্তা। তা হলে খোলা বাজারে তাঁর তৈরি মাল বিক্রি করতে কোনও বাধা থাকবে না। কাঁচামাল ও প্রাপ্ত দামের মধ্যে গ্রহণযোগ্য লাভও থাকবে।

* * *

পরের দিন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মাইমুনাকে ডেকে পাঠালাম। ও আমার জরিপ কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছিল। জোবরা গ্রামে সুফিয়ার মতো এরকম কত জন মানুষ মহাজনের কাছে ধার নিতে বাধ্য হচ্ছে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে বললাম মাইমুনাকে।

এক সপ্তাহের মধ্যে তালিকা তৈরি হল। বিয়াল্লিশ জন মানুষের নাম পাওয়া গেল যাঁরা মোট ৮৫৬ টাকা ধার করেছেন।

"হায় আল্লাহ, এতগুলো মানুষের জীবনে এত দুর্দশা মাত্র ৮৫৬ টাকার অভাবে।"

মাইমুনা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। দু'জনেই আমরা সেই হতভাগ্যদের চরম দুর্দশার কথা ভেবে অসম্ভব যন্ত্রণায় স্তম্ভিত হয়ে রইলাম।

* * *

এই সমস্যাটি ভুলে যাওয়া চলবে না। সেই বিয়াল্লিশ জন শক্তসমর্থ, কঠোর পরিশ্রমী মানুষের সাহায্যে আসবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। একটি কুকুর যেমন পুরো স্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত হাড় চিবিয়েই চলে আমিও তেমন এই সমস্যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশ্লেষণ করে চললাম। ৮৫৬ টাকা ঋণ যদি এমন ঋণ হয় যা তাদের নিজের তৈরি মাল যাকে খুশি বেচবার সুযোগ করে দেবে, তবেই তারা তাদের সম্ভাব্য উচ্চতম মূল্য পাবে। ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছে আর তাদের বিকিয়ে থাকতে হবে না।

ঠিক করলাম তাদের আমি ৮৫৬ টাকা ধার দেব। তারা আমাকে সুবিধা অনুযায়ী তা ফেরত দেবে।

সুফিয়ার ঋণ দরকার। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করার জন্য তাঁর কোনও অবলম্বন নেই। পারিবারিক কর্তব্য সাধনের জন্য, জীবিকার জন্য (মোড়া বানানো) ও চরম বিপর্যয়ের মুখে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তা তাঁর একান্ত দরকার।

দুর্ভাগ্যবশত গরিবদের ঋণদানের জন্য তখনও পর্যন্ত কোনও প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ছিল না। চালু প্রতিষ্ঠানগুলির ভ্রান্ত নীতির জন্য ঋণের বাজার পুরোপুরি মহাজনদের কবলিত হয়ে গেছে। এই তথাকথিত নিয়মনিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন দারিদ্রের একমুখী বিশাল স্রোত তৈরিতে সাহায্য করেছে।

মানুষ অপদার্থ বা অলস বলে দরিদ্র নয়। তারা সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তারা

www.pathagar.com

গরিব শুধুমাত্র এইজন্য যে তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার জন্য কোনও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অস্তিত্ব নেই। এটা একটা সাংগঠনিক সমস্যা। কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা নয়।

মাইমুনার হাতে ৮৫৬ টাকা দিয়ে আমি বললাম, "আমাদের তালিকার ৪২ জনকে এই টাকা ধার দিয়ে এসো, যাতে তারা মহাজনের ঋণ শোধ করতে পারে ও নিজেদের তৈরি জিনিস ভাল দামে বেচতে পারে।"

মাইমুনা জিজ্ঞেস করল, "কখন তারা আপনাকে টাকা ফেরত দেবে?"

"যখন পারবে, কোনও তাড়া নেই।" আমি উত্তর দিলাম, "যখন তাদের তৈরি মাল বিক্রি করা সুবিধাজনক হবে, আমি তো আর মুনাফালোভী সুদের কারবারি নই।" ঘটনা এভাবে মোড় নেওয়ায় মাইমুনা হতবুদ্ধি হয়ে চলে গিয়েছিল।

* * *

সাধারণত বালিশে মাথা ঠেকানো মাত্রই আমার চোখের পাতা বুজে আসে। সে রাতে আমার কিছুতেই ঘুম এল না এই লজ্জায় যে আমি সেই সমাজেরই একজন, যে সমাজ ৪২ জন সবল, পরিশ্রমী ও দক্ষ মানুষকে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মাত্র ৮৫৬ টাকার মতো সামান্য অর্থের সংস্থান করতে পারে না।

আমি মাত্র ৮৫৬ টাকা ধার দিয়েছি। এটা ব্যক্তিগত দরদ ও ভাবাবেগ প্রসূত সমাধান মাত্র। আমি যা করেছি তা একেবারেই নগণ্য—এই চিন্তা তার পর কয়েক সপ্তাহ আমাকে ক্রমাগত তাড়িত করছিল। গোটা সমস্যার একটা প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিভাগীয় প্রধানের পিছু ধাওয়া করার চেয়ে একজন হতদরিদ্র অভাবী মানুষের অনেক বেশি প্রয়োজন সহজতম উপায়ে মূলধনের সন্ধান পাওয়া। যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার চিন্তাভাবনা সাময়িক ও ভাবাবেগের পর্যায়ে থাকবে। একটা প্রতিষ্ঠান লাগবে যার উপর তাঁরা নির্ভর করতে পারেন।

একজন গরিব মানুষের পক্ষে পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানের নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য। ক্যাম্পাসের গেটের রক্ষী পুলিশই তাদের ঢুকতে বাধা দেবে। পুলিশ মনে করবে ব্যাটা চুরির মতলবেই এসেছে।

কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু সেটা কী?

ঠিক করলাম স্থানীয় ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ম্যানেজারকে অনুরোধ করব গরিব মানুষদের ধারের ব্যবস্থা করার জন্য। মনে হল তা স্বচ্ছন্দে করা যাবে।

* * *

এ থেকেই সব কিছুর সূত্রপাত। একজন মহাজন হয়ে উঠবার কোনও বাসনাই আমার ছিল না। কাউকে ধার দিয়ে মহৎ হবার ইচ্ছাও ছিল না। আমি চাইছিলাম সমস্যার আশু সমাধান। আজ অবধি আমার ও গ্রামীণ ব্যাংকের সব সহকর্মীর সেই একই স্থির লক্ষ্য—দারিদ্র সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি। এই সমস্যা মানবাত্মাকে গ্লানি ও অপমান ছাড়া কিছুই দেয় না।

www.pathagar.com

২
বিশ্বব্যাংক, ওয়াশিংটন ডি. সি.: নভেম্বর ১৯৯৩

১৯৭৬ সালে ৪২টি পরিবারকে ৮৫৬ টাকা ঋণ দানের সূত্রপাত এবং ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ২৩ লক্ষ পরিবারকে ২৩০ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করা—এই দুইয়ের মধ্যে আমরা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি। ১৯৯৭ সালে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল—উদ্দেশ্য ২০০৫ সালের মধ্যে ১০ কোটি পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবার জন্য বিশ্বজুড়ে প্রচার অভিযান চালানো। গ্রামীণ প্রকল্প সারা বিশ্বে প্রসারিত। ১৯৯৮ সালের মধ্যে ইকোয়েডর থেকে ইরিত্রিয়া, নরওয়ের মেরুপ্রদেশ থেকে পাপুয়া নিউগিনি, শিকাগোর বস্তি থেকে নেপালের প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত প্রায় ৫৮টি দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুকরণে ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি চালু হয়েছে।

* * *

১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাস গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়ই প্রথম আমাদের মতাদর্শ আন্তর্জাতিক ঋণদাতা দেশগুলির অন্তরের গভীরে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট, লুই প্রেস্টন ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-ক্ষুধা-সম্মেলনে (World Hunger Conference) আমাকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালেন।

আমি যখন সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত অগণিত মহিলার ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। একটু সময় নিয়ে আমি সমবেত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। কে ভাবতে পেরেছিল ঢাকার মীরপুরের মণিপুর বস্তির সামনে আমার অফিসঘর থেকে আমি বিশ্ব অর্থনীতি জগতের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আমাদের সাফল্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেব! পাল্লা দেব বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে?

গত কয়েক বছরে গ্রামীণ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে এত তর্কাতর্কি ও মতবিরোধ ঘটেছে যে বিশ্লেষকগণ আমাদের 'তার্কিক-সঙ্গী' আখ্যা দিয়েছেন। বিশ্বব্যাংকের কিছু বিশেষজ্ঞ কখনওই আমাদের ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচির কার্যপ্রণালী সম্যক অনুধাবন করতে পারতেন না। আমাদের উভয়ের পদ্ধতি এতই ভিন্ন যে অনেক বছর ধরে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করার পরিবর্তে বিবাদ-বিসম্বাদে অধিকাংশ সময় নষ্ট করেছি।

আমার শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আমি ১৯৮৬ সালের বিশ্ব খাদ্য দিবসের টেলিভিশন

www.pathagar.com

আলোচনা সভার কথা স্মরণ না করে পারলাম না। আমেরিকার বিশ্ব খাদ্য দিবস সমিতির জাতীয় সমন্বয়কারী প্যাট্রিসিয়া ইয়ং আমাকে বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন সভাপতি বারবার কোনাব্‌ল-এর সঙ্গে টেলিভিশন আলোচনা বৈঠকে একই প্যানেলে মতামত ব্যক্ত করতে আমন্ত্রণ জানালেন। সেই টেলিভিশন কনফারেন্স উপগ্রহের মাধ্যমে ত্রিশটি দেশে সম্প্রচারিত হয়। টেলি কনফারেন্স সম্বন্ধে তখন অবধি কোনও ধারণাই আমার ছিল না। কিন্তু এই আমন্ত্রণ আমি সাগ্রহে গ্রহণ করলাম। ঋণ পাওয়া মানবিক অধিকার বলে গণ্য হওয়া উচিত এবং কীভাবে পৃথিবী থেকে ক্ষুধা দূর করার অভিযানে ঋণ সফল ভূমিকা পালন করতে পারে—তা ব্যাখ্যা করার এই সুযোগ হাতছাড়া করলাম না।

সেই টেলি কনফারেন্সে আমি আমার বক্তব্য পেশ করলাম। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিবাদ করার কোনও ইচ্ছাই আমার ছিল না। কিন্তু তিনি আমাকে উসকানি দিলেন এই বলে যে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক-কে আর্থিক সহায়তা করেছে। এই ভুল তথ্য ঠিক করা আমার কর্তব্য মনে করে আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে বললাম—বিশ্বব্যাংকের এ ব্যাপারে কোনও অবদান নেই। কিন্তু তিনি আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কয়েক মুহূর্ত পরে আবার একই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলেন। এই বার আমি দৃঢ়ভাবে তাঁর মতামতের প্রতিবাদ জানালাম। কেন জানি না মি. কোনাব্‌ল আমার প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে তৃতীয় বার পুনরায় একই ভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করলেন। আমার মনে হল উপগ্রহ চালিত টেলিভিশনের দর্শকদের কাছে পরিষ্কারভাবে সব জানানো দরকার। নতুবা আমি তাঁদের চোখে মিথ্যাবাদী বলে পরিগণিত হব। আমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বললাম: আমরা, গ্রামীণ ব্যাংক, কোনওদিনই বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য চাইনি বা গ্রহণ করিনি। তাদের কর্মপদ্ধতি আমাদের মনোমতো ছিল না। কোনও প্রকল্পে অর্থ সাহায্য দিলেই তাদের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টাগণ তার উপর খবরদারি করে সেই প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ অধিকার করায়ত্ত করেন। প্রকল্পটি নিজেদের মতো করে গড়ে নিতে না পারা পর্যন্ত তাঁরা নিরস্ত হন না। আমাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতির মধ্যে কেউ এসে নাক গলাবে, ছড়ি ঘোরাবে এবং তাদের বিচার বিবেচনায় আমাদের সায় দিতে বাধ্য করবে—এটা কোনওভাবেই আমাদের কাম্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে সেই বছরই বিশ্বব্যাংক নামমাত্র সুদে দুই শত মিলিয়ন ডলার আমাদেরকে ঋণ দেবার আগ্রহ ব্যক্ত করেছিল এবং আমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছি। মি. কোনাব্‌ল আত্মম্ভরিতার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যে বললেন যে বিশ্বের সেরা মেধাবী ব্যক্তিরাই শুধু বিশ্বব্যাংকে কাজ করার সুযোগ পায়। তাঁকে বললাম প্রতিভাবান, ডাকসাইটে অর্থনীতিবিদ নিয়োগ করা মানেই এই নয় যে তাঁরা দরিদ্রদের সহায়ক নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণে সক্ষম হবেন। তাঁরা তাঁদের চিন্তাজগতের আকাশে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারেন—কিন্তু তা গরিবের জীবনের বাস্তবতা অনুধাবনে কোনও কাজে আসে না।

আমার বিবেচনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপদ্ধতি গরিবের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। এই মতামতের সপক্ষে আমি ফিলিপাইনের নিগ্রোস অক্সিডেন্টাল দ্বীপে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। ড. সিসিল ক্যাসটিলো ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তিনি তাঁর কর্মসূচিকে সম্প্রসারণের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন। তিনি ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইফাদের (IFAD) অর্থ সাহায্য চেয়ে আবেদন করলেন। ইফাদও তাঁকে অর্থ জোগান দিতে আগ্রহী হল। ইফাদ তাঁর প্রস্তাব সরেজমিনে তদন্ত করতে বিভিন্ন সময়ে চারবার বিশেষজ্ঞ দল পাঠালেন। মুঠো মুঠো ডলার খরচ হল বিমান ভাড়া, দৈনিক ভাতা এবং বিশেষজ্ঞদের পারিশ্রমিকের জন্য। কিন্তু সেই প্রকল্পের এক পয়সাও জুটল না।

www.pathagar.com

অবশেষে বহুবার বিষয়টি ইফাদের উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরার পর অন্য আরেকটি উদ্যোগ নেওয়া হল। এবার ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পে অর্থ জোগানের জন্য ফিলিপাইন সরকার, এ ডি বি (Asian Development Bank) এবং ইফাদের মধ্যে এক চুক্তি সাক্ষরিত হল এই মর্মে যে এ ডি বি ও ইফাদ ফিলিপাইন সরকারকে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালানোর জন্য ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার ঋণ দেবে। আমলাতন্ত্রের জটিলতায় ১৯৯৮ সালের জুলাই মাস অবধি সে ঋণ নিগ্রোস অক্সিডেন্টাল-এ গ্রামীণ ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি প্রজেক্ট ডুংগাননের কাছে পৌঁছয়নি। এক কথায় বলতে গেলে দীর্ঘ পাঁচ বছরের সমস্যা পর্যালোচনার পরও নিগ্রোস অক্সিডেন্টাল-এর গরিবরা এখনও পর্যন্ত ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের সুফল ভোগ করে না। তাদের মর্মান্তিক অবস্থায় ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচিতে অর্থ যোগান দেয়া ছিল একান্ত জরুরি।

যদি নিগ্রোস অক্সিডেন্টাল-এর প্রজেক্ট ডুংগানন শুধু ইফাদের বিশেষজ্ঞ দলের যাতায়াত খরচের সমতুল্য ঋণ পেতে পারত তা হলে সেই অর্থ শত শত দরিদ্র পরিবারকে ক্ষুদ্র-ঋণের সুবিধা দান করতে পারত।

প্রকৃতপক্ষে বিশেষজ্ঞগণ আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের বিশেষভাবে বিভ্রান্ত করেছে। এরা ধরে নেয় প্রতিটি পদক্ষেপেই গ্রহীতা দেশগুলিকে চালনা করবার প্রয়োজন। উপরন্তু সংস্থা ও তাদের উপদেষ্টারা গ্রহীতা দেশের প্রতি অত্যন্ত দুর্বিনীত আচরণ করেন। এই সব উপদেষ্টাদের খবরদারি গ্রহীতা দেশের চিন্তাভাবনা, উদ্যোগ, সব মৌলিকতা পঙ্গু করে দেয়। আরও দুর্ভাগ্যজনক গ্রহীতা দেশের সরকারি কর্মচারী ও পেশাজীবীদের আচরণ; ঋণদাতাদের দলিলে লিখিত পরিসংখ্যানগুলি ভুল জেনেও তা অবলীলাক্রমে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেন তাঁরা।

ঋণদাতা সংস্থাগুলিকে আর্থিক বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট দেশগুলিতে কত টাকা ঋণ হিসেবে পৌঁছাতে হবে তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নিতে হয়। সংস্থার কর্মকর্তারা এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। তারা সর্বদাই একটা চাপের মধ্যে থাকে। উপদেষ্টারা নিখুঁত পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার ভাব দেখিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মকর্তাদের সাহস জোগান। গ্রহীতা দেশের কর্মকর্তারা সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করে দায়মুক্ত থাকেন। তাঁরা চাতকের মতো চেয়ে থাকেন শেষ কথাটি জানার জন্য। কত টাকা পাওয়া যাবে? অর্থের যথাযথ ব্যবহারের চেয়েও অর্থের পরিমাণের দিকেই তাঁদের আগ্রহ।

* * *

১৯৮৪ সালে আমরা গ্রামীণের পক্ষ থেকে বিশ্বব্যাংক-কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম যে আমরা তাদের কাছ থেকে টাকাও নেব না আমাদের কাজের ব্যাপারে তাদের খবরদারিও মেনে চলব না। বিশ্বব্যাংক আমাদের বাদ দিয়ে নিজেরাই বাংলাদেশে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নিল। ঋণদান ছাড়াও তারা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প যোগ করল একই সঙ্গে। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে হল। আমি জানিয়ে দিলাম, 'যদি তোমরা ঘোড়ার মতো দ্রুতগামী, সিংহের মতো তেজিয়ান, বাঘের মতো সাহসী ও হরিণের মতো দৃষ্টিনন্দন একটা প্রাণী বানাতে চাও তা হলে কাগজে কলমে হয়তো তোমরা এক উন্নততর জীব বানাতে পারো কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ওরকম প্রাণী দেখা যাবে যে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না।'

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সরকার সেবার আমাদের উপদেশ গ্রহণ করে বিশ্বব্যাংকের রচিত প্রকল্পটি গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। তার কারণের বিস্তারিত বিবরণ আমি দিচ্ছি না। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার হল বিশ্বব্যাংকের অভ্যন্তরীণ আমলাতন্ত্র প্রকল্পের দুর্বলতা বিষয়ে আমাদের মতামত থেকে কোনওই শিক্ষালাভ করল না। প্রকল্প চুক্তিপত্র থেকে বাংলাদেশের নাম মুছে দিয়ে শ্রীলঙ্কা সরকারের কাছে প্রকল্পটি গছিয়ে দিল।

* * *

সাহায্যকারী সংস্থাগুলির প্রচুর অর্থ। শুধু ব্যয় করার অপেক্ষা। বিভিন্ন দেশে কতটা ঋণ দেওয়া হবে তার লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কর্মকর্তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যে কর্মকর্তা যত পরিমাণ টাকা ঋণ দিতে পারবেন তাঁর তত তাড়াতাড়ি পদোন্নতি হবে—এটাই ধরে নেয়া যায়।

ঋণদাতা সংস্থার কোনও যুবক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী অফিসার তাড়াতাড়ি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে চাইলে তাঁকে এমন প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে যেটার পেছনে সব চাইতে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় হবে। যিনি যত বেশি অঙ্কের প্রকল্প পাশ করাতে পারবেন তত সহজ হবে তাঁর পদোন্নতি।

কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছি ঋণদাতা সংস্থা বড় অঙ্কের ঋণ অনুমোদনে অতিরিক্ত আগ্রহী। এর জন্য তাঁরা সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের ঘুষ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সবরকম চেষ্টার জন্য প্রস্তুত থাকেন। একটা চালু নিয়ম হল সরকারি আমলাদের নবনির্মিত ব্যয়বহুল বাড়িগুলিকে প্রকল্প দপ্তর হিসেবে ভাড়া নেওয়া। দুনিয়ার নামকরা শহরে কর্মশালা ও সম্মেলনের আয়োজন আর একটি প্রচলিত রীতি। অপ্রয়োজনীয় জানা সত্ত্বেও ঋণদাতা সংস্থা এইসব সফর ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করেন সরকারি আমলাদের সন্তুষ্ট করার জন্য।

ঋণদাতা সংস্থার এক হতাশ বড়কর্তা আমার কাছে একবার কবুল করেছিলেন যে শত চেষ্টা করেও তিনি এক শীর্ষস্থানীয় আমলাকে একটি বড় প্রকল্পের ব্যাপারে রাজি করাতে পারছিলেন না। অবশেষে এই বড় প্রকল্পটি 'গেলানোর' জন্য ওই বড় আমলার গ্রামের জন্য ৫০ লক্ষ ডলারের একটা একেবারে ফালতু প্রকল্পে অর্থ জোগান দিয়েছিলেন। ও-তে কাজও হয়েছে। (যে বড় প্রকল্পটি অনুমোদনের এত প্রচেষ্টা চলছিল, আমার বিবেচনায় তাও ছিল একেবারেই অর্থহীন প্রকল্প)।

পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের প্রকল্পটির ব্যাপারে বিস্তারিত শুনে আমি অত্যন্ত তাজ্জব হলাম। প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠলাম, "তুমি ভাল করেই জানো ও টাকা আমলা মহোদয়ের সাঙ্গপাঙ্গদের পকেটে যাবে।"

বড়কর্তা উত্তর দিলেন, "এটা আমি ভালই বুঝি। আপনিও তা জানেন। কিন্তু প্রকল্প অনুমোদনের জন্য এ ধরনের মূল্য দিতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হয়।"

বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমি বললাম, "সোজা ভাষায় বলো না কেন তুমি ওদের ঘুষ দিচ্ছ।"

বড়কর্তা উত্তর দিলেন, "যাই বলেন, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত নই। এটা একটা ন্যায়সংগত প্রকল্প যা সবরকম বাছাইয়ের মধ্যে দিয়ে নির্বাচিত হয়েছে। আমি জানি যে এই প্রকল্প সব বাধা অতিক্রম করিয়ে আমি নিয়ে যেতে পারব।

এক আন্তর্জাতিক সংস্থার নিজস্ব অর্থ 'ঘুষ' হিসেবে খরচ হচ্ছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হল এই অর্থ সুদসমেত ফেরত দিতে হবে বাংলাদেশের নির্দোষ জনগণকে।

www.pathagar.com

অনেক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, জোগানদার, সম্ভাব্য ঠিকাদার ঘুষ লেনদেনে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে ঋণদাতা সংস্থার বিনিয়োগের সুফলটা এরাই ভোগ করে। একটি গবেষণামূলক সংস্থার সমীক্ষায় প্রকাশ গত ২৬ বছরে বিদেশি সংস্থাগুলি থেকে যে তিন হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে তার পঁচাত্তর শতাংশ বাংলাদেশের জনগণ নগদ হিসেবে হাতে পায়নি। এই অর্থ ব্যয় হয়েছে যন্ত্রপাতি, পণ্যদ্রব্য, রসদ ইত্যাদি ক্রয় করতে এবং বিশেষজ্ঞ, ঠিকাদার, উপদেষ্টাদের পারিশ্রমিক হিসেবে। বাকি যে ২৫ শতাংশ বাংলাদেশ নগদ পেয়েছে তাও স্থানীয় জোগানদার, ঠিকাদার, উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞদের হস্তগত হয়েছে। এদের মাধ্যমে এই টাকার অনেকটাই ব্যয় হয়েছে বিদেশি ভোগ্যপণ্য ক্রয় করতে যা জনগণের কর্মশক্তি ও অর্থনৈতিক মঙ্গলসাধনে কোনও ভূমিকাই পালন করবে না। এটা সাধারণত মনে করা হয় যে অর্থ সাহায্যের একটা মোটা অংশ অফিসার ও রাজনৈতিক নেতাদের ঘুষ দেয়া বাবদ ব্যয় হয়। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করানোর জন্য, কেনাকাটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এরকম লেনদেন হয়ে থাকে বলে সবাই ধরে নেন।

বিশ্বের সর্বত্র একই সংকট। আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রকৃত পরিমাণ হল প্রতি বছর ৫,০০০-৫,৫০০ কোটি ডলার। ফলে প্রকল্পগুলি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সর্বত্রই এই অর্থব্যয়ের প্রকল্পগুলি চালাতে গিয়ে বিশাল কর্মচারী বাহিনীর সৃষ্টি হয়। ক্রমে প্রকল্পগুলি হয়ে উঠে দুর্নীতি ও অদক্ষতার মূর্তি। লাভ হওয়ার চাইতে লোকসানের অঙ্ক হয় বড়। বৈদেশিক সাহায্যের পেছনে একটা ধারণা কাজ করে। সেটা হল এই অর্থ সরকারের মাধ্যমে ব্যয় করতে হবে। যেখানে একদিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির এবং অবাধ বাণিজ্যের জয়গান গাওয়া হচ্ছে সেখানে অন্যদিকে বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ সরকারি যন্ত্রের মাধ্যমে ব্যয় করা হচ্ছে। এটা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং বাজার অর্থনীতিকে মোটেই সাহায্য করছে না।

বহুবারই আমি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি এই অর্থ আমলাতন্ত্রের পিছনে অপব্যয় না হয়ে সরাসরি অভাবী মানুষদের হাতে পৌঁছলে অনেক সন্তোষজনকভাবে ব্যবহার হতে পারত। যদি বাংলাদেশের ১ কোটি দরিদ্র পরিবারের প্রত্যেককে ১০০ ডলার করে মোট ১০০ কোটি ডলার দেওয়া হয় তা দিয়ে তাঁরা উপার্জন সৃষ্টির কাজ বের করবে অথবা ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে ব্যয় করলেও তা স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত পণ্যে ব্যয় করবে।

বিদেশি সাহায্য কোনওক্রমে বাংলাদেশে পৌঁছতে সক্ষম হলেও তা প্রধানত খরচ হয় রাস্তা বা সেতু নির্মাণকার্যে। এগুলি হয়তো ভবিষ্যতে দরিদ্র মানুষের কাজে লাগবে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত জীবন কি তাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে? দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকলে দেখা যাবে তাঁরা আর বেঁচেই নেই। উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও তাঁদের ভাগ্যে জোটে না।

আমি রাস্তা বা সেতু নির্মাণের বিপক্ষে নই। কিন্তু গরিব মানুষ তার সুফল ভোগ করতে পারলে তবেই তা অর্থবহ হয়ে ওঠে। সেই প্রচেষ্টা সম্ভব করে তোলার উদ্যোগের একান্ত অভাব।

এই ধরনের কর্মকাণ্ড গরিবদের কল্যাণের নামে চালানো হলেও তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুফল ভোগ করে শুধুমাত্র বিত্তশালী মানুষ। বিদেশি সাহায্য বিত্তশালীদের জন্য খয়রাতি সাহায্য। গরিব পর্যন্ত এটা পৌঁছয় না।

বিদেশি সাহায্যের উপকার গরিবদের কাছে পৌঁছাতে হলে এর ধরন পালটাতে হবে। নতুন কর্মপদ্ধতি স্থির করতে হবে। এই কর্মপদ্ধতি এমন হবে যাতে সরকারি এই সাহায্য গরিবদের কাছে পৌঁছয়। বিশেষ করে গরিব মহিলাদের কাছে।

সমস্ত উন্নয়নমূলক সাহায্যের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হওয়া উচিত দারিদ্র দূরীকরণ। উন্নয়নকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করতে হবে। এটাকে জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রশ্ন

www.pathagar.com

হিসেবে দেখালে হবে না। জাতীয় আয় বাড়লেই দারিদ্র দূর হবে এরকম একটা অনুভূতিহীন কথা বলে দায়িত্ব শেষ করলে হবে না।

উন্নয়নেরও সংজ্ঞা বদলের সময় এসেছে। সমাজের নীচের ৫০ শতাংশ জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিই হওয়া উচিত উন্নয়নের মাপকাঠি। যদি এই সাহায্য নিচুতলার ৫০ শতাংশ মানুষের আর্থিক অবস্থার কোনও উন্নতি না করতে পারে তা হলে সেটাকে 'উন্নয়নমূলক সাহায্য' বলা যায় না। আর এক অর্থে, সমাজের নীচের ৫০ শতাংশ মানুষের জনপ্রতি আয়ের হিসেবই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত মাপকাঠি।

* * *

এক আমেরিকান সাংবাদিক আমার কাছে এসেছিলেন। বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে আমার বিরামহীন অভিযোগে তিনি খুব বিরক্ত। তাঁর মতে বিশ্বব্যাংক এক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। এই দায়িত্ব তারা কোনওরকম ধন্যবাদ প্রাপ্তির আশা না-রেখেই ক্রমাগত পালন করে যাচ্ছে।

ক্যাসেট রেকর্ডারের মাইক্রোফোন আমার সামনে ধরে তিনি আমাকে তর্কে আহ্বান জানালেন, "সর্বক্ষণ সমালোচনার বদলে আমাকে বলুন আপনি নিজে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হলে কী কী নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতেন?"

আমাকে তর্কে কাবু করার ইচ্ছা তাঁর চোখে মুখে। যেন বলতে চান, বল এবার, তোমার কী বলার আছে।

"বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হলে কী করব তা আমি কখনও ভেবে দেখিনি।" উত্তর দিলাম। এরপর একটু সময় নিয়ে জবাব দিলাম, "বোধহয় আমার প্রথম কাজ হবে এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থানান্তরিত করা।"

"এরকম একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নেবার কারণটা জানতে পারি কি?"

"লুই প্রেস্টন (বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট) বলেন, বিশ্বব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হল দারিদ্র্যের মোকাবিলা করা। তা হলে যেখানে দারিদ্র সমস্যা অত্যন্ত প্রকট সেখানেই বিশ্বব্যাংককে স্থানান্তরিত করা উচিত। ঢাকায় সর্বহারা হতদরিদ্র মানুষ বিশ্বব্যাংককে সর্বদা ঘিরে থাকবে। খুব কাছের থেকে দেখলে, বিশ্বব্যাংক তৎপরতার সঙ্গে এই সংকটের আশু ও বাস্তব সমাধান করতে পারবে।"

তিনি আমার কথায় অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়লেন, ইন্টারভিউ শুরু করবার সময় তাঁর মনোভাব যেমন অসহিষ্ণু ছিল, মনে হল তা অনেক নরম হয়েছে।

আমি বলেই চললাম: আসলে প্রধান কার্যালয় ঢাকা শহরে স্থানান্তরিত করলে বিশ্বব্যাংকের পাঁচ হাজার কর্মচারী সেখানে বদলি হবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন। সন্তানদের ঠিকমতো মানুষ করে তোলার জন্য ও আনন্দদায়ক সামাজিক জীবন যাপনের জন্য ঢাকা শহরকে তাঁরা উপযুক্ত মনে করেন না। অতএব অনেকেই স্বেচ্ছাঅবসর নেবেন ও চাকরি বদল করবেন। সেক্ষেত্রে আমার দুটি সুবিধা। যাঁরা দারিদ্র দূরীকরণের জন্য একান্তভাবে উৎসর্গীকৃত নন তাঁদের বাদ দেওয়া যাবে। সেই খালি পদগুলিতে সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ও অঙ্গীকারবদ্ধ এইরকম কর্মী নিযুক্ত করা যাবে।

আরও একটা সুফল পাওয়া যাবে। প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় কমানো যাবে। আমি এমন ধরনের লোক নিয়োগ করতে পারব যাদের জীবনযাত্রার ধরন যা তা চালিয়ে যেতে অতি মোটা বেতন লাগে না। তা ছাড়া ওয়াশিংটন ডি. সি.-র তুলনায় ঢাকা শহরের জীবনযাত্রার খরচ অনেক কম।

www.pathagar.com

* * *

বিদেশি সাহায্যের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়নের পর বহু বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। যে সময় এই কাঠামো তৈরি করা হয়েছে তখন মনে করা হত বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অলৌকিক সাফল্য নিয়ে আসে, এবং তাই ক্ষুধা ও দারিদ্রকে নির্মূল করতে পারে। দাতা বা গ্রহীতা কেউই আসলে দরিদ্র জনগণের প্রকৃত অবস্থা বোঝার কোনও চেষ্টাই চালান না। ঋণের অর্থ ব্যয় হয় বিশাল চমকপ্রদ নির্মাণ কার্যে, তৈরি হয় বিশাল সেতু, বিশাল কলকারখানা, বাঁধ ইত্যাদি। অচল প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে কিন্তু নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় না। জনগণকে নিজেদের সমস্যা সমাধান করার জন্য নিজেদের সংগঠিত করার কোনও আয়োজন দেখা যায় না। নিজেদের প্রচেষ্টায় তৈরি এবং পরিচালিত স্ব-সাহায্য প্রকল্পগুলিকে 'বয় স্কাউট' প্রকল্প বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়।

এখন আমরা তৃতীয় সহস্রাব্দের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু আজও কত পরিমাণ ডলার অর্থ-সাহায্য প্রাপ্তি ঘটল তাই হয়ে ওঠে গণ-মাধ্যমের মুখ্য সমাচার। মানুষও তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, প্রশ্ন করে না, দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই ভাবে যত বেশি ডলার ততই মঙ্গলজনক।

সাহায্যের গুণগত মানের উপর প্রকৃত মনোযোগ দেওয়া হয় না। দুর্ভাগ্যের কথা অনেকগুলো দশক পার হয়ে যাবার পরও সাহায্যদাতা গোষ্ঠীর আজও মূল প্রশ্ন হল, "এবার কত দেব?"

* * *

১৯৯০ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের মূল্যায়ন করার জন্য একটা গবেষণা হাতে নেবার ব্যাপারে আমরা বিশ্বব্যাংককে অনুমতি দিলাম। আমাদের কর্মীরা অনেকেই শঙ্কিত হলেন—এ যেন মুরগির খাঁচায় শিয়ালকে ছেড়ে দেওয়া, এর থেকে ইতিবাচক লাভ কিছুই ঘটবে না। আমি তাদের বোঝালাম, পক্ষপাতদুষ্ট হলেও বিশ্বব্যাংক-কে এই প্রয়াস চালাতে দেওয়া উচিত। না হলে বিশ্ববাসীকে তারা বোঝাবে আমাদের নিশ্চয়ই কিছু গোপনীয়তা আছে। আমাদের তো আড়াল করার মতো কিছু নেই। তা হলে তাদের উচ্চমানের গবেষক দলকে কেন আমাদের কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখার অনুমতি দেব না?

১৯৯৩ সালের বসন্তকালে গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। জানতে পারলাম তাদের হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক অর্থনৈতিকভাবে সর্বদাই দুর্বল থাকবে অথবা শীঘ্রই দেউলিয়া হয়ে যাবে। আমাদের সহকর্মীরা এই গবেষণা সম্পর্কে আগে যা আশঙ্কা করেছিল সেটাই ফলতে দেখল।

১৯৯১, ১৯৯২ সালে গ্রামীণ ব্যাংক তার কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির কারণে প্রথম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত সেই সময়কার সমীক্ষা ও তথ্যনির্ভর। এরপর ১৯৯৩ সালের প্রথম ভাগের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে (যা আমাদের প্রকৃত সাফল্যের পরিচায়ক) তাদের পুনরায় গবেষণা করতে বলা হল তারা তাই করল। এবার সিদ্ধান্ত হল সম্পূর্ণ বিপরীত।

গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদনে আমাদের প্রতিক্রিয়া সংযোজন করতে হবে এই শর্তেই আমরা বিশ্বব্যাংকের গবেষণায় সম্মতি দিয়েছিলাম। তাই দ্বিতীয়বার পরিস্থিতি পর্যালোচনার প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়েছিল। নতুবা এই গবেষণা বিপরীত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হত না। (এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা ছিল না। তাই সেক্ষেত্রে ভিন্ন মত

www.pathagar.com

প্রকাশের প্রয়োজন হয়নি)।

উভয়ের সুদীর্ঘ সম্পর্কের এক উত্তরণ দেখা গেল। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে অগণিত বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য থাকলেও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বহু কর্মকর্তার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। তাঁরা অনেকেই গ্রামীণ ব্যাংকের উৎসাহী সমর্থক হয়ে উঠলেন। আমাদের বক্তব্যে তাঁদের আগ্রহ জন্মাল। আগে তাঁরা এমনটি ছিলেন না।

* * *

১৯৯৫ সালের প্রথমদিকে আমরা আবার বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত সহজ শর্তের ঋণ প্রত্যাখ্যান করলাম। এবার বাংলাদেশের জন্য সাড়ে সতেরো কোটি ডলার ঋণদানের প্রস্তাব ছিল যার মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য বরাদ্দ ছিল ১০ কোটি ডলার।

ঋণ প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা বেশ একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের একটি তথ্য প্রকল্প অনুসন্ধানী দল এসেছিলেন। মাঝে মাঝে এরকম দল বিশ্বব্যাংক থেকে এবং অন্যান্য দাতা সংস্থা থেকে বাংলাদেশে আসে। তাদের উদ্দেশ্য হল—কী ধরনের প্রকল্পে তাঁরা বিনিয়োগ করতে পারেন তা নির্ণয় করা। বাংলাদেশ সরকারের একজন কর্মকর্তা আমাকে অনুরোধ করলেন সে দলকে আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিতে। আমি তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম যে বিশ্বব্যাংকের কোনও আর্থিক সহায়তা আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা স্থানীয় বাজারে বন্ড বিক্রি করে ও আমাদের মুনাফা থেকে যথেষ্ট আর্থিক সংগতি বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। শীঘ্রই আমরা সবরকম ঋণ মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর সংস্থারূপে আত্মপ্রকাশ করব।

তিনি আমাকে তবুও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। 'বিশ্বব্যাংক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়'—অতএব তাঁর মতে আমার অবশ্য কর্তব্য তাদের অনুরোধ রক্ষা করা। আমি রাজি হলাম।

যখন বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞ ঢাকায় আমাদের দপ্তরে এসে জানতে চাইলেন গ্রামীণ বিশ্বব্যাংকের কাছে কী সাহায্যের প্রত্যাশী, তখন আমি বললাম নিশ্চয়ই কোথাও কোনও ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের কাছে গ্রামীণ ব্যাংক কোনও টাকা চাচ্ছে না।

কয়েকমাস পরে জানলাম, বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ চুক্তিবদ্ধ হতে চলেছে। বিশ্বব্যাংক সরকারকে সাড়ে সতেরো কোটি ডলার সহজশর্তে ঋণ দেবে গ্রামীণ ব্যাংকের মতো ক্ষুদ্র অঙ্কের ঋণদান কর্মসূচির জন্য।

দলিলের খসড়ার একটা অনুলিপি অর্থসচিব আমাদের কাছে পাঠালেন। এ ব্যাপারে আমাদের মন্তব্য জানতে চাইলেন। দেখলাম ঋণের একটা অংশ গ্রামীণ ব্যাংককে দেবার পরিকল্পনা আছে। তখনই প্রত্যুত্তরে চিঠি লিখে দিলাম আমাদের ঋণের কোনও প্রয়োজন নেই।

ব্যাপারটা অর্থমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের খুব অসুবিধেয় ফেলল। যে চুক্তির ব্যাপারে তাঁরা এত খেটেছেন তা আমি ভণ্ডুল করে দিলাম এক কথায়। অর্থসচিব আমাকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি ছিলেন আমার দীর্ঘকালের পরিচিত শ্রদ্ধেয় বন্ধু। এবার আমার আশঙ্কা হল আমি বোধহয় একজন পুরোনো বন্ধু ও সমর্থককে হারাতে চলেছি। আমার অনুমান ঠিক। এই ঋণ গ্রহণে আমাকে রাজি করানোর জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করলেন।

"প্রফেসর ইউনূস, আপনাকে একটি টাকাও ঋণ নিতে হবে না। এই প্রকল্প প্রস্তাবে আপনি আপত্তি না-জানালেই হবে। টাকা নেবেন কি নেবেন না সেটা পরে আপনি বিবেচনা

www.pathagar.com

করে দেখবেন। ওটা আপনার ব্যাপার।

আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম, "যদি আগামী ২০ বছরে আমি একটি টাকাও না নিই, বিশ্বব্যাংকের দলিলে আমরা চিরকাল তাদের প্রদত্ত টাকার গ্রহীতা হিসেবে নথিভুক্ত হয়ে থাকব। বরাবর তারা আমাদেরকে তাদের প্রজেক্ট বলে চিহ্নিত করবে।"

"কিন্তু আমাদের দেশের জন্য এই টাকার বড় দরকার।"

"গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য টাকার প্রয়োজন নেই।"

"লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করুন যাঁরা গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহক নন, গরিবদের কথা ভাবুন।"

"আমি তো গরিবদের কথাই ভাবছি। শুধু তাদেরই জন্য এরকম আপাত সংগতিহীন পদক্ষেপ নিয়েছি। গ্রামীণ ব্যাংক যা প্রচার করে তার অর্থ হল গরিব মানুষের ঋণ পাবার পুরোপুরি অধিকার আছে। সেই ঋণ তাদের বাণিজ্যিক শর্তে দেওয়া যায় এবং তাতে লাভও করা যায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা আছে পৃথিবীর এইসব উত্তরাধিকারহীন দুর্ভাগা মানুষের পরিষেবা করা। এটা শুধু গরিবদের সেবা করার এক মহাসুযোগ হিসেবে দেখতে বলছি না, বলছি যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবলেও এটা করতে হবে। গরিবদের অস্পৃশ্য বা পতিত করে রাখা শুধু অযৌক্তিক বা অনৈতিকই নয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্বুদ্ধিতাও বটে। ১৯ বছরের কঠোর পরিশ্রম, অশেষ বঞ্চনা ও সংগ্রামের পর আমি ও আমার সহকর্মীরা কোনও অবলম্বন ছাড়াই প্রায় স্বনির্ভর হয়ে উঠতে যাচ্ছি। বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবে রাজি হতে অনুরোধ করার পরিবর্তে আপনার উচিত আমাদের অভিনন্দন জানানো।"

অর্থসচিব আমার দিকে চেয়ে রইলেন। স্পষ্টতই তিনি তখন বিচলিত। আমাকে সর্বতোভাবে রাজি করাতে বদ্ধপরিকর হলেও তিনি বললেন, "বুঝতে পারছি কী কঠিন কাজ আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন।"

"আমার তো তা মনে হয় না। আজ এখানে আসবার আগে আমি একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে হারাবার ভয়ে খুবই চিন্তান্বিত ছিলাম, কারণ আমার জন্য আপনি এক লজ্জাকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়বেন। আমি ভয়ানক শঙ্কিত ও অশান্ত ছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রামীণ ব্যাংকের এতদিনের সংগ্রামকে আমি অবজ্ঞা করতে পারি না। এই ঋণগ্রহণে আমি অঙ্গীকার করলে আমার সহকর্মীরা একযোগে বলবেন, 'তাহলে কেন আমরা এত বছর কঠোর পরিশ্রম করেছি। কী উদ্দেশ্যে?'"

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন। "বুঝলাম। আমরা আর আপনার উপর চাপ দেব না।"

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল যেন তক্ষুনি মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেলাম।

* * *

গ্রামীণ ব্যাংককে দাতাসংস্থার উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করে এবার আমি এক নতুন সমস্যার মুখোমুখি হলাম। তা হল 'দয়া' বা 'দানশীলতা'।

ঢাকা শহরে গাড়ি নিয়ে ঢুকলেই পেশাদার ভিক্ষুকরা কিছু পাবার আশায় চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরে।

কেন ভিক্ষা দেব না? যদি মাত্র ক'টা পয়সার বিনিময়ে নিজের বিবেক দংশনের উপশম হয়? কোনও কুষ্ঠরোগী যখন তার গলিত হাত ও আঙুল বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের আশায়,

www.pathagar.com

তখন আমরা এত আতঙ্কিত হয়ে যাই যে তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের হাত পকেটে চলে যায় এবং তাদের হাতে টাকা ধরিয়ে অব্যাহতি পেতে চাই সেই বীভৎস দৃশ্য থেকে। আমাদের কাছে সেই অর্থ একেবারে তুচ্ছ হলেও গ্রহীতার পক্ষে তা পরম আশীর্বাদ। কিন্তু এটা কি উপযুক্ত সমাধান? না। এই অভ্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

দাতা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ঠিকই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের জন্য তিনি একেবারেই কিছুই করছেন না।

ভিক্ষাদান প্রকৃত সমস্যা থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখার সহজ উপায়। দরিদ্রের দুঃখের কিছুটা ভাগ নিতে পারলাম এই অনুভব আমাদের আত্মতৃপ্তি দান করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এভাবে আমরা দারিদ্র-সমস্যার সমাধান এড়িয়ে চলি। কিছু টাকা এই সমস্যার দিকে ছুড়ে দিয়ে আমরা পাশ কাটিয়ে চলে যাই। কিন্তু এভাবে ক'দিন পারব?

ভিক্ষাদান কোনও চিরস্থায়ী সমাধান তো নয়ই—এমনকী তাৎক্ষণিকও নয়। ভিক্ষুক আবার পরের গাড়ির সওয়ারির কাছে, সফরকারিদের কাছে দৌড়বে, একইভাবে ভিক্ষা চাইবে। শেষ পর্যন্ত সে আবার প্রথম দাতার কাছেই ফিরে আসবে। যেহেতু সে এখন ভিক্ষার উপরই নির্ভরশীল। সত্যিই সমস্যার মোকাবিলা করতে চাইলে নতুন সমাধান উদ্ভাবন করতেই হবে আমাদের। দাতা গাড়ির দরজা খুলে ভিক্ষুককে ডেকে বসাতে পারেন। একটু সময় ব্যয় করে আন্তরিকভাবে তার সমস্যার বিষয় আলোচনা করতে পারেন। তার নাম, বয়স, চিকিৎসার সুযোগ, পেশাগত যোগ্যতা কিছু আছে কি না সেসব ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে পারেন। তা হলেই সাহায্য হয়ে উঠবে ইতিবাচক। ভিক্ষা দেবার অর্থ হল ভিক্ষুককে দূরে সরিয়ে দেওয়া যাতে সে দাতার শান্তি বিঘ্নিত না করে।

সাহায্য করা নৈতিক দায়িত্ব কি না, অভাবী মানুষকে সাহায্যের ইচ্ছা উচিত কি না, এ ব্যাপারে আমি প্রশ্ন তুলছি না। শুধু বলতে চাইছি এই সাহায্য কী আকার ধারণ করছে।

গ্রহীতার পক্ষে দানের ফল মারাত্মক হতে পারে। ভিক্ষা তাদের মর্যাদা হরণ করে, নিজে উপার্জন করার উৎসাহ নষ্ট করে দেয়। ফলে গ্রহীতা হয়ে যায় অকর্মণ্য। সে এই ভেবে নিশ্চিন্ত থাকে যে 'এভাবে হাত বাড়িয়ে বসে থেকেই আমার উপার্জন হয়ে যাবে।'

এই একই কারণে বাংলাদেশ ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্যসাধনের এক সচেতন নীতি গ্রহণ করেছে। গত দশ বছর ধরে আমরা আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সামনে এমন একটা ধারণা তৈরি করেছি যাতে মনে হয় আমরা এক দুরারোগ্য সমস্যায় নিমজ্জিত হয়ে রয়েছি। প্রকৃত সত্য হল বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও আমরা ততটা অসহায় বা হতাশ কোনওটাই নই।

কোনও বালককে ভিক্ষা করতে দেখলে আমি আমার স্বাভাবিক আবেগকে সংযত করি। কিন্তু এটাও সত্য যে কখনও কখনও আমি ভিক্ষা দিয়েও থাকি। যখন মানুষের দুঃখ অসহনীয়ভাবে মর্মান্তিক, কোনও অসুস্থ মানুষ বা অসহায় মা তার মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানকে কোলে করে ভিক্ষা চায়, তখন আমি তাদের ভিক্ষা না দিয়ে পারি না। তবে আমি সতত এই ইচ্ছার সঙ্গে যতদূর সম্ভব লড়াই করে চলি।

ব্যক্তি মানুষের উদাহরণ থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে এই সাহায্য নিয়ে কী ঘটে তার নমুনা পাওয়া যেতে পারে।

বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে দেখা যাবে যে-সরকার এই সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে দক্ষ তাকেই সরকার চালানোর জন্য বেছে নিতে হয়। বাইরের সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে সেই সরকারও সচেষ্ট থাকেন। কঠিন পরিশ্রম, আত্মনির্ভরশীলতা,

www.pathagar.com

সাদামাটা জীবনযাপনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করা হয়। বিদেশ থেকে খাদ্য জোগানের নিশ্চয়তা খাদ্যাভাব দূর করার পরিবর্তে আরও খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে। জনগণ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠলে শস্য আমদানিকারক, বিশেষত, জাহাজ-কোম্পানি এবং সরকারি কর্মচারী যারা খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণে নিযুক্ত তাদের সবারই ক্ষতি। তারা চায় খাদ্য ঘাটতি চলতেই থাকুক।

বিদেশি সাহায্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণকে বিকৃত করে। দয়া ভিক্ষাকারী এবং এমন রাজনীতিবিদ যারা দুর্নীতিরাজ কর্মকর্তা ঠিকাদার, ও মূল্যবোধহীন ব্যবসায়ীদের মন জুগিয়ে চলতে পারেন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তাদের সহায়ক হয়ে গড়ে উঠে। স্থানীয় লোকজন যে তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে আসতে আগ্রহী হবে এরকম পরিবেশ আর সৃষ্টি হয় না।

* * *

আমি বক্তৃতা দেবার টেবিলের কাছে দাঁড়ালাম। গ্রামীণ ব্যাংক এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে, যা বাংলাদেশের লোকসংখ্যার দশ শতাংশ। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে গ্রামীণ ব্যাংক তার এক তৃতীয়াংশ গ্রাহকদের দারিদ্রমুক্ত করতে পেরেছে। আরও এক তৃতীয়াংশকে দারিদ্রসীমা অতিক্রমের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। আমার বক্তব্য শুরু থেকেই এক। আমাদের জীবদ্দশাতেই আমরা সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র দূর করতে পারি। শুধু আমাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন।

এই কথাটি বার বার বলা দরকার। কারণ আমরা যা কল্পনা করি তাই আমরা গড়ে তুলতে পারি। আমরা যদি দারিদ্রমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখি তবে আমরা তার রূপকার হবার উদ্যোগ নিতে পারব। আমরা চাইলেই দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে—এই বক্তব্য যখন বিশ্বব্যাংকের সম্মেলনে পেশ করলাম তখন তা একটা বিশেষ গুরুত্ব পেল।

উপস্থিত বিশেষজ্ঞমণ্ডলী ও আমার বহুদিনের সহকর্মীদের মুখের দিকে আমি তাকালাম। সেখানে উপস্থিত অনেকেই আমাদের সত্যিই সাহায্য করেছেন। অন্যরা গ্রামীণ ব্যাংকের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব কি না তাই নিয়ে তখনও সন্দিহান। তাঁরা ভেবেছিলেন এটা নেহাতই স্বপ্ন, এক কথায় দুঃস্বপ্ন।

আমি জানি সেদিন সেইসব সন্দেহপ্রবণ নেতিবাচক মানুষেরাও আমার কথা শুনছিলেন। কারণ গ্রামীণ ব্যাংক এতদিন যা বলে এসেছে তাই বাস্তবে করে দেখিয়েছে।

ব্যাংক আমাকে জানাল: গরিব মানুষ ঋণের উপযুক্ত নয়। আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল, "আপনি কী করে জানলেন? আপনি তো কখনও তাদের ধার দেননি। সম্ভবত এই ব্যাংকই জনগণের উপযুক্ত নয়।" তাঁরা উত্তর দিলেন, "গরিবদের জামানত রাখার মতো কিছু নেই।"

সেটা সত্যি, কিন্তু গরিব মানুষদের আত্মসম্মানবোধ আছে। আছে সহযোগী গ্রহীতাদের সদর্থক চাপ। আমরা পৃথিবীর একটি দরিদ্রতম দেশে দরিদ্রতম মানুষের মধ্যে কাজ করেছি। এঁরা হলেন বাংলাদেশের গ্রামের মহিলা যাঁদের কোনও জমি নেই, সারাজীবন যাঁরা টাকা স্পর্শ করেননি, নিরক্ষর, এঁরা শুধুমাত্র কেউ দেখে ফেলার ভয়ে রাতের অন্ধকারে খোলা জায়গায় তাঁদের প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে বাধ্য হন। কোনও পুরুষের সামনে দাঁড়ানো তাঁদের নিষেধ। অনাত্মীয় পুরুষ হলে মুখ পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হয়। এঁদের সঙ্গে কাজ করে আমরা ৯৮ শতাংশ ঋণ আদায়ের নজির সৃষ্টি করতে পেরেছি।

www.pathagar.com

সম্মেলনে বার বার বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলেন যে গ্রামীণ ব্যাংক যা করার চেষ্টা করেছে তা এক কথায় অসম্ভব।

"ঠিক আছে," আমি বললাম, "ধরে নিন আমরা পাগল কিন্তু আমরা তার পরোয়া করি না। আমরা একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাব।"

আমাদের বলা হল যদিও আমরা অল্পসংখ্যক অভাবী মানুষকে ঋণ দিয়ে তা ফেরত পেতে সক্ষম হয়েছি, বেশিসংখ্যক গ্রামে পৌঁছবার পক্ষে তা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। অথচ আজ আমরা ছত্রিশ হাজার গ্রামে কাজ করছি, সংখ্যায় বাংলাদেশের অর্ধেক গ্রামেরও বেশি, ১০৭৯টি শাখায় আমাদের বারো হাজার কর্মী কাজ করছেন।

আলোচনা হচ্ছিল পরিবারের প্রধান সদস্যকে ঋণের টাকা দেওয়া উচিত। সাধারণত তিনি একজন পুরুষ। তা না করে আমরা হতদরিদ্র মহিলাদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলাম এবং তা দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার বলে প্রমাণিত হল। আজ আমাদের ২১ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে ৯৪ শতাংশ হলেন মহিলা।

অনেকে মতামত দিচ্ছিলেন তাঁরা আমাদের স্বল্প পরিমাণ ঋণদানের বিপক্ষে। গড়ে প্রতি গ্রাহককে পাঁচ হাজার টাকার ঋণ দ্বারা কখনওই পরিবারের অতলস্পর্শী দারিদ্রের মান পরিবর্তনের উপযোগী উপার্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু স্বাধীন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আমাদের গ্রাহকেরা স্থির গতিতে তাঁদের অবস্থার উন্নতি করে চলেছেন। এক দশকের মধ্যে তাঁদের অর্ধেক দারিদ্রসীমার উর্ধ্বে উঠে গেছেন ও একচতুর্থাংশ এই সীমা অতিক্রমের প্রায় নিকটে এসে গেছেন।

স্বাধীন সমীক্ষায় দেখা গেছে, আমাদের গ্রাহকেরা অন্য পরিবারের তুলনায় পুষ্টি, শিশুমৃত্যু, গর্ভ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য বিধান, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক উন্নত মানের জীবন যাপন করেন। আমাদের গৃহনির্মাণ ঋণ দ্বারা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার পরিবারের নিজস্ব বাড়ি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, এ ছাড়া ১ লক্ষ ৫০ হাজার পরিবার গ্রামীণ অর্থ সহায়তায় গঠিত উদ্যোগের আয় থেকে নিজেদের গৃহ নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন।

সম্মেলনে অনেকেই রায় দিয়েছিলেন গ্রামীণ ব্যাংক সর্বদাই দাতাদের ভর্তুকির উপর নির্ভরশীল একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকবে। অথচ আমরা আমাদের শাখান্তরেও কাজ কারবার লাভজনক করে তুলতে পেরেছি। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকৃতপক্ষে এখন পুরোপুরি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাজ করে। টাকার দরকার হলে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। আজ গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের অন্যতম শক্তিশালী আর্থিক সংস্থা।

১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায় গ্রামীণ ব্যাংককে আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিক থেকে একটি উচ্চমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করার পর বিশ্বব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটল। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন বিশ্ব ক্ষুধা সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্বব্যাংকে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম, তখন বিশ্বব্যাংক আমাদের সহযোগী সংস্থা 'গ্রামীণ ট্রাস্ট'-কে ২০ লক্ষ ডলার অনুদান দিয়েছিল, যাতে গ্রামীণ ট্রাস্ট সারা বিশ্বে আমাদের অভিজ্ঞতাকে অনুকরণ করে গ্রামীণ ব্যাংকের অবিকল ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এর ফলে এখন গ্রামীণ ট্রাস্টের সহায়তায় বিশ্ব জুড়ে ২৭টি দেশে ৬৩টি প্রকল্প চালু হয়েছে।

অর্থের পরিমাণের দিক থেকে 'গ্রামীণ ট্রাস্ট'-এ বিশ্বব্যাংকের অবদান বলতে গেলে বেশ অল্প। প্রতিদিন বিশ্বব্যাংক পৃথিবী জুড়ে যা ঋণ দেয় তার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আমরা একে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য বলে বিবেচনা করি। এতে ক্ষুদ্র ঋণের প্রতি বিশ্বব্যাংকের সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে।

www.pathagar.com

দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই-এর ন্যায়সংগত হাতিয়ার হিসেবে, বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্র-ঋণের স্বীকৃতির শুরু এখানেই। শীঘ্রই বিশ্বব্যাংক ক্ষুদ্র-ঋণে অর্থ জোগানের জন্য ও দাতাদের সংগঠিত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত দরিদ্র মানুষদের সাহায্যার্থে তারা দাতা সংস্থাগুলির মধ্যে পরস্পর আলোচনা ও নীতি রচনার জন্য একটা সংগঠন তৈরি করল (CGAP—Consultative Group to Assist the Poorest)। ক্ষুদ্র-ঋণ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের আমন্ত্রণ করা হল এর নীতি নির্ধারণে একটি সহায়কমণ্ডলী (PAG—Policy Advisory Group) গঠন করতে। আমাকে তার সভাপতি করা হল।

* * *

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আমাদের অতীতের মন কষাকষি মুছে ফেলে নতুন করে শুরু করতে আমরা আগ্রহী। আমাদের মধ্যবর্তী বাধা প্রায় দুস্তর। কিন্তু এখন আশা করার সুযোগ রয়েছে যে শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সূত্রপাত করতে আমরা সফল হতে চলেছি।

১৯৯৬ সালে বিশ্বব্যাংকের সভাপতি জেমস ডি উলফেনসন স্বীকার করেন যে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প দরিদ্রতম গ্রামগুলির এবং বিশ্বের জনগণের কাছে বাজার অর্থনীতির স্পন্দন ছড়িয়ে দিয়েছে এবং এই সুশৃঙ্খল পেশাদারি পদক্ষেপ লক্ষ লক্ষ মানুষকে দারিদ্রমুক্তির সম্মানজনক পথ দেখিয়েছে।

* * *

নিয়মিত পরিক্রমাকালে জেমস উলফেনসন যখনই কোনও দেশে আসেন, প্রাণচঞ্চল রাজধানী শহর অপেক্ষা গ্রাম ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠা দূরবর্তী প্রকল্পগুলি পরিদর্শনের জন্য বেশি সময় অতিবাহিত করেন। ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে তিনি যখন তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে আসেন তখন তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখা পরিদর্শন করেন যদিও গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্বব্যাংকের কোনও আর্থিক সহায়তা ছিল না। তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ-গ্রহীতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের বাড়ি গিয়ে নানা সমস্যার কথা আলোচনা করেন।

বাংলাদেশে থাকাকালীন তিনি আমাকে স্পষ্টভাবে জানান যে প্যারিসে এক সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্বব্যাংক সম্বন্ধে আমার নেতিবাচক বক্তব্যে তিনি অত্যন্ত আহত হয়েছেন। ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে গিয়ে 'নতুন' বিশ্বব্যাংক পরিদর্শনের জন্য তিনি আমায় আহ্বান জানালেন। বললেন পূর্বোক্ত সমালোচনাগুলো নতুন করে গড়ে তোলা এই বিশ্বব্যাংকের প্রাপ্য নয়। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে আমি ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে ক'দিন তাঁর সঙ্গে কাটাই ও বিশ্বব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বৈঠক করি।

দুটি বিষয় আমাকে অভিভূত করল। প্রথমত জিম উলফেনসন মুখে যা বলেন সেটাই তাঁর মনের কথা। সেটা তিনি খুব স্পষ্ট, নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন যে বিশ্বব্যাংকের লক্ষ্য হল দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা। অন্য কেউ নন স্বয়ং বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য শুনে সত্যিই আমি রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। শুধু ইচ্ছের কথা জানানো ছাড়াও তিনি আরও অগ্রসর হলেন। তাঁর কর্মপন্থার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে তা সমাপ্ত করার সময়সীমা জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, বিশ্বব্যাংকের লক্ষ্য হবে যেসব মানুষ ভয়ংকর দারিদ্রের মধ্যে কাল কাটাচ্ছে

www.pathagar.com

(অর্থাৎ যাদের আয় দিনে এক ডলারের কম) তাদের সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেক কমিয়ে আনা।

তৎক্ষণাৎ অনুভব করলাম এবার সত্যিই আমি একজন শক্তিমান সমর্থক পেয়েছি। আমরা এখন বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারি।

এই উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে গেল যখন আমি বিশ্বব্যাংকের মুখ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠকে বসলাম। জিম উলফেনসন সম্বন্ধে আমি যে আকর্ষণ বোধ করছিলাম, যে ভাবমূর্তি তিনি আমার মনে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এঁদের কারওরই বক্তব্যে তার প্রতিফলন নেই। কারওর মতে নতুন প্রচেষ্টা পুরোনো পদক্ষেপের সংস্কারমাত্র। তাঁরা এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু খুঁজে পাননি। তাঁদের মতে কর্মপদ্ধতি আগেরই মতো আগের নিয়মেই চলবে। অন্যরা ছিলেন বিভ্রান্ত, কিছুটা দোটানায়। এইসব প্রস্তাবের আক্ষরিক অর্থ কী, তা কীভাবে তাঁদের দায়িত্ব পরিবর্তন করবে সেই বিষয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন।

যদি জিম উলফেনসনকে প্রশ্ন করার সুযোগ থাকত যে পুরোনো কর্মীদের নিয়ে কি নতুন ব্যাংক গড়ে তোলা সম্ভব তা হলে তার উত্তর আমার জানা ছিল। তিনি উচ্চপদগুলির পরিবর্তনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কিন্তু তা পুরোনো বিশ্বব্যাংক-কে কতখানি বদলে দিতে পারবে? আমি অনুমান করতে পারিনি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না যে কাজটা সহজসাধ্য নয়।

চারদিন পরে ফিরে এসে আমি অনুভব করলাম জাহাজের নতুন ক্যাপ্টেন এক নতুন ও দুর্গম গন্তব্যের কথা ঘোষণা করেছেন। দারিদ্র দূরীকরণের মতো কঠিন সমস্যার টালমাটাল স্রোতে নৌচালনার কোনও অভিজ্ঞতাই নাবিকদের নেই। ক্যাপ্টেনও তাদের সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ দিতে পারেননি। জাহাজ কি নতুন গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে? আমার অটল বিশ্বাস ক্যাপ্টেন যদি সৎ ও দৃঢ় চরিত্রের হন তা হলে সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও জাহাজ নতুন গন্তব্যে পৌঁছবেই।

আমি প্রার্থনা করি যে ক্যাপ্টেন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন। গন্তব্যে পৌঁছতে লক্ষ্য অবিচল ও অটল থাকবে। ইতিহাস তাঁর সাফল্য স্মরণ করবে। তাঁর চমকপ্রদ বক্তৃতা নয়।

www.pathagar.com

৩
২০ বক্সিরহাট রোড, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের বাণিজ্যপ্রধান ও সবচেয়ে বড় বন্দর-শহর চট্টগ্রামে ৩০ লক্ষ লোকের বাস। শহরের পুরানো বাণিজ্যিক এলাকায় বক্সিরহাট রোডে আমি বড় হয়েছি। রাস্তাটি খুবই জনবহুল ও স্বল্প পরিসর। শুধুমাত্র একটি ট্রাক যেতে পারার মতো চওড়া, বক্সিরহাট রোড চাক্তাই নদী-ঘাট থেকে পণ্যাদি শহরের বাজারে যাবার প্রধান রাস্তা।

এই রাস্তার এক ধারে সোনাপট্টি। মণিকারদের অঞ্চল। আমরা এখানে ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ির উপরতলায় থাকতাম, বাড়ির নম্বর ছিল ২০ (এখন অবশ্য তা বদলে গেছে)। একতলার সামনের অংশে আমার আব্বার গহনার দোকান ও পিছনের অংশে কারিগরদের জায়গা ছিল। আমাদের জগৎ ছিল পেট্রোলের ধোঁয়া, ফেরিওয়ালা, জাদুকর, ভিক্ষুক, রাস্তার পাগলদের হাঁকডাক, নানান গোলমালে ভরা। রাস্তা আটকে সবসময় ট্রাক বা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। সারাদিন ধরে আমরা ট্রাক-ড্রাইভারদের চিৎকার, তর্কাতর্কি ও জোরদার হর্ন শুনতাম। যেন সবসময় উৎসব চলছে। অথচ এখানেই মাঝরাতের দিকে চারিদিক প্রায় নিঃশব্দ হয়ে আসত। আব্বার কারখানায় স্বর্ণকারদের হালকা হাতুড়ি পেটার ও পালিশ করার মৃদু আওয়াজ শোনা যেত। সর্বদা কিছু না কিছু শব্দ ছিল আমাদের জীবনের নেপথ্য ছন্দ।

উপরতলায় শুধু চারটি ঘর ও একটি রান্নাঘর। আমরা ছোটরা নাম দিয়েছিলাম—'মায়ের ঘর', 'রেডিয়ো ঘর', 'বড় ঘর'। চতুর্থটির কোনও নাম ছিল না। এখানে মাদুর বিছিয়ে তিনবেলা খাওয়া হত, যেখানে আমার আব্বার ছিল কর্তার আসন। বড়ঘরটি ছিল বাচ্চাদের থাকার ঘর। সবার একসঙ্গে এখানে শোওয়া হত।

তিনতলার রেলিং ঘেরা ছাদ ছিল আমাদের খেলার জায়গা। যখন একঘেয়ে লাগত আমরা নীচের তলায় আব্বার দোকানের খরিদ্দার, পিছনের ঘরে কর্মরত স্বর্ণকারদের কাজ দেখতাম। অথবা রাস্তার সারাক্ষণ বদলাতে থাকা এবং প্রায় একই ধরনের বিভিন্ন দৃশ্য দেখে সময় কাটাতাম।

* * *

চট্টগ্রামে ২০ নং বক্সিরহাট রোডে আসার আগে আব্বা অন্যত্র দোকান করতেন। সেটি ১৯৪৩ সালে জাপানি বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরিত্যক্ত হয়। জাপানিরা প্রতিবেশী দেশ বার্মাকে আক্রমণ করেছিল এবং চট্টগ্রামের প্রায় দুয়ারে এসে পড়েছিল। ব্রিটিশ ভারতও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। আমাদের মাথার উপর আকাশ-যুদ্ধ কখনওই তেমন মারাত্মক

www.pathagar.com

হয়নি। জাপানি বিমান থেকে কাগজের ইস্তাহার ফেলা হত ও ছাদ থেকে তাই দেখতে আমরা ছোটরা ভারী মজা পেতাম। কিন্তু একবার বিমান হামলায় আমাদের বাড়ির দেওয়াল ধসে পড়ল। আব্বা তাড়াতাড়ি পুরো পরিবারকে আমাদের আদিবাড়ি বাথুয়া গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। এই গ্রামেই আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জন্মেছিলাম।

শহর থেকে বাথুয়ার দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। আমার দাদা (আব্বার আব্বা) ছিলেন ছোট ব্যবসায়ী। তাঁর জমি ও খামার ছিল। কিন্তু তিনি পেশা বদলে স্বর্ণকারের ব্যবসা গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর বড় ছেলে আমার আব্বা দুলা মিয়া, হাইস্কুল শেষ করার আগেই পড়া ছেড়ে তাঁর আব্বার ছোট্ট ব্যবসায় লেগে গিয়েছিলেন। স্যাকরার কাজে প্রথাগতভাবে হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু অতি শীঘ্রই তিনি স্থানীয় মণিকার হিসেবে মুসলিম খরিদ্দারদের কাছে সুনাম অর্জন করেন।

আমার আব্বা ছিলেন কোমল স্বভাবের মানুষ। তিনি কদাচিৎ আমাদের শাস্তি দিতেন। কিন্তু আমাদের পড়াশুনোর ব্যাপারে খুব কড়া ছিলেন।

আজও কান পাতলে আমি আব্বার দোকানের সিন্দুকের ড্রয়ার টানার শব্দ শুনতে পাই। তাঁর চার ফুট উঁচু তিনটি লোহার আলমারি ছিল কাউন্টারের পিছনের দেওয়াল জুড়ে। যখন দোকান চালু থাকত তখন আলমারিগুলি খোলা থাকত। আলমারির পাল্লার ভিতরের দিকে আয়না এবং সাজানোর তাক করা ছিল। খরিদ্দারদের সেগুলি আলমারি বলে মনে হত না। মনে হত দোকানের সুন্দর শোকেস।

আমরা পড়ছি কি না তা দেখবার জন্য আব্বা উপরে উঠে আসতেন। তাঁর পায়ের শব্দ আমাদের খুব চেনা ছিল। রাতে এশার নামাজ পড়ার আগে বাবা আলমারির ড্রয়ার ঠেলে বন্ধ করতেন। আলমারি বন্ধ করবার ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ আমরা শুনতে পেতাম। প্রতি পাল্লায় তিনটে তালা অর্থাৎ প্রত্যেক আলমারির ছটা করে তালা ছিল। এর ফলে আমি ও আমার বড় ভাই আবদুস সালাম তড়িঘড়ি অন্য কাজ ফেলে বইয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার যথেষ্ট সময় পেতাম। অবশ্য আব্বা যে পাঠ্যপুস্তকের কথা ভাবতেন, বইগুলি মোটেই তা নয়। কিন্তু তিনি কখনও ঠিক কী বই পড়ছি দেখবার জন্য পিছন থেকে উঁকি মারতেন না।

যখন তিনি দেখতেন সামনে বই খোলা ও আমাদের ঠোঁট নড়ছে, তিনি সন্তুষ্ট হতেন। "লক্ষ্মী ছেলে, ভাল ছেলে" বলে তিনি নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে রওয়ানা হতেন।

আমার আব্বা ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনবার তিনি হজ করতে মক্কায় গিয়েছিলেন। ভারী ফ্রেমের চশমায়, দুধ সাদা দাড়িতে তাঁকে দেখাত বিদগ্ধ মানুষের মতো। তিনি কোনওদিন বইয়ের পোকা ছিলেন না। বড় পরিবার ও সফল ব্যবসা সামলাতে গিয়ে আমাদের পড়াশুনোর দিকে খুঁটিনাটি লক্ষ রাখার সময় তার ছিল না। তিনি সবসময় সাদা পোশাক পরতেন—চটি, পাজামা, লুঙ্গি, গেঞ্জি, নামাজ পরার টুপি সবই সাদা। তাঁর সময় কেটে যেত দোকান, নামাজ ও সাংসারিক কর্তব্য সাধনের মধ্যে। কিন্তু আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনমনীয়।

* * *

আমার মা সুফিয়া খাতুন ছিলেন ব্যক্তিত্বময়ী ও দৃঢ়চেতা মহিলা। গোটা পরিবারের শৃঙ্খলারক্ষার ভার ছিল তাঁরই উপর। তিনি যদি তাঁর নীচের ঠোঁটটা কামড়ে কোনও ব্যাপারে

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নিতেন, আমরা জানতাম তার নড়চড় হবে না। তিনি চাইতেন আমরা তাঁর মতো সুশৃঙ্খল হয়ে উঠি।

মা ছিলেন মমতার প্রতিমূর্তি। সম্ভবত তিনিই আমার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। দূর গ্রাম থেকে দূর সম্পর্কের গরিব আত্মীয়রা দেখা করতে আসতেন। তাঁদের জন্য মার ভাঁড়ারে আলাদা করে টাকা রাখা থাকত। গরিব ও হতভাগ্যদের জন্য তাঁর সস্নেহ নজর সম্ভবত আমার ভবিষ্যৎ গন্তব্যস্থল আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছিল। তিনিই আমার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছিলেন।

তিনিও এক ছোট ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে, যাঁরা বার্মায় কারবার করতেন। তাঁর বাবা অর্থাৎ আমার নানা (আম্মার আব্বা) জমিদারি মেজাজে থাকতেন। চাষের জমি ইজারা দিয়ে, বই পড়ে, দিনপঞ্জি লিখে তাঁর সময় কাটত। তিনি ভোজন রসিক ছিলেন। রকমারি খাওয়া-দাওয়া নিয়ে মেতে থাকতেন যার জন্য তিনি নাতিদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

আমার ছোটবেলায় মাকে যেভাবে দেখেছি, আমার মনে পড়ে। পরনে রঙিন জরি পাড় শাড়ি, ডান দিকে সিঁথি করা ঘন কালো চুলে মস্ত খোঁপা বাঁধা। আমি তাঁকে অসম্ভব ভালবাসতাম। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি সবচেয়ে বেশি তাঁর আঁচল ধরে টানতাম।

খরা, বন্যা, ঝড় যাই হোক না কেন, চেষ্টা করলেও তিনি কখনও অসুন্দর হতে পারতেন না। পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময়ের উৎস ছিল তাঁর গলার গান ও গল্প। আবেগে ধরা গলায় তাঁর বর্ণিত কারবালা যুদ্ধের দুঃখের কাহিনী আমি আজও মনে করতে পারি। প্রতি বছর মহর্‌রমের সময় যখন আমরা সেই করুণ ঘটনার স্মৃতিচারণ করতাম তখন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করতাম—

"মা, বাড়ির দিকের আকাশটা লাল ও অন্যদিকেরটা নীল কেন?"

"হায়, নীল হল হাসানের জন্য ও লাল হল হোসেনের জন্য।"

"কারা এই হাসান, হোসেন?"

"তাঁরা দুজন আমাদের মহান পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের (দ:) নাতি। তাঁর পবিত্র দুই চোখের মণি।"

তিনি যখন তাদের মহাপ্রয়াণের কাহিনী শেষ করতেন তখন গোধূলির আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলতেন বাড়ির এদিকের আকাশের নীল রং হল বিষ যা হাসানের প্রাণনাশ করেছিল। অন্যদিকের লাল হল হোসেনের রক্ত। শিশুকালে তাঁর সেই বর্ণনা আমাকে এত মুগ্ধ করেছিল যে পরে বিখ্যাত বাংলা *বিষাদ-সিন্ধু* পাঠও আমার সেই মুগ্ধতাবোধকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি।

আমার ছোটবেলা মায়ের শাসনে কেটেছে। মা যখন রান্নাঘরে সুস্বাদু পিঠে বা মচমচে ভাজা কোনও নাস্তা বানাতেন তখন আমরা তাঁকে ঘিরে থাকতাম, মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতাম, একটু চেখে দেখার জন্য দরবার করতাম। তাওয়া থেকে প্রথম পিঠেটি নামিয়ে ঠান্ডা করার জন্য মা যেই ফুঁ দিতে শুরু করতেন, আমি তাঁর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতাম। কারণ পরিবারের মধ্যে ভাল 'চাখিয়ে' বলে আমার বিশেষ মর্যাদা ছিল।

মার আরও অনেক কিছু আমায় মুগ্ধ করত। আমাদের দোকানে তৈরি অলংকারগুলির উপর তিনি কারুকাজ করতেন। গলার হার বা কানের দুলের সূক্ষ্ম কাজগুলি তিনি সযত্নে পরিপাটি করে শেষ করতেন। কোথাও একটু ভেলভেট, কোথাও এক গুচ্ছ পশমের ফিতে, কখনও বা বিনুনি করা মালা গাঁথার দড়ি বানিয়ে জুড়ে দিতেন। অভিভূত হয়ে আমি দেখতাম

www.pathagar.com

তাঁর দীর্ঘ সরু আঙুলগুলি কেমন করে গয়নার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলছে। এ কাজে যে টাকা তিনি আয় করতেন তা বিলিয়ে দিতেন সাহায্যপ্রার্থী, অভাবী গরিব আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে।

চৌদ্দটি সন্তান জন্মেছিল তাঁর। এদের মধ্যে পাঁচটি সন্তান শিশুকালেই মারা যায়। এত বড় পরিবারে জন্মগ্রহণ করে খুবই অল্পবয়সে আমি অনেক ভার নিতে শিখেছিলাম। শিশুপালন ও পারিবারিক বিশ্বস্ততার গুরুত্ব, পারস্পরিক নির্ভরতা ও সমঝোতার মূল্য বুঝতে শিখেছিলাম।

আমার আট বছরের বড় বোন (বুবু) মমতাজের বিয়ে হয়েছিল খুবই অল্পবয়সে। শহরের এক প্রান্তে তার শ্বশুরবাড়ি, আমাদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। প্রায়ই আমরা সেখানে যেতাম। রকমারি রান্না খেয়ে আসতাম। বুবু মায়ের কাছ থেকে তিনটি গুণ পেয়েছিল। চমৎকার রান্নার হাত, প্রিয় মানুষজনকে তৃপ্তি করে খাওয়ানো এবং অসাধারণ গল্প বলার ক্ষমতা। সে গল্প কোনওদিন ফুরোবার নয়।

আমার তিন বছরের বড় ভাই সালাম আমার সারাক্ষণের সঙ্গী ছিল। জাপানি যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আমাদের মারামারি চলতেই থাকল। মুখে মেশিনগানের আওয়াজ করতে করতে জাপানি বিমান মনে করে আকাশে আমরা নানা রঙের ঘুড়ি উড়াতাম। দুখানি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি চৌখুপ্পি (diamond shaped) ঘুড়ি ছিল জাপানি বিমানের বিকল্প। আমাদের উত্তেজনা চরমে উঠল যখন আব্বা এরই মধ্যে ক'টা জাপানি বোমার খোল কিনে আনলেন। আম্মা সেগুলো ছাদে গাছের টবের কাজে লাগালেন।

* * *

আমি বাসার কাছেই লামারবাজার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। আমাদের এলাকার অধিকাংশ খেটে খাওয়া পরিবারের ছেলেরা ছিল আমার স্কুলের সহপাঠী। ছাত্র ও শিক্ষকেরা সেখানে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন। স্কুলের আর্থিক সংগতি থাকলে তবেই শিশুদের বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ থাকে। তবে এ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিশেষ চেষ্টা ছিল খেটে খাওয়া পরিবারের বাচ্চাদের স্কুলে আনতে।

মেধাবী ছাত্ররা বৃত্তি পাবে এবং জাতীয় স্তরে পরীক্ষা দেবে—এটাই ছিল স্কুলের পক্ষে গৌরবের। অথচ দেখলাম আমার অধিকাংশ সহপাঠী শীঘ্রই স্কুল ছেড়ে দিল।

আমাদের সময়কার শিক্ষালয়গুলি ছাত্রদের মধ্যে সঠিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলত। বৃত্তি পাবার শিক্ষাগত জ্ঞানার্জন ছাড়াও এই শিক্ষা সমাজ সচেতনতা, আধ্যাত্মিক চেতনা, শিল্পানুরাগ, সাহিত্য ও সংগীতপ্রীতি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মতো কবিদের প্রতিভার উৎকর্ষ উপলব্ধি, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ ঘটাত।

বড়দা ও আমি হাতের কাছে বই বা পত্রিকা যা পেতাম সব পড়ে ফেলতাম। আমি রহস্য রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা কাহিনীর ভক্ত ছিলাম। বারো বছর বয়সে আমি নিজেই গোটা এক রহস্যকাহিনী লিখে ফেলেছিলাম।

অবিরত পড়ার খোরাক জোগাড় করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছিল না। প্রয়োজন মেটাতে নিজেদেরই উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছিল—বই কেনা, ধার করা, এমনকি চুরি পর্যন্ত। আমাদের প্রিয় শিশুপাঠ্য পত্রিকা *শুকতারা* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। তাতে নিয়মিত একটি প্রতিযোগিতা থাকত, জিতলে বিনামূল্যে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যেত। পত্রিকায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের নাম ছাপা হত। তাদের মধ্যে একজনের নাম বেছে

www.pathagar.com

আমি সম্পাদককে চিঠি লিখেছিলাম:

মাননীয় সম্পাদক,

আমি অমুক, একজন বিজয়ী প্রতিযোগী। আমাদের ঠিকানা বদল হয়েছে। এখন থেকে আমার বিনামূল্যে প্রাপ্য সংখ্যা ডাকযোগে বক্সিরহাটে পাঠালে বাধিত হব।

বাড়ির নম্বর হল...

আমাদের সঠিক ঠিকানা না দিয়ে পাশের দোকানের ঠিকানা জানালাম যাতে করে পত্রিকা আব্বার হাতে না পড়ে। প্রতি মাসে আমরা সেই বিনামূল্যের সংখ্যার অপেক্ষায় বসে থাকতাম। এবং এই পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে স্বপ্নের মতো কাজ করেছিল।

তুলনামূলকভাবে পাঠ্যপুস্তক অবহেলা করা সত্ত্বেও এই পাঠ্যক্রম বহির্ভূত পড়াশুনোর জন্য প্রতিবছর ক্লাসে আমাদের ফল ভালই হত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে প্রায় প্রতিবারই আমি ক্লাসে প্রথম হয়ে এসেছি।

সাম্প্রতিক বিষয় সম্বন্ধেও আমরা ওয়াকিবহাল থাকতাম। এর জন্য বড়দা ও আমি প্রতিদিন আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডা. রসিকলাল বণিকের চেম্বারে বিভিন্ন সংবাদপত্র পড়ে সময় কাটাতাম।

* * *

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকার পর ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট মধ্যরাত্রে।

এই সময় ভারতের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিকে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবিতে ‘পাকিস্তান-আন্দোলন’ তুঙ্গে উঠেছিল। আমরা জানতাম চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্গত হবে কারণ পূর্ব বাংলায় মুসলমানই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। বাংলার আর কোন কোন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্গত হবে বা সত্যিকারের সীমারেখা কোথায় টানা হবে তা তখনও স্থির হয়নি।

স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সম্ভাবনা হলে, তা ঠিক কখন হবে? এই নিয়ে ২০ নং বক্সিরহাট রোডে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ক্রমাগত তর্ক ও বাদানুবাদ চলতে লাগল। আমরা বুঝতে পারলাম তা হবে একটি রোমাঞ্চকর দেশ যার পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ড হাজার মাইলেরও বেশি ভারতীয় ভূখণ্ড দিয়ে বিভক্ত।

পূর্বাংশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এলাকা হল ৫৫ হাজার বর্গমাইল যা পশ্চিম পাকিস্তানের এলাকার ৬ ভাগের এক ভাগ। পূর্ব অংশে প্রধানত নিচু সমতলভূমি, যাকে নানা ভাগে ভাগ করেছে অসংখ্য নদী, খাল, বিল, হ্রদ ও জলাভূমি। এখানে জমি এতই নিচু যে সমুদ্রের একশো মাইল দূরেও তা জলস্তরের চেয়ে মাত্র ৩০ ফুট উঁচু।

* * *

আমার আব্বা একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও তাঁর বহু হিন্দু বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন (নিশিকাকা, নিবারণকাকা, প্রফুল্লকাকা ও আরও অনেকে)। ছোট হলেও আমি বেশ বুঝতাম ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু ক্ষোভ ও অবিশ্বাস জমা হয়েছে। সংবাদপত্র পড়ে ও রেডিও শুনে আমরা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার খবর জেনেছি। ভাগ্যবশত চট্টগ্রামে তার খুব সামান্য আঁচ লেগেছিল।

www.pathagar.com

কোনদিকে আমাদের রাজনৈতিক ঝোঁক এ ব্যাপারে কারওর কোনও সন্দেহ ছিল না। আমরা সবাই আন্তরিকভাবে ভারতের বাকি অংশ থেকে আলাদা হতে চাইছিলাম। আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট ভাই ইব্রাহীমের যখন বুলি ফুটল সে তার পছন্দের সাদা চিনিকে 'জিন্না চিনি' ও অপছন্দের গুড়কে 'গান্ধী চিনি' বলে ডাকতে শুরু করল।

মা পর্যন্ত তাঁর সান্ধ্যকালীন রূপকথার গল্পে জিন্না, গান্ধী ও মাউন্টব্যাটেনের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলেন যাতে আমরা বুঝতে পারি আমাদের জীবনে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

আমার বড়দা সালাম, যদিও তার বয়স তখন মাত্র দশ, একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সংবাদ সংগ্রাহক হয়ে উঠল—যা সে আজ অবধিও আছে। স্থানীয় বড় ছেলেরা চাঁদ তারা আঁকা সবুজ পতাকার নীচে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে লাগল—তাদের দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছিল।

* * *

এই সব আশা ও স্বপ্ন যে-রাতে শেষপর্যন্ত সত্যি হল সে সময়টা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে—যেন গতকালেরই ঘটনা।

দেখতে পেলাম আমাদের বাড়িটা পতাকা ও সবুজ-সাদা ফেস্টুন দিয়ে সাজানো হয়েছে। সমস্ত পাড়া, এককথায় পুরো শহরটারই সাজ সাজ রব। বাইরে আমরা জ্বালাময়ী রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রায়শই তা চাপা পড়ে যাচ্ছিল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' সোচ্চার ধ্বনিতে। তখন মধ্যরাত, কিন্তু পথে ভর্তি লোকজন। যেন সেটা একটা বিশাল হলঘর। ছাদ থেকে আমরা বাজি পোড়াচ্ছিলাম, অন্যদেরও তাই করতে দেখলাম। চারিদিকে প্রতিবেশীদের ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম যাঁরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ফানুসের ও হাউইয়ের আলো ও বিস্ফোরণ দেখছিলেন। সারা শহর উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিল। রাতের আকাশ উজ্জ্বল রঙে সজীব হয়ে উঠেছিল।

মাঝরাতে আব্বা আমাদের নীচে রাস্তায় নিয়ে গেলেন। তিনি কোনওদিনই সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না। কিন্তু ঐক্য ও সংহতির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য মুসলিম লিগের ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই রাতে তিনি গর্বভরে ন্যাশনাল গার্ডের পোশাক পরলেন, এমনকি জিন্না টুপি পর্যন্ত। আমার ভাইবোন দুই বছরের ইব্রাহীম ও ছোট্ট টুনুও আমাদের সাথে ছিল। ঠিক মাঝরাতে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থগিত হল। গোটা শহর অন্ধকারে ডুবে গেল। পরমুহূর্তে আলো জ্বলে উঠল। একটি নতুন দেশের জন্ম হল।

'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগানে বার বার সোচ্চার হয়ে উঠল চট্টগ্রামের প্রতিটি অঞ্চল।

সাত বছর বয়সে এই প্রথম আমি দেশবাসীর জন্য প্রতিটি শিরায় গর্ব ও উম্মাদনা অনুভব করলাম।

আরও অনেক কিছু তখনও ঘটতে বাকি ছিল।

www.pathagar.com

৪
ক্যামেরার চোখ দিয়ে : ছেলেবেলার নানা শখ

বুবু, বড়দা, আমি, ইব্রাহীম ও টুনু—এই পাঁচ ভাইবোনের পর আম্মা আরও চারটি সন্তানের জন্ম দেন। আইয়ুব, আজম, জাহাঙ্গীর ও মঈনু।

আমার যখন ন বছর বয়স, তখন আম্মা হঠাৎ হঠাৎ বিনা কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁর আচরণ উত্তরোত্তর অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। তাঁর মানসিক ব্যাধির সূত্রপাত, আমাদের পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা।

দিন দিন তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। শান্ত অবস্থায় তিনি নিজের সঙ্গে অর্থহীন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি নামাজে বসে কোনও বইয়ের একই পাতা থেকে বা একই কবিতা একটানা পুনরাবৃত্তি করে যেতেন। প্রথম প্রথম আমরা ছোটরা বুঝতে পারতাম না তাঁর এই আচ্ছন্ন অবস্থায় আমরা কী করব।

অশান্ত অবস্থায় তিনি চিৎকার করে অশ্রাব্য ভাষায় মানুষজনকে গালিগালাজ করতেন। বন্ধু, প্রতিবেশী বা পরিবারের কোনও একজনকে কর্কশ ভাষায় দোষারোপ করতেন। কখনও সেই তিরস্কারের পাত্র হতেন রাজনৈতিক নেতা অথবা বহুকাল আগে মৃত কোনও ব্যক্তি। কাল্পনিক শত্রুদের অপমান করতেন এবং আচমকা কোনও সতর্কতার সুযোগ না দিয়েই অশান্ত হয়ে উঠতেন।

এটা ছিল আমাদের সবার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। আম্মা সবাইকে আক্রমণ করতেন—বাচ্চা থেকে বয়স্ক কেউ বাদ যেত না। ঘুমানোর সময় আমরা কেউ জানতাম না সেদিন রাতে নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে ঘুমাতে পারব, না আম্মার প্রবল চিৎকার ও মারধোর শুরু হবে। তিনি অশান্ত হয়ে উঠলেই তাঁকে শান্ত করার জন্য আব্বাকে আমার সাহায্য করতে হত। আম্মার মারধোর ও জিনিস ছোড়ার হাত থেকে ছোট ভাইবোনদের বাঁচাতে হত। এইসব বিপজ্জনক পরিস্থিতির পর আম্মা আবার শান্ত ও কোমল হয়ে যেতেন। আমাদের প্রাণভরে আদর করতেন, ছোটদের দেখাশুনো করতেন।

তাঁর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যেতে লাগল। তিনি আমাদের পড়াশুনা, স্কুল, কাজকর্মের জগৎ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন।

* * *

আম্মাকে জোর করে শান্ত করা বা কোনওভাবে তাঁকে ব্যাধিমুক্ত করার প্রয়াসে আব্বাকে যে নানান রকম যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত, তাও আমাদের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। আব্বার চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। সে সময় দেশে চিকিৎসার যা যা

www.pathagar.com

সুযোগ ছিল যথাসাধ্য সবই করিয়েছিলেন আম্মার জন্য। নানী ও আমার দুই খালারও মায়ের মতো অসুখ ছিল। আব্বা ভেবেছিলেন রোগটি বংশগত। কোনও ডাক্তার রোগের কারণ হদিস করতে পারেননি। সৌভাগ্যবশত আমরা ভাইবোনেরা কেউই এই রোগের শিকার হইনি।

হতাশ হয়ে আব্বা টোটকা চিকিৎসার দ্বারস্থ হলেন। ওঝা ডাকা হল। সম্মোহন, ঝাড়ফুঁক পর্যন্ত চলতে লাগল আম্মার উপর। কতকগুলি উপায় ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। আম্মা কোনও দিন এই ধরনের চিকিৎসার সঙ্গে সহযোগিতা করেননি। এবং কোনওটাই ফলপ্রসূ হয়নি।

একজন নামজাদা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আম্মাকে 'সম্মোহনের' বিধান দিয়েছিলেন, তা দেখে আমাদের তাক লেগে গেল। আমরা পরস্পরের উপর সেই বিদ্যা প্রয়োগ করতে লাগলাম। পরে আরও একজন ডাক্তার রোগের উপশমের জন্য কড়া ঘুমের ওষুধ খাওয়াবার নির্দেশ দেবার পর আম্মা আফিঙে আসক্ত হয়ে পড়লেন।

ক্রমে ক্রমে আমরা ভাইবোনেরা এই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিলাম। মার সাহায্য ছাড়াই জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হতে শিখলাম। খালা (মায়ের ছোটবোন) ও বুবু আমাদের মায়ের অভাব পূরণ করেছিলেন। এইসব পরিস্থিতিকে একটু কৌতুকের মিশেল দিয়ে আমরা গ্রহণ করতে শিখলাম। এতে আমাদের দুঃখ অনেকটা লাঘব হত।

"আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাষ কী?" আমরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতাম। অর্থ হল, আগত কয়েক ঘণ্টায় মায়ের মেজাজ কেমন আশা করা যায়। তিনি চুপচাপ হয়ে গেলেই আন্দাজ করতাম এবার ঝড় আসতে চলেছে। কখনও তা হত ভয়ানক ঘূর্ণিঝড়ের মতো। বিশেষ কারো নাম উচ্চারণ মাকে হঠাৎ করে উত্তেজিত করতে পারে এই ভয়ে আমরা বাড়ির সবাইকে সাংকেতিক নামে ডাকতাম। কেউ দুই নম্বর, কেউ বা চার। সেই নাম ছোট বড় সবাই ব্যবহার করতে শুরু করলেন, এমনকি দরকার ছাড়াও। আমার ভাই ইব্রাহীম দশ বছর বয়সে একটা হাসির নকশা লিখেছিল তাতে আমাদের বাড়িকে বেতারকেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করেছিল। সেখানে আম্মা যেন সবসময় নানান ভাষায় সুর সহকারে নানা বয়ান সম্প্রচার করে চলেছেন।

এই যন্ত্রণাময় কঠোর বাস্তবের মধ্যে যিনি সবচেয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি হলেন আমার আব্বা। তিনি আশ্চর্য চমৎকারভাবে এই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিলেন। ওইরকম বিশৃঙ্খল পারিবারিক অবস্থার মধ্যে অভাবনীয় সুস্থির ভাব বজায় রাখলেন। আম্মার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মমত্বপূর্ণ। পরের তেত্রিশ বছর, যতদিন আম্মা এই রোগগ্রস্ত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন, বাবা তাঁকে সবরকম ভাবে ভালবাসা ও যত্ন দিয়ে গিয়েছিলেন।

মায়ের সঙ্গে তিনি ব্যবহার করতেন এমনভাবে যেন কিছুই বদল হয়নি। সেই ১৯৩০ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে যে সুফিয়া খাতুনকে তিনি বিয়ে করে এনেছিলেন, আজও যেন সে একইরকম আছে। আমাদেরও তিনি এইরকম ব্যবহার করতে শিখিয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর প্রতি আব্বার ছিল অবিচল ধৈর্য ও আনুগত্য।

আম্মার অসুখের সূচনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল আব্বা একই সঙ্গে আমাদের আম্মা ও আব্বা দু'জনের ভূমিকা পালন করে গেছেন। সন্তানদের মানুষ করে তোলা ছাড়া তাঁর আর কোনও লক্ষ্য ছিল না।

আজ আমরা যা হয়েছি তার বেশির ভাগটাই আব্বার জন্য।

www.pathagar.com

* * *

আমাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে আব্বা কখনও দ্বিধা করেননি। কিন্তু তিনি আমাদের একদম সরল আড়ম্বরহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন। আমাদের হাতখরচও ছিল যৎসামান্য। বই পড়া ছাড়াও বড়দা ও আমার নানান বিষয়ে আগ্রহ ও শখ জন্মেছিল। সিনেমা দেখা ও বাইরে খাওয়া তার মধ্যে অন্যতম। খুব দামি খাবারের দিকে কিন্তু আমাদের ঝোঁক ছিল না। আমার প্রিয় খাবার ছিল আলুর চপ ও ভিনিগারে ভেজানো ভাজা পেঁয়াজের পুর ভরা আলুর দম। বাড়ির কাছেই একটা সাধারণ চায়ের দোকানে জুঁই ফুলের গন্ধে ভরপুর, ধোঁয়া ওঠা চায়ের সঙ্গে এই জলখাবার আমাদের খুব পছন্দ ছিল। বাড়াবাড়ি কিছু নয়, কিন্তু এর জন্য অতিরিক্ত কিছু নগদ টাকার দরকার হত। আব্বা অবশ্য আমাদের এরকম শখের কথা জানতেন না।

চট্টগ্রাম জেলায় বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাবার সুবাদে মাসে মাসে কিছু টাকা আমার হাতে আসত। এই টাকা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। বাকি টাকাটা আমি জোগাড় করতাম আব্বার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে। দোকানে খুব ভিড়ের সময় কাছাকাছি থাকলেই সাহায্য করার জন্য আমার ডাক পড়ত। আমি সোৎসাহে হাজির হতাম। তাঁর খুচরো পয়সার ড্রয়ার থেকে সেসময় নিরুপায় আমি কিছু টাকা ও পয়সা সরাতাম।

এই আত্মসাৎ প্রক্রিয়া কখনোই মাত্রা ছাড়াত না। অথচ এতে আমাদের সাধারণ চাহিদা দিব্যি মিটে যেত। আব্বার কাছে এর জন্য কোনওদিনই ধরা পড়িনি।

প্রথম যে ক্যামেরাটা বড়দা ও আমি মিলে কিনেছিলাম সেটা একটা বক্স ক্যামেরা। সর্বত্র ওটা নিয়ে আমরা ঘুরতাম।

ছাদ থেকে বিশেষজ্ঞদের মতো আমরা ছবি তোলার বিষয় ও দৃশ্য নির্বাচন করতাম। পোর্ট্রেট, রাস্তা, বাড়ি, উৎসব, নিসর্গ ইত্যাদি। এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গী ছিলেন পাড়ার স্টুডিয়োর মালিক। সেই ব্যতিক্রমী মানুষটির স্টুডিয়োর নামও ছিল রোমাঞ্চকর—'মায়াপুরী স্টুডিও'। তিনি আমাদের ডার্করুমে ঢোকার অনুমতি দিতেন এবং সাদাকালো ছবি প্রিন্ট ও ডেভেলপ করতে দিতেন। আমরা চেষ্টা করতাম ছবিগুলিতে বিশেষ মাত্রা যোগ করতে। এমনকী রঙিন করে তুলতে। এইসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের পদোন্নতি ঘটল। আমরা একটা ফোল্ডিং ক্যামেরা কিনে ফেললাম। যার ভিউ-ফাইন্ডারের মধ্যে দিয়ে আমাদের চেনা জগৎকে নতুনভাবে দেখতে শিখলাম।

ছবি আঁকা ও রং করায় আমার অনুরাগ জন্মাল। একজন পেশাদার শিল্পীর কাছে আমি ও আমার এক বন্ধু কিছুদিন শিক্ষা নিয়েছিলাম। তাঁকে আমি 'ওস্তাদ' বলে ডাকতাম। বাড়িতে আমি ইজেল, ক্যানভাস, রং এমনভাবে রাখতাম যেন আব্বার সাড়া পেলে মুহূর্তেই সেগুলি লুকিয়ে ফেলতে পারি। ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে তাঁর বিশ্বাস ছিল মানুষের প্রতিকৃতি আঁকা ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ। তিনি চাইতেন আমরা শুধুই পড়াশুনো করে সময় কাটাই। সেইজন্য পড়ার বাইরে আমাদের শখ-আহ্লাদ মেটাতে হত গোপনে গোপনে। পরিবারের চাচা চাচীরা কেউ কেউ শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁরা হয়ে উঠলেন আমার চক্রান্ত-সহযোগী। আমাকে সাহায্য ও প্রেরণা দিয়ে চললেন।

এইসব শখের অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রাফিকস ও ডিজাইন সম্বন্ধে আমার আগ্রহ জন্মায়। বড়দা ও আমি ডাকটিকিট সংগ্রহ করাও শুরু করলাম। পাড়ার একজন দোকানদারকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলাম যাতে আমাদের ডাকটিকিট সংগ্রহের বাক্সটি শো কেসের সামনে সাজিয়ে রাখা হয়। উদ্দেশ্য বিক্রির জন্য লোকের নজর কাড়া।

www.pathagar.com

দুই চাচার সঙ্গে প্রায়ই আমি হিন্দি ও হলিউডের সিনেমা দেখতে যেতাম। আমি পল্লীগীতি গাইতে শুরু করলাম। রোমান্টিক স্বপ্নিল জগতের হাতছানিতে সাড়া দিতে লাগলাম। তখনকার একটি জনপ্রিয় গানের কথা আজও মনে পড়ে—"আয় মেরি, দিল কাঁহি আওর চল"—এসব গান তখন আমাদের মুখে মুখে।

* * *

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল প্রথম আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনল। এই স্কুলের আবহাওয়া সম্পূর্ণ উদার ও সংকীর্ণতামুক্ত। যেখানে সব ধর্মের মানুষ একাসনে ওঠাবসা করেন। আমার অধিকাংশ সহপাঠী বিভিন্ন জেলা থেকে বদলি-হয়ে-আসা সরকারি আমলার ছেলে। আগে যাদের সঙ্গে আমি পড়তাম তাদের সঙ্গে এদের অনেক তফাত। এদের অনেকেই পরে সরকারি বা বিভিন্ন সংস্থায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল শিক্ষাদানের ব্যাপারে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। এই স্কুলের বয় স্কাউটের সুনাম আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। এখানকার স্কাউট ডেন ছিল পাঠক্রমের গণ্ডির বাইরের জগতের সিংহদ্বার। অন্যান্য স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে আমরা ব্যায়াম, খেলাধুলো, নানান শিল্পকর্ম ও আলোচনা সভায় যোগ দিতাম। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ক্যাম্প করায় ও ক্যাম্প ফায়ারে বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজনে আমাদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। বড় বড় স্কাউট সমাবেশেও আমরা যোগ দিতাম। 'উপার্জন সপ্তাহে' আমরা রাস্তায় ফেরি করে, জুতো পালিশ করে, চায়ের দোকানে বেয়ারার কাজ করে টাকা তুলতাম। মজার উপাদান ছাড়াও স্কাউটিং আমাকে উদার চিন্তা করতে ও সংবেদনশীল হতে শিক্ষা দিয়েছে। বাইরের আচার অনুষ্ঠান বর্জন করে, অন্তরে ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে, মানুষের দুঃখের ভাগীদার হতে স্কাউটই আমাকে প্রেরণা দেয়।

স্কাউটিং ও পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য আব্বা আমার পড়ার বাইরে নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে উৎসাহী হলেন। আমার স্কাউটিং অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য তিনিই দিতেন। এ ভাবেই আমার উপর তাঁর অবিচল আস্থা গড়ে ওঠে। ভবিষ্যতে যখনই কোনও উদ্যোগ নিতে গিয়েছি তাঁর পূর্ণ সমর্থন আমি পেয়েছি।

১৯৫৩ সালে করাচিতে বয় স্কাউটের বিরাট জাতীয় সমাবেশ জাম্বুরি-র (Jamboree) কথা আমি সবসময় স্মরণ করি। সেবার ট্রেনে করে আমরা ভারত পরিক্রমা করেছিলাম। নানা ঐতিহাসিক স্থান দেখতে গিয়েছিলাম। এই ভ্রমণ যেন ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়ানো, অন্তরাত্মাকে উপলব্ধির জন্য তীর্থদর্শনের মতো। অধিকাংশ সময় কাটত খেলায় ও গানে। কিন্তু আগ্রার তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের অতিপ্রিয় সহকারী প্রধান শিক্ষক কাজি সিরাজুল হক্‌কে নিঃশব্দে চোখের পানি ফেলতে দেখেছিলাম। সেই চোখের পানি সম্রাটের জন্য নয়, সমাধিতে যে প্রেমিক প্রেমিকা শায়িত আছেন তাদের জন্য নয়, শ্বেতপাথরে যে কাব্য খোদাই করা হয়েছে তার কারণেও নয়। তিনি বলেছিলেন আমাদের নিয়তির কথা ভেবে তিনি অশ্রুপাত করছেন। ইতিহাসের আর ঐতিহ্যের দায়িত্ব আমাদেরকে বহন করতে হচ্ছে, সেই চিন্তাই তাঁকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল।

আমার বয়স তখন মাত্র তেরো। তা সত্ত্বেও সেই আবেগমথিত কল্পনা আমাকে বিহ্বল করে তুলল। ক্রমে ক্রমে কাজি সাহেব আমার সারা জীবনের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর উৎসাহে স্কাউটিংয়ের মধ্যে দিয়ে আরও অনেক কাজ করতে লাগলাম। আমার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার যে সহজাত ক্ষমতা ছিল কাজি সাহেব তা প্রথম

www.pathagar.com

আবিষ্কার করেন। স্কাউট আন্দোলন করতে গিয়ে আমি অনেককে সারা জীবনের বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। তার মধ্যে একজন মাহবুব, যে পরে গ্রামীণ ব্যাংকে আমার সঙ্গে কাজ করেছে। কিন্তু কাজি সাহেব এক কথায় আমার কল্পনাকে বিদ্যুতের মতো শাণিত ও আলোকিত করেছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছে, তাদের সবার নীতিবোধ গঠনে তাঁর প্রচ্ছন্ন মহিমাময় প্রভাব ছিল। আমাদের লক্ষ্যকে সর্বদা উঁচু রাখতে তিনিই আমাদের শিখিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা আমাদের সেই বয়সের আবেগ ও অস্থিরতাকে ঠিক পথে পরিচালিত করেছিল। এর জন্য তাঁকে কোনও ধর্মোপদেশ দিতে হয়নি। কাজ ও হৃদয়ের সঙ্গে নিবিড় যোগের দ্বারা তিনি আজীবন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর চরম বিশৃঙ্খলার দিনগুলিতে আব্বা ও ভাই ইব্রাহীমের সঙ্গে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেই উত্তাল সময়ের অরাজকতার কথা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। এর একমাস পরে অশীতিপর বৃদ্ধ কাজি সাহেবকে, তাঁর ভৃত্য সামান্য কিছু টাকার লোভে খুন করে। ওই নৈরাজ্যের সময়, খুনিকে ধরবার গরজ কারোই ছিল না। ওঁর পরিচিত আর সবার মতো এ খবরে আমি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম। পুরনো দিনের কথা মনে পড়তে লাগল। বুঝলাম তাজমহলের সামনে তাঁর চোখের পানি ছিল তাঁর নিজের ও দেশবাসীর ভবিষ্যতের তীব্র যন্ত্রণার পূর্বাভাস।

www.pathagar.com

৫

আমেরিকায় ক্যাম্পাসের দিনগুলি

(১৯৬৫-১৯৭২)

ছোটবেলা থেকেই আমি নিজেকে শিক্ষকের ভূমিকায় কল্পনা করতাম। আজ অবধিও তাই করি। আমার ছোট ভাইরা প্রায়ই বলে আমি নাকি ওদের পড়াতে খুব ভালবাসতাম। স্কুলে ভাল ফল করার উপর খুব জোর দিতাম। পরীক্ষা খারাপ হলে ভাইদের আমার কাছে জবাবদিহি করতে হত কেন তারা উপযুক্ত ফল করতে পারেনি।

১৯৫৫ সালে স্কুলের পাঠ শেষ করে আমি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হলাম। সেখানে আমার জীবনের দুটি রোমাঞ্চকর বছর কেটেছে। তার কথা লিখতে গেলে একটি আলাদা বই হয়ে যাবে। ১৯৫৭ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলাম। সেখানকার চারটি বছর আমার খুবই বৈচিত্রহীন ও একঘেয়ে কেটেছিল।

১৯৬১ সালে, ২১ বছর বয়সে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হবার পর আমার প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পেলাম। ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশরা চট্টগ্রাম কলেজ স্থাপন করেছিল। এই কলেজ উপমহাদেশের এক বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আমি সেখানে অর্থনীতি পড়িয়েছি। ছাত্ররা প্রায় আমার সমবয়স্ক ছিল।

এই সময় আমি পারিবারিক ব্যবসাতেও উৎসাহী হয়ে পড়ি। বড়দা সালামের এটা একটা হবি'র মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন দেশে চিঠি লিখে শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। মাঝে মাঝে প্রায় আমাদের মধ্যে আলাপ হত কী কী ধরনের শিল্পে আমরা বিনিয়োগ করতে পারি। আমরা দেখলাম পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্যাকেজিং সামগ্রী আমদানি করা হয়। সিগারেট তৈরি হয় পূর্বাঞ্চলে, কিন্তু তার জন্য সিগারেটের প্যাকেট আমদানি করতে হয় সুদূর পশ্চিমাঞ্চল থেকে। এ জাতীয় একটা শিল্প স্থাপনের সুযোগ যে আছে এটা বুঝতে আমাদের কষ্ট হল না। একটা প্যাকেজিং প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য আব্বাকে বুঝালাম। নানা জেরার পর অবশেষে আব্বা মত দিলেন। প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করে পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকে জমা দিলাম ঋণের আবেদন জানিয়ে। শিল্প স্থাপনে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহী বাঙালি উদ্যোক্তা সেই সময় খুবই বিরল ছিল। আমাদের ঋণের আবেদন দ্রুত মঞ্জুর হল।

সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এই প্যাকেজিং শিল্প ১৯৬৪ সনে উৎপাদন শুরু করল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কয়েকজন দক্ষ প্রিন্টার নিয়ে এলাম। একশো জন শ্রমিক নিয়োজিত হল কারখানায়। এই কারখানায় তৈরি হতে থাকল সিগারেটের প্যাকেট, ওষুধের

www.pathagar.com

কার্টন, প্রসাধন সামগ্রীর বাক্স, ক্যালেন্ডার, ইত্যাদি। কারখানাটি দ্রুত লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। শুধু টাকা রোজগারকে কোনওদিন আমার কাছে আকর্ষণীয় বস্তু বলে মনে হয়নি। আমি একজন ব্যবসায়ী হব এরকম কোনও ইচ্ছা আমার মনে কখনও আসেনি। অথচ এই শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার পেছনে সমস্ত শক্তি দিয়ে খেটেছি। এটা যেন প্রমাণ করা যে পূর্বাঞ্চলে শিল্প কারখানা লাভজনকভাবে চলতে পারে। আর নিজের কাছে প্রমাণ করা যে আমি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি।

এই শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পব্যাংক থেকে ঋণ নেবার কথা যখন আব্বার কাছে প্রস্তাব করলাম, আব্বা সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। ঋণ নিয়ে তিনি ব্যবসা করবেন না। তাঁর পুরনো মূল্যবোধ অনুযায়ী তিনি কিছুতেই ধারকর্জের মধ্যে যেতে চাইলেন না। বহুবার তাঁকে বোঝানোর পর তিনি সম্মত হলেন। কিন্তু কারখানা চালু হবার আগেই তিনি ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঋণের দায় তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। কারখানা চালু হবার পর থেকে তিনি সর্বক্ষণ পাহারা দিয়ে থাকলেন তাড়াতাড়ি ঋণ পরিশোধ করে দেবার জন্য। আমি ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকা চলে গেলাম। প্যাকেজেস চালাবার দায়িত্ব পড়ল বড়দা সালামের উপর। আব্বা তাঁকে বাধ্য করলেন মেয়াদ পুরো হবার আগেই শিল্পব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করে দেবার জন্য। সম্ভবত আমরাই পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের প্রথম (একমাত্র?) ঋণগ্রহীতা যারা মেয়াদপূর্তির আগেই সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিল এবং আর নতুন কোনও ঋণ নেয়নি। শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক নিজে থেকেই আহ্বান করল কাগজ তৈরির একটা কারখানা স্থাপনের জন্য এক কোটি টাকা ঋণের আবেদন করতে। আব্বা কিছুতেই সে প্রস্তাবে কান দিলেন না।

এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল। মাত্র তেইশ বছর বয়সে আমি বুঝে নিলাম কাজে নামলে কাজ আর কঠিন থাকে না।

* * *

আমি পড়াতে খুবই ভালবাসতাম। যখন আমেরিকায় ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে আমি পি.এইচ.ডি. করবার সুযোগ পেলাম তখন আমি আর দ্বিধা করলাম না। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলাম।

এটা আমার তৃতীয় বার বিদেশ যাত্রা। প্রথম দুবার গেছি বয়-স্কাউট হিসেবে। ১৯৫৫ সালে স্কাউট দলের সঙ্গে বিশ্ব জাম্বুরিতে আমি কানাডা এবং ১৯৫৯ সালে জাপান ও ফিলিপাইন সফরে গিয়েছিলাম। এবার আমি পূর্ণবয়স্ক হয়েছি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। ১৯৬৫ সালে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পৌঁছতে পারা আমার কাছে বিরাট অভিজ্ঞতা।

বাংলাদেশের ছাত্ররা এত শ্রদ্ধাশীল যে অধ্যাপকদের নাম ধরে ডাকার কথা তারা সুদূর কল্পনাতেও আনতে পারে না। ডেকে না পাঠালে ছাত্রদের অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। স্যারের সঙ্গে বাক্যালাপের সময়ও তারা খুবই সম্ভ্রম রক্ষা করে চলে। আমেরিকায় শিক্ষকেরা একই সঙ্গে ছাত্রদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। লক্ষ করতাম প্রায়ই অধ্যাপক ও ছাত্ররা খালি পা ঘাসের উপর ছড়িয়ে টান টান হয়ে বসে, ঠাট্টা তামাশা, গল্পগুজব করছেন, পরস্পর ভাগ করে খাবার খাচ্ছেন। নাম ধরে সম্বোধন করছেন। একে অপরের বাড়ি যাচ্ছেন। এইরকম ঘনিষ্ঠতা বাংলাদেশে অকল্পনীয়।

www.pathagar.com

কলোরাডোয় তরুণী সহপাঠিনীদের ব্যাপারে আমি এত লাজুক ও অপ্রস্তুত বোধ করতাম যে কোনদিকে তাকাব তাই যেন ঠিক করতে পারতাম না। চট্টগ্রাম কলেজে অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক ছাত্রী পড়ত। ৮০০-র মধ্যে মাত্র ১৫০ জন। ছাত্রীরা সবসময় আলাদা আলাদা থাকত। ছাত্র রাজনীতি ও অন্যান্য কাজে তারা কদাচিৎ অংশগ্রহণ করত। কলেজের নাটকে অভিনয়ের জন্য ছাত্রীরা অনুমতি পেত না। সেইজন্য ছেলেরা সাজপোশাক পরে, মুখে রং মেখে নারীচরিত্রে অভিনয় করত। সহপাঠিনীরা সাধারণত লেডিস কমনরুমে নিজেদের গুটিয়ে রাখত। পুরুষ ছাত্রদের নাগালের বাইরে যা ছিল একটি সুরক্ষিত অঞ্চল।

আমার ছাত্রীরা ছিল অসম্ভব মুখচোরা। ক্লাস শুরু হবার আগে ছাত্রীরা একজোট হয়ে অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষের সামনে অপেক্ষা করত। অধ্যাপক বের হয়ে আসার পর তাদের সম্ভাষণ জানাতেন না, তাদের মুখের দিকে তাকাতেন না পর্যন্ত। তিনি সোজা ক্লাসরুমে যেতেন, ছাত্রীরা তাদের বই আঁকড়ে কিছু না বলে নতমুখে ছেলেদের দৃষ্টি এড়িয়ে অধ্যাপকের পিছু পিছু ক্লাসে ঢুকত। অধ্যাপকের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ছেলেরাও ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে বা ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে সাহস পেত না।

ছাত্রীরা ক্লাসে আলাদা বসত। তারা একেবারেই ছেলেদের সঙ্গে মিশতে চাইত না। ক্লাস শেষ হলে আবার সারি দিয়ে একে একে তারা নতমুখে আমার পিছন পিছন বেরিয়ে আসত। প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে আমি তাদের নাম মুখস্থ করতে চেষ্টা করতাম যাতে করে তাদের সঙ্গে আমার সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশ্য ক্লাসরুমের বাইরে আমি কখনও তাদের সঙ্গে কথা বলিনি।

তা হলে ভাবুন আমার করুণ অবস্থা, যখন ১৯৬৫ সালের গরমকালে আমি আমেরিকা পৌঁছলাম, ক্যাম্পাস তখন ছিল রক সংগীতে উত্তাল। ছাত্রীরা জুতো খুলে লনে বসে রোদ পোহাত, হাসত, গল্পগুজব করত, আমি যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ সভা ও মিছিলে যোগ দিতাম। কিন্তু লাজুক ছিলাম বলে কখনও বক্তৃতা দিতে পারিনি।

ষোলো বছর বয়সে আমি চট্টগ্রাম কলেজে "সম্মিলিত ছাত্র প্রগতি সংঘের" (United Students' Progressive Party) নেতা নির্বাচিত হয়েছিলাম। চট্টগ্রাম কলেজে সেই দলের প্রাধান্য ছিল। ছাত্র সংসদের নির্বাচনে তাদেরই সর্বদা বিজয়ী হবার সম্ভাবনা থাকত। স্বৈরাচারী সরকারের রক্ষণশীল মনোভাব ও অনুশাসনের অজুহাত মানুষের উপর শোষণের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তাই আমরা ছিলাম সরকার বিরোধী দল। তবে গোপন অতি-বাম সংগঠনগুলির নিয়ন্ত্রণ আমরা মানতে রাজি ছিলাম না।

আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সমর্থন নিয়ে আমরা আমাদের দলের এই ধরনের নিয়ন্ত্রকদের সরিয়ে দিয়েছিলাম। সেই দিনগুলিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্থিতাবস্থা বদল করার অভিযান ছিল ছাত্র রাজনীতিতে এক আলোড়নকারী পদক্ষেপ। তা সারা চট্টগ্রাম জেলাকে তোলপাড় করে তুলেছিল। তখন থেকে আমি সবসময় স্বাধীন পথে চলবার চেষ্টা করেছি।

আমেরিকায় থাকাকালীন আমি ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলাম। কিন্তু সর্বদাই আমি মনকে খোলা রাখতে চেয়েছি, শুধুমাত্র প্রচলিত মতবাদের স্রোতে গা ভাসাতে নয়। বোল্ডারের ক্যাম্পাসে আমার সবচেয়ে ভাল লাগত ছাত্রদের কেন্দ্রীয় ভবন। ওখানে ছাত্রদের আসা যাওয়া, আড্ডামারা, অট্টহাসি, খাওয়া-দাওয়া, কিম্ভূত কিমাকার পোশাক দেখে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারতাম। আমেরিকান যুবসমাজকে স্বাস্থ্যবান ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর বলে মনে হত।

খুব ভাল লাগছিল আমার। পড়াশুনোও ঠিকভাবে চলছিল। আমি 'স্কোয়ার ড্যান্সিং' শিখে

www.pathagar.com

ফেলেছিলাম। অবশ্য আমার নাচ শেখার অভিজ্ঞতা ওইটুকুই। আরও নানাধরনের নাচের চল ছিল টুইস্ট, রক অ্যান্ড রোল, স্লো ডান্সিং। আমি কোনওটাই চেষ্টা করিনি। অন্য ছাত্ররা নাচে খুবই পারদর্শী ছিল। আমি ওই ব্যাপারে এক কথায় অপদার্থই ছিলাম। নাচ আমার একদম আসত না বলে পার্টি ও হইহুল্লোড় আমি সযতনে এড়িয়ে চলতাম। যখন আমি এটা মেনে নিতে পারলাম যে যারাই মদ্য পান করে তারাই খারাপ নয়, তখনও আমি নিজে পান করিনি। তেমন ইচ্ছাই হয়নি, রোজকার ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনাও আমার মনে দাগ কাটত। কোনও দিন ভুলতে পারব না, বোল্ডারে এক রেস্তোরাঁয় এক পরিচারিকা আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেছিল, "আমার নাম শেরিল।" প্রচুর বরফ দেওয়া এক গ্লাস ঠান্ডা পানি আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। আমার দেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার কোনও দেশের মানুষই এরকম অকপট ও উষ্ণ ব্যবহার আশা করতে পারে না।

আমাদের দলের বাকিরা অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার ছেলেরা সবাই শেরিলের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। "এই যে, মিষ্টি মেয়ে" বলে ডেকে তার সঙ্গে ঠাট্টা, তামাশা করছিল। সেও সমান তালে ঠাট্টার যোগ্য জবাব দিচ্ছিল। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার পক্ষে ওসব করা সম্ভব ছিল না। মুখচোরা স্বভাবের জন্য তার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছিলাম না। এমনকী অন্য ছেলেদের ওইরকম কথাবার্তায় অসম্ভব অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

আমেরিকান রান্না যতই অভিনব হোক আমি মায়ের হাতের মশলা দেওয়া তরকারির স্বাদের অভাব বোধ করতাম। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, বিফ বার্গার, আলুভাজা ও ব্যাঙের ছাতার চাটনি আমি যতই পছন্দ করি না কেন, ভাত, ডাল ও বাংলাদেশের মিষ্টির জন্য প্রাণ কাঁদত।

শেরিল আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ডিমের কোন পদ খেতে ইচ্ছুক?"

"তার মানে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ভাজা, ঝুরি ভাজা, কড়া সেদ্ধ, পোচ না ওমলেট। কোনটা খাবেন বলুন।"

"ডিম ভাজা।"

"কেমনভাবে ভাজতে বলব?"

"কেমনভাবে ভাজতে বলবেন মানে বুঝলাম না।"

"ডিম ভাজার কুসুম উপরে থাকবে না উলটে দিতে বলব?"

"যা হয় হলেই হল।"

ততক্ষণে বন্ধুরা আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখে টিটকিরি দিতে ও হাসাহাসি করতে শুরু করেছে। তারা শেরিলকে বোঝাতে লাগল পূর্ববাংলার মানুষ একটু অন্যরকম।

"আচ্ছা বেশ, কুসুম উপরদিকে থাকুক।" আমি কোনওরকমে বললাম। কী বলব ভেবে পাইনি বলে এবং সবাই আমায় দেখছে বলে ভীষণ লজ্জা করছিল।

"কড়া না অল্প ভাজা?"

"যা খুশি।"

"সঙ্গে টোস্ট, মাফিন বা রুটি দেব?"

"যা হোক।"

"এর সঙ্গে আপনি আরও কিছু নিতে পারেন, আলুভাজা, চপ বা আলুসিদ্ধ— কোনটা দেব?"

এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল সে ইচ্ছা করে সবার সামনে আমাকে অপদস্থ করার জন্য এত প্রশ্ন করছে। কিন্তু পরে আমি বুঝেছিলাম এটা আমেরিকার রীতি। এখানে বেছে নেবার প্রচুর সুযোগ।

www.pathagar.com

"কাটা সসেজ, হ্যাম, বেকন কোনটা আপনার পছন্দ?"

তালিকা দীর্ঘতর হতে লাগল। অন্য ছেলেরা আমার হতভম্ব অবস্থা ও লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া দেখে সমানে আমার পিছনে লাগছিল। আমি আহত হয়ে কী বলব ভেবে না পেয়ে বলে ফেললাম, "দেখুন, আমি নিজেই ডিম ভাজতে পারি।"

আমেরিকান খোলামেলা মানসিকতার সঙ্গে তখন আমি মানিয়ে নিতে পারিনি। এত ভিতু ছিলাম এই যে এই ঘটনার পর থেকে আমার রেস্তোরাঁ-আতঙ্ক হয়ে গেল।

* * *

বোল্ডারে সুন্দর ক্যাম্পাস ও বন্ধুদের ছেড়ে বৃত্তির শর্ত অনুযায়ী গরমের পরই আমায় টেনেসিতে ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতে হল। এখান থেকে আমার সম্পূর্ণ অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল। ন্যাশভিলে পৌঁছে এত মন খারাপ লাগল যে আমার চোখে পানি এসে গেল। সামান্য ছোট্ট একটা বিমানবন্দর। সেখানে বোল্ডারের মতো ছাত্রদের জন্য বিশাল প্রাণবন্ত ক্যাম্পাস নেই। বোল্ডারের মতো খোলামেলা শহরের তুলনায় এই শহরের কোনও আকর্ষণই নেই।

মাত্র কিছুদিন আগে ভ্যান্ডারবিল্ট বর্ণবৈষম্যমুক্ত হয়েছে। এই প্রথম অশ্বেতাঙ্গ ছাত্র ভর্তি শুরু হল। ভ্যান্ডারবিল্টে 'ক্যাম্পাস গ্রিল' নামে যে ছোট্ট রেস্তোরায় আমি খেতে যেতাম, ছ মাস আগে পর্যন্ত সেখানে শ্বেতাঙ্গ ছাড়া আর কারওর প্রবেশাধিকার ছিল না। এখানে বিদেশি ছাত্র সংখ্যায় অল্প, বাঙালি একটিও নেই। আমি খুব একা হয়ে গেলাম। কেবলই বাড়ির কথা মনে পড়তে লাগল। শীতে এখানে ভীষণ ঠান্ডা, যার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের ডর্মেটরির নাম ছিল 'ওয়েসলি হল'। তার ব্যবস্থা এতই খারাপ যে আমরা তার নাম দিয়েছিলাম 'ওয়েসলি হেল'। পুরনো দুর্গন্ধময় ঘরে সারারাত গরম পানির পাইপের দমাদ্দম আওয়াজ শোনা যেত। বাথরুম পুরনো ধাঁচের এবং উন্মুক্ত। আমার মতো লাজুক ও সংস্কারগ্রস্ত মানুষের সকলের সামনে জামাকাপড় খুলে গোসল করার মানসিকতা ছিল না।

সে বছর ভ্যান্ডারবিল্টে আমিই একমাত্র ফুলব্রাইট বৃত্তি পাওয়া ছাত্র ছিলাম। প্রথম সেমিস্টারের ক্লাসগুলো আমার একঘেয়ে লাগত। উন্নত অর্থনীতির বিষয়ের উপর এখানকার স্নাতক পাঠ্যক্রম আমার পূর্বে অর্জিত স্নাতকোত্তর ডিগ্রির তুলনায় খুবই অনগ্রসর ছিল। ইউরোপিয়ান ইতিহাসের অধ্যাপক আমাকে পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে দেননি। তিনি চাইতেন তিনি যা পড়াবেন ঠিক সেটুকুই আমরা উগরে দিই।

এরপর অবশ্য বোঝা গেল আমি কী ভীষণ ভাগ্যবান। কর্তৃপক্ষ আমাকে উচ্চতর অর্থনীতির ক্লাসে পড়বার অনুমতি দিলেন এবং আমার পি.এইচ.ডি করার সুযোগ ঘটল। একজন মানুষের সাহচর্য আমার ভ্যান্ডারবিল্টের জীবনকে অর্থবহ করে তুলেছিল। তিনি হলেন রুমানিয়ান অধ্যাপক নিকোলাস জর্জেস্কু-রোগেন (Nicholas Georgescu-Roegen)।

পরীক্ষায় খুব খারাপ নম্বর দেবার জন্য ক্যাম্পাসে তাঁর বদনাম ছিল। অনেক ছাত্রকেই তিনি অকৃতকার্য সাব্যস্ত করেছিলেন। তাঁর নম্বর দেবার ব্যাপারে একটি কথা প্রচলিত ছিল। "তিনি যখন তোমার প্রতি অতিমাত্রায় ভদ্র, বুঝবে তুমি তক্ষুনি ঘায়েল হতে চলেছ।" তাঁর হাতে কেউ 'B' পেলে ছাত্রমহলে বিস্মিত গুঞ্জন শোনা যেত। "ও জর্জেস্কুর কাছ থেকে B পেয়েছে।" একবারই এক কোরিয়ান ছাত্র তাঁর কাছ থেকে 'A' পেয়েছিল। যতদূর জানা যায়, এটাই একটিমাত্র নজির।

www.pathagar.com

ক্যাম্পাসে জোর গুজব শুনলাম বহু ছাত্রের জীবন উনি নষ্ট করেছেন। ছাত্ররা তাঁর ছায়া মাড়াতে সাহস পেত না।

আমি ভাগ্যবান যে এমন একজন কঠোর, ক্ষমাহীন কর্মযোগী পুরুষকে আমার শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে ওঁর চেয়ে ভাল পড়াতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

বুঝলাম এতদিন আমি তত্ত্ব মুখস্থ করেছি মাত্র। অধ্যাপক জর্জেস্কুর দু ঘণ্টা বক্তৃতার পর আমার চোখের সামনের পর্দাটা সরে গেল। জ্ঞানের মাধুর্য এমন সুন্দর ভাবে এই প্রথম আমার হৃদয়ে প্রবেশ করল। তাঁর কাছ থেকে প্রথম পরিষ্কারভাবে অনুভব করতে পারলাম তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা কেন, বাস্তবতাকে কেন তত্ত্বের কাঠামোতে আনতে হয়, তত্ত্বের আগে কেন বাস্তবতার অন্তর্নিহিত সারমর্মটুকু বুঝতে হবে।

কতকগুলি সহজ শিক্ষা তাঁর কাছে প্রথম পেয়েছিলাম যা আমার সারাজীবনের সম্পদ। গ্রামীণ ব্যাংক গড়ে তুলতে সে শিক্ষা আমার অত্যন্ত কাজে লেগেছিল।

যদিও অধ্যাপক জর্জেস্কু-রোগেন আমার গুরু ও পথপ্রদর্শক তবুও তাঁর সঙ্গে সেভাবে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তিনি ছিলেন এক রক্ষণশীল ইউরোপিয়ান শিক্ষক। ছাত্রদের সঙ্গে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখা তাঁর নীতি ছিল। তাঁর লেখা বইগুলি খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও দুর্বোধ্য ছিল। কিন্তু পড়ানোর ভাষা ছিল স্পষ্ট ও বাহুল্যবর্জিত। তিনি একজন দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ ছিলেন। ১৯৪৮ সালে রুমানিয়ার অর্থমন্ত্রীর পদে আসীন থাকাকালীন, তাঁকে দেশত্যাগ করে আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে হয়। বক্তা হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষ। তাঁর ক্লাসের প্রতিটি কথা ছিল যেন সযত্নে গ্রথিত এক অপরূপ শিল্পকর্ম। তাঁর কাছে আমি উচ্চতর পরিসংখ্যানতত্ত্ব, অর্থনীতির তত্ত্ব ও মার্কসবাদের পাঠ নিয়েছিলাম, তাঁর কাছে পরীক্ষায় প্রতিবারই 'A' পেয়েছিলাম।

শিক্ষকতায় তাঁর টিচিং অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে তিনি আমাকে নির্বাচন করায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম। এই দায়িত্ব পালনের সময় ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করলাম সহজবোধ্য তাত্ত্বিক কাঠামোর ভেতর কী করে কঠিন বাস্তবকে বিশ্লেষণ করা যায়।

শিখলাম সব বিষয় তত জটিল নয় যতটা আমরা কল্পনা করে নিই। অনুদার, অহংকারী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আমরা সহজ সমস্যার জটিল সমাধান খুঁজতে উদ্যত হই।

www.pathagar.com

৬
বিয়ে ও মুক্তিযুদ্ধ
(১৯৬৭-১৯৭১)

১৯৭০ সালে ভিরা ফোরোস্টেনকোকে আমি বিয়ে করি।

যখন ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করেছিলাম, আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করবার কোনও অভিপ্রায়ই আমার ছিল না। বিয়ের ব্যাপারে আমি নিঃসংশয় ছিলাম যে আর পাঁচজনের মতো গুরুজনদের নির্বাচিত পাত্রীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। পশ্চিমে তা প্রাচীনপন্থী মনে হলেও আমাদের দেশের 'সামাজিক বিবাহ' প্রথার যৌক্তিকতা নিয়ে আমার মনে কোনও সংশয় ছিল না।

তা ছাড়া, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলাম। তাদের সংস্পর্শে এলে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করতাম আমি। বাংলাদেশে, বিশেষত রক্ষণশীল চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করে আমাদেরও মানসিকতায় যথেষ্ট গোঁড়ামি ছিল। বিয়ের আগে হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে আমাদের পরিবারে কখনও খোলাখুলি আলোচনা হত না, এসব যেন একান্ত স্বতন্ত্র গোপনীয় ব্যাপার। আমিও সেই মনোভাবাপন্ন ছিলাম।

১৯৬৭ সালে একদিন ভ্যান্ডারবিল্টের লাইব্রেরিতে বসে পড়ছি। একটি সুন্দরী মেয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এল। তার চোখদুটি নীল, কোঁকড়া লাল চুল কাঁধ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে। জানতে চাইল আমার দেশ কোথায়।

"পাকিস্তান।" আমি সন্ত্রস্তভাবে উত্তর দিলাম।

সে কিন্তু খুব স্বচ্ছন্দ। বন্ধুর মতো কৌতূহলী হয়ে সে আমার পরিবার সম্বন্ধে জানতে চাইল। তার নাম জানলাম ভিরা ফোরোস্টেনকো। রাশিয়ান সাহিত্যে সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করছিল।

ভিরার জন্ম সোভিয়েত রাশিয়ায়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে তার পরিবার আমেরিকায় চলে এসেছে ও নিউ জার্সির ট্রেনটনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

আমেরিকায় পাকাপাকিভাবে থেকে যাবার কোনও বাসনাই আমার ছিল না। আমেরিকাকে আমি যতই প্রশংসা করি না কেন, প্রায়শই নিজেকে খাঁচায় বন্দি বলে মনে হত। এ জীবনযাত্রা আমার জন্য নয়। দেশে গিয়ে মানুষের সাহায্যে লাগাই ছিল আমার ধ্যান, জ্ঞান, উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে ফিরে ঠিক কী করতে চাই তার কোনও ধারণাই আমার ছিল না। সবসময় জীবনে কিছু একটা উদ্দেশ্য সফল করবার স্বপ্ন দেখতাম। আমেরিকায় পড়াশুনোর দিনগুলিতে নিজেকে মনে হত অস্তিত্বহীন। মনে হত শুধু পড়াশুনো করে ভাল নম্বর পাচ্ছি

www.pathagar.com

যার কোনও ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই। দেশে ফিরে যাবার আগে পর্যন্ত যেন কয়েদখানার মেয়াদ পূর্ণ করে চলেছি।

যাতায়াতের খরচ বাঁচাবার জন্য ছুটিতে বাংলাদেশ যাইনি। গ্রীষ্মকালে বোল্ডারে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি। বহুদিনের অদর্শন আমাকে ঘরে ফেরার প্রতি আরও উন্মুখ করে তুলেছিল।

আমার বহু বন্ধুই ছিল একেবারে বিপরীত। তারা হন্যে হয়ে আমেরিকায় ভিসা বাড়ানোর উপায় খুঁজে বেড়াত।

* * *

আমেরিকায় স্থানীয় এক অভিজাত পরিবারে আমি প্রথম বর্ণভেদ প্রথার পরিচয় পেলাম। গৃহকর্ত্রী আমায় বললেন, "গবেষকদের মতে কালো চামড়ার মানুষের বুদ্ধি সাদা চামড়ার মানুষের তুলনায় অনেক কম।"

তাঁর দিকে সরাসরি তাকিয়ে আমি বললাম, "আমি যদি বলি মহিলাদের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে কম, কেমন মনে হবে আপনার?"

"আপনি আমায় অপমান করার জন্য একথা বললেন?" মহিলাটি প্রশ্ন করলেন।

"না, তবে গবেষণার একটা বড় গলদ হল গবেষণার জন্য অর্থহীন কিংবা হাস্যকর একটা বিষয় বেছে নেয়। বিষয় বাছাইতে গলদ থাকলে উদ্ভট ফলাফল পেতে বাধ্য হবেন।"

"আপনার বিবেচনায় এই গবেষকরা বর্ণ বিদ্বেষী?"

"হয়তো। আবার নাও হতে পারে। তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন উত্তরাঞ্চলের মানুষের তুলনায় দক্ষিণের মানুষের বুদ্ধি বেশি। অথবা ৫ ফুটের চেয়ে লম্বা লোকেরা বেঁটেদের চেয়ে অনেক বেশি অপরাধ করে থাকেন।"

আশ্চর্যের কথা, ভিতরে ভিতরে বর্ণবৈষম্যের চোরাস্রোত সত্ত্বেও আমেরিকায় আমি খুবই স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম। এখানে অভিবাসন-সংক্রান্ত কর্মীরা পর্যন্ত সবাইকে সমান নজরে দেখেন। আমেরিকার মূল অধিবাসী ছাড়া, আমেরিকার সবাই কোনও না কোনও ভাবে অন্য দেশ থেকে এসে বসবাস করছে। ইউরোপের মতো আমেরিকানরা কখনও সেখানে কারওর থাকার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। সে গায়ের রং কালো বা সাদা যাই হোক না কেন।

১৯৬৯ সালে ভিরা টেনেসি ছেড়ে নিউ জার্সিতে ওর বাবা-মা'র কাছে চলে গেল। ততদিনে আমি বাংলাদেশে ফিরে যাবার তোড়জোড় শুরু করেছি।

ভিরা বলল, "আমি তোমার সঙ্গে বাংলাদেশ যাব ও ওখানে থাকব ঠিক করেছি।"

"অসম্ভব।" আমি বললাম, তার মতো আমারও গোঁ কম ছিল না। "ওটা গরমের দেশ, রুচি, সংস্কৃতি সবই আলাদা, সেখানে মহিলাদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়—এখানকার থেকে আকাশপাতাল তফাত।"

"আমি ঠিক মানিয়ে নেব।" ভিরা বলল।

ক্রমাগত চিঠিতে ও টেলিফোনে সে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইল। প্রতিবারই আমি যুক্তি দিয়ে বোঝাতাম কেন এ বিয়ে টিকবে না—প্রতিবারই ও পালটা যুক্তি দিত।

অবশেষে আমার মত বদল হল।

আমরা ১৯৭০ সালে বিয়ে করে ন্যাশভিলের দক্ষিণে মারফ্রিসবরোতে বাস করতে শুরু করলাম। ওই সময় আমি মধ্য-টেনেসি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছিলাম।

www.pathagar.com

* * *

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে ফেরার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। মুক্তিযুদ্ধের কাজে আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম।

অন্যান্য সব বাঙালির মতো আমার নজর ঢাকার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। সেই ভয়ংকর দিনটিতে ঘরে ফিরে রেডিয়োতে খবর শুনলাম পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালিদের দমন করতে নেমে পড়েছে। বাঙালিদের নেতা শেখ মুজিবর রহমান পলাতক।

পোশাক বদলানো মাথায় উঠল। আমি ছুটলাম ফোনের দিকে। ন্যাশভিলে ড. জিল্লুরের সঙ্গে কথা বললাম। তাঁকে রেডিয়ো চালাতে বললাম। জানালাম তক্ষুনি তাঁর বাড়ি যেতে যাই। অন্য বাঙালিদেরও খবর দিতে অনুরোধ করলাম।

ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে জিল্লুরের বাড়ি পৌঁছে গেলাম। আমাকে নিয়ে বৃহত্তর ন্যাশভিলের পূর্ব পাকিস্তানের ছয় জন বাঙালি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আশু কর্তব্য স্থির করাই ছিল সবার উদ্দেশ্য। সমস্ত সূত্র থেকে আমরা খবর সংগ্রহ করলাম। জানা গেল পাকিস্তান সেনাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তারা বাঙালিদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

যতদূর সম্ভব খবর সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। বিষাদে মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সামগ্রিক অবস্থার কোনও স্পষ্ট চিত্র আমাদের সামনে ছিল না। আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি জামাতে ইসলামী সমর্থক, তিনি কেবলই বলতে লাগলেন, "আসল ঘটনা আমাদের সবারই অজানা। আরও বিস্তারিত খবরের জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।"

আর সহ্য হল না আমার। বললাম, "যতটা দরকার তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা সংগ্রহ করেছি। বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এখন আমাদের স্থির করতে হবে আমরা নতুন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলাম কি না। আমি আমার সিদ্ধান্ত সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই। আমি নিজেকে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা দিলাম। কেউ ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, যাঁরা বাংলাদেশের সঙ্গে হাত মেলাবেন না তাঁরা আমার চোখে পাকিস্তানি, এক কথায় বাংলাদেশের শত্রু।"

চারিদিক নীরব। আমি যেভাবে সমর্থনের প্রশ্ন তুলেছি তাতে সবাই অবাক হয়ে গেছে। এইরকম অপ্রত্যাশিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সকলেই বাংলাদেশের পক্ষ নিল। 'বাংলাদেশ নাগরিক সমিতি' গঠন করে তক্ষুনি ন্যাশভিলের সংবাদপত্রে ও টেলিভিশনের সাংবাদিক সম্মেলনে সেকথা প্রচার করার প্রস্তাব দিলাম।

তিনটি বিষয় তখনই স্থির করা হল।

(১) আমরা স্থানীয় টেলিভিশন কেন্দ্রের সাংবাদিক ও স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ করব এবং বাংলাদেশের স্বার্থে তাদের সমর্থন চাইব।

(২) আমরা প্রত্যেকে এক হাজার ডলার দিয়ে একটা তহবিল গঠন করব যাতে এখানকার কাজের খরচ চালিয়ে নেওয়া যায়।

(৩) বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া অবধি আমাদের বেতনের দশ শতাংশ আমরা ওই তহবিলে জমা দেব। প্রয়োজনে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করব।

প্রত্যেকে চেক বই বার করে লিখতে উদ্যত হলেন। যাঁদের কাছে চেক বই ছিল না তাঁরা অন্যের কাছ থেকে ধার করলেন।

পরের দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ আমরা স্থানীয় টেলিভিশন কেন্দ্র ও দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক বৈঠক ডাকলাম। আমি 'বাংলাদেশ নাগরিক সমিতি'-র সচিব ও দলের মুখপাত্র

www.pathagar.com

নির্বাচিত হলাম। স্থানীয় টেলিভিশন কেন্দ্র আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে খবর পরিবেশনের সুযোগ পায় না। তারা আমাদের প্রতিবেদন উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করল। আমরা তাদের কাছে হয়ে উঠলাম তাজা আন্তর্জাতিক খবর সরবরাহকারী, যে খবরের সঙ্গে আবার স্থানীয় কিছু মানুষজন জড়িত আছেন। আমি ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বাকি পাঁচজন সকলেই শহরের হাসপাতালের ডাক্তার। আমরা সবাই একযোগে নিজেদের এমন একটি দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করছি যার এখনও জন্মই হয়নি। কী রোমাঞ্চকর সংবাদ।

সংবাদপত্রগুলির পক্ষ থেকে আমাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। ছবি ছাপা হল। সেদিন বিকেলে আমরা আবার সমবেত হলাম জিল্লুরের বাড়িতে টি ভি-তে সান্ধ্য খবর শোনবার জন্য। আমাদের আন্দাজ ঠিক প্রমাণিত হয়েছিল—আমাদের খবর খুবই গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হচ্ছিল। স্থানীয় সংবাদে আমার একটি সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। আমায় প্রশ্ন করা হয়েছিল "টেনেসীবাসীদের জন্য আপনার কোনও বার্তা আছে কি?" "হ্যাঁ, অবশ্যই আছে," আমি উত্তর দিলাম। "দয়া করে আপনাদের প্রতিনিধি পরিষদ ও সেনেটের সদস্যদের অনুরোধ করে বার্তা পাঠান যাতে অবিলম্বে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা হয়। আপনাদের পাঠানো অস্ত্রশস্ত্র নির্দোষ নিরস্ত্র বাংলাদেশের নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশের এই নির্দয় গণহত্যা বন্ধ করতে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য আপনাদের প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানান।"

খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু অন্তত কাজ করতে পেরেছি। আমাদের দলের ছ' জনের দৃষ্টিভঙ্গি ও আর্থসামাজিক অবস্থা আলাদা হলেও একটি ব্যাপারে আমাদের মতপার্থক্য নেই। এটা ভেবেও খুব আনন্দ হল। আমাদের এবার কাজ হল আমেরিকাবাসী অন্য বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া জানতে সচেষ্ট হওয়া। আমরা ঠিক করলাম পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগ করব। কেউ তেমন পরিচিত ছিলেন না। কে যেন বলল, এনায়েত করিম নামের এক বাঙালি পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় প্রধান পদের অধিকর্তা।

তাঁকে ফোন করলাম। তিনি আমাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর দিলেন। ২৯ মার্চ তারিখে রাজধানী ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ হবে—পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্বিচারে অসামরিক নাগরিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। আমাদেরও তাতে যোগ দিতে এনায়েত করিম অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন, বাঙালির সবচেয়ে বড় দলটি আসবে নিউ ইয়র্ক থেকে। এখানেই সর্বাধিক বাঙালির বাস।

ফোনে কথা হবার পর বিক্ষোভ সমাবেশ সম্বন্ধে আলোচনায় বসলাম আমরা। আমাদের ডাক্তার বন্ধুরা হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবেন না। আমি তাদের জানালাম আমি প্রস্তুত আছি। কালই আমি রওনা হব।

ঠিক হল, আমি যাব সম্পূর্ণ নিজের খরচে। আমাদের চাঁদা তুলে সংগৃহীত ছয় হাজার ডলার আমাকে দেওয়া হবে, ওয়াশিংটনে তেমন প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য।

কিন্তু ওয়াশিংটনে আমি থাকব কোথায়? কাউকে চিনি না। এনায়েত করিম যথেষ্ট বন্ধুভাবাপন্ন মানুষ, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে দোষ কি? আবার তাঁকে ফোন করলাম। জানতে চাইলাম কাল আমি তাঁর অতিথি হতে চাইলে কোনও অসুবিধা হবে কিনা? তিনি দ্বিরুক্তি করলেন না। বললেন, "চলে আসুন।"

তাঁর উদারতা আমায় অভিভূত করল। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত তাঁর কাছে। আসলে সংকট আমাদের সব বাঙালিকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। হঠাৎ করে আমরা এক বিশাল পরিবারভুক্ত হয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

ড. জিল্লুরের বিরাট শর্ট ওয়েভ রেডিয়োতে আমরা মধ্যরাত পর্যন্ত বিশ্বের সব বেতার কেন্দ্র শোনবার চেষ্টা করলাম। কৌশল করে নানা কেন্দ্র ধরে বিচিত্র ভাষায় প্রচারিত সংবাদের অর্থ উদ্ধার করার চেষ্টা চলতে লাগল। ড. জিল্লুরের আমেরিকান স্ত্রী মাঝে মাঝেই রকমারি সুস্বাদু নাস্তা পরিবেশন করছিলেন। শেখ মুজিবের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে এই নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত দিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত খবরে শুনলাম শেখ সাহেব চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে সেনাবাহিনীর কাছে ধরা পড়েছেন। (যদিও আসলে তাঁকে ঢাকায় তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।) আমাদের সবার চোখে পানি এল। তিনি যুদ্ধে জাতীয় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এ বিষয় নানারকম দৃশ্যপট কল্পনা করে আমরা এ যাবৎ ভরসা পেতাম। বেতারে তাঁর সরাসরি কণ্ঠস্বর সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করত। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের সম্ভারও তাঁর কণ্ঠস্বরকে নীরব করতে পারেনি।

এমন অবস্থায় পাকিস্তানি সৈন্য তাঁকে নিয়ে কী করতে পারে? তাঁকে কি ঢাকায় ফিরিয়ে এনে গুলি করে মারা হবে? ফাঁসি দেওয়া হবে? অত্যাচার হবে তাঁর ওপর?

১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ। বিষাদে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অসংখ্য অজানা প্রশ্ন নিয়ে আমি ভোরবেলা ওয়াশিংটন ডি.সি.-র উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। দুপুর নাগাদ এনায়েত করিম সাহেবের বাড়ি পৌঁছে গেলাম। ছবির মতো বাড়ি। আমাকে পেয়ে পরিবারের সবাই খুবই খুশি। মিসেস করিম তক্ষুনি টেবিলে খাবার সাজাতে লেগে গেলেন। কথায় কথায় জানা গেল আমরা দুজনেই চট্টগ্রামের মানুষ। আমাদের সম্পর্কে বন্ধুত্বের ছোঁয়া লাগল।

তাঁদের পরিবারের একজন হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগল না আমার। সরকারি কর্মচারীরা কখনও মন খুলে মিশতে পারেন না—এই ধারণা আশ্চর্যজনকভাবে বদলে গেল তাঁকে দেখে। এবার দ্বিতীয়বার অবাক হবার পালা। মতবিনিময়ের সময় সবার কথার দাম দেওয়া হচ্ছে। সমানে ফোন আসছিল। পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন পাকিস্তানি দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তারা ফোন করে ওয়াশিংটনে তাঁদের সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন, নীতি নির্ধারণের উপদেশের আশায়। বিভিন্ন মানুষ নানা প্রশ্ন ও তথ্য সহ এসে হাজির হচ্ছিলেন। সারা বাড়ি ব্যস্ততায় সরগরম।

বাড়ির ভিতরকার পরিবেশ দেখে আমি আরও বিস্মিত, রোমাঞ্চিত অনুভব করলাম। মনে হচ্ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আমরা সবাই স্বাধীন দেশের নাগরিক। কেউই পাকিস্তানের আধিপত্য স্বীকার করছিল না।

এইভাবে নেশা ধরানো স্বাধীনতার স্বপ্ন উপভোগ করতে করতে হঠাৎ দেখলাম একজন গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু লিখছেন। তাঁর পরিচয় জেনে নিলাম। তিনি ছিলেন জাতিসংঘে পাকিস্তানের সহকারী স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব এস.এ. করিম। সেদিন সকালেই নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছেন। তাঁর লেখা সবাইকে পড়ে শোনাতে চাইলে সবাই নীরবে তাঁর চারপাশে জড়ো হল। তিনি পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের উদ্দেশ্যে একটি আবেদনপত্র লিখেছেন, নির্বিচারে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য পাকিস্তানকে বাধ্য করতে। শুনতে শুনতে লেখকের ভাব প্রকাশের দক্ষতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মাল।

ক্যাপিটল হিলে আগামীকালের বিক্ষোভ সমাবেশে কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, কী কী প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, আমার ভূমিকা কী হবে—এইসব বিষয়ে খোঁজখবর নিলাম। 'বিক্ষোভ সমাবেশ'-কে কোনও ভাবে ব্যর্থ হতে দেওয়া হবে না এই ছিল পণ। টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে তুলে ধরার জন্য কেউ কি পোস্টার বা ফেস্টুন বানাচ্ছে? বাড়ির কেউ কিছু বলতে পারল না। আমারই উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে মনে করলাম। দোকানে গিয়ে রঙিন

www.pathagar.com

কাগজ, তুলি, পোস্টার কালার কিনে নিয়ে এলাম। তক্ষুনি বসে যতগুলো পারলাম ফেস্টুন বানিয়ে ফেললাম।

আমাকে এসব করতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। সমবেত দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি অনুভব করতে পারলাম। চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্রাবস্থায় আমি পোস্টার লেখার কায়দা ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলাম। সেদিন সেই দক্ষতা কাজে লেগে গেল। বিড়ির পেছনের ভাগকে তুলি হিসেবে ব্যবহার করে কলেজ জীবনে অনেক পোস্টার লিখেছি।

শামসুল বারি এসে পৌঁছলেন। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলিতে দূর থেকে তাঁকে চিনতাম। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কাছাকাছি এনে দিল। যুদ্ধের পুরো সময়টা দুজনে একসঙ্গে কাজ করেছি।

সন্ধ্যার দিকে আরও লোক সমাগম হতে লাগল। সমস্ত বাঙালি কর্মচারী সপরিবারে একে একে দেখা করে গেলেন। তাঁদের কেউ বাংলাদেশে নিজেদের আত্মীয়পরিজন নিয়ে শঙ্কিত। বাকিরা ঢাকার পরিস্থিতি ও তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের কী করণীয় তা জানতে চাইলেন।

একটি নতুন মুখ দেখা গেল। তিনি মিসৌরির এক তরুণ ডাক্তার হাসান চৌধুরী, বাড়ি কুমিল্লায়। সবেমাত্র আমেরিকায় এসেছেন, এখনও বছর পোরেনি। তিনিও ওয়াশিংটনের কাউকে চেনেন না। এনায়েত করিমের বাড়ির অবারিত দ্বারের সন্ধান পেয়ে আমারই মতো উপস্থিত হয়েছেন।

রাতটা কেটে গেল পরিস্থিতি পর্যালোচনায়, আগামী কালের সঠিক কর্মসূচির পরিকল্পনায়। প্রথম কর্তব্য দূতাবাসে আবেদনপত্র দাখিল করা যাতে তা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় কর্তব্য হল ক্যাপিটল হিলে সুষ্ঠুভাবে বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করা।

ঢাকার বিপর্যয় এনায়েত করিমের বাড়িতে তিনজন অচেনা অতিথিকে জড়ো করেছে। মিসেস করিমের আন্তরিক ব্যবহার পরিচয়ের বাধা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমাদের খাওয়ানো ও পরিচর্যার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সমানে পাক সেনাদের অভিশাপ দিচ্ছিলেন। বার বার রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ—সকালে ঘুম ভেঙে গেল এক তুমুল চিৎকারে। উঠে পড়লাম, পোশাক বদলে নিলাম। কে কার উপর চোটপাট করছে দেখবার জন্য হাজির হলাম ছোট লাগোয়া ঘরটিতে। সেখানে পাঁচ-ছ জন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন দাড়িঅলা রোগা, ছোটখাটো তরুণ, তীক্ষ্ণ চিৎকারে করিম সাহেবকে কিছু বলতে বলতে ভর্ৎসনা করছেন। তিনি নীরবে শান্ত হয়ে বসে তা শুনে যাচ্ছেন।

খুব রাগ হয়ে গেল আমার। অমন অমায়িক অতিথিবৎসল গৃহস্বামীর উপর চোটপাট করার কার এত সাহস? তাঁর পরিচয় কী? বাকিরাই বা কারা?

তুমুল গোলমালের মধ্যে সামান্য সুযোগে করিম সাহেব শান্ত স্বরে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ক্ষুদে আগন্তুক তা শোনবার পাত্রই নন। করিম ও দূতাবাসের অন্য কর্মচারীদের তিনি বিশ্বাসঘাতক বলে তিরস্কার করছিলেন। সকলের শার্টের সঙ্গে সাঁটানো আছে বড় অক্ষরে 'বাংলাদেশ' বাটন, যা জ্বলজ্বল করছে।

তাঁরা বোস্টন, হার্ভার্ড ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সকালেই গাড়ি করে পৌঁছেছেন। আমাদেরই মতো সটান মি. করিমের বাড়ি এসেছেন। উদ্দেশ্য ক্যাপিটল হিলের বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেওয়া। আসামাত্রই বিক্ষোভসংক্রান্ত প্রস্তুতির বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইছিলেন। কথা বলার সময় জানা গেল পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তারা বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই ছোটখাটো মানুষটি হলেন ড. মহিউদ্দিন আলমগীর, হার্ভার্ড থেকে সদ্য পি.এইচ.ডি করেছেন। মি. করিমকে কঠিন ভাষায় আক্রমণ

www.pathagar.com

* * *

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ বিজয়ী হল। আমি দেশে ফিরে দেশকে নতুন করে গঠনের কাজে ব্রতী হবার সিদ্ধান্ত নিলাম। মুক্তিযুদ্ধ সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। ত্রিশ লক্ষ বাংলাদেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, এক কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে নিরাপত্তার আশায় ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে গড়ে উঠেছে অগণিত উদ্বাস্তু শিবির, দুঃখ কাতর গৃহহারাদের জন্য। পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচার ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ। যুদ্ধ যতদিনে শেষ হয়েছে ততদিনে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। অর্থনৈতিক অবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। বুঝলাম এবার আমার ফেরার সময় এসেছে। দেশ গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করবার ডাক এসেছে। নিজের মধ্যে নিজের প্রতি একটা তাড়না অনুভব করলাম।

www.pathagar.com

৭
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
(১৯৭২-১৯৭৪)

অনেক স্বপ্ন ও আদর্শকে সঙ্গী করে ১৯৭২ সালে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরলাম। পাশ্চাত্য জগতের যুক্তিসংগত উপায়ে সমস্যা সমাধানের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি তখন আমার তৈরি হয়ে গেছে। পশ্চিমের সমাজব্যবস্থা ও পণ্যবস্তুর ব্যবহারে অনেকটা সহজ হয়ে গেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভি দেখতে দেখতে আমি জটিল সমীকরণ সমাধানে অভ্যস্ত হয়ে গেছি ততদিনে।

আমার বিশ্বাস ছিল যে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অঙ্গরাজ্য না হয়ে নিজস্ব সম্পদের ওপর নির্ভর করতে পারলে স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত উন্নতি লাভ করবে।

ফিরে এসে যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমি সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের চিহ্ন দেখলাম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসুবিধা। কিন্তু মানুষ সুদৃঢ়ভাবে তার মোকাবিলা করছে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটতে থাকল। আশা মিলিয়ে যেতে লাগল বিভ্রান্তির অতলে। সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা, পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

দেশে ফিরে আমি সরকারের পরিকল্পনা-কমিশনে নিযুক্ত হলাম। গালভরা নাম সেই পদের। কিন্তু সারাদিন খবরের কাগজ পড়া ছাড়া আমার কোনও কাজই ছিল না। আমি অর্থনীতিতে সদ্য পি.এইচ-ডি. করে এসেছি আমেরিকা থেকে। এখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। অথচ অবাক কাণ্ড, আমাকে দিয়ে করাবার মতো কোনও কাজ সরকারের নেই।

প্রফেসর নুরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক ছিলেন। তাঁরই পীড়াপীড়িতে আমি পরিকল্পনা কমিশনে যোগ দিয়েছিলাম। তাঁর কাছে বারংবার নিস্ফল আবেদন জানাবার পর আমি কাজ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলাম যখন পরবর্তী কাজের সন্ধান করছিলাম তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিল। আমিও সেটা গ্রহণ করলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রধানের পদে যোগ দিলাম।

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চট্টগ্রাম শহরের কুড়ি মাইল উত্তরে উনিশশো একর রুক্ষ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। কতকগুলি পাহাড়ের চূড়া সমতল করে তার উপর বড় বড় লাল ইটের আধুনিক অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে, উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের থাকবার জন্য। প্রত্যেকের কোয়ার্টার এক একটি পাহাড়ের চূড়ার উপর। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যে সমতলভূমি তাতে ক্লাসরুম, ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের আবাসন নির্মিত হয়েছে।

www.pathagar.com

করলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে পরে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আমি মি. করিমকে বাঁচাতে ড. আলমগীরের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলাম। গতকাল আলোচনার পর আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম যে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মীদের পাকিস্তান দূতাবাসের অন্তর্ভুক্ত থাকার সিদ্ধান্তই বুদ্ধিমানের কাজ। তা হলে পাকিস্তানিরা সরকারি ক্ষমতাকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বিরুদ্ধে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে না। দূতাবাসের কর্মী হিসেবে তাঁরা আমেরিকার অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের উচ্চ পদের অধিকারী কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বহাল রাখতে পারবেন এবং বাস্তব অবস্থার সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন।

ড. আলমগীর আবার চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর কাছে এগুলি মিথ্যা অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়—তাঁর মতে যারা মুক্তির জন্য নিজেদের সামিল করতে ভয় পায়, তারা নিজেদের আরামদায়ক জীবনযাত্রা সুরক্ষিত করতেই বেশি মাত্রায় আগ্রহী।

আলোচনায় কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা হল না। যে প্রসঙ্গ ড. আলমগীর উত্থাপন করেছিলেন, ১৯৭১ সালের ৪ অগাস্টের আগে অবধি তার সমাধান হল না। সেইসময়ই বাংলাদেশি কূটনীতিকগণ পাকিস্তানি দূতাবাস ছেড়ে নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকারে যোগদান করেন।

সেদিন বিকেলে বিক্ষোভ দেখাবার জন্য আমরা সবাই জমায়েত হলাম ক্যাপিটল ভবনের সিঁড়িতে। আমার বানানো সব ফেস্টুন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দূরদূরান্ত থেকে বহু বাঙালি এসেছিলেন বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিতে। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনের বাঙালিদের চেয়েও দলে ভারী ছিল ডেট্রয়েটের বাঙালিরা। এঁরা অধিকাংশ সিলেটি ও নানা কলকারখানার কর্মী। সংখ্যায় তাঁরা অবাক করার মতো।

কে বা কারা এই বিক্ষোভের উদ্যোক্তা আমাদের জানা ছিল না। অনুমতির অভাবে আমরা বিক্ষোভ শুরু করতে পারছিলাম না। দূতাবাসের এক কর্মী ফজলুল বারি অনুমতির জন্য আবেদন করেছিলেন। দূতাবাসের বাঙালি কর্মচারীরা বিক্ষোভে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তের ফলে তিনি নিজে গিয়ে মঞ্জুরি পত্র সংগ্রহ করে আনতে পারেননি। ভাগ্যক্রমে তিনি আর এক 'বারি'-কে পাকড়াও করেছিলেন। তিনি হলেন শামসুল বারি। তাঁর হয়ে আবেদন পত্র সংগ্রহের কাজটি করেন শামসুল বারি।

হতভম্ব হয়ে ভাবছিলাম কীভাবে শুরু করব! এমন সময় শামসুল বারি উপস্থিত হলেন। সঙ্গে অনুমতি পত্র। আমি জোর গলায় হেঁকে বললাম, "এই তো আমাদের নেতা এসে গেছেন। আসুন আমরা সারি দিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ি। শুরু হোক আমাদের প্রতিবাদ মিছিল।"

ম্যাজিকের মতো কাজ হল। ক্যাপিটল হিলের সিঁড়িতে সে বিক্ষোভ প্রদর্শন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। আমেরিকান আইনসভার সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলাম আমরা। সম্মিলিত সহায়ক গোষ্ঠী আমাদের অবস্থা ও দাবি সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য সময় নিলেন। সেদিন সংবাদ মাধ্যমগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিল। টেলিভিশনের ক্যামেরা গোটা মিছিলের ছবি তুলেছিল, তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল, সাংবাদিকদের কাছে দিনটি হয়ে উঠেছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনার জন্য সন্ধ্যায় দূতাবাসের আর এক কর্মী, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এ. এম.এ. মুহিতের বাড়িতে বৈঠক বসালাম আমরা। সারাদিন মি. মুহিত নেপথ্যে সব কাজে মদত দিয়েছেন।

সান্ধ্যকালীন সেই বিশাল জমায়েতে উত্তপ্ত আলোচনা হল। কীভাবে আমেরিকায়

www.pathagar.com

বাঙালিদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা যায় সেই বিষয়ে। যত শীঘ্র সম্ভব বাঙালি কূটনীতিকদের পাকিস্তান সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয় নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠল। হট্টগোল দিয়ে যে-দিন শুরু হয়েছিল, সান্ধ্য সমাবেশে তা শেষ হল আরও উত্তেজনাপূর্ণ ও আবেগময়, তর্কাতর্কি ও ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্য দিয়ে। বিষয় হল: বাঙালি কূটনীতিকগণ কেন তক্ষুনি পাকিস্তান দূতাবাসের কাজে ইস্তফা দিচ্ছেন না?

রাতের খাওয়া শেষ হল। কয়েকটি বিষয় স্পষ্টতর হওয়া প্রয়োজন। কীভাবে আমেরিকায় বাঙালিদের সংগঠিত করা যায়। বাঙালি কূটনীতিকরা নেতৃত্ব দিতে অক্ষম—এই বিষয়টি কীভাবে বাঙালিদের কাছে প্রাঞ্জল করে তোলা সম্ভব? পাকিস্তানে থাকার ব্যাপারে কূটনীতিকরা যে যুক্তি দেখাচ্ছেন তা কতদূর সংগত? ফিরে আসার আগে এই প্রশ্নগুলির যোগ্য সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম।

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ—শামসুল বারি ও আমার উপর ভার পড়ল ওয়াশিংটনের সব দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার। রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে আমাদের সমস্যা তাঁদের ব্যাখ্যা করা ও বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য তাঁদের অনুরোধ জানানো।

আমাদের দুজনের পক্ষেই সেই অভিজ্ঞতা খুব রোমাঞ্চকর হয়েছিল। একদিনে অনেকগুলি দূতাবাসে যেতাম আমরা। প্রত্যেকে নিজস্ব ঢং-এ আমাদের স্বাগত জানাতেন। কিন্তু বহু প্রশ্নই হত একই ধাঁচের। "আপনারা কার প্রতিনিধিত্ব করছেন? আপনাদের আমেরিকায় কোনও সংগঠন আছে? যেখানে কোনও সরকারই নেই, সেই রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ব্যাপারে আপনারা আমাদের কী প্রতিক্রিয়া আশা করেন? কোনও বিদেশি সরকার আপনাদের সমর্থন জানাচ্ছে? আমেরিকায় আপনাদের কূটনীতিবিদগণের অবস্থান কী? তাঁরা কি আপনাদের পক্ষে? সেক্ষেত্রে তাঁরা কখন প্রকাশ্যে বিবৃতি দেবেন? পূর্ব পাকিস্তানের কত শতাংশ মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশ চায়?"

কেবলমাত্র একটি বাদে সব প্রশ্নেরই বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দিতে পারতাম আমরা। শুধু আমরা বলতে পারতাম না বাংলাদেশের নিজস্ব কোনও সরকার গঠন করা হয়েছে কিনা।

বারি ও আমি একমত হলাম শীঘ্র আমাদের সরকার গঠন খুবই জরুরি। ওয়াশিংটন থেকে বাংলাদেশ সরকার গঠন কীভাবে সম্ভব? বাংলাদেশের অধিকাংশ নেতাই মৃত বা নির্বাসিত। বাংলাদেশে কেউ সরকার গঠনের কথা কল্পনাও করতে পারে না।

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। কলকাতায় উড়ে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা সরকার গঠন করলে কেমন হয়? তা হলে আমরা বিশ্বের দরবারে আমাদের সরকারের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে পারব। আমাদের দেশও হবে, সরকারও হবে। স্বীকৃতির দাবি আরও জোরালো করে তুলতে পারব। বারিরও এই পরিকল্পনা পছন্দ হল। আমরা মন স্থির করে ফেললাম। কালই আমি কলকাতা রওনা হব ও সেখানে 'নির্বাসিত সরকার' গঠনে উদ্যোগী হব।

আর একটি পরিকল্পনা ছিল আমার। বাংলাদেশে সংবাদ প্রচারের জন্য একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা। এতে বাংলাদেশের মানুষ জানতে পারবে কী ঘটে যাচ্ছে এবং তাদের কর্তব্য স্থির করতে পারবে।

স্থির করলাম, একটা গাড়ির উপর রেডিয়ো ট্রান্সমিটার বসাতে হবে। সেটি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাড়া করলে বর্ডার পার হয়ে ভারতে চলে আসবে সেই চলমান বেতারকেন্দ্র।

আমার সম্বলে সেই ৬০০০ ডলার ছিল। ঠিক করলাম ওই টাকা দিয়ে ট্রান্সমিটার কেনা

www.pathagar.com

হবে। টাকাটা সদ্ব্যবহার করার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত উপায়।

তিনটি দেশের দূতাবাসের সঙ্গে আমাদের বিশেষ আলোচনা হল। বার্মার দূতাবাসে অনুরোধ করা হল তাঁদের দেশের সীমান্ত পাক সেনাদের কবল থেকে পলাতক বন্দিদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করা বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে চরম শত্রুতা। আমরা চাঁদা তুলে এই উদ্বাস্তুদের জন্য অর্থসংগ্রহ করছি। সুতরাং এদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ভারের দুশ্চিন্তা বার্মা সরকারকে করতে হবে না।

শ্রীলঙ্কা দূতাবাসের সঙ্গে আলোচনায় অনুরোধ জানানো হল তাঁরা যেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে চলাচলকারী সামরিক ও অসামরিক কোনও বিমানকেই অবতরণের অনুমতি না দেন। পাকিস্তান অসামরিক বিমান করাচি থেকে ঢাকা পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কার দূতাবাস কর্তৃপক্ষ বিনম্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন সরকারি নীতির উপর তাঁদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা খুব সীমিত। তা সত্ত্বেও আমেরিকাবাসী বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর মনোভাব তাঁরা অবশ্যই সরকারকে জানাবেন। তাঁরা সরাসরি শ্রীলঙ্কা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পরামর্শ দিলেন আমাদের। নীতি পরিবর্তনের কারণ কতখানি জরুরি তা সরকারকে বোঝানো একান্ত প্রয়োজন।

সোভিয়েত দূতাবাস বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত আছেন বোধ হল। বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতিবিদগণ তাঁদের পরিচিত। স্বাধীন বাংলাদেশ সম্বন্ধে এঁরা কী মতামত পোষণ করেন তা জানতে দূতাবাস আগ্রহী হলেন। বামপন্থীগণ, বিশেষত মাওলানা ভাসানী স্বাধীন বাংলাদেশের সপক্ষে কিনা জানতে উৎসাহী হলেন। তা হলেই সোভিয়েত সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করার প্রয়োজনীতা অনুভব করবে—এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হল না।

ভারতীয় দূতাবাস আমাদেরকে উচ্চপদস্থ কূটনীতিবিদদের সম্মান দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। তাঁরা কয়েকটি বিষয়ে পরিষ্কার জানতে চাইলেন—পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিবিদগণের সিদ্ধান্ত। আমাদের নেতাদের অবস্থান কোথায়? তাঁদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি কি না? আমাদের আমেরিকাস্থিত কোনও সংগঠন আছে কি না? আমরা তাঁদের অনুরোধ করলাম, সীমান্ত বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের জন্য খোলা রাখতে, নির্বাসিত বাংলাদেশিদের কলকাতায় অবাধ যাতায়াতের অনুমতি দিতে। পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে যেসব বাংলাদেশি ভারতে আসবেন তাদের ভিসার ব্যাপারে যেন কড়াকড়ি শিথিল করা হয় সে ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে আবেদন জানালাম।

সে রাতে সরকার গঠন নিয়ে আমাদের আলোচনা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। পূর্ব পরিকল্পনার কিছুটা ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। বিস্তারিত আলোচনার পর স্থির হল হাসান যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতা ও আগরতলায় রওনা হয়ে যাবে। পলাতক রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তারপর সেখান থেকে সে আমাকে সংকেত পাঠাবে, কখন আমার রওনা হওয়া উচিত সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে।

সেই রাতে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগা হিলালি তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী ধাপের কর্মকর্তা এনায়েত করিমের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের জন্য এলেন। আমরা তখন সবে খেতে বসেছি। তাঁর আগমনের খবর পাওয়া মাত্র আমাদের খাবারসহ ছাদের চিলেকোঠায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। দু' ঘণ্টা ঠায় আমরা সেখানে একটি আওয়াজও না করে বসে রইলাম। যাতে করে রাষ্ট্রদূত কোনওক্রমেই টের না পান, তাঁর বাঙালি সহকর্মী তিনজন ভয়ংকর রাষ্ট্রবিরোধীকে তাঁর নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন। রাষ্ট্রদূত আন্তরিকভাবে

www.pathagar.com

খোঁজ নিলেন করিম সাহেবের কোনও আত্মীয় সম্প্রতি ঢাকায় সামরিক আক্রমণে আহত হয়েছেন কিনা।

* * *

পরের দিনই পরিকল্পনানুযায়ী হাসান কলকাতা হয়ে আগরতলা রওনা হয়ে গেলেন। কলকাতা পৌঁছে সেখানে নেতাদের সম্বন্ধে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে আমাকে আমেরিকা ছেড়ে আসতে নিষেধ করলেন। অনতিবিলম্বে মুজিবনগর সরকার গঠন হল। আমেরিকা ও কানাডার প্রবাসী বাঙালিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সমস্তরকম সাহায্য বন্ধ, নির্বিচার গণহত্যার অবসান ও শেখ মুজিবকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত প্রচার অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন।

নিউইয়র্কের পাকিস্তান মিশনের কূটনীতিবিদ মাহমুদ আলি ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল পদত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নায়ক হয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী সংসার চালানোর জন্য একটি সামান্য চাকরি নিলেন।

'বাংলাদেশ লিগ অফ আমেরিকা', ড. মোহাম্মদ আলমগীরের নেতৃত্বে নিউইয়র্ক থেকে কাজ করছিলেন। শিকাগোতে ড. এফ. আর. খানের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ' গঠন হল। শামসুল বারি হলেন তার প্রধান কর্ণধার। তিনি 'বাংলাদেশ নিউজলেটার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। তাঁর হাত থেকে সম্পাদকের কার্যভার আমি গ্রহণ করি। তারপর থেকে এই পত্রিকা ন্যাশভিলে ৫০০ নং প্যারাগন মিলস রোডে আমার বাড়ি থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। আমার ফ্ল্যাট হয়ে ওঠে তার প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র। লম্বা প্রচার অভিযান সেরে ফিরে আসবার পর আমার ফোন বাজবার বিরাম ছিল না। ফোন আসত উত্তর আমেরিকার নানা শহরে থেকে, ইংল্যান্ড থেকে। প্রতিটি প্রবাসী বাঙালি প্রতিদিনের যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর জানবার জন্য উদগ্রীব থাকতেন।

ওয়াশিংটনের বাঙালিদের প্রচেষ্টায় ক্যাপিটল হিলের কাছে (মার্কিন জাতীয় সংসদ) বাংলাদেশ তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। হাউস ও সেনেটের প্রচার অব্যাহত রাখবার জন্য প্রথম দিকে তথ্যকেন্দ্রের দায়িত্ব পুরোপুরি আমার উপর ছিল। পরে তা বিস্তৃত আকারে রূপ নেয়। সরাসরি ছাত্রমহলের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমরা 'বাংলাদেশ-বান্ধব সমিতি'ও স্থাপন করেছিলাম।

সেই নয় মাসের সংগ্রামে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার চিত্র আমাদের মনে তৈরি হয়ে গেছিল। যত দিন যাচ্ছিল সে চিত্র স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল। আমরা চেয়েছিলাম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশের সুযোগ। ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাচনের স্বাধীনতার আস্বাদ মানুষকে দিতে চেয়েছিলাম। আশা করেছিলাম মানুষ দারিদ্রের কবল থেকে মুক্তি পাবে। প্রতিটি নাগরিকের শান্তি ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিলাম।

আমরা সেই জাতিগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলাম যে-জাতি বিশ্বের দরবারে মর্যাদার সঙ্গে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সুদক্ষ স্থপতির নকশা করা ষাটের দশকে তৈরি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকার্য অত্যাধুনিক। প্লাস্টার ছাড়া খোলা লাল ইটের তৈরি বাড়িগুলির চতুর্দিকে উন্মুক্ত বারান্দার ছড়াছড়ি। বাড়িগুলি যতখানি দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয়, উপযোগিতার দিক দিয়ে ততখানি নয়। সেটা বুঝলাম সেখানে পড়াতে শুরু করার পর। বিভাগীয় প্রধানের জন্য বিশাল একটি অফিস ঘর রয়েছে, অথচ অন্যান্য শিক্ষকের নিজস্ব কোনও ঘর নেই। আমার প্রথম কাজ হল বিভাগীয় প্রধানের অফিস ঘরটি শিক্ষকদের কমনরুম হিসেবে খুলে দেওয়া। আমার নিজের অফিস একটি ছোট্ট ঘরে স্থানান্তরিত করলাম। এতে কেউ খুশি হল না। কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় প্রধানের জন্য বিশাল ঘরের ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে অন্যদের বসবার জায়গা পর্যন্ত নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরুতে সবদিক সামাল দিতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। পরীক্ষায় নকল করে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে শিক্ষকেরা ছাত্রদের খাতা দেখতে নারাজ হলেন। পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানালেন তাঁরা। ছাত্ররা সে প্রস্তাব কিছুতেই মানতে রাজি নয়। তাদের যুক্তি হল সদ্য মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে ও মনে তারা যে পরীক্ষা দিতে বসেছে এই যথেষ্ট।

বহু ছাত্র মুক্তিবাহিনীর সদস্য ছিল। যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিল। তারা আবার সবসময় যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করা রিভলবার নিয়ে ঘোরাফেরা করত। যখন তখন শিক্ষকদের ভয় দেখাত। তাড়াতাড়ি পরীক্ষার ফল বার না হলে তাঁদের উচিত শিক্ষা পেতে হবে এইসব হুমকি দিত।

সেই বিস্ফোরক পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য আমি স্বয়ং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে মধ্যস্থতা করবার ভার নিয়েছিলাম।

আমি শহরে আব্বা-আম্মার কাছে থাকতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার জন্য আব্বা তাঁর গাড়ি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। পথে বাসের জন্য অপেক্ষমাণ ছাত্র ও শিক্ষকদের দেখতে পেতাম। তাদের অনেককেই গাড়িতে তুলে নিতাম।

আমি সমস্যার স্বরূপ অনুধাবন করে পরিস্থিতির উন্নতির চেষ্টা করলাম।

আবিষ্কার করলাম ক্যাম্পাসে আবাসনের অভাবে অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষক তড়িঘড়ি বেলা দুটোর বাস ধরে বাড়ি ফিরে যান। সারা বিকেল, সন্ধ্যা ও রাত বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর জনমানবহীন থাকে। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমার বিবেচনায় জাতীয় সম্পদের ভীষণ অপচয়। এই সমস্যা দূর করতেই হবে। তক্ষুনি একদল ছাত্রকে ডেকে পাঠালাম। সমস্যার মূল কারণ অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিলাম। এই সমীক্ষার রিপোর্ট ছাপা হল বিভাগীয় প্রতিবেদনে 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত সমস্যা' শিরোনামে। কারণগুলি জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। ক্যাম্পাসকে আমি পার্ট-টাইম বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দিয়েছি। আমার সেই বক্তব্যও তারা সেই লেখায় প্রচার করল। এই সংবাদ চারিদিকে বেশ আলোড়ন তুলল। অনেক সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার নিলেন। কোনও শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক এভাবে এর আগে সমস্যার মূলে আঘাত করেননি।

শিক্ষা সচিব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই প্রতিবেদনের একটা কপি চাইলেন। এই সমস্যাটির নানারকম সমাধান সমেত বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করে তাঁকে দিলাম। দুর্ভাগ্যবশত সেগুলির কোনওটিই গ্রহণ করা হল না। কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। শহর থেকে ক্যাম্পাসে আসার জন্য রেলপথ তৈরি হয়েছে। কিন্তু পার্ট-টাইম বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্যাটি আজ অবধিও অটুট রয়েছে।

www.pathagar.com

* * *

রাঙামাটি সড়ক ও ক্যাম্পাসের মাঝখানে জোবরা গ্রাম। প্রতিদিন আমার গাড়ি সেই গ্রামের রাস্তা অতিক্রম করত। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে ধু ধু মাঠ দেখা যেত। আমার সহকর্মী লতিফীকে জিজ্ঞাসা করতাম এই পড়ে থাকা বিশাল জমি শীতের ফসলের জন্য চাষ হয় না কেন? গ্রামের সঙ্গে লতিফীর নিবিড় পরিচয়। তিনি কিছু সমস্যার কথা বললেন। আমি প্রস্তাব দিলাম দু'জনে গ্রামে গিয়ে সোজাসুজি মানুষের সঙ্গে কথা বলব। পরে এতেই আমাদের উত্তর হাতে হাতে এসে গেছিল। এর মূল কারণটা ছিল সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জলাভাব।

মনে হল এ ব্যাপারে কিছু করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে এতটা জমি অনাবাদি থেকে যাবে এ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডার বলে গণ্য করা হয় তা হলে সেই জ্ঞানের কিছু অংশ অন্তত চারপাশে ছড়িয়ে পড়া উচিত এবং দেখানো উচিত সেই জ্ঞান ব্যবহারিকভাবে কতখানি কার্যকর।

বিশ্ববিদ্যালয় কোনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয় যে বিখ্যাত জ্ঞানীগুণী মানুষ শুধু তাঁদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে চলবেন, অথচ অধীত জ্ঞান প্রতিবেশী মানুষের কোনও উপকারে আসছে কিনা সে ব্যাপারে উদাসীন থাকবেন।

* * *

দু-চার মাসের মধ্যেই ক্যাম্পাসে আমার থাকবার জন্য একটি বাড়ির ব্যবস্থা করতে পারলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার কাছাকাছি থাকতে পারব, দরকারে বেশি সময় দিতে পারব ভেবে মন আনন্দে ভরে গেল।

ক্যাম্পাসে আমার বাড়ির সামনেই পাহাড়ের সারি। প্রতিদিন আমি ফাঁকা পাহাড়গুলির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে দেখতে পেতাম শিশু, বালক, বালিকা, মানুষজন গোরু, ছাগল নিয়ে ক্যাম্পাস পেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে। সকালে বেরোবার সময় তাদের হাতে থাকে ধারালো কাস্তে। সন্ধ্যায় ফিরবার সময় মাথায় বেঁধে বয়ে আনত পাহাড়ের গাছের ডালপালা, কখনও বা পুরো গাছটাই।

ভাবলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ইচ্ছা করলেই এই ন্যাড়া পাহাড়ে গাছ লাগিয়ে চমৎকার বন বানাতে পারেন, বিশেষত শস্য, ফল ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের গাছ। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় হবে। গ্রামবাসীরা কাজ পাবে। সারা দেশের জন্য আরও খাদ্য ও অন্য ব্যবহার্য সামগ্রী উৎপন্ন করা সম্ভব হবে।

আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম স্থানীয় গ্রামবাসীদের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত। সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আসা উচিত অর্থনীতি বিভাগের।

গ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে চাইলাম। অধিকাংশ শিক্ষকদেরই গ্রাম সম্বন্ধে ধারণা ভাসাভাসা। আমি ঠিক করলাম জোবরা গ্রামের প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিয়ে দেখব। ছাত্রদের সাহায্য নিয়ে গ্রাম সম্বন্ধে একটা জরিপ প্রকল্প চালু করলাম।

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আমার জানার দরকার ছিল—

—গ্রামের ক'টি পরিবারের নিজস্ব চাষের জমি আছে?

—প্রতিটি পরিবারের জমির পরিমাণ কত?

—কত শস্য উৎপাদন হয়?

www.pathagar.com

—জমিহীন পরিবারের জীবিকা নির্বাহের উপায় কী?
—কোন পরিবারগুলি দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত?
—চাষ ছাড়া আর কোনও কর্মদক্ষতা তাদের আছে কিনা?
—জীবনের মান উন্নয়নের পথে তাদের কী কী বাধার সম্মুখীন হতে হয়?
—কতগুলি পরিবার সারা বছরের আহার্য খাদ্যের উপযুক্ত শস্য উৎপাদনে সক্ষম?
—কতগুলি পরিবারের সারা বছরের খাবার জোগাড় হয় না?
—যে ফসল উৎপন্ন হয় তা ক'মাসের খাবার জোগান দিতে পারে? দশ মাস, আট মাস, ছয় মাস না তারও কম।

'জোবরা' গ্রামের মাধ্যমে আমি বাংলাদেশকে বুঝতে চাইলাম। 'জোবরা'-ই আমার বাংলাদেশ। এই স্বদেশকে আমি স্পর্শ করতে, অনুভব করতে পারি। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে পারি। ছোট ছোট পরিবর্তন সহ যা যা আমি করতে চাই সবই এখানে করার চেষ্টা করতে পারি।

* * *

দারিদ্রের কারণ বিশ্লেষণ করতে না-গিয়ে অর্থনীতিবিদরা দেশের দারিদ্রের কারণ বিশ্লেষণের দিকে চলে গেছেন। দরিদ্র মানুষেরা যে তাদের উপযুক্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত, সমাজ সচেতন অর্থনীতিবিদগণ এই সত্যটির উপর খুবই জোর দেন। যথেষ্ট ফসল মজুত থাকা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র মানুষ তার নাগাল পায় না। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির চমকপ্রদ উন্নয়নের যুগে মানুষ যখন চাঁদে পা রাখতে সক্ষম হয়েছে, তখনও মানুষের এত কষ্ট, অনাহারের জ্বালা-যন্ত্রণা—এক কথায় অনৈতিক।

ক্ষুধা সম্বন্ধে যা জানবার জন্য আমার এত ব্যাকুলতা সেটা জানতে এবং বুঝতে পরবর্তী বিশ বছর সময় লেগেছে। আমার এই অনুভূতির কথা ১৯৯৪ সালে আইওয়ার ডেময়েন-এ (Des Moins) বিশ্বখাদ্য পুরস্কার গ্রহণের সময় আমি বলেছিলাম—

"অর্থনীতির অনন্যসাধারণ তত্ত্বগুলি দারিদ্র ও ক্ষুধার সমস্যাকে স্পর্শ করে না। অর্থনীতিবিদদের মতে অর্থনীতির অগ্রগতি ও উন্নতিই এই সমস্যার সমাধান করবে। অর্থনীতিবিদগণ তাঁদের মেধা ও বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। কেউ দারিদ্র ও অনাহার ঘটিত সংকটের দিকে দৃকপাত করেন না।"

যদি সারা বিশ্ব দারিদ্র দূরীকরণকে জরুরি কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে তা হলে আমরা এমন এক পৃথিবী গড়ে তুলতে পারব যার জন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারব, এখনকার মতো লজ্জাবোধ নিয়ে আর কাটাতে হবে না।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সেই ভয়ংকর অবস্থা অবিরাম বেড়ে চলতেই লাগল। যত অবস্থার অবনতি হতে লাগল, তত আমি অশান্ত বোধ করতে লাগলাম। আর সহ্য করতে না পেরে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করলাম।

বয়োজ্যেষ্ঠ উপাচার্য আবুল ফজল একজন স্বনামধন্য জাতীয় ব্যক্তিত্ব, সমাজ সমালোচক ও ঔপন্যাসিক ছিলেন। অনেকেই তাঁকে জাতীয় বিবেক ও চেতনার কেন্দ্রে স্থান দিত। অত্যন্ত অমায়িকভাবে তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন।

"বল, ইউনূস, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?" মাথার উপর ধীর গতিতে পাখা চলছিল। মশার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। তাঁর আরদালি চা নিয়ে এল।

"এত মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে। অথচ কেউ কিছু করতে এগিয়ে আসছে না কেন?"

www.pathagar.com

বৃদ্ধ আবুল ফজল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "এ ব্যাপারে তোমার প্রস্তাব কী?"

"আপনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। অনেকেই আপনাকে 'জাতির বিবেক' বলে মানেন। যা চলছে তার বিরুদ্ধে আর কারওর প্রতিবাদের সাহস নেই বলে আমি আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।"

"আমার কাছ থেকে তুমি কী কাজ আশা কর?"

"প্রেসে আপনাকে বিবৃতি দিতে হবে।"

"বুঝলাম, কিন্তু কী বিষয়ে?"

"সমগ্র জাতি ও নেতাসমূহের কাছে আবেদন রাখুন, সমস্ত শক্তি দিয়ে এই অনাহারের প্রতিকার করার জন্য। আমার বিশ্বাস, আপনি নেতৃত্ব দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অধ্যাপক সেই আবেদন পত্রে নিশ্চয়ই সই করবেন।"

"তুমি কি মনে করো তাতে উপকার হবে?"

"নিশ্চয়ই। তা জাতীয় মতামতকে ঠিক পথে চালিত করবে।"

চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, "ঠিক আছে, ইউনূস, তুমি বিবৃতিপত্র লেখ, আমি সই করে দিচ্ছি।"

আমি হাসলাম, "আপনি বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কথাশিল্পী। আপনি ভাল বুঝবেন বিবৃতির ভাষা কী হওয়া উচিত।"

"না, না। এটা তুমিই করো ইউনূস।"

"আমি তো লেখক নই।"

"ইউনূস, এ ব্যাপারে তুমি এত হৃদয় দিয়ে চিন্তা করছ। তুমিই ভাল জানবে কী লেখা উচিত।"

"কিন্তু দেখুন, আমি একজন অর্থনীতির অধ্যাপকমাত্র। এই লিখিত বিবৃতি হবে মিছিলের স্লোগান, জনগণকে অনুপ্রাণিত করার আবেদনপত্র।"

যত আমি তাঁকে অনুনয় করে বোঝাতে লাগলাম, জনগণকে নাড়া দেবার জন্য, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিকে মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর জন্য তিনিই উপযুক্ত মানুষ, ততই তিনি আমাকে লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তাঁর জোরালো ব্যক্তিত্বপূর্ণ আবেদনের কাছে আমাকে হার মানতে হল। কথা দিলাম বিবৃতিপত্রের প্রাথমিক খসড়া তৈরি করার চেষ্টা করব।

সেই সন্ধ্যায় আমি দীর্ঘ আবেদন পত্র লিখলাম। উপাচার্যের হাতে তা দিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে তিনি সমস্তটা পড়লেন।

পড়া শেষ হতেই আবুল ফজল তাঁর কলম তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কোথায় সই করতে হবে?"

আমি তো হতবাক। কথা ছিল বিবৃতিতে কোথাও সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের দরকার হলে তিনি তা করবেন।

"কিছু বদলাবার দরকার নেই। চমৎকার হয়েছে।" বলে সেই মুহূর্তে সই করে দিলেন আবেদনপত্রে।

আর কোনও উপায় রইল না। আমিও সই করলাম। অনেকগুলো কপি করিয়ে, অধ্যাপকদের প্রত্যেককে বিবৃতির একটা করে কপি দিলাম। কোনও কোনও শব্দের ব্যবহারে অনেকেই প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু উপাচার্য স্বয়ং সই করেছেন। তাঁর সমর্থনের জোরে সব বিরুদ্ধ মত ভেসে গেল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অধ্যাপক একযোগে বিবৃতিতে সই করলেন। আমরা সংবাদ মাধ্যমের কাছে সেই আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলাম। পরের দিন

www.pathagar.com

আমাদের বক্তব্য খবরের কাগজের মুখ্য সমাচারের শিরোনামে প্রকাশ হল।

আমাদের চিঠি একটা বিশাল কর্মোদ্যমের সূচনা করল। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি সংস্থা থেকে এরকম আরও প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে লাগল। এঁরা আগে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটি মন্তব্যও করেননি।

* * *

এখন থেকে আমি তত্ত্ব মুখস্থ না করে বাস্তব জগৎ থেকে পাঠ গ্রহণ করার উপর জোর দিলাম। এই জগৎ অনুসন্ধানের জন্য হাজার মাইল ভ্রমণের প্রয়োজন নেই। ক্লাসরুমের বাইরেই সে জগৎ সতত হাতছানি দিয়ে চলেছে।

প্রকৃত অর্থে ক্লাসরুমের ভিতরে ছাড়া সর্বত্রই এ জগৎ ব্যাপৃত।

www.pathagar.com

৮

কৃষিপ্রকল্প : তেভাগা খামারের অভিজ্ঞতা

(১৯৭৪-৭৬)

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ আমাকে কৃষিকার্যে উদ্যোগী হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল।

৩৫০ লক্ষ একর এলাকা জুড়ে পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলির অন্যতম বাংলাদেশ। এখানে আরও খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন ছিল। এই দেশে চাষের উপযোগী ভূখণ্ড রয়েছে ২১০ লক্ষ একর। যেখানে বর্ষায় প্রধানত ধান ও গম উৎপন্ন হয়। শুকনো মরশুমে পরিবর্ধিত জলসেচ প্রকল্প ও উন্নতমানের জল সরবরাহ ব্যবস্থা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। বিশেষজ্ঞদের সমীক্ষায় জানা গেছে, আমাদের মাটির যে উৎপাদন ক্ষমতা তার মাত্র ১৬ শতাংশের মতো আমরা ব্যবহার করি।

* * *

স্থির করলাম জোবরার গ্রামবাসীদের অধিক খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করব। কীভাবে তা সম্ভব? প্রতি মরশুমে বেশি ফসল ফলানো, না একই জমিতে অধিকবার ফসল ফলানো?

আমি কৃষিবিদ নই। তবু অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম প্রতি মরশুমে কত বেশি ফসল ফলানো সম্ভব।

স্থানীয় স্বল্প ফলনশীল ধানের তুলনায় ফিলিপাইনসের উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের গুরুত্ব সম্বন্ধে ছাত্রদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে শুরু করলাম। চাষিদেরও সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে ডেকে আনলাম। এটা তাদের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তা জানাবার জন্য।

চাষিরা অনেকটা কৌতুকের সঙ্গে আমাদের কর্মকাণ্ড দেখতে থাকলেন। কিন্তু আমরা খুব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের জন্য আমরা তাদের বিনামূল্যে সহায়তা দিতে শুরু করলাম। ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ—স্বেচ্ছাসেবী-কৃষকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সারা গ্রাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টির সামনে আমরা হাঁটুডোবা কাদাজলে ধানের চারা রোপণের সংগ্রাম করে চলেছি। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক চাষির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধানের চারা রোপণ করছেন এ দৃশ্য এর আগে কে দেখেছে? এমনকী শুনেছে কি কেউ?

এক সারিতে ও সুনির্দিষ্ট দূরত্বে প্রতিটি ধানচারা বপন করার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি ও আমার ছাত্ররা কৃষকদের হাতে কলমে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে সার্থক ফলন ও জমির সদ্ব্যবহারের জন্য তা অত্যন্ত জরুরি। স্থানীয় সংবাদপত্রে আমাদের ছবি ছাপা হল। আমরা দড়ি ধরে স্থানীয় চাষিদের সরলরেখায় ধান রুইতে শেখাচ্ছি। প্রথমে অনেকেই হাসি মশকরা করল। আমার হাতে-কলমে শিক্ষাদানে অনেক ছাত্র বিরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু

www.pathagar.com

আমাদের সহায়তায় এই উপায়ে উৎপন্ন ফসল পরিমাণে চারগুণ বেড়ে গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের জন্য নতুন পথের সন্ধান করতে লাগলাম। স্থানীয় চাষের ব্যাপারে আমার আগ্রহ ও উদ্যম পুরোপুরি কঠোর বাস্তব নির্ভর ছিল। ব্যর্থতার মধ্যে আমি সার্থক জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হয়েছিলাম।

শিক্ষাজগৎ ও গ্রামকে একত্র করে 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প' নামক একটি প্রকল্প আগেই চালু করা হয়েছিল। আমি এর বাস্তব প্রয়োগে সচেষ্ট হলাম।

আমার অনেক ছাত্রেরই স্মরণে ছিল যে ১৯৭২ সালে প্রথম যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দিই তখন আমি অনেক কড়া শিক্ষক ছিলাম। আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে ছাত্রদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হত।

তবে 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প' ছাত্রদের সঙ্গে আমার দূরত্ব ঘুচিয়ে দিল। এটা ছাত্র ও শিক্ষকদের অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে প্রচলিত বাংলাদেশি ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে গড়ে ওঠা জড়তার বাধা কাটাতে সাহায্য করেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রথাগত শিক্ষা বর্জন করে সি. ইউ. আর. ডি. পি. নামক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পকে আরও বিস্তৃতভাবে রূপায়ণ করতে উদ্যোগী হয়েছি। ছাত্রদের গ্রামে নিয়ে যেতাম। গ্রামবাসীদের রোজকার জীবনযাত্রা কেমনভাবে উন্নতি লাভ করছে তার মূল্যায়ন করতে উৎসাহিত করতাম। এই অভিজ্ঞতা থেকে ইচ্ছামতো বিষয় নির্বাচন করে তার উপর গবেষণাপত্র রচনা করার অবাধ সুযোগ ছিল তাদের, যা তাদের শিক্ষাক্রমের অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

* * *

১৯৭৫ সালের শীতকালে আমি শীতের ফলন বাড়াবার জন্য সেচ ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হলাম।

বর্ষায় যেখানেই আমি গাড়ি চালিয়ে যেতাম, অবাক হয়ে দেখতাম যে প্রায় প্রতি বর্গ মিটার জমিতে চাষের কাজ চলছে। এমনকী যে জলাভূমিকে অযোগ্য মনে করা হত সেখানেও ধান ও মাছের চাষ হচ্ছে। অথচ শীতে এসব জমি অব্যবহৃত পড়ে থাকে। এসব জমিতে শীতের ফসল ফলালে কেমন হয়?

প্রতিদিন দেখতে পেতাম অনাবাদি জমির মাঝখানে পড়ে রয়েছে আমাদেরই উদ্যোগে স্থাপিত গভীর নলকূপ। শীতকালের শুকনো মরশুমে সেই নলকূপ অনায়াসে ক্ষেতে পানি সরবরাহ করতে পারে। তাতে নতুন ফসল ফলানো সম্ভব। কিন্তু কিছুই করা হচ্ছে না। নতুন, অথচ অব্যবহারে অকেজো হয়ে পড়ে আছে নলকূপগুলি।

নলকূপ ব্যবহার না করার কারণ অনুসন্ধান করলাম। জানা গেল গত শুকনো মরশুমে পানি বাবদ খরচের টাকা সংগ্রহ নিয়ে চাষিদের পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদ ঘটেছিল তা নিয়ে তারা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। এই ঝগড়াবিবাদ করে যেটুকু চাল তাঁরা গত মৌসুমে উৎপাদন করেছিলেন সেটুকু খাবার সময় মনে হয়েছে তিতা ভাত খাচ্ছি। তাঁরা বললেন, তাঁরা আর গভীর নলকূপের চাষও চান না, তিতা ভাতও খেতে চান না। সেই থেকে গভীর নলকূপটি আর কাজে লাগেনি। পানি ও টাকার কী সাংঘাতিক অপচয়!

ঘটনার অযৌক্তিকতায় আমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেলাম। ভাবা যায়? যে দেশে অসংখ্য মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা পড়ছে, সেখানে ৩০০ ফুট গভীর নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এগুলো চালু থাকলে অন্তত ৬০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হত।

www.pathagar.com

সেসময় আবিষ্কৃত সেচের যাবতীয় উপায়ের মধ্যে গভীর নলকূপই হল সবচেয়ে ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতি। সম্ভবত সেইজন্যই নলকূপ খননে সরকার ও দাতা-সংস্থাগুলির সাহায্যের হাত সর্বাধিক দরাজ ছিল। হস্তচালিত পাম্প বা টিউব ওয়েল যা সবচেয়ে সস্তা ও দরিদ্র পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত তা সরকারি পরিকল্পনায় কখনও প্রাধান্য পায়নি।

গভীর নলকূপ খননের কাজ সবচেয়ে ব্যয়বহুল হলেও তা সবচেয়ে কম কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। এগুলির খননকার্যে অনেক দুর্নীতির কাহিনী রয়েছে। উপরন্তু জ্বালানি তেল, লুব্রিকেন্ট তেল ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ প্রায়ই অপব্যবহারে বিনষ্ট হয়। জোবরা গ্রামে আমার এই অভিজ্ঞতা কোনও বিরল দৃষ্টান্ত নয়। এটা একটা জাতীয় স্তরের সমস্যা, যা সমাজব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করেছে।

গভীর নলকূপের সদ্ব্যবহারের জন্য চাই পর্যাপ্ত জলসেচের ব্যবস্থা ও অসংখ্য ভাগচাষি, যাঁরা সমবেতভাবে কৃষিপণ্যের ব্যাপারে একমত হবেন। তাঁদের সারের ব্যবহার ও সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। পাম্পের মেরামত ও সংরক্ষণের তালিমও অত্যন্ত জরুরি। তাঁদের ফসল বিক্রয়ের জন্য একটি বাজারও দরকার। এতসব সামাল দেবার জন্য দরকার সীমিত পরিসরে পুঙ্খানুপুঙ্খ সঠিক পরিচালন ব্যবস্থা।

দুর্ভাগ্যবশত সরকারি প্রকল্পগুলি গভীর নলকূপের প্রযুক্তি ও তাদের ব্যবহারকারীদের মধ্যে কোনও সংযোগ রক্ষা করতে পারেনি। ভেবে নেওয়া হয়েছিল একবার নলকূপ বসিয়ে দিলেই সব কর্তব্য শেষ—সেগুলি অনন্তকাল ঠিকঠাক কাজ করে চলবে। দাতা-সংস্থাগুলির প্রদত্ত মোটা টাকা সরকার সেচের নানা উন্নত প্রকল্প চালু করতে ব্যয় করেছেন। জনগণের সমস্যা নিরসনে ব্যয় করার মতো সময়, সংগতি, সদিচ্ছা কোনওটাই সরকারের নেই।

এই নিরবচ্ছিন্ন সাংগঠনিক সমস্যার জন্য চাষিরা স্বভাবতই অতিরিক্ত ঝুঁকি নিতে আগ্রহ বোধ করেন না।

এইসব অব্যবস্থার ফলে দশ লক্ষ টাকা খরচ করে খনন করা গভীর নলকূপগুলির প্রায় অর্ধেকেই অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। পরিত্যক্ত নলকূপের মরচে ধরা কলকবজা চাষিদের কাছে অপ্রয়োজনীয় ব্যর্থ কারিগরি প্রযুক্তির মাশুল বহন করে চলেছে। এটি বিপথগামী উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যর্থতার আর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

নতুন ধরনের কৃষি সমবায় স্থাপনের পরিকল্পনা আমার মাথায় এল। নাম দিলাম 'নবযুগ তেভাগা খামার।'

স্থানীয় কৃষকদের ডেকে আলাপ আলোচনা করলাম। একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পের রূপরেখা স্থির হল। খরা বা শুকনো মরশুমে জমির মালিক তাঁদের জমি দেবেন। ভাগচাষিরা তাঁদের শ্রম দান করবেন। আমি সকল ব্যয়ভার বহন করব। গভীর নলকূপ চালু রাখার জ্বালানি খরচ, অধিক ফলনশীল শস্যবীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ ও প্রযুক্তিগত খরচ সবই আমার। পরিবর্তে তিনটি দল (অর্থাৎ জমির মালিক, ভাগচাষি ও আমি) প্রত্যেকে ফসলের এক তৃতীয়াংশ ভাগ পাবে।

প্রথমে গ্রামবাসীরা আমার প্রস্তাব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ল। চাষি ও নলকূপ চালকদের মধ্যে এত তিক্ততা ও অবিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে আমার বা অন্য কারওর কথায় কান দেবার মতো মনের অবস্থা তাদের ছিল না। আমার পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অযথা অনেক সময় নষ্ট হবে এই যুক্তিতে তারা আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচারণ করল। কেউ কেউ বলল লাভের এক তৃতীয়াংশ আমার প্রাপ্য হিসেবে বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমার ভাগ হওয়া উচিত লাভের এক পঞ্চমাংশ। ক্ষতি হলে সব দায় আমার। লাভ হলে তা তিনভাগে সমান ভাগ হবে—আমার এই বিবেচনাপূর্ণ প্রস্তাবও

www.pathagar.com

তাদের উৎসাহিত করতে পারছিল না। প্রথম বৈঠকে তারা আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

এক সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় দফায় বৈঠক বসল। এবার আমি তাদের বিশ্বাস করাতে পারলাম যে তাদের হারাবার কিছু নেই। সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধ, সেচের পানি সবই তারা প্রথমে বিনামূল্যেই পাবে। বিনিময়ে তাদের ফসলের এক তৃতীয়াংশ আমাকে দেবার জন্য রাজি হতে হবে। গরিব ভাগচাষিদের কাছে এ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রস্তাব। আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও ধনী কৃষকরা ভাবল একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? সমস্ত গ্রামে এ ব্যাপারে গুঞ্জন উঠল—তারা আগাম জল্পনা করতে লাগল এর ফল কী হতে পারে।

* * *

আমার পক্ষেও এ ছিল প্রচণ্ড উদ্বেগের সময়। রাতে ঘুমাতে পারতাম না। দুশ্চিন্তা করতাম, না জানি কী ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে আমার আশা ও উত্তেজনার অবধি ছিল না। নিশ্চিত জানতাম ঠিকমতো প্রয়োগ হলে এই প্রকল্প সফল হবেই। এটাই যে হয়ে উঠবে সেচ সংক্রান্ত সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান—সে সম্বন্ধে আমার কোনও সংশয় ছিল না। কিন্তু এটা সফল করে তোলা ছিল দুরূহ ব্যাপার।

প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমার নিযুক্ত চারজন ছাত্র ও তেরোজন উপদেষ্টামণ্ডলী নিয়ে আমি চাষিদের সঙ্গে নিয়মমাফিক বৈঠকে বসতাম। সেচ, সার, প্রযুক্তি, সংরক্ষণ, যাতায়াত, বাজার ইত্যাদি নানা সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা হত সে বৈঠকে।

একজন কৃষক তাঁর ফসল ফলাচ্ছেন এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। এ দৃশ্য দেখা যেত শুধু বর্ষাকালে। এটা তাদের পক্ষে ছিল পরম সুসময়। এবার শীতের মরশুমেও সেই খুশির দিনের সূচনা হল।

চাষের কাজে বাঙালি কৃষকের উৎসাহ, শক্তি ও উদ্যোগ এক কথায় অসাধারণ। তারা নিজের হাতে বীজ ছড়ায়। অচিরেই কচি চারাগাছ উঁকি মারে মাটির বুক ফুঁড়ে। তারপর আসে সেই চারাগাছ রুইবার জন্য হাড়ভাঙা খাটুনির সময়। কিন্তু বহুদিনের অভ্যাস কৃষকদের এই কঠোর পরিশ্রমকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছে—অনভ্যস্ত শিক্ষাবিদের পক্ষে সেই পরিশ্রম খুবই কষ্টসাধ্য। আমরা যখন হাঁটুজলে উবু হয়ে চারাগাছ পুঁতছিলাম আমাদের শিক্ষার অহংবোধ ও সামাজিক ব্যবধান সব ঘুচে গিয়েছিল।

যথোপযুক্ত সেচের ফলে মাঠ পান্নাসবুজ কচি ধানে ভরে গেল। ধানের সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা দেখলে প্রত্যেক বাঙালির বুক ভরে যায়। কোনওরকম অর্থ বিনিয়োগ ছাড়াই কৃষক প্রচুর ফসল ফলাতে পারল।

আমাদের সবার কাছেই এটা ছিল শেখার সময়। প্রথম বছর শেষ হল অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে। প্রত্যেক কৃষক সুখী হল। আমার অবশ্য তেরো হাজার টাকা ক্ষতি হল, কারণ কৃষকেরা লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত করে আমাকে ঠকাল। শর্ত অগ্রাহ্য করে তারা আমাকে এক তৃতীয়াংশের কম ফসল ভাগে দিল। কিন্তু পুরো পরিকল্পনা সফল হওয়াতে আমার মনে এ নিয়ে কোনও ক্ষোভ ছিল না বরং নিজেকে বিজয়ী বলে মনে হচ্ছিল। যে জমিতে শুকনো মরশুমে এতদিন কোনও ফলন হয়নি, সেখানে আমরা সোনার ফসল ফলাতে পেরেছি এখানেই আমাদের চরম সার্থকতা।

১৯৭৮ সালে আমাদের তেভাগা চাষের ডিজাইন ও সফল বাস্তবায়ন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেছিল।

www.pathagar.com

* * *

প্রাথমিক আনন্দ-উচ্ছ্বাসের পর বুঝতে পারলাম বিরাট ভুল হয়ে গেছে।

কৃষকদের নিয়ে এই তেভাগা সমীক্ষা এক নতুন সমস্যার উপর আলোকপাত করল। এই সমস্যার কথা আমার মনে আগে উদয় হয়নি।

ধান পাকলে তা মাড়াই করার জন্য প্রচুর লোকের প্রয়োজন হয়। এইসব একঘেয়ে দৈহিক পরিশ্রমের জন্য নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুঃস্থ মহিলাদের নিয়োগ করা হয়। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া এদের অন্য রোজগারের পথ খোলা নেই। ধোপার গাধার মতো তারা খেটে যায়। খুব ভোরে শুরু হয় মাড়াইয়ের কাজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে মাড়াইয়ের কাজ করে এইসব মহিলা শ্রমিক। পড়ে যাবার ভয়ে সংকীর্ণ এক চিলতে দেওয়াল আঁকড়ে ধরে থাকে।

২৫-৩০ জন মহিলার ধান মাড়াইয়ের এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন দৃশ্য আমি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না। খালি পায়ে, শুধুমাত্র দেওয়ালে ভর দিয়ে, সমানে শরীরটা মুচড়ে পা দিয়ে চাপ দিয়ে খড় থেকে ধান ছাড়ানো—এই কাজ ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অবিরাম চলছিল। কত পরিমাণ ধান মাড়াই হল তার উপর এদের আয় নির্ভর করে। মাড়াই করা ধানের ষোলো ভাগের একভাগ মাত্র তারা পায়। সাধারণত তা বারো কেজি পরিমাণ। আর্থিক মূল্যানুযায়ী ১৮/১৯ টাকা।

দেওয়ালের কোন জায়গাটা বেশি সুবিধাজনক, অপেক্ষাকৃত কম ক্লান্তিকর, সেই জায়গা দখলের জন্য মহিলাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এক দৌড়ে সেখানে পৌঁছনোর জন্য প্রতিযোগিতা এত ভয়ানক হয়ে ওঠে যে অনেকেই রাত থাকতে কাজের জায়গায় পৌঁছতে চেষ্টা করে। এসে দেখে আরও আগেই সবাই সেখানে হাজির।

কী নিদারুণ যন্ত্রণাময় জীবন। শুধুমাত্র ১৯ টাকা রোজগারের জন্য সমস্ত দেহের ওজন দিয়ে, খালি পা অবিরত চালনা করে দশ ঘণ্টা অকল্পনীয় পরিশ্রম।

আমি স্পষ্ট বুঝলাম যে কৃষক যত বিত্তশালী, আমার তেভাগা চাষের পরিকল্পনা তার পক্ষে ততই লাভজনক। যে যত গরিব এই ব্যবস্থা থেকে তার উপকারের আশা ততই সামান্য। ধান মাড়াইয়ে নিযুক্ত মহিলারা সবচেয়ে কম মজুরি পান। সম্পূর্ণ ছবিটা আমায় একেবারে নিরাশ করে দিল।

অথচ আমি তো ঠিক এর উলটোটাই চেয়েছিলাম। আশা ছিল দরিদ্রতম মানুষ অধিক লাভবান হবেন। অনেক পরিকল্পনার জাল বুনলাম কিন্তু কোনওটাই নির্ভরযোগ্য মনে হল না। বুঝলাম আর্থিক সংগতি থাকলে মহিলারা নিজেরাই ধান কিনে মাড়াই করে এর চারগুণ উপার্জন করতে পারতেন।

কয়েক সপ্তাহ ধান মাড়াইয়ের পর এক মহিলা আমাকে বললেন, "আপনার তেভাগায় আমাদের কীসের সুখ? ক'সপ্তাহ পরই তো আমরা বেকার হয়ে যাচ্ছি। কী খাব এবার আমরা?"

এই মহিলাদের কেউ বিধবা, কেউ তালাক প্রাপ্ত বা স্বামী পরিত্যক্তা। প্রায় প্রত্যেকেরই সন্তান পালনের দায়িত্ব আছে। এতই গরিব তাঁরা যে ভাগচাষি হবার ক্ষমতাটুকুও তাঁদের নেই। তাঁদের না আছে জমি বা টাকা, না আছে কোনও আশা।

এইভাবে আমার দৃষ্টি দীন থেকে দীনতরদের উপর নিবদ্ধ হল।

আন্তর্জাতিক উন্নয়নের বাগাড়ম্বরে 'ছোটচাষি' কথাটি ব্যবহার হয় সাধারণ ও মাঝারি মানের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষদের কথা বোঝাতে। তাই গ্রামের প্রকল্পগুলি সর্বদা চাষি

www.pathagar.com

ও জমির মালিকদের কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়। দুটো কারণে আমি এর বিরোধিতা করলাম।

প্রথমত "কৃষক" বলতে অলিখিতভাবে পুরুষদেরই বোঝায়। এখানে পুরুষ ও নারী এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষের উপর পক্ষপাতের প্রশ্ন ওঠে। একদল চাষিকে সনাক্ত করলেই তাদের উন্নয়নের চিন্তাধারা পুরুষভিত্তিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। জনগোষ্ঠীর অপর অংশ অর্থাৎ মহিলাদের অস্তিত্বের কথা সবাই সযতনে এড়িয়ে যায়।

মহিলাদের কথা উঠলেও তাদের, পুরুষ শাসিত পরিবারে নিছক ঘরের কাজে সাহায্যকারিণীর বেশি কিছু ভাবা হয় না। এইরকম চিন্তা যে-কোনও উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, গ্রামবাংলায় ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন (আধ একরের কম জমির মালিক) মানুষেরাই কৃষিক্ষেত্রে প্রধান শ্রম দান করে। এতে তারা তাদের মোট কাজের সময়ের এক পঞ্চমাংশ মাত্র ব্যয় করতে পারে, বাকি ৮০ ভাগ কাজের যোগ্য সময়ের অপচয় হয়, অকাজে বা নিষ্কর্ম অলসতায় কেটে যায়। এই বাকি সময়টুকু কৃষিকাজে কখনওই ব্যয় হয় না। অর্থাৎ কৃষিকাজ তাদের জীবিকার একটা ছোট অংশ মাত্র, সেটুকুর ভিত্তিতে কোনও শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। এটা তত্ত্বগতভাবে ভুল। শুধু তাই নয়, এই ভ্রান্ত শ্রেণীবিভাগ তাদের উপযুক্ত রোজগার বা কর্মসংস্থানের কার্যকরী সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। তাদের "কৃষক" হিসেবে চিহ্নিত করা মানেই তাদের অন্যান্য সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে না দেওয়া। তাদের পক্ষে এই ধারণা কোনও আশার আলো দেখায় না।

* * *

এই কারণেই চাষি ও প্রকৃত গরিবের মধ্যে পার্থক্য করা আমার কাছে অত্যন্ত জরুরি কর্তব্য হয়ে উঠল।

এই সময় সরকারি আমলা ও সমাজবিজ্ঞানীরা প্রকৃত অর্থে দরিদ্র কারা এই প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন বোধ করছিলেন না। নিঃসন্দেহে তাঁরা ভেবেছিলেন এর উত্তর এতই প্রাঞ্জল যে সে সম্বন্ধে দ্বিমত উঠতেই পারে না। তা ছাড়া প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানী নিজের সুবিধা অনুযায়ী দারিদ্রের সংজ্ঞা বদল করতেন। একজন ছেঁড়া জামা পরা মানুষও 'গরিব' বলে বিবেচিত হতে পারেন, আবার একজন ময়লা জামা পরা মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে 'গরিব' আখ্যা পান। নীচের তালিকার কে গরিব আর কে গরিব নয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন—

—বেকার?
—নিরক্ষর?
—ভূমিহীন?
—গৃহহীন?
—যে সারা বছর পুরো পরিবারের খাদ্য জোগানে অক্ষম?
—যে ২৫ একরের কম জমির অধিকারী?
—যার বাড়ির চাল খড়ের, ছিদ্র দিয়ে বর্ষায় ঘরে জল পড়ে?
—অপুষ্টির শিকার?
—সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার ক্ষমতা যাদের নেই?
—ফেরিওয়ালা?

www.pathagar.com

এইরকম অস্পষ্ট ধারণা দারিদ্র দূরীকরণ প্রচেষ্টাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। গরিবের সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য সুস্পষ্ট ধারণার অভাব অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। 'গরিব' কথাটির অর্থ ছোট বা প্রান্তিক চাষির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কথাটি প্রকৃত অর্থে এক বৃহৎ দলের প্রতীক। এই সংজ্ঞা নারী ও শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করে না। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অবস্থা প্রান্তিক কৃষকদের চেয়েও দুর্দশাগ্রস্ত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'গরিব'* শব্দের তিনটি সংজ্ঞা আমি নির্ধারণ করেছি।

গরিব ১)—দরিদ্রতম, জনসংখ্যার নিম্নতম ২০ শতাংশ
গরিব ২)—জনসংখ্যার নিম্নতম ৩৫ শতাংশ
গরিব ৩)—জনসংখ্যার নিম্নতম ৫০ শতাংশ

দরিদ্রের উপরোক্ত প্রতিটি শ্রেণীকে আমি আবার অঞ্চল, পেশা, ধর্ম, গোষ্ঠীগত পরিচয়ে যেমন আদিবাসী/নিম্নবর্গ, মহিলা/পুরুষ, বয়স অনুযায়ী ভাগ করে থাকি। পেশা বা অঞ্চল অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ, উপার্জন অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের মতো নিরাপদ নয়। সব শ্রেণীবিভাগকে একত্র করে আমরা দারিদ্রের বহুমাত্রিক ছক তৈরি করতে পারি।

অন্যান্য দেশে শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ আলাদা যেহেতু তুলনায় খুব কম সংখ্যক মানুষ সেখানে দরিদ্র। দেশভেদে দারিদ্রের পৃথক সংজ্ঞা হওয়া উচিত (২৫ একর জমির মালিকানা মরুপ্রদেশে দারিদ্রের মাপকাঠি হলেও উর্বর দেশে তা সচ্ছলতার উদাহরণ) দারিদ্রের বিশ্বজনীন সংজ্ঞার বদলে, পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি জাতির দারিদ্রের মাপকাঠি নির্ণয় করা, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির বিশ্লেষণমূলক কাজের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

কারা দরিদ্র নয় নির্ধারণ করা ও তাদের মধ্যে কারা সবচেয়ে অভাবী, শুধুমাত্র তত্ত্বকথার খাতিরে তার চুলচেরা বিচারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু হাতে-কলমে কাজ চালানোর জন্য তা খুবই জরুরি। স্পষ্ট সীমারেখা টানা না হলে এই বিষয়ে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা কোনওদিন বুঝতেও পারবেন না অভাবীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া সাহায্য সঠিক জায়গায় না পৌঁছে পিছলে চলে যাচ্ছে তাদের কাছে যারা দারিদ্রসীমার উপরে বাস করেন।

অচেনা জলরাশিতে জাহাজ চালনা করতে নাবিকের নৌচিহ্ন দরকার হয়। যে-কোনও বিষয়ের সংজ্ঞাও তেমন স্পষ্ট ও ত্রুটিমুক্ত হওয়া দরকার যে সংজ্ঞা প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ ও বাস্তবে ব্যবহারপযোগী নয় সে সংজ্ঞা এক কথায় মূল্যহীন।

১৯৭৫ সালে তেভাগা চাষ প্রকল্পে ধান মাড়াইয়ের কাজে নিযুক্ত মহিলা শ্রমিক, জোবরা গ্রামে বাঁশের মোড়া প্রস্তুতকারিণী সুফিয়া বেগম ও ক্ষুদ্র কারবারি বজলুল, যাকে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে ১০ শতাংশ সুদে টাকা ধার করতে হয়, তাদের প্রত্যেককেই আমি 'দরিদ্র' বলে চিহ্নিত করব। এদের মতো আরও অনেকে ঝুড়ি, চটের মাদুর, পাটি তৈরির মতো শিল্পকর্ম করতে হাড়ভাঙা খাটুনি করে যাচ্ছে, অথচ উপার্জন এত কম যে জীবনের ন্যূনতম চাহিদাটুকুও মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না। এদেরও এই শ্রেণীভুক্ত করতে হবে।

এদের প্রত্যেকেরই নিজেদের আর্থিক ভিত্তি খুবই পাতলা। এই ভিত্তি পুরু করার এবং তার মাধ্যমে উপার্জন বাড়ারও কোনও সম্ভাবনা নেই।

www.pathagar.com

* * *

চাষ নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আমাদের জোবরা গ্রামের গভীর নলকূপ পুনরুদ্ধারের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অপরিসীম। এই অভিজ্ঞতাগুলি ভূমিহীন সর্বহারাদের প্রতি আমাকে মনোযোগী করে তুলেছিল।

কোনও দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পে 'দরিদ্র' নয় এমন মানুষের অন্তর্ভুক্তি হলে প্রকৃত দরিদ্রদের কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে হটিয়ে দেবে সচ্ছল মানুষেরা। শীঘ্রই আমি যুক্তি দিয়ে এই সত্য প্রচার করতে শুরু করলাম।

অর্থনীতি শাস্ত্রের সেই প্রাচীন 'গ্রেশাম ল' অনুযায়ী আমাদের মনে রাখা উচিত, আজকের উন্নয়নশীল বিশ্বে দরিদ্র ও সচ্ছলকে একই প্রকল্পের অন্তর্গত করলে, সচ্ছল সর্বদাই দরিদ্রকে হটিয়ে দেবে, কম দরিদ্র সবসময় বেশি দরিদ্রকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে। এই পদ্ধতি অনন্তকাল চলতেই থাকবে তাই প্রকল্প তৈরির সময় প্রথম থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে গরিবদের জন্য রচিত প্রকল্পে যারা গরিব নয় তারা যেন ঢুকে যেতে না পারে।

তা না-হলে দরিদ্র জনগণের নাম করে যে প্রচেষ্টা শুরু হবে শেষপর্যন্ত তার সুফল ভোগ করবে সচ্ছল মানুষেরা।

---

* CGAP (Consultative Group to Assist the Poorest) and 'Micro-credit Summit Campaign' Committe অর্থাৎ দরিদ্রতমদের সাহায্যদানের জন্য দাতা সংস্থা সমূহের পারস্পরিক পরামর্শ করার সংগঠন এবং 'ক্ষুদ্র-ঋণের শীর্ষ সম্মেলনের প্রচার সমিতি' 'দরিদ্র' শব্দের যে সংজ্ঞা গ্রহণ করেছে তা হল—দারিদ্রসীমার নীচে যে-কোনও মানুষ। যাঁরা দারিদ্রসীমার নিম্নতম অর্ধাংশের অন্তর্গত তাঁরাই 'দরিদ্রতম' মানুষ।

www.pathagar.com

৯

ব্যাংকিং : জামানতের লোহার গরাদে ভাঙন, ১৯৭৬

কৃষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কাজ করার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত দরিদ্রদের কাছে পৌঁছতে পারিনি। এই উপলব্ধির পর, আমি একদম ঘরের কাছের ভূমিহীন, সম্বলহীন মানুষদের সমস্যার প্রতি মনঃসংযোগ করলাম।

আমার বিবেচনায় ভূমিহীন মানুষ, ছোট চাষিদের চেয়ে অনেক বেশি উদ্যোগী। যাদের জীবন কেবল চাষের কাজের মধ্যেই আবর্তিত হয় তারা হয়ে ওঠে রক্ষণশীল, সংকীর্ণমনা ও অনুদার। যাদের জমি নেই তাদের জমির সঙ্গে তেমন বন্ধনও নেই। তারা অনেক বেশি উদার। নতুন ভাবনা গ্রহণ করতে সর্বদাই আগ্রহী। অসহায় অবস্থার ভয়ানক দুর্বিপাকের আবর্তে পড়ে তারা হয়ে ওঠে লড়াকু। জমির সঙ্গে যোগ নেই বলে, চিরন্তন জীবনযাত্রাকে আঁকড়ে না ধরে তারা অন্য পথের সন্ধানী হয়।

* * *

প্রথম অধ্যায়ে সুফিয়া বেগমের কাহিনী শুনিয়েছিলাম। এই ঘটনা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। মাত্র পাঁচ টাকার অভাবে কেউ সারাজীবনের জন্য ক্রীতদাস হয়ে থাকতে পারে, তা কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

৪২টি পরিবারকে যখন ৮৫৬ টাকা ঋণ দিলাম, তখন দেখলাম তাদের মধ্যে খুশির বান ডেকেছে। এই সামান্য ক'টা টাকা মানুষের জীবনে এত সুখ নিয়ে আসতে পারে? এর পর আমার পক্ষে এ বিষয়টি থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

একটা সুবন্দোবস্তের একান্তই দরকার। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক বিলিব্যবস্থা, যাতে অভাবী মানুষ দরকার হলেই টাকার জন্য তার দ্বারস্থ হতে পারে। কিন্তু কেমনভাবে? এই প্রশ্নের মীমাংসার আশায় ব্যাংকের কাছে যাব ঠিক করলাম। একমাত্র ব্যাংকই প্রয়োজনের সময় তাদের টাকা ঋণ দিতে পারে। সেটাই ব্যাংকের কাজ।

* * *

আমি জনতা ব্যাংকের স্থানীয় শাখায় গেলাম। সরকার পরিচালিত জনতা ব্যাংক দেশের উল্লেখযোগ্য ব্যাংকগুলির মধ্যে একটি।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের ঠিক বাইরে রাস্তার বাঁ পাশে ব্যাংকের স্থানীয় শাখা। তার দুধারে ফুটপাথে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ছোটখাটো দোকান ও খাবারের ঝুপড়ি চালান। বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

ছাত্রদের জন্য সুপুরি থেকে শুরু করে সবরকম খাদ্যদ্রব্য, কাগজ, কলম কী না বিক্রি হয় সেগুলোতে। যখন আবাস থেকে ক্লাসরুম পর্যন্ত ছাত্রদের আনার কাজ থাকে না তখন রিকশাওলারা এখানে জটলা করে, বিশ্রাম নেয়, আড্ডা মারে।

একটিমাত্র চৌকোনা ঘরে জনতা ব্যাংকের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখাটি চালানো হত। সামনের দুটি জানালায় শিক বসানো। দেওয়ালের রং গাঢ় সবুজ—জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়ে বিশ্রী দেখাত। চৌকাঠ পেরোলেই ডানদিকে ক্যাশিয়ারের বসার জায়গা। সামনে কয়েকটা টেবিল চেয়ার পাতা। পিছনের দেওয়ালের ডানদিক ঘেঁষে সিন্দুক। ম্যানেজারের আসন তার ডান পাশে, ছাদে পাখা ঘুরছে। আমি প্রবেশ করতেই ম্যানেজার আমাকে অত্যন্ত বিনীতভাবে অভিবাদন জানিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন।

"বলুন স্যার, আপনার জন্য কী করতে পারি?"

বেয়ারা চা বিস্কুট নিয়ে এল। আমার আসার উদ্দেশ্য তাঁকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলাম।

"শেষবার তেভাগা প্রকল্পের জন্য আমি আপনার কাছে ঋণ নিতে এসেছিলাম, এখন এসেছি এক নতুন প্রস্তাব নিয়ে। জোবরার গরিব মানুষদের আমি টাকা ধার দিতে চাই। ঋণের অর্থমূল্য হবে খুবই স্বল্প। আমি নিজে একাজ একবার করেছি। ৪২জনকে মাত্র ৮৫৬ টাকা ধার দিয়েছি। কিন্তু আরও অসংখ্য অভাবী মানুষের টাকার খুবই প্রয়োজন—তাদের কাজ চালাবার উপযোগী কাঁচা মাল ও অন্যান্য রসদ কেনার জন্য।"

"কী ধরনের জিনিষ তারা বানায়?" ম্যানেজার মনে হল দ্বন্দ্বে পড়ে গেছেন। যেন নিয়মকানুন না জেনেই অজানা এক খেলায় নেমেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান বলে তিনি আমায় কথার মাঝখানে থামিয়ে দিতে পারেননি। কিন্তু তিনি যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন।

"বাঁশের মোড়া, মাদুর, ঝুড়ি এই ধরনের নানা জিনিষ বানায়, কেউ রিকশা চালায়। তারা যদি বাণিজ্যিক সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় তাহলে তারা খোলা বাজারে নিজেদের তৈরি মাল বেচতে পারবে। ভাল লাভ করতে পারবে, যা দিয়ে নিশ্চিত জীবন যাপন করা যায়।"

"নিশ্চয়ই করবে।"

"বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা সারাজীবন ক্রীতদাসের মতো খাটুনি খাটতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে তারা কোনওদিন পাইকারদের হাত থেকে মুক্তি পাবে না—যারা এখন চড়া সুদে তাদের মূলধন ধার দেয়।"

"হ্যাঁ, মহাজনদের কথা শুনেছি।"

"এইজন্যই তো আপনার কাছে আসা। মহাজনের কবল থেকে গরিব গ্রামবাসীদের রেহাই দিন। তাদের টাকা ধার দেবার ব্যবস্থা করুন।"

ব্যাংক ম্যানেজার প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তারপর অট্টহাসি করে বলে উঠলেন, "মাপ করবেন, তা আমি পারব না।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু কেন?"

"শুনুন, মানে...", তিনি তোতলাতে থাকলেন। তাঁর অগুন্তি আপত্তির কোনটা দিয়ে কথা শুরু করবেন তা স্থির করতে পারছিলেন না। "প্রথমত যে স্বল্প ঋণের কথা আপনি বললেন তা দিয়ে ঋণের আবেদনপত্র লেখার খরচই উঠবে না। এরকম সামান্য কাজে নষ্ট করার মতো সময় ব্যাংকের নেই।"

"কেন নেই?" জিজ্ঞাসা করলাম। "গরিবদের কাছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।"

"দেখুন, এসব মানুষ নিরক্ষর। তারা ঋণের আবেদনপত্র লিখবে কেমন করে?"

"বাংলাদেশের ৭৫ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। আবেদনপত্র ভর্তির প্রশ্নটাই এখানে হাস্যকর।"

www.pathagar.com

"কিন্তু দেশের প্রতিটি ব্যাংকেই তো এক নিয়ম চলছে।"

"সেই নিয়ম ব্যাংক সম্বন্ধে কী ধারণার সৃষ্টি করে? তা নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।"

"কেউ টাকা জমা দিতে এলেও তাকে টাকার অঙ্ক লিখতে হয়। এটাই রীতি।"

"কেন?"

"কেন বলতে কী বোঝাতে চান আপনি?"

"ব্যাংকের তরফ থেকে টাকা নিয়ে কেন একটি লিখিত রসিদ দেওয়া হয় না, যে অমুক মানুষের কাছ থেকে অত টাকা জমা নেওয়া হল। এটা কেরানির কাজ, একজন আমানতকারীর নয়।"

"আচ্ছা, গ্রাহকের লেখালেখি ছাড়া কি একটা ব্যাংক চালানো সম্ভব?"

"খুবই সহজ। গৃহীত টাকার অঙ্ক জানিয়ে ব্যাংক শুধুমাত্র একটা রসিদ দিয়ে দিলেই দিব্যি কাজ চলে যায়। গ্রাহককে কলম ধরতে হবে কেন?"

"কেউ টাকা তুলতে চাইলে, তখন কী করবেন? লিখতে হবে না?"

"লেখার দরকার কী? কাজটা আরও অনেক সহজে করা যায়। গ্রহীতা তাঁর টাকা জমা দেবার রসিদটা ক্যাশিয়ার সাহেবকে ফেরত দেবেন, আর ক্যাশিয়ার সাহেব গ্রাহকদের জমা টাকাটা ফেরত দেবেন। এবার হিসেব কীভাবে রাখা হবে তা ব্যাংকের মাথাব্যথা।"

ম্যানেজার মাথা নাড়লেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বোধহয় কীভাবে কথা শুরু করবেন তা স্থির করতে পারছিলেন না।

আমি বললাম, "আমার বিবেচনায় আপনাদের ব্যাংকিং পদ্ধতি নিরক্ষরদের বিপক্ষে।"

এবার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

"স্যার, আপনি যা ভাবছেন ব্যাংকিং তত সহজ ব্যাপার নয়।"

"হতে পারে। তবে আপনারা এটাকে যত জটিল করে ফেলেছেন আসলে এটা তত জটিল কিছুতেই নয়।

"দেখুন, সরল সত্য হল, পৃথিবীর সর্বত্র, আমার ব্যাংকের মতোই গ্রহীতাকে ঋণ নেবার সময় আবেদনপত্রে দরকারি তথ্য লিখে জানাতে হয়।"

"ঠিক আছে। মেনে নিলাম। আমার ছাত্রদের পাঠিয়ে দেব। গ্রহীতাদের হয়ে তারা আবেদনপত্র পূরণ করবে।"

"আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন। আমরা গরিব মানুষকে ঋণ দিতে অপারগ।" ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জানালেন।

"কিন্তু কেন?"

আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম সৌজন্য রক্ষা করতে। আমাদের কথোপকথনে কিছুটা অভিনয়ের আড়ালও ছিল। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মুখে এমন হাসি ফুটিয়ে রেখেছিলেন যাতে করে মনে হয় আমি যেন কৌতুক ভরে তাঁর পিছনে লাগার চেষ্টা করছি। এবং সেটা তিনি ধরে ফেলেছেন। যেন এক অবাস্তব বিষয় নিয়ে এক মজাদার সাক্ষাৎকার হল এতক্ষণ। কিন্তু আমি সেটা অগ্রাহ্য করে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম জবাবের অপেক্ষায়।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বললেন, "তাদের জামানত রাখবার কিছু নেই।" আমি নির্বোধ না সুদক্ষ অভিনেতা এটা তিনি ধরতে পারেননি। ভাবলেন এই বক্তব্য সব আলোচনার ইতি টেনে দিতে পারবে।

"ঋণের টাকা ফেরত পেলেই তো হল, জামানতের প্রয়োজন কী? আপনার তো টাকা ফেরত পাওয়া নিয়ে কথা।"

www.pathagar.com

"অবশ্যই টাকা ফেরত চাই। একই সঙ্গে জামানতও চাই, সেটাই আমাদের নিরাপত্তা।"

"আমার কাছে এর কোনও মানে নেই। হতদরিদ্র মানুষ কম করে দিনে ১২ ঘন্টা পরিশ্রম করে। পেট চালানোর জন্য তাদের নিজেদের তৈরি মাল বেচে উপার্জন করতে হয়। তাদের ক্ষেত্রে টাকা নিয়ে ফেরত না দেবার প্রশ্নই ওঠে না। আবার দৈনিক বাঁচবার জন্য তাদের ঋণ না নিয়ে উপায় নেই। তাদের সবচেয়ে বড় জামানত হল তাদের জীবন।"

ম্যানেজার সায় দিলেন। "আপনি একজন আদর্শবাদী শিক্ষক। বই ও তত্ত্ব নিয়ে আপনার কারবার।"

"টাকা যখন আপনি ফেরত পাচ্ছেনই, জামানত আপনার প্রয়োজন কী?"

"কারণ সেটা ব্যাংকের নিয়ম।"

"তাহলে যারা বন্ধক দেবার ক্ষমতা রাখে তারাই এখান থেকে ঋণ পাবার যোগ্যতা অর্জন করবে?"

"হ্যাঁ।"

"এটা একটা অযৌক্তিক নিয়ম। এর অর্থ হল ধনীদেরই শুধু ঋণ পাবার অধিকার আছে।"

"নিয়ম তো আমি তৈরি করিনি, ব্যাংক করেছে।"

"আমার মতে এরকম নিয়মের পরিবর্তন দরকার।"

"যাই বলুন স্যার, এক্ষেত্রে আমরা ঋণ দিতে অক্ষম।"

"সত্যিই পারবেন না?"

"না। আমরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ও তার কর্মীদের টাকা জমা রাখি।"

"কিন্তু ঋণের সুযোগ বাড়িয়ে ব্যাংক আরও লাভবান হতে পারে, নয় কি?"

"ঋণ শুধু প্রধান কার্যালয় থেকে মঞ্জুর করা হয়। আমাদের এই শাখা চালু রয়েছে কেবল বিশ্ববিদ্যালয় ও তার কর্মচারীদের টাকা জমা রাখবার জন্য। আপনার তেভাগা কৃষি ব্যবস্থায় আমাদের ঋণদান একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। প্রধান কার্যালয় থেকে অনুমতি দেওয়ার জন্য সেটা সম্ভব হয়েছিল।"

"আপনি বলতে চান, আজ আমি ঋণ চাইলে আপনার ব্যাংক তা প্রত্যাখ্যান করবে?"

"ঠিক তাই।" বলে ম্যানেজার হেসে উঠলেন। মনে হল বিগত বহুকাল তাঁর কাজের বিকেলটা এমন মজায় কাটেনি।

"তাহলে ক্লাসে যখন আমরা পড়াই যে ব্যাংক ঋণ দেয় তা ডাহা মিথ্যা।"

"স্যার, আপনাকে ঋণের জন্য হেড অফিসে কথা বলতে হবে। জানি না তারা কী করবে?"

"অর্থাৎ আমাকে আরও উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।"

"হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে।"

চা শেষ করে বিদায় নেবার সময় ম্যানেজার বললেন, "আমি জানি আপনি হাল ছাড়বেন না। কিন্তু ব্যাংকিং-এ আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আপনার স্বপ্ন কোনওদিন সফল হবে না।"

"ধন্যবাদ।" বলে আমি উঠে পড়লাম।

* * *

দিন দুই চার বাদে আমি জনতা ব্যাংকের আঞ্চলিক ম্যানেজার জনাব হাওলাদারের সঙ্গে তাঁর শহর অফিসে দেখা করলাম।

আমি কী চাই তা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। তাঁর সাথে আমার যা কথোপকথন হল তা

www.pathagar.com

জোবরার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে আমার কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি। বিপক্ষ সব যুক্তি যা সেই আলোচনায় উত্থাপন করা হয়েছিল সেগুলি আবার শুনলাম। এ ছাড়াও আমার প্রস্তাব বিরুদ্ধ আরও কিছু ব্যাংকিং রীতিনীতির কথাও তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম।

তার পরেও, বহু বছর ধরে গরিব মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ধারণার কথা আমি শুনে আসছি। যাঁরা কখনও গরিবদের জন্য কাজ করেননি তাঁদের মুখে এদের সম্বন্ধে আমি বহু অলীক ধারণা ও গপ্পো শুনেছি। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বলেছেন—

—কোনও উপার্জনক্ষম গরিব মানুষকে কাজের সুযোগ দেবার আগে তাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

—শুধুমাত্র ঋণদানে কাজ হয় না—এর সঙ্গে যোগ করতে হবে কর্ম প্রশিক্ষণ, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, বাজার-চাহিদা, প্রযুক্তি, শিক্ষা ইত্যাদি।

—গরিব মানুষ কিছু সঞ্চয় করতে পারে না।

—যা হাতে পায়, অভাবী মানুষ তাই খরচ করে ফেলে কারণ তাদের নানান চাহিদা মেটাবার জরুরি তাগিদ থাকে।

—বহুদিনের দারিদ্র মনকে পঙ্গু করে দেয়। আশা আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করে দেয়। বহুদিন খাঁচায় বন্দি পাখির মতো তাদের অবস্থা। খাঁচার দরজা খুলে দিলেও উড়ে যেতে ভয় পায়।

—হতদরিদ্র মহিলাদের কোনও কর্মদক্ষতা নেই। তাদের সম্বন্ধে প্রকল্পের কথা ভাবাই অর্থহীন।

—গরিব এত বেশি ক্ষুধার্ত যে মরিয়া হয়ে গিয়ে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

—জীবন সম্পর্কে গরিবের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সংকীর্ণ—নিজেদের জীবনযাত্রা পরিবর্তনের জন্য তারা আগ্রহী হয় না।

—ধর্ম ও কুসংস্কার এদের উপর, বিশেষত মহিলাদের উপর, এমন প্রভাব বিস্তার করে যে তা থেকে তাদের মুক্ত হওয়া অসম্ভব।

—গ্রাম্য রাজনীতি এত শক্তিশালী ও সুদৃঢ়, যে এরকম ঋণদান প্রকল্প চালু করা অকল্পনীয়।

—গরিব মানুষদের ঋণদান, প্রগতি বিরোধী। এর ফলে গরিব মানুষের বিপ্লব করার ইচ্ছা বিনষ্ট হয়ে যায়। তাদের অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে দেওয়ার জন্য ঋণ দেওয়া হয়—এর সঙ্গে ঘুষ দেওয়ার কোনও ফারাক নেই।

—ধনীদের বিরুদ্ধে গরিবদের সংগঠিত করার জন্য ঋণদান এক সুচতুর পদ্ধতি। এই উপায়ে সামাজিক নিয়ম, শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়।

—গরিব মহিলারা কখনওই ঋণের টাকা বা উপার্জন নিজেদের অধিকারে রাখতে পারবেন না। স্বামীরা যেন তেন প্রকারে ওই টাকা আত্মসাৎ করে, অত্যাচার এবং প্রয়োজনে খুন করতেও দ্বিধা করে না।

—গরিব মানুষ নিজেদের কথা না ভেবে উপরওয়ালার হুকুম তামিল করতে বেশি আনন্দ উপভোগ করে।

—ঋণ নিরাপত্তা হরণ করে। অভাবী মানুষের দুর্বল কাঁধে ঋণ কেবল বোঝাই বৃদ্ধি করে, কারণ তারা ঋণ শোধ করতে পারে না। বাধ্যতামূলক ঋণ শোধের আপ্রাণ চেষ্টায় তারা আরও গরিব হয়ে যায়।

—গরিব মানুষকে স্বাধীন পেশা গ্রহণে উৎসাহী করলে বেতনভোগী শ্রমিকের অভাব ঘটবে। বেতনের হার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বেড়ে যাবে জিনিষ তৈরির খরচ—

www.pathagar.com

মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে যা কৃষিজাত সামগ্রী উৎপাদন ব্যাহত করবে।

—মহিলাদের ঋণ পাবার সুযোগ দিলে গার্হস্থ্য জীবনে তাদের ভূমিকা ও স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক অবাঞ্ছিত ভাবে প্রভাবিত হবে।

—ঋণ হয়তো সাময়িকভাবে সাহায্য করতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতে তার সুফল আর বিস্তৃত হয় না। সমাজের সমতা নির্ভর পুনর্গঠন এভাবে সফল করে তোলা সম্ভব নয়।

এই তালিকা কখনওই শেষ হয় না। সমানে এসব কল্পকাহিনী ও অর্ধসত্য প্রচারিত করে চলে, সমাজের বুকে এইসব বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। দুনিয়ার সর্বত্র এই সব নানান তথ্য প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত প্রতিটি বিশ্বাস বা অর্ধসত্যের সপক্ষে জোরালো যুক্তি আছে। কিন্তু সাধারণ অভাবী মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কৃষি, বাণিজ্য বা শিল্প সব ক্ষেত্রেই কিছু কিছু যুক্তি ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সমান সত্য। কিন্তু সমালোচনার প্রাসঙ্গিকতা নির্ভর করে কীভাবে ঋণদান প্রকল্পিত হচ্ছে, ঋণশোধের শর্ত কীভাবে গঠিত ও আরোপিত হচ্ছে তার উপর।

কতকগুলি কল্পিত ধারণা (যেমন জামানত না-নিলে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না) নিয়ম হিসেবে চালু হয়ে গেছে। এগুলির উপর ভিত্তি করে সমাজে এমন সব প্রতিষ্ঠান ও নীতি নির্মাণ হয়েছে যা সমাজের একাংশের উন্নয়নের পক্ষে দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আরেক অংশ অনৈতিকভাবে পক্ষপাতের সুযোগ পাচ্ছে।

* * *

চট্টগ্রামের জনতা ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসে আলোচনার সময় জনাব হাওলাদার বলেছিলেন, "দেখুন, সরকার গরিবদের সাহায্য করতে সত্যিই ইচ্ছুক। যদি গ্রামের কোনও সচ্ছল ব্যক্তি প্রত্যেক গরিব গ্রহীতার জামিনদার হতে রাজি হন তাহলে ব্যাংক আনুষঙ্গিক বন্ধক ছাড়াই তাকে ঋণদানের কথা বিবেচনা করবে।"

আমি চিন্তা করে দেখলাম এই প্রস্তাবে তবু খানিকটা যুক্তি আছে। কিন্তু এর বাধাগুলি আমার কাছে অলঙ্ঘ্য বা দুস্তর বলে মনে হল।

আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম, "তা কী করে হয়? জামিনদার যে গ্রহীতার উপর অহেতুক সুযোগ নেবে না তার নিশ্চয়তা কী? সে এই সুযোগে অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারে, এমনকী গ্রহীতাকে সে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করতে পারে।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। গত কয়েকদিনের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে শুধু জনতা ব্যাংকই নয়, সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থার গলদের জন্য আমি বীতশ্রদ্ধ। তার উপর আমার আস্থা হারাতে চলেছে।

আবার বাক্যালাপ শুরু করি, "আচ্ছা আমি যদি জামিনদার হই?"

"আপনি?"

"সবার ঋণের জন্য আমি জামিনদার হতে চাইলে আপনারা রাজি হবেন?"

আঞ্চলিক ম্যানেজার হেসে উঠলেন। "কত টাকা ঋণ নিতে চান বলুন?"

যথেষ্ট প্রসারের কথা মাথায় রেখে ও আমার হিসেবদক্ষতার অভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমি বললাম, "সর্বমোট ১০ হাজার টাকা। সম্ভবত তার বেশি নয়।"

"ঠিক আছে।" তিনি কাগজপত্র বার করে ডেস্কের উপর রাখলেন। সে দিকে চেয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। পিছনের তাকে দলিল দস্তাবেজের বাণ্ডিল। ফাইলপত্রে ধুলো পড়ে ময়লা

www.pathagar.com

হয়ে রয়েছে। মাঝখানে সারি সারি উঁচু করা হালকা নীল রঙের লেফাফাগুলি প্রায় জানালা ছুঁয়েছে। পাখার হাওয়ায় ফাইলপত্র এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। ম্যানেজারের ডেস্কে একগাদা ফাইল লাল ফিতের বাঁধনে পড়ে রয়েছে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।

"ঠিক আছে। আপনার জামিনদার হবার প্রস্তাব আমরা মেনে নিলাম। কিন্তু দয়া করে আর বেশি টাকা চাইবেন না।"

"এটা তো একটা চুক্তি।"

তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে আমি বললাম, "কোনও একজন গ্রাহক যদি ঋণশোধ না করে সেই অনাদায়ি ঋণ মেটাতে আমি কিন্তু আসব না।"

আঞ্চলিক ম্যানেজার আমার দিকে অস্বস্তি ভরে তাকালেন। বুঝতে চেষ্টা করলেন হঠাৎ করে আমার কথার সুর পালটে গেল কেন।

"জামিনদার হিসেবে আমরা আপনাকে টাকা শোধ দিতে বাধ্য করব।"

"কী করতে পারবেন আপনারা?"

"আপনার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।"

"চমৎকার। আমি তো তাই চাইছি।"

আমি যেন উন্মাদ হয়ে গেছি তেমনভাবে তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমার উদ্দেশ্য সফল হল। আমি এই ধরনের অনৈতিক বিশ্রী ব্যবস্থা যে কী পরিমাণ উদ্ভট তা দেখাতে চাইছিলাম। এই হাস্যকর ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে আমি বদ্ধপরিকর। আমি জামিনদার হয়েছিলাম বটে কিন্তু ঘোষণা করলাম কোনও দায়দায়িত্ব আমি নেব না।

"প্রফেসর ইউনূস, আপনি ভাল করেই জানেন আপনি স্বেচ্ছায় একজন ভিক্ষুকের ঋণের জামিনদার হয়েছেন বলে কখনও আপনার মতো একজন বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে আমরা মামলা দায়ের করতে পারব না। আপনার কাছ থেকে টাকাটা উদ্ধার করতে পারলেও আমরা বদনামের হাত থেকে রক্ষা পাব না। ঋণের পরিমাণ এতই সামান্য যে তা দিয়ে উকিলের পারিশ্রমিকও মেটানো যাবে না। টাকা আদায়ের জন্য আমাদের অফিসের লেখালিখির খরচও উঠবে না।"

"আপনারা ব্যাংক চালান। লাভ লোকসানের হিসেব আপনারা করুন। কোনও বিচ্যুতি হলে আমি কিন্তু টাকা শোধের দায় নিতে যাচ্ছি না।"

"প্রফেসর ইউনূস, আপনি এরকম অসহযোগিতা করলে আমার পক্ষে কিছু করা অসম্ভব।"

"আমি তার জন্য দুঃখিত। ভুলে যাবেন না, ব্যাংক অগণিত মানুষের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে, বিশেষত যারা এক কথায় নিঃসম্বল।"

"প্রফেসর, আমি তো আপনাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।"

"আমি তা অস্বীকার করছি না। একমাত্র আপনাকে আমি কখনও দায়ী করছি না। আমার বিরোধ ব্যাংকের নিয়মকানুনের সঙ্গে।"

আরও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর হাওলাদার সাহেব আমার প্রস্তাব, মতামতের জন্য ঢাকায় হেড অফিসে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আমি বললাম, "ভেবেছিলাম আঞ্চলিক ম্যানেজার হিসেবে আপনার স্বেচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে।"

"আছে। কিন্তু এই প্রস্তাব প্রচলিত রীতির বাইরে। এর জন্য ওপরওয়ালার অনুমতির প্রয়োজন।"

ছয় মাস টানা চিঠি চালাচালির পর সেই ঋণ অনুমোদিত হল। অবশেষে ১৯৭৬ সালের

www.pathagar.com

ডিসেম্বর মাসে আমি জনতা ব্যাংক থেকে জোবরার গ্রামবাসীদের জন্য ঋণ আদায় করতে সক্ষম হলাম।

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতিটি ঋণের আবেদনপত্রে আমাকে সই করতে হয়েছে। এমনকী ইউরোপ, আমেরিকা সফরের সময়ও আমার সহকারী নিয়মিত সব দলিলপত্র পাঠাতেন আমার সইয়ের জন্য। ব্যাংক সরাসরি গ্রাহকদের সঙ্গে চুক্তিতে নারাজ। জামিনদার হিসেবে আমার সঙ্গেই তাদের কারবার, গ্রাহকদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমাকেই তারা ধর্তব্যের মধ্যে ধরত। সত্যিকারের গরিব মানুষ, যারা তাদের কাছ থেকে মূলধন নিয়ে ব্যবহারে লাগাত, তারা কখনও ব্যাংকের কাছে গ্রাহকের মর্যাদা পেত না। সত্যিকারের গ্রহীতারা ছিল অস্পৃশ্য। এটি অবশ্য শাপে বর হয়েছিল। ব্যাংকে ধর্না দিয়ে তাদেরকে হয়রানি ও মর্যাদাহানির কবলে পড়তে হয়নি।

* * *

বিশ্বজোড়া প্রচলিত ব্যাংকিং রীতিনীতি আমি বোঝার চেষ্টা শুরু করলাম। তাদের নিয়মটি স্পষ্টভাবে এরকম দাঁড়ায়: যার যত বেশি আছে তাকে তত বেশি দাও। যার কিছু নেই তার পাবার অধিকারও নেই।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিপুল সংখ্যক মানুষকে ঋণ পাবার উপযুক্ত নয় বলে অচ্ছুৎ করে রেখেছে। ব্যাংকাররা কেন নিরাপত্তা বা জামানতের উপর এত জোর দেন? তাদের লেনদেনে জামানত এত অপরিহার্য কেন? এ ব্যাপারে কেউ কিন্তু কোনও প্রশ্ন তুলছে না। এই ধারণা ও ব্যবস্থাগুলি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে কোনও প্রশ্ন ছাড়াই চলে আসছে।

মরিয়া হয়ে জামানতের যৌক্তিকতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছিলাম আমরা। প্রথমে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি অনিশ্চিত ছিলাম। কী লক্ষে আমি নিজেকে এর মধ্যে জড়াতে চলেছি তাও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। আমি অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে পথ চলছিলাম। প্রতি পদে শিক্ষালাভ করছিলাম। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করছিলাম। ঋণদানের ক্ষেত্রে "অস্পৃশ্যগণ" যে শুধু স্পর্শযোগ্যই নন, বরং আলিঙ্গন করার উপযুক্ত—একটা প্রমাণ করতে আমাদের অসম্ভব সংগ্রাম করতে হয়েছিল। যে সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি।

অপার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, বিশাল ধনসম্পত্তি নিরাপত্তা হিসেবে গণ্য করে যে ঋণ দেওয়া হয়, তার তুলনায় কোনও জামানত ছাড়া যে ঋণ দেওয়া হয় তার পরিশোধ অনেক বেশি সন্তোষজনক। আমাদের ৯৮ শতাংশ ঋণ যে আমরা ফেরত পাচ্ছি তার একটাই কারণ। গরিব মানুষ জানে এ ছাড়া দারিদ্র থেকে রেহাই বা মুক্তি পাবার আর কোনও পথ তাদের সামনে খোলা নেই। তাদের আর কোনও ভরসা নেই। 'একমাত্র সম্বল' ঋণের সঙ্গে ঠকবাজি করলে তারা বাঁচবে কীভাবে?

অন্যদিকে ধনী জানে আইনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আছে। আইন তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে সে ভয় তার নেই। নিম্নস্তরের অবহেলিত জনগণ সর্বদাই সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। তারা ভাল থাকতে চায়, কোনও জটিলতায় জড়াতে চায় না। এ ছাড়া তাদের উপায় নেই।

www.pathagar.com

* * *

দারিদ্র কতগুলো বড় বড় পরিসংখ্যানের সমাহার নয়।

দারিদ্র নাৎসিদের কোনও বন্দি শিবির নয়। যেখানে মানুষ অসহায়ভাবে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে ও নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনবে।

দারিদ্র মানুষের চারিদিক ঘিরে রাখা একটা দেওয়াল মাত্র। সেই বন্ধ দেওয়ালের ফাঁক ফোকর দিয়ে দু-একটা দিন কিছু খাবার পৌঁছিয়ে ভাল রাখার চেষ্টা সেটা গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়। সে চায় সেই দেওয়ালে ফাটল ধরিয়ে তা সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলতে। গ্রামীণ ব্যাংক সারা বিশ্বজুড়ে তার অনুগামী সংস্থাগুলির মানুষকে মনোবল ও শক্তি জোগাতে সাহায্য করছে।

জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের সঙ্গে দারিদ্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। এটা মেনে নিয়ে তারা জীবন কাটাচ্ছে।

দারিদ্র এক ভয়ানক ব্যাধি যা শরীর ও মনকে পঙ্গু করে দেয়।

আমি সমানে ভাবতে থাকলাম। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থাৎ ব্যাংক প্রদত্ত ঋণই মহাজনদের বিলুপ্ত করার সহজতম উপায়। উভয়েই ঋণের কারবারে জড়িত। উন্মুক্ত বাজারি অর্থনীতিতে দুজনেই প্রতিযোগিতায় নামুক, তাহলে বোঝা যাবে কার জিত।

দরিদ্রদের চাহিদা মেটাবার জন্য কোনও সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নেই। ঋণদাতা সংস্থার সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সেই সুযোগে ঋণের কারবার পুরোপুরি মহাজনের করায়ত্ত হয়ে গেছে। তারা জোরদার ব্যবসা চালাচ্ছে। এদের জন্যই দারিদ্রের স্রোত একমুখী ও অপ্রতিহত—দিন দিন তা আরও বর্ধিত আকার ধারণ করছে।

যদি ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা তাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকত তাহলে দারিদ্রের প্রবল স্রোতকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হত। স্রোতের গতিপথ দ্বিমুখী করে তোলা মোটেই কঠিন হত না।

* * *

আমাদের প্রথমদিককার গ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম হল আম্মাজান আমিনা। ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প এক পথের ভিখারির জীবন কীভাবে আমূল বদলে দিতে পারে আম্মাজান আমিনার জীবন কাহিনী তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

আম্মাজানের ছটি সন্তানের চারটি দারিদ্র ও ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুবরণ করেছে। জীবিত দুটিই কন্যা সন্তান। তাঁর স্বামী প্রৌঢ়, বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়। খুবই অসুস্থ তিনি। বছরের পর বছর ধরে, বাঁচার তাগিদে তাঁরা পারিবারিক সম্পদ প্রায় সবই বিক্রি করে ফেলেছেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর আমিনার সম্বল রইল শুধু ভিটেটুকু। বাংলাদেশের মহিলাদের গড়পড়তা আয়ু পুরুষদের চেয়ে কম। ৫৮ থেকে ৫৮.৪ বছর। আমিনার তখন মধ্য চল্লিশ চলছে। তিনি নিরক্ষর। উপার্জনের কোনও রাস্তা তাঁর জানা নেই। কুড়ি বছরের উপর বিবাহিত জীবন যাপন করলেন যে বাড়িতে, সেখান থেকে তাঁকে বার করে দিতে চেয়েছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সেই প্রচেষ্টা তিনি প্রতিরোধ করেছেন সর্বশক্তি দিয়ে।

ঘরে পিঠে ও বিস্কুট তৈরি করে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বেড়াতেন তিনি। একদিন বাড়ি

www.pathagar.com

ফিরে দেখেন তাঁর দেওর তাঁর বাড়ির টিনের চাল বিক্রি করে দিয়েছে। খরিদ্দার তখন তা খুলতে ব্যস্ত।

তখন ভরা বর্ষা। পানিতে ভিজে, ঠান্ডায় কাতর, অনাহারে দুর্বল আমিনার আর খাবার তৈরির সামর্থ্য রইল না। তবু কোনওক্রমে দুই সন্তানের অন্ন জুগিয়ে চললেন তিনি।

আম্মাজান আমিনার আত্মসম্মানবোধ প্রবল। তাঁর পক্ষে পেশাদার ভিক্ষুক হওয়া সম্ভব নয়। তবু তিনি আশে পাশের গ্রামে ভিক্ষা করতে শুরু করলেন। মাথার উপর ছাদ না থাকায় বর্ষায় তাঁর মাটির দেওয়াল নষ্ট হয়ে গেল। একদিন বাড়ি ফিরে দেখলেন বাড়ি সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে। তাঁর বুকফাটা আর্তনাদ শোনা গেল, "আমার বাচ্চারা কোথায়?"

মৃত বড় মেয়েটিকে তিনি আবিষ্কার করলেন দেওয়ালের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে।

১৯৭৬ সালে আমার সহকর্মী নূরজাহানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি তখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। একমাত্র জীবিত ছোট বাচ্চাটিকে বুকে আঁকড়ে ধরে খিদের জ্বালায় মরিয়া হয়ে তিনি দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কোনও মহাজন বা বাণিজ্যিক ব্যাংক তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। কেন— সে প্রশ্ন অবান্তর। গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে ঋণ নিয়ে তিনি বাঁশের ঝুড়ি বানাতে শুরু করে উপার্জনের পথ খুঁজে পান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহক ছিলেন। এখন তাঁর সন্তান গ্রামীণ ব্যাংকের এক সদস্যা।

২০ লাখের বেশি এইরকম জীবন কাহিনীর সমন্বয়ে গ্রামীণ ব্যাংক গড়ে উঠেছে।

* * *

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্ব

পরীক্ষামূলক অধ্যায়
১৯৭৬-৭৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১০
কেন ঋণদানের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার

বাংলাদেশের সনাতন ব্যাংক পুরুষদের সঙ্গে লেনদেনে উৎসাহী, তারা নারীদের ঋণ দেবার কথা মনে রাখেন না।

এভাবে অভিযোগ করলে আমার ব্যাংকার বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন, "শহরে আমাদের মহিলা শাখা তোমাদের নজরে পড়ে না? কেবলমাত্র নারীদের সেবার উদ্দেশ্যে সেগুলি চালু করা হয়েছে।"

আমি উত্তর দিই, "হ্যাঁ। অবশ্যই নজরে পড়ে। সেগুলি স্থাপনের আসল উদ্দেশ্যও আমার দৃষ্টি এড়ায় না। তোমাদের লক্ষ্য মহিলাদের সঞ্চয় জমা রাখা। কিন্তু তাদের কেউ টাকা ধার নিতে চাইলে তোমাদের মনোভাব কেমন হয়?"

বাংলাদেশে কোনও মহিলা এমনকী সচ্ছল মহিলাও ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ম্যানেজার সাহেব প্রশ্ন করবেন, "আপনি স্বামীর সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করেছেন?"

তিনি হ্যাঁ বললে এবার প্রশ্ন হবে, "তিনি কি আপনার প্রস্তাব সমর্থন করেন?"

এর উত্তরও যদি ইতিবাচক হয় সেখানেই কিন্তু প্রসঙ্গের ইতি টানা হয় না। ম্যানেজার সাহেব বিনীত ভাবে অনুরোধ করবেন, "একবার আপনার স্বামীকে নিয়ে আসুন। তাঁর সঙ্গে আমাদের আলোচনা দরকার।"

কোনও পুরুষকে ঋণ দেবার সময় কোনও ম্যানেজার এরকম সওয়াল জবাবের কথা ভাবতেই পারেন না। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন কি না বা আলোচনার জন্য স্ত্রীকে আনার প্রয়োজন এসব প্রসঙ্গ কারওর মনেই উদয় হয় না। এই ধরনের প্রস্তাব বা নির্দেশ সেক্ষেত্রে অপমানজনক।

গ্রামীণ ব্যাংকের আগে বাংলাদেশের ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা এক শতাংশেরও কম ছিল। এর কারণ বুঝতে কারো অসুবিধা নেই। ব্যাংকিং পদ্ধতি পুরোপুরি পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট—এ ব্যাপারটা আমার কাছে প্রাঞ্জল হয়ে গেছিল।

ব্যাংক-ঋণের ব্যাপারে মহিলাদের বঞ্চিত করে রাখার বিরুদ্ধে যেহেতু আমি উত্থাপন করেছি আমি নিজে ঋণ দেবার কাজে নামলাম তখন শুরুতেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম—আমার ঋণ কর্মসূচিতে ৫০ শতাংশ ঋণগ্রহীতা অবশ্যই মহিলা হবেন।

* * *

বেশ কিছু মহিলাকে ঋণ দেয়ার পর মহিলাকে ঋণ দেয়ার অনেক সুফল পেতে আরম্ভ

www.pathagar.com

করলাম। এগুলি কখনও আগে থেকে ধারণা করতে পারিনি।

ঋণগ্রহীতা হিসেবে মহিলাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আবিষ্কার করলাম। শুধু পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতের প্রতিকারের জন্য নয়, উন্নয়নের স্বার্থে মহিলাদের ঋণের সুযোগ করে দেবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

এ ব্যাপারে আমি আরও মনোনিবেশ করলাম। লক্ষ করলাম পুরুষদের তুলনায় মহিলারা ঋণের প্রয়োগ করে অনেক দ্রুত আশাতীত পরিবর্তন আনতে পারেন।

পুরুষের চেয়ে মহিলারা অনেক বেশি দারিদ্র ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় জর্জর থাকেন। অনাহার ও অভাব মূলত মহিলাদেরই দায়। পর্যাপ্ত আহার্যের অভাবে পরিবারের সব সদস্যের মধ্যে অলিখিত নিয়মানুযায়ী যাঁকে উপবাসী থাকতে হয়, তিনি হলেন 'মা'। মায়ের জন্য সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা হল দুর্ভিক্ষ ও চরম অন্নাভাবের দিনগুলিতে সন্তানকে দুধ পান করাবার ক্ষমতাটুকুও অবশিষ্ট না থাকা।

বাংলাদেশে গরিব হওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু আরও দুঃসহ হল গরিব ঘরের নারী হয়ে জন্মানো। সামান্যতম সুযোগ পেলে এঁরা দারিদ্রের আগ্রাসন থেকে মুক্তির জন্য কঠিনতম সংগ্রাম করতে সদাই প্রস্তুত।

আমাদের সমাজে দরিদ্র নারীর কোনও নিরাপত্তা নেই। সংসারে স্বামী ইচ্ছে করলেই, যে-কোনও মুহূর্তে, তাকে তিনবার তালাক বলে বিতাড়িত করতে পারেন। এঁরা নিরক্ষর। সদিচ্ছা থাকলেও উপার্জনের সন্ধানে বাড়ির বাইরে যাবার অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত। শ্বশুরবাড়ি, এমনকী নিজের বাপের বাড়িতেও তাঁরা আদরণীয়া নন। প্রায় একই কারণে, আপদ বিদায় করতে গিয়ে একজনের খাওয়া খরচ বাঁচানোই সবার উদ্দেশ্য।

তালাক নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এলে সেই নারীর কপালে জোটে অপমান ও লাঞ্ছনা। তারা সেখানে একেবারেই অবাঞ্ছিত। তাই সুযোগ পেলে নারী নিজেদের নিরাপত্তা অর্জন করতে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হন। নিরাপত্তার অর্থ হল অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

এ ব্যাপারে কাজের সূত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি সর্বহারা নারী, পুরুষের তুলনায় স্বনির্ভর হয়ে ওঠেন অনেক দ্রুতগতিতে।

লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, দারিদ্র নিপীড়িত মহিলারা সুদক্ষ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। তাঁদের অস্তিত্ব শুধু বিপন্নই নয় তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে—এ ব্যাপারে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট। সেই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাঁরা অবিরত সংগ্রাম করে যান। লক্ষ্য দারিদ্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ।

মহিলারা সন্তানকে ভালভাবে মানুষ করতে সচেষ্ট থাকেন। পুরুষমানুষের তুলনায় নিজেদের কাজে তাঁরা অনেক বেশি একনিষ্ঠ।

প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য পুরুষের বদলে মহিলাদের মারফত পৌঁছলে সংসারের অনেক বেশি সাশ্রয় হয়—সমাজেরও মঙ্গল হয়।

পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সংসারের চাহিদা সেখানে শীর্ষস্থান লাভ করে না। দরিদ্র পিতা যেইমাত্র অতিরিক্ত আয় করতে শুরু করেন তখনই তিনি নিজের প্রতিই অতিমাত্রায় মনোযোগী হয়ে পড়েন। সবদিক বিচার করে গ্রামীণ ব্যাংক কেন পুরুষের মাধ্যমে সাংসারিক গণ্ডিতে প্রবেশ করবে?

অত্যন্ত দুঃস্থ, সর্বহারা নারী যখন প্রথম উপার্জন শুরু করেন, তাঁর সব সাধ ও স্বপ্ন অনিবার্যভাবে গড়ে ওঠে সন্তানদের কেন্দ্র করে। তারপর মায়ের নজরে পড়ে তাঁর সংসার বা গৃহস্থালির প্রতি। কখনও ভাবেন ছাদ সারাই এর কথা। কখনও দু-চারটে বাসন কেনার কথা। টুকিটাকি এমন সব আয়োজন যা পরিবারের মান উন্নয়নের উপযোগী। আমাদের এক গ্রহীতা

www.pathagar.com

একটি ছোট খাট কিনবার পর এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, এক সাংবাদিককে প্রায় জোর করে বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলেন।

* * *

যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করা, তাহলে স্বাভাবিকভাবে মহিলাদের প্রতিই প্রথম মনোযোগ দেওয়া উচিত। দরিদ্র জনসাধারণের অধিকাংশই মহিলা। অভাবের তাড়নায় তাঁরা নামমাত্র পারিশ্রমিকের জীবিকা গ্রহণে বাধ্য হন। চরম অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থার মধ্যে তাঁদের জীবন কাটে। যেহেতু সন্তানদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, তাঁদের হাতেই রয়েছে আগামী প্রজন্মের রক্ষণাবেক্ষণের ভার। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের চাবিকাঠি।

পুরুষ ও নারীর মধ্যে ঋণ প্রদানের ফলাফল নিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের সমীক্ষার ফল উপরোক্ত বক্তব্যকে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সব কারণ খতিয়ে দেখে, অতঃপর আমরা আমাদের আগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। আমরা এখন থেকে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে মহিলাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। এর বাস্তবায়ন অবশ্য সহজ হয়নি। প্রথম ও প্রধান প্রতিরোধ এল স্বামীদের তরফ থেকে। তারপর প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন ধর্মীয় নেতারা। এমনকী সরকারি কর্মচারীরাও প্রতিবাদের ঝড় তুললেন।

প্রায়শই আমরা গ্রহীতাদের কাছে শুনতাম দুর্ভিক্ষ, ঝড় বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের চাইতেও তাঁদের বড় সমস্যা তাঁদের স্বামীদের নিয়ে। এরা যেন তেন প্রকারে ঋণের টাকা হাতিয়ে নিয়ে খাবে এই আশঙ্কায় মহিলারা সন্ত্রস্ত থাকতেন। স্বামীরা সবসময়ই চাইতেন ঋণের টাকা তাঁদের হাতে পৌঁছুক।

ধর্মীয় নেতা ও মহাজনদের মনে হতে লাগল গ্রামের ওপর তাদের একচ্ছত্র অধিকার আমরা কেড়ে নিতে চলেছি।

এসব প্রতিবাদের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু যখন সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষিত মানুষজন আমাদের বিপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে শুরু করলেন তখন আমি সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তাঁরা বলতে লাগলেন, "যেখানে এত পুরুষ বেকার ও উপার্জনহীন সেখানে মহিলাদের ঋণদান একেবারেই অযৌক্তিক।"

অনেকে আবার বলতে লাগলেন, "যতই মহিলাদের ধার দেওয়া হোক, সে টাকা তারা স্বামীদের হাতে তুলে দেবে। মেয়েদের আগের চেয়ে বেশি শোষিত হবার উপায় আপনারা উদ্ভাবন করেছেন।"

কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে। আমাদের বিবেচনায় মহিলাদেরকে টাকা পয়সা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সাহায্য করা, পারিবারিক ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব অধিকার অর্জন করার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

সরকারি আমলারা অনেকেই আমাদের এই বক্তব্যকে আমল দেননি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক কর্মকর্তা আমাকে ভদ্র ভাষায় কড়া চিঠিতে লিখলেন, "কেন আপনাদের অধিকাংশ ঋণগ্রহীতা মহিলা?—এ ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যাখ্যা দেবেন।"

চিঠির ভঙ্গিমা ছিল কর্কশ। যেন আমাদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। উত্তরে আমি লিখলাম, "আমাদের ঋণ গ্রহীতারা অধিকাংশই মহিলা কেন, তা আলোচনা করতে আমি আগ্রহী। কিন্তু তার আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংকের কাছে

www.pathagar.com

কখনও কি জানতে চেয়েছে, কেন তাদের অধিকাংশ ঋণগ্রহীতা পুরুষ?"

সে চিঠির জবাব কোনওদিনও আসেনি। তাঁদের চিঠির উত্তর দেবার জন্যও আর তাঁরা আমাকে পীড়াপীড়ি করেননি।

অথচ এ সমস্যা কেবল বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নয়। নানা দেশে ভ্রমণের সুবাদে একই মনোভঙ্গির পরিচয় পেয়েছি। অধিকাংশ উন্নয়নশীল প্রকল্পে মহিলারা কদাচিৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পান। এটা কেন হবে। সত্যিই আমি বুঝতে পারি না।

বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে পর্দাপ্রথা মহিলাদের ঘরে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করে, সেখানে পুরুষদের কাছে মহিলাদের কোনও অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই বললে চলে। তার উপর যৌতুকপ্রথার জন্য সেখানে অবিবাহিতা মেয়েদের দায় বলে মনে করা হয়।

* * *

মহিলাদের ঋণের আওতায় আনা প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ। অনেকেই বললেন, এ রীতিমতো সামাজিক অনাচার। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের টপকে মহিলারা ঋণ পাবেন—এর ফলে অনেক অকল্পনীয় সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হবে। এরকম অভিযোগের আশঙ্কা আমাদের ছিলই। নানা উপায়ে আমরা সেসবের মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

প্রথমদিকে বেশ ভুলভ্রান্তি হচ্ছিল। উপযুক্ত সতর্কতার অভাবে আমাদের ঋণদানের ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভয়ানক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হচ্ছিল। ধীরে ধীরে এ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ল। গ্রহীতাদের বোঝানো হতে লাগল—ঋণের কারণে দাম্পত্য শান্তি বিঘ্নিত করা চলবে না। আবার শুধু বিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য ঋণের টাকা স্বামীর হাতে দিয়ে দিলে চলবে না। এই দুই এর সামঞ্জস্য রক্ষা খুবই কঠিন কাজ। গ্রহীতাদের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। ঋণদানের আগে তার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ একান্ত প্রয়োজন।

গ্রামীণ ব্যাংকের বাইরে এর সমাধান খোঁজার চাইতে আমরা গ্রামীণ ব্যাংকের ভেতরেই এর প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান সন্ধান করলাম। আমরা ভাবলাম এই সমাধান তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া দরকার। পেয়েও গেলাম। সদস্যদের গ্রুপকে এই দায়িত্ব দিলাম।

তাঁরা সমবেতভাবে সমস্যার সমাধান করতে লাগলেন। ব্যক্তিগত নানা কৌশলও উদ্ভাবন করতে থাকলেন। আলোচনা সভায় গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে স্বামীদের সঙ্গে বৈঠক ডাকা হল। ব্যক্তি হিসেবে তাঁরা প্রত্যেকে স্ত্রীদের কাছে এক একজন প্রতাপশালী পুরুষ বলে বিবেচিত হলেও ব্যাংকের সঙ্গে দলগত ভাবে আলোচনায় তাঁদেরকে অনেক সমঝদার ও যুক্তিবাদী মনে হতে লাগল। আমরা কী করছি, কেন করেছি সবকিছু সবিস্তারে তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করা হল। ব্যাংকের নিয়ম ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁদের সংশয়ের অনেকটাই দূর হয়ে গেল। তাঁরা ব্যাংককে আগের মতো বিবেচনাহীন প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করতে থাকলেন না।

এরপর গ্রামীণ ব্যাংক অতিক্রম করেছে অনেক দূর পথ। গ্রামীণ ব্যাংক স্বামীদেরও ঋণদান করে। তবে তা হয় তাঁদের স্ত্রীদের মাধ্যম। স্ত্রীরাই মুখ্য গ্রহীতা।

গ্রামীণ ব্যাংকের একজন সদস্যা যখন গৃহনির্মাণের জন্য ঋণের আবেদন করেন তখনই স্বামী স্ত্রী সম্পর্কের সত্যিকারের পরীক্ষা হয়। যে সকল সদস্য অন্তত তিন বছর ধরে গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে সফলভাবে লেনদেন করছেন তাঁদেরকে গৃহঋণ পাবার উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়। আমরা তা সম্ভব করেছি। আমরা চার লাখেরও বেশি সদস্যকে গৃহনির্মাণ ঋণ মঞ্জুর করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বামীকে স্ত্রীর নামে জমির দলিল লিখে দিতে হয়েছে।

www.pathagar.com

দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতিসাধনে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মবিধি ছাড়াও দলের ভিত্তিতে রচিত গ্রামীণ ব্যাংকের দলগত ঋণের ব্যবস্থা স্বামী স্ত্রীকে অনেক কাছে নিয়ে আসে। কখনও কখনও তা দাম্পত্য সম্পর্কের বিষয়ে পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করে।

উনিশশো তিরাশি সালের আগে টাঙ্গাইলে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প চালু করার জন্য উদ্যোগ চালানোর সময় আমি বিষয়টি লক্ষ করেছি। একবার একটি কেন্দ্র সভার পর, শাখা অফিসে পৌঁছবার জন্য একা আমি গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটছিলাম। কিছুক্ষণ পর একই পথে দেখা হল এক যুবকের সঙ্গে। বয়স তার ত্রিশের কাছাকাছি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে আমরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।

সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি গ্রামীণ ব্যাংকের লোক?"

আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?"

"আপনাকে কেন্দ্র সভায় যেতে দেখলাম, আমার স্ত্রীও ওই দলে আছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে যুবকটির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। তার নাম জয়নাল। সে একজন কৃষিমজুর। আট মাস আগে তার স্ত্রী ফরিদা গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দিয়েছে, তাদের পাঁচ বছরের একটি শিশুকন্যা আছে।

জয়নাল বলল, "সাপ্তাহিক কিস্তি শোধ দেবার জন্য ফরিদা খুব খাটে। এখনও পর্যন্ত তার একটা কিস্তিও বাদ যায়নি।"

"তিনি কি গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দেবার আগে আপনার অনুমতি নিয়েছিলেন?"

"অবশ্যই। তবে প্রথমে সন্দেহ ছিল, সে ঠিক কাজ করছে কিনা। তারপর দেখলাম গ্রামের অনেক মেয়েই গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দিচ্ছে। ফরিদা বার বার করে আমার অনুমতি চাইছিল। শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম।"

"তিনি যোগ দিয়েছেন বলে আপনি খুশি তো? না, মনে হচ্ছে যোগ না দিলেই ভাল হত?"

"না, না, আমি খুবই খুশি। আগে ফরিদা সব সময় অভিযোগ করত ভাত জোটে না বলে। এখন আর ওসব অশান্তি নেই। যা রোজগার তাতে আমাদের তিনজনের স্বচ্ছন্দে চলে যায়। খাবার অভাব নেই।"

বার্ষিক পরীক্ষায় দারুণ ফল করার মতো খুশির খবর। যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনটি সব ঠিকঠাক চলছে বলে ভীষণ ভাল লাগল। জয়নাল ও আমি নিঃশব্দে পথ চলতে লাগলাম।

বহুক্ষণের নীরবতা ভাঙল। জয়নালের নেতিবাচক কথায় আমার ঘোর কেটে গেল।

"একটাই মুশকিল হয়ে গেছে। এর আগে রাগারাগি হলে স্ত্রীকে মারধোর করে গায়ের ঝাল মেটাতাম। কিন্তু শেষ যেবার ওর গায়ে হাত তুলেছিলাম খুব ঝামেলায় পড়েছিলাম। ফরিদার দলের সব মেয়েরা এসে আমাকে চিৎকার করে গাল দিতে লাগল। আমি গালিগালাজ হজম করে গেলাম বটে কিন্তু ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। আমার ওপর চোটপাট করার ওদের কী অধিকার আছে? আমার স্ত্রী, আমি তাকে যা খুশি করতে পারি। এর আগে কত মারধোর হয়েছে, কেউ একটা কথাও বলেনি, কোনও গা করেনি। এটা ঠিক হচ্ছে না। আবার ওই মেয়ের দল আমায় শাসিয়ে গেছে। বলেছে এরকম আর হলে ওরা আমায় দেখে নেবে।"

আমি জয়নালকে বললাম, "এখন থেকে ওকে রেহাই দেন ভাই। কত খাটছে দেখুন তো। আপনার মনের জ্বালা মেটাবার জন্য অন্য উপায় খুঁজে দেখুন না।"

* * *

স্বাধীন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মহিলারা গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দেবার পর স্ত্রীকে নির্যাতনের ঘটনা অনেক কমে গেছে।

www.pathagar.com

১১
মহিলা গ্রহীতাদের কাছে পৌঁছনো

যে-দেশে কোনও দরিদ্র মহিলা কখনও ব্যাংকের দরজা পর্যন্ত যাননি, সেখানে গ্রাহক হিসেবে কীভাবে তাঁদের সংগ্রহ করা যায়, আস্থা অর্জন করা যায়?

আমি যদি একটা বিজ্ঞাপন ছাপাতাম—

"সকল মহিলারা শুনুন—
শুধুমাত্র মহিলাদেরকেই ঋণ দেয়া হবে। আমাদের ব্যাংকে এসে ঋণ গ্রহণ করুন।"

তাহলে আমি নিঃসন্দেহে গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতাম। বহুল প্রচারের সুযোগও পেতাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হত না। মফস্বল ও গ্রামের ৮৫ শতাংশ মহিলা নিরক্ষর। এ বিজ্ঞাপন তাঁদের চোখে কখনওই পড়ত না। উপরন্তু স্বামী ছাড়া বাইরে বেরোবার অধিকারও তাঁদের নেই।

মহিলাদের উৎসাহিত করার উপায় খুঁজে বার করতে আমি এক কথায় গলদঘর্ম হয়ে গেছি। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে। প্রথমে আমাদের একজনও গ্রাহিকা ছিলেন না। তাঁদের অনুসন্ধানের জন্য আমরা ঐকান্তিক চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

নানা ধরনের প্রক্রিয়া ও কৌশলের সাহায্য নিতে হল।

* * *

কীভাবে মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব? পর্দাপ্রথার কড়াকড়ির জন্য বাড়ির ভিতরে ঢুকে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না।

যেখানে পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি নেই, সেখানেও আচারবিচার, নিয়মকানুন, পারিবারিক অনুশাসন ও সংস্কার, গ্রাম বাংলার নারী ও পুরুষের মধ্যে দূরত্ব রক্ষা করে চলে।

বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা দুরাশা। বেশ কয়েক ঘণ্টা বাড়ির বাইরে পায়চারি করতে হত আমাকে। যাতে আশেপাশের সকলে আমাকে খেয়াল করে। আমার আচার আচরণ সন্দেহাতীত কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। আমাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যেতে হত। তাদের পারিবারিক গোপনীয়তা ও আদব-কায়দার প্রতি আমাকে সম্মান দেখানোর ভূমিকা সযতনে পালন করতে হত।

আমি কখনও আশা করিনি কেউ একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার বসার জন্য চেয়ার এনে দেবে, অথবা সম্মান প্রদর্শনের জন্য কিছু করবে। গ্রামের মানুষ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছে

www.pathagar.com

মাথা নত করতে অভ্যস্ত। ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে এরকম দূরত্ব তৈরি হোক তা আমি কখনও চাইনি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সহজ ভঙ্গিমায় সাধারণভাবে কথা বলতাম। আমার আসার উদ্দেশ্য গ্রামের মহিলাদের কাছে জানাবার চেষ্টা করতাম।

আমি নানান মজাদার গল্পের মাধ্যমে বক্তব্য বোঝাতাম। এটা সবারই জানা যে সরল কৌতুকের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছনো সবচেয়ে সহজ।

সহকর্মীদের প্রতি আমার নির্দেশ ছিল বাচ্চাদের দেখলেই আদর করবার জন্য। এই অভ্যাস আমার সহজাত বলে নয়, মায়ের মন জয় করার এটাই হল দ্রুততম উপায়। ছাত্র ও সহকর্মিণীদের দামি পোশাক বা চটকদারি শাড়ি পরতেও নিষেধ করে দিয়েছিলাম।

* * *

গ্রাম পরিক্রমার সময় সাধারণত আমার সঙ্গে একজন ছাত্রী থাকত। তার কাজ ছিল বাড়িতে প্রবেশ করে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করা। আমাদের আসার উদ্দেশ্য তাদের বুঝিয়ে বলা। আমাদের গ্রাহক হবার ব্যাপারে তাদের আস্থা অর্জন করার এই ছিল প্রথম ধাপ। মহিলাটির মনে কোনও প্রশ্ন জাগলে আমার ছাত্রীটি বাইরে এসে আমাকে জানাত এবং আমার উত্তর তাকে জানাবার জন্য আবার বাড়ির ভিতর ঢুকত। সে ঘর বারই শুধু করত, কিন্তু ঋণের ব্যাপারে অন্দরমহলের মত আদায় করতে পারত না।

ঘণ্টাখানেক পরে আমি নিরাশ হয়ে সেদিনের মতো বিদায় নিতাম। পর দিন আবার সেখানে হাজির হতাম।

এইরকম পরিক্রমা চলতেই থাকত। আমার তরফ থেকে ছাত্রীটিকে অসংখ্যবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হত, একই প্রশ্নের কতবার যে জবাব দিতে হত তার ঠিক-ঠিকানা নেই, প্রায়ই আমার বক্তব্য গ্রামের মহিলাদের কাছে স্পষ্ট হত না। তাদের সমস্যার কথাও আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারতাম না। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাসম্পন্ন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান বলে অনেকটা সুবিধা হয়েছিল। বাড়ির পুরুষেরা কিছুটা স্বস্তি ও নিশ্চিন্ত বোধ করত। তবু তারা সর্বদা দাবি করত, ঋণ দিতে হলে তাদেরই দিতে হবে, তাদের স্ত্রীদের কখনওই নয়।

বর্ষাকালের এক বৃষ্টিভেজা দিনের কথা আমার খুব মনে আছে। আমি যথারীতি বাড়ির বাইরে বসে আছি। অবশ্য সেদিন ভাগ্যে একটা চেয়ার জুটেছে। দুটি কুঁড়ের মাঝখানের পরিসরে সেটা পাতা হয়েছে। হঠাৎ খুব ঘনঘটা করে বৃষ্টি নামল। বেশ ভারী বর্ষণ। বাড়ির মহিলা একটি ছাতা দিয়ে গেলেন আমাকে। আমার সঙ্গের ছাত্রীটি ঘর বার করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিজে গেছিল। দেখে মহিলাটির মায়া হল, তিনি বললেন, "পাশের বাড়ি খালি আছে। প্রফেসর সাহেবকে ওই বাড়ির ভিতরে বসতে বলো।" আমার ছাত্রী রেহাই পেল। নাহলে অবিরাম বর্ষণে ভিজে সপসপে হয়ে যেত বেচারি।

কোনও বাড়ির ভিতরে প্রবেশের জন্য সেই প্রথম আমার আমন্ত্রণ লাভ।

আমার ওই অস্থায়ী আশ্রয়স্থলটি ছিল গ্রাম বাংলার বাড়িগুলির একটি। ছোট্ট একটিই ঘর। মেঝেতে ধুলো ভর্তি। বিদ্যুৎ নেই। চেয়ার টেবিলের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় মামুলি আসবাবপত্র কিছু নেই।

একা অন্ধকারে চৌকির উপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রান্নার চমৎকার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছিল। বাঁশের দেওয়াল দিয়ে পাশের বাড়ির সঙ্গে তফাত করা হয়েছে। যতবারই আমার ছাত্রীটি ওপাশে যাচ্ছে বুঝতে পারছি সেখানে মহিলাদের জটলা চলছে।

www.pathagar.com

ফিসফিসানির শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম। স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। আমার ছাত্রীটি তাদের কথা বলার জন্য আমার ঘরে ঢুকলে, এটুকু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে বেড়ার ওপাশে মহিলারা উন্মুখ হয়ে আমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। এটা যোগাযোগের আদর্শ উপায় নয়—তবু বাইরে বসে কাকভেজা হবার চেয়ে মন্দের ভাল।

মিনিট কুড়ি এভাবে কথাবার্তা চালানোর পর মহিলারা আর ছাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা না করে সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করল। চট্টগ্রামের ভাষার কলকাকলিতে নানা মন্তব্যও ছুড়ে দিতে লাগল। অন্ধকার চোখে সয়ে গেছিল বলে আমি মানুষের ছায়ামূর্তি দেখতে পাচ্ছিলাম। অনুভব করছিলাম বেড়ার ফাঁক দিয়ে বহু জোড়া চোখ আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমার স্বচ্ছন্দ ও নিখুঁত উচ্চারণে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা সে সময় সন্দেহাতীতভাবে কাজ করেছিল।

পুরুষদের মতো তারাও প্রশ্ন করল, "আমাদের কেন দল গড়তে হবে? প্রত্যেককে কেন আলাদা ভাবে ঋণ দেওয়া হবে না?"

অন্তত জনা পঁচিশ মহিলা বেড়ার ফাঁক দিয়ে প্রশ্নবাণ ছুড়ে আমাকে ঘায়েল করছিল। আতপ চালের ভাত রান্নার গন্ধ পাচ্ছিলাম। হঠাৎ অত্যধিক চাপের ফলে বেড়ার একাংশ ভেঙে পড়ল। সব বাঁধন ঘুচে গেল—তারা সরাসরি ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করল। অধিকাংশের মুখ ঘোমটায় ঢাকা। তারই মধ্যে শোনা যাচ্ছে, অনেকের খিল খিল হাসির শব্দ—কেউ আবার লজ্জায় অধোবদন—মুখ তুলে তাকাতেই পারছে না। তবে আর দোভাষীর প্রয়োজন হচ্ছিল না। সেই প্রথম আমি জোবরা গ্রামের একদল মহিলার সঙ্গে এক ঘরে বসে কথা বলার সুযোগ পেলাম।

ঘোমটায় মুখ ঢাকা এক মহিলা বললেন, "আপনার কথায় আমাদের ভয় লাগছে বাবা।"

আর একজন কথা বলছিলেন দেওয়ালের দিকে মুখ করে, "আমার স্বামীই তো সবসময় টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করে, তবে আমাদের কেন ধার দেওয়া?"

আমি তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না।

তৃতীয়জন বলল, "ধার দিতে হয় আমার স্বামীকে দিন। সে-ই টাকাপয়সার হিসেব রাখে। আমি তো কোনওদিন টাকা ছুঁয়েও দেখিনি। ইচ্ছাও নেই।"

যে মহিলা আমার সবচেয়ে কাছে নতমুখে বসেছিলেন তিনি বললেন, "টাকা নিয়ে করবটা কী তাই তো বুঝতে পারছি না।"

এক প্রৌঢ়া বলে উঠলেন, "না, না। একদম নয়। আমাদের টাকার দরকার নেই। যৌতুকের টাকা মেটানো নিয়েই অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছে। আমি চাই না আবার স্বামীর সঙ্গে বিবাদ হোক। না, না, স্যার, আমরা আর ঝঞ্ঝাটে জড়াতে চাই না।"

দারিদ্র মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কীভাবে নষ্ট করে দেয় তা এদের দেখলে উপলব্ধি করা কঠিন নয়। স্বামীদের আর কারোর উপর প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা নেই—শুধু এরা ছাড়া। তাদের হতাশা থেকে মুক্তির উপায় হল স্ত্রীদের প্রহার করা। নানাভাবে চোটপাট ও দোষারোপ করা এবং তালাক দেওয়া। এক কথায় তাদের সঙ্গে জীবজন্তুর মতো ব্যবহার করা। দাম্পত্য কলহ ও বৈবাহিক নৃশংসতা কতদূর নিষ্ঠুর হতে পারে সে ব্যাপার আমার জানা। মহিলারা নগদ টাকার ব্যাপারে নিজেদের জড়াতে চান না যেহেতু চিরকাল পুরুষেরা টাকাপয়সার নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে।

মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য সরকার নানা আইনকানুন জারি করেছে। কিন্তু আজ অবধি সেগুলি বলবৎ হয়নি, ঐতিহ্যে ভাঙন ধরার ভয়ে। এখনও টাকা সংক্রান্ত আলোচনার সময় গ্রামের মহিলারা ভয়ানক ভীত সন্ত্রস্ত বোধ করেন।

www.pathagar.com

তাদের অহেতুক শঙ্কা দূর করবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। বললাম, "কেন ধার নেবেন না। ধারের টাকা দিয়ে আপনি নিজেই টাকা রোজগার করতে শুরু করতে পারবেন। তাতে আপনারও সংসারের কত মঙ্গল হবে বলুন তো?"

সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি, "আমরা কিছুতেই আপনার টাকা ধার নিতে পারব না।" বার বার বলি, "কেন নয়? আয় করে ছেলেমেয়েকে পেটভরে খাওয়াতে পারবে। স্কুলে পাঠাতে পারবে।"

"না, আমার মা মৃত্যুশয্যায় শেষ উপদেশ দিয়ে গেছিলেন কখনও যেন কারওর কাছে ধার না করি। মাপ করবেন, আমরা ধার করতে পারব না।"

"একদম ঠিক। আপনার মা অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন। একেবারে সঠিক নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে আপনাকে নিশ্চয়ই তিনি গ্রামীণ ব্যাংকে যোগদান করতে আদেশ করতেন। এই প্রকল্পের কথা তো তাঁর জানা ছিল না। সেসময় ধার দেবার জন্য ছিল শুধু সুদখোর মহাজনেরা। তাদের কাছে টাকা ধার করতে তিনি আপনাদের নিষেধ করে গেছেন। এটা খুবই সমঝদারির পরিচয়। মহাজন প্রতি মাসে, কখনও প্রতি সপ্তাহে দশ শতাংশ সুদ নেয়। আপনার মা যদি আমাদের কথা জানতেন তো নির্দ্বিধায় আমাদের সংস্থায় যোগ দিতে আপনাদের উৎসাহিত করতেন। কারণ এর ফলে জীবন হয়ে উঠবে সার্থক, সুন্দর ও আনন্দময়।"

"আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলুন না। সে টাকার ব্যাপারটা ভাল বোঝে।"

এতবার এসব যুক্তি শুনেছি যে আমার উত্তর তৈরি ছিল। এরকম সংস্থার কথা তাঁরা জন্মে শোনেননি, দেখা তো দূরের কথা। সেখানে যোগ দিয়ে একটা ঝুঁকি নিতে আহ্বান জানানো এবং রাজি করানো অত্যন্ত কঠিন। তাঁদের মনে শুধুই শঙ্কা। যা নির্মূল করা দুরূহ কাজ।

এইসব আশঙ্কা থেকে তাঁদের মুক্ত করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলাম।

দিনের শেষে ছাত্রদের কাছ থেকে তাদের সারাদিনের কাজের বিবরণ ও অগ্রগতির পর্যালোচনা করা হত। তারা সিগারেটের প্যাকেটে সম্ভাব্য গ্রাহকদের নাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী নোট করে আনত। আলোচনার পর, পরের দিনের কর্ম পরিকল্পনা স্থির করা হত।

* * *

একদিন মরিয়ম নামে এক মহিলা আমার কাছে এক হাজার টাকা ধার চাইলেন। তিনি তালাকপ্রাপ্তা ও তিন সন্তানের জননী। দোরে দোরে কাপড়জামা ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রথম দফায় তাঁর এত টাকা ঋণের প্রস্তাব আমি মেনে নিতে পারিনি। আমার দুশ্চিন্তা ছিল ধার শোধ দিতে গিয়ে তিনি নাজেহাল হয়ে যাবেন। তখন সারা গ্রাম আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। এতদিনের সব পরিকল্পনা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে। অনেক ধৈর্য ধরে তাঁকে বোঝাতে লাগলাম যে অল্প মূলধন (৫০০ টাকা) নিয়ে শুরু করে পরে বাড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

বাড়ির উঠোনে আমি অপেক্ষা করছিলাম। আমার বার্তাবাহিকা বার বার ঘরের ভিতর ও উঠোনে যাওয়া আসা করছিল মরিয়মের মতামত আমাকে জানাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। আমি বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লাম। এ যেন বহুদিন ধরে জমে থাকা বরফ গলানো। ঘোমটায় মুখ ঢাকা ডজনখানেক মহিলা হতচকিত হয়ে ত্রস্তভাবে

www.pathagar.com

আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল। পরিস্থিতি সামাল দিতে একজন প্রৌঢ়া এগিয়ে এলেন। বসবার জন্য ছোট কাঠের একটি টুল আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তাঁদের বোঝাতে শুরু করলাম কৃষিকাজের উদাহরণ দিয়ে। নতুন অপরীক্ষিত ফসল চাষের আগে একদম তাড়াহুড়ো না করে খুব সতর্কভাবে প্রতিটি বীজ পুঁততে হয়। তারপর চারা গজায়। একটি চারা বেশি বীজ উৎপন্ন করলে তবেই তো বেশি ফসল পাওয়া যায়। কথা বলতে বলতে দেখলাম মহিলারা সবাই আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, যদিও ঘোমটায় সবার মুখ ঢাকা ছিল।

* * *

আমাদের সদস্যদের পরিবারে যে ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন তাঁদের একজনের কথা শুনুন।

ঢাকা জেলার কাপাসিয়া উপজেলার কিরাতি গ্রামে ১৯৫৯ সালে হাজেরা বেগমের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন খেতমজুর। ছ-ছটি কন্যাসন্তানকে প্রতিপালনের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। যৌতুক দেবার ক্ষমতা ছিল না বলে তিনি এক অন্ধের সঙ্গে হাজেরার বিবাহ দেন। হাজেরা লোকের বাড়ি বাসন মেজে যা সামান্য উপার্জন করতেন তা দিয়ে তাঁর ও তাঁর স্বামীর ও তিনটি সন্তানের আহার জোগানো ছিল দুঃসাধ্য। স্বামীর কাছে গ্রামীণ ব্যাংকে যোগদানের অনুমতি চাইলেন তিনি। স্বামীর মত অনুযায়ী ব্যাংক এক খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান, পবিত্র ইসলাম ধর্মকে বিলুপ্ত করাই যার উদ্দেশ্য। গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দিলে হাজেরাকে তালাক দেবার ভয় দেখান তাঁর স্বামী।

হাজেরা আর কাউকে কিছু জানালেন না। কাছেই এক গ্রামে গিয়ে প্রাথমিক আলোচনা চক্রে যোগ দিলেন তিনি। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীদের কাছ থেকে শুনলেন গ্রামীণ ব্যাংকের নীতি ও ভূমিকার কথা।

প্রথমবার মিটিং-এ দলের অন্য সদস্যরা তাঁকে গ্রামীণ ব্যাংকের নিয়মাবলি সম্বন্ধে কতগুলি মৌখিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। হাজেরা এত ভয় পেয়েছিলেন যে কোনওটারই উত্তর তাঁর মুখে জোগাল না। হাজেরা পরে বলেছিলেন, "সারাজীবন ধরে শুনে এসেছি আমি অপদার্থ। পরিবারের পণ দেবার সামর্থ্য নেই। তাই মেয়ে হয়ে জন্মে শুধু মা বাবার দুঃখেরই কারণ হয়েছি। বহুবার মাকে বলতে শুনেছি জন্মমুহূর্তেই আমাকে মেরে ফেললে ভাল হত। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ঋণ পাওয়া বা শোধ দেবার কোনও যোগ্যতা আমার আছে।"

দলের পূর্ণ সমর্থন ছাড়া তিনি কিছুতেই দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিতে পারতেন না। তাঁর প্রথম কিস্তির দুই হাজার টাকা ঋণ পাবার পর তাঁর দুচোখ বেয়ে অঝোরধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। দলের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি একটা বাছুর কিনলেন। তাকে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করতে লাগলেন সযত্নে। ধান মাড়াই করার কাজও করতে লাগলেন। হাজেরার বাবা যখন বাছুরটি কিনে বাড়িতে নিয়ে এলেন, তাঁর স্বামী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁর মনেই রইল না, এই কাজের জন্য তিনি স্ত্রীকে তালাক দেবেন বলে শাসিয়েছিলেন।

এক বছরের মধ্যে হাজেরা তাঁর ঋণ শোধ করলেন। দ্বিতীয় দফায় প্রাপ্ত ঋণের টাকা থেকে কিছুটা খরচ করে একখণ্ড জমি বন্ধক নিলেন। তাতে সত্তরটা কলাগাছের চারা লাগালেন। ঋণের বাকি টাকায় আর একটি বাছুর কিনে ফেললেন। আজ তিনি একটি বন্ধকী ধানকলের মালিক। তাঁর খামারে হাঁস, মুরগি, ছাগল কি না আছে। ভরভরন্ত কারবার।

www.pathagar.com

হাজেরা বলেন, "এখন আমরা তিনবেলা পেট ভরে খেতে পাই। আমার বাচ্চারা আর খিদের জ্বালায় কষ্ট পায় না। এমনকী সপ্তাহে একবার মাংস কেনার ক্ষমতা অবধি আছে আমার। সব বাচ্চাকে আমি স্কুল, কলেজে পড়াতে চাই যাতে ওরা আমার মতো দুর্দশায় না পড়ে।" গ্রামীণ ব্যাংক সম্বন্ধে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দেন, "গ্রামীণ ব্যাংক আমার মায়ের মতো। না, না, ভুল হল, মায়ের মতো নয়, গ্রামীণ ব্যাংক সাক্ষাৎ আমার মা জননী। সে আমাকে নতুন জীবন দান করেছে।"

www.pathagar.com

১২
গ্রামীণ ব্যাংকের মহিলা কর্মীরা

১৯৭৭ সালে, গ্রামীণ ব্যাংকের পত্তনের গোড়ার দিকের আমাদের দুই মহিলা কর্মী নুরজাহান ও জান্নাতকে দেখে আমরা আবিষ্কার করলাম মহিলা কর্মী নিয়োগ কতদূর কঠিন কাজ। আমাদের গোটা সমাজ ও সংস্কৃতি যেন মহিলাদের ঘরের বাইরের কাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

শুধু গ্রাহকদের খাতিরে আমরা স্ত্রীজাতির উপর গোটা সমাজের দুর্ব্যবহার ও পক্ষপাতহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি তা নয়—এই চক্রান্ত আমাদের ব্যাংককর্মীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের মহিলা কর্মীদের উপর নির্দেশ ছিল একা গ্রামে ঘুরে কাজ করতে হবে। অনেকেরই মা বাবা ভাবলেন এটা মর্যাদার পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। মেয়ে ডেস্কে বসে, মুখ গুঁজে ফাইলপত্র নিয়ে কাজ করে গেলে যে বাবা মার মানতে আপত্তি ছিল না, তাঁরাই মেয়ের সারাদিন গ্রাম পরিক্রমাকে ভাল চোখে দেখলেন না।

প্রথম দিকে নিজের ছাত্রী ছাড়াও আমরা স্থানীয় এলাকা থেকে মহিলা কর্মীদের নিযুক্ত করতাম। আমরা চাইতাম তাঁরা নিজেদের বাড়ি থেকে কাজের জায়গায় হাজিরা দিন (কর্মীদের নিয়ে অহেতুক সমস্যা ও গুজব এভাবে এড়ানো যেত)।

মহিলা ব্যাংককর্মীরা গ্রাহিকাদের বাড়ি যেতেন পায়ে হেঁটে। চলার পথে প্রায়ই তাঁদের দেখতে লোকের ভিড় হয়ে যেত। যাতায়াতে মাইল দুই পথ হাঁটবার সময় বহু লোকের সমালোচনা ও তির্যক মন্তব্য তাঁদের হজম করতে হত। এঁরা অন্দরমহল ছাড়া তরুণীদের অন্যত্র চলাফেরা দেখতে অভ্যস্ত নন।

সাধারণত যেসব তরুণী সদ্য পড়াশুনো শেষ করে বিয়ের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন বা সদ্য বিবাহিতা, যাঁদের স্বামী তখনও বেকার, তাঁদেরই কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হত। অবিবাহিতা কন্যা চাকরি পেয়ে গেলেই তাঁদের উপর থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বিয়ের জন্য পারিবারিক চাপ কমে আসত। চাকরি পাবার ফলে বিয়ের বাজারে তাদের দর বেড়ে যেত। পারিবারিক বোঝা না হয়ে তারা হয়ে উঠত পারিবারিক সম্পদ।

* * *

ব্যাংকর্মীদের কর্মক্ষেত্র বিশাল—মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে এটিও একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ছেলেরা তবু সাইকেলে যাতায়াত করতে পারত, কিন্তু আমাদের সমাজে মেয়েদের সাইকেল চালানো শোভন নয়। প্রকৃতপক্ষে আজও আমাদের বহু প্রশিক্ষণরত কর্মী সাইকেল চালাতে জানেন না।

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণের জন্য আমরা বাইসাইকেল কিনলাম। মেয়েদের সাইকেল চালানো শিক্ষা দিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল। কোনও কোনও অঞ্চল এতই রক্ষণশীল যে সেখানে সাইকেল চালাবার জন্য মেয়েদের ধিক্কার দেওয়া হত।

সেই থেকে কেটে গেছে বিশটা বছর। আজ আমাদের ৯৪ শতাংশ গ্রাহক মহিলা এবং সমাজের বহুমুখী পরিবর্তনের রূপকার আমরা। দুর্ভাগ্যবশত আজও আমাদের একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

* * *

মহিলা ব্যাংককর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত দুরূহ সমস্যার কথায় আবার ফিরে আসি। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে মহিলা কর্মীদের চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য চাপাচাপি শুরু হয়। একটি সুশ্রী তরুণীর একা গ্রামে ঘোরাঘুরি করার ঘোরতর বিরোধী তাঁরা। কোনও বিপদ হলে মেয়েটি আত্মরক্ষা করতে অক্ষম। এই দুশ্চিন্তায় তাঁরা সদা শঙ্কিত।

আবার চাকরি ছাড়ার চাপ আসে মহিলার প্রথম সন্তানের জন্মের পর। দ্বিতীয় বা তৃতীয় সন্তান জন্মানোর পর শ্বশুরবাড়ির বিরোধিতা এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে তা প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে যায়। মেয়েটিও স্বভাবতই তার সন্তানদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে চায়। তখন তার পক্ষে কমবয়েসি সহকর্মীদের মতো হেঁটে হেঁটে কাজ করাও হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য।

এই জন্য বহু সংখ্যক মহিলা কর্মী তাড়াতাড়ি স্বেচ্ছা অবসরের জন্য আবেদন করেন। দশ বছর চাকরির পর একজন ব্যাংককর্মী অবসরের অর্ধেক সুযোগ সুবিধাসহ অবসর গ্রহণ করতে পারে—নিয়ম আছে গ্রামীণ ব্যাংকে।

* * *

আমাদের তরুণ মহিলা কর্মীরা কী ধরনের চাপের মুখে চাকরি গ্রহণ করেন ও কাজ করে যান, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নূরজাহান বেগমের কাহিনী।

গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প যখন শুরু হয় তখন নূরজাহান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী, বয়স ২৩ বছর। সে ছিল এক রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। মাত্র ১১ বছর বয়সে সে বাবাকে হারিয়েছিল। তার মা চেয়েছিলেন মেয়ে আর পাঁচজনের মতো বিয়ে করে সংসার ও সন্তানপালন করুক। কিন্তু বাদ সাধল নূরজাহান স্বয়ং। এম. এ. পাশ করার পর সে বিদ্রোহ করে বসল। সে চাকরি করে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তার গ্রামের মহিলাদের মধ্যে প্রথম এম. এ. পাশের কৃতিত্ব তার। একটি বেসরকারি সংস্থায় (এন.জি.ও) চাকরির আবেদন মঞ্জুর হয়েছে তার। মায়ের কাছে সে অনুনয় করে কেঁদে পড়ল, "মা, আমার এতদিনের অর্জিত শিক্ষাকে ব্যবহার করার সুযোগ থেকে আমায় বঞ্চিত কোরো না।"

নূরজাহানের সব অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হল। মা তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। বাংলাদেশের অভিজাত পরিবারের মেয়েরা কোনওদিন কারওর অধীনে চাকরি করে না। অগত্যা নূরজাহান তার বড় ভাইকে ধরে পড়ল। বড় ভাইয়ের অবশ্য তার চাকরি গ্রহণের ব্যাপারে আপত্তি ছিল না। তবে তার মনে ছিল ভয়। আর পাঁচজনে কী বলাবলি করবে তার জন্য দ্বিধাগ্রস্ত ছিল সে। তাই নূরজাহান চাকরিতে যোগদানের তারিখ কেবলই পিছতে লাগল। এন. জি. ও. থেকে তিনবার তাকে অনুমতি দেওয়া হল তারিখ বদলের জন্য।

www.pathagar.com

তারপর আর তাদের পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব হল না। চাকুরির সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল নূরজাহানের।

নূরজাহান কিন্তু হাল ছাড়ল না। সে এরপর গ্রামীণ ব্যাংকে ইন্টারভিউ দিল। আমরা তাকে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে এবার মাকে গিয়ে বলল, "তুমি এতদিন আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আবাসে থাকবার অনুমতি দিয়ে এসেছ। এবারও তাই হবে। এখন থেকে আমি এক মেয়েদের হস্টেলে মেয়েদের সঙ্গে এক হলঘরে থাকব। তুমি কিন্তু আর আপত্তি করতে পারবে না।"

তার মা বললেন, "কাজটা কী ধরনের?"

"আমি একটি ব্যাংকের কর্মীর নিয়োগপত্র পেয়েছি। লক্ষ্মী মা আমার, তুমি আর আপত্তি কোরো না।"

নূরজাহানের ভাইরা সব একজোট হয়ে মাকে বোঝালেন, অবশেষে অনুমতি মিলল।

তাঁরা ভেবেছিলেন নূরজাহানকে অফিসারের ডেস্কে বসে কাজ করতে হবে। সেখানে ফোন ও ব্যক্তিগত সচিব থাকবে। তার যে ডেস্ক, অফিস কিছুই থাকবে না নূরজাহান সে কথা গোপন রেখেছিল। পায়ে হেঁটে দরিদ্রতম গ্রামের হতদরিদ্র গৃহকর্ত্রী ও কাঙালিনীদের সঙ্গে কথা বলাই হবে তার কাজ, একথা নূরজাহান বাড়িতে বলেনি। সে জানত, বললে তার পরিবার আতঙ্কিত হবে ও চাকরিতে ইস্তফা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করবে।

১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে সে কাজ শুরু করেছিল। তার পরিবার যতদিন গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যপদ্ধতির বিষয় অবগত ছিল না, ততদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার কাজে বাধা দেবার কথা ভাবেননি।

কাজে যোগদানের প্রথমদিনই নূরজাহানকে 'আম্মাজান আমিনা'র কাহিনী লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিলাম। এর পিছনে তিনটি যুক্তি ছিল—

প্রথমত, একজন নতুন কর্মীকে উৎসাহিত করার জন্য হতদরিদ্রের সত্যিকারের সমস্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জন খুবই জরুরি। আমার বিশ্বাস এতে তার কাজের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় কারণ, তার কর্মতৎপরতার মূল্যায়ন করতে এই কাজ বিশেষ ভাবে সাহায্যকর হবে। কাজের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গিরও আভাস পাওয়া যাবে।

গরিব মানুষদের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়। উপরন্তু তা এমনভাবে করতে হবে যাতে তাদের জীবনে সত্যিই পরিবর্তন আসে। নূরজাহান এম. এ. পাশ করেছে। কিন্তু দারিদ্র সমস্যা নিয়ে যে কর্মীর কাজ তার আরও কিছু যোগ্যতা থাকার দরকার। ঐকান্তিক আগ্রহ সেগুলির মধ্যে অন্যতম। সবরকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লক্ষ্য যে স্থির ও অবিচল থাকতে পারে, মানুষের সঙ্গে যার যোগাযোগের ক্ষমতা ও মনস্তত্ত্ব বোঝার দক্ষতা আছে, সেই পারে একজন দরিদ্র মানুষের শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে, ব্যাংককর্মীকে গ্রাহকদের অন্দরমহলে অবাধ যাতায়াতের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে, দেখতে হবে তাদের জীবন কেমনভাবে চলে, কী কাজ তারা করে। তাদের বাচ্চাদের হাসিকান্না, পড়াশুনো, শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও আরও অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

তৃতীয় কারণ হল, প্রকল্পকর্মীদের সর্বদা সচেতন থাকা জরুরি যে তারা শুধু ঋণের ব্যাপারেই নয় মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে জড়িত থাকবে। তাদের প্রধান মনোযোগের কেন্দ্র হবে 'মানুষ', যাদের সেবায় তারা নিযুক্ত হয়েছে।

প্রতিটি কর্মীকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে গ্রাহকের প্রথম পরিচয় সে মানুষ।

www.pathagar.com

তাদের কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গ্রাহকদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সাধন। তারা শুধু বিক্রেতা নয়—যান্ত্রিকভাবে সেবাও তাদের কাজ নয়। সেগুলি শুধুই হাতিয়ার, তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য।

গ্রাহক ও ব্যাংককর্মীর মধ্যে সহজ ও শঙ্কাবিহীন মত বিনিময় ও ভাবের আদান প্রদানের জন্য প্রয়োজন গ্রাহকের জীবন ও সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা।

এই সমস্ত কারণের জন্য নূরজাহানকে বললাম, "আম্মাজান আমিনাকে মন দিয়ে স্পর্শ করবার চেষ্টা করো। তার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে তার অন্তরাত্মার কান্না শোনবার চেষ্টা করো। সঙ্গে কাগজ কলম নিয়ো না—তোমার প্রথম কর্তব্য হবে তার আস্থা অর্জন করা।"

আমার সহকর্মী আসাদের সঙ্গে নূরজাহান সেখানে পৌঁছল।

আম্মাজান আমিনা আসাদকে দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিল, "ও কি তোমার স্বামী?

"না", নূরজাহান উত্তর দিয়েছিল। "আমরা একসঙ্গে কাজ করি, ও আমার সহকর্মী।"

"তুমি এসেছ আমার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে একজন পুরুষমানুষ যে আবার তোমার স্বামী নয়। এ কেমন ধারা হল?" আম্মাজান আমিনা জিজ্ঞাসা করেছিল। এই ব্যাপারটা রক্ষণশীল পর্দাপ্রথার বিরোধী। নূরজাহানের প্রতি সন্দেহ জন্মেছিল তার।

কিন্তু ধীরে ধীরে, অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে নূরজাহান তার বিশ্বাস অর্জন করল। একজন নবনিযুক্ত ব্যাংককর্মীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হল এরকম ঘটনাবলির বিবরণ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে তা লিপিবদ্ধ করে রাখা।

* * *

একদিন নূরজাহানের এক আত্মীয় তাকে পারিবারিক খবরাখবর দিতে এল। আমাদের অফিসে এসে একজন মাত্র কর্মীকে দেখতে পেল সে। অফিসঘর বলতে একটি টিনের চালাঘর। কোনও টেলিফোন নেই। টয়লেট বা পানির ব্যবস্থা নেই। সে হতবাক হয়ে গেল। বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পর্কে তার যা ধারণা ছিল তা এখানে একেবারেই নেই।

অফিসের ম্যানেজার আসাদ তাকে জানাল নূরজাহান কর্মক্ষেত্র পরিদর্শনে গেছে। আত্মীয়টি তাকে খুঁজে পেল একটা গাছের তলায়। ঘাসের উপর বসে সে ক'জন গ্রাম্য মহিলার সঙ্গে বাক্যালাপে ব্যস্ত তখন। সে আরও হতভম্ব হয়ে গেল। নূরজাহান যেন ধরা পড়ে গেছে। সে লজ্জায় মিথ্যা কথা বলল, "চিন্তা কোরো না। আজ এক বিশেষ পরিস্থিতির জন্য আমাকে এখানে দেখছ। দয়া করে মাকে একটি কথাও জানিয়ো না। রোজ এমন ঘটে না।"

কিন্তু তার আত্মীয় বাড়িতে বিস্তারিত খবর জানিয়ে দিল।

নূরজাহানের মা তো সব শুনে রেগে আগুন। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণা মহিলাদের মতো তিনিও চাইলেন নূরজাহান পর্দাপ্রথা মেনে নিয়ে ঘরে থাকুক। মা কখনও বাড়ির বাইরে যাননি। এমনকী সন্তানদের বাড়িতেও নয়। তারাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। নূরজাহান খোলা আকাশের তলায় কাজ করছে এ তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। তাঁর ধারণায় এটা সম্মানীয় মহিলার পক্ষে অমর্যাদার কাজ।

নূরজাহান এবার মার কাছে সত্যি ঘটনা খুলে বলল। মা নিজেও গরিবদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। সব শুনে তিনিও কোমল হয়ে গেলেন। আজ নূরজাহানের মা গ্রামীণ ব্যাংকের গুণগ্রাহীদের মধ্যে অন্যতম।

একদিন দু'জন অল্পবয়সি সহকারিণীকে নিয়ে নূরজাহানকে কুমিল্লা শহরে যেতে নির্দেশ

www.pathagar.com

দিলাম। সেখানকার সাংস্কৃতিক উৎসবে সে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করবে। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার দূরত্ব বেশি নয়, পথও নিরাপদ। তাই সঙ্গে কোনও পুরুষ সহকর্মীকে দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। এটা কিন্তু আমার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় নয়। আমি চাইতাম আমার কর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হোক। বিপদ বাধার সম্মুখীন না হলে, তাদের জয় করতে না শিখলে কোনও যুবক বা যুবতীর মনে আত্মবিশ্বাস জন্মায় না। দূরত্ব যাই হোক, কোনও মহিলা একা পথে যাতায়াত করতে পারবে না—এটা মেনে নেওয়া যায় না। গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে এমন যুক্তিহীন চিরাচরিত প্রথা ভাঙার খুব দরকার।

নিরাপত্তা, যাত্রার ঝক্কি সামলানো ও খুঁটিনাটি পথনির্দেশ দেবার জন্য একজন পুরুষ সঙ্গীকে তার সঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করিনি দেখে নূরজাহান মনে মনে আমার উপর ভয়ানক রেগে গেল। মুখে অবশ্য কিছু প্রকাশ করল না। সে নিজেই এক সহকর্মীকে ফোন করল, তার সঙ্গে যেতে অনুরোধ জানাল। নূরজাহানের দুর্ভাগ্য ও আমার সৌভাগ্য যে তার হাতে তখন সময় ছিল না। নূরজাহান কখনও একা ভ্রমণ করেনি। সে শক্তি ও সাহস জোগাবার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল—"হে আল্লা, দুটো মেয়েকে নিয়ে যেন নিরাপদে ফিরতে পারি। হায়! আমি যে কখনও দূরে, অচেনা কোথাও একা যাইনি। এ যাত্রা আমাকে উদ্ধার করো।"

সে একাই গেল। কুমিল্লায় অসাধারণ দায়িত্বের সঙ্গে কাজ শেষ করে ফিরে এল। সবাই ওর ভীষণ প্রশংসা করল।

এখন নূরজাহান একা যাতায়াত করে। দুনিয়ার সর্বত্র ওর অবাধ গতিবিধি। কোথাও কোনও সমস্যা নেই। গ্রামীণ ব্যাংকের তিনজন মহাব্যবস্থাপকের (জেনারেল ম্যানেজার) একজন হল সে। আমাদের প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান নূরজাহান। গ্রামীণ ব্যাংকের দশ হাজার কর্মী তারই হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

* * *

দারিদ্র এক দীর্ঘমেয়াদি ব্যাধি। অস্থায়ী কোনও উপায় অবলম্বন করে তার উপশম সম্ভব নয়। স্বল্পমেয়াদি কিছু প্রতিকার আছে ঠিকই, কিন্তু দ্রুত কোনও প্রতিকারের পদক্ষেপ নেবার আগে এক দীর্ঘমেয়াদি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি।

এই সমস্যার মোকাবিলায় শুধুমাত্র একটি স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প যথেষ্ট নয়। সম্পর্কের পরম্পরা একটি পারস্পরিক বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে যা বৃহত্তর সম্পর্ক গড়ে ওঠবার ভিত্তি স্থাপন করে। যেসব প্রকল্প ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ততার আশ্বাস পুরোপুরি দিতে পারবে সেগুলিই সার্থক হয়ে উঠবে।

দারিদ্র দূরীকরণ প্রক্রিয়ার সার্থক প্রয়োগের জন্য দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল ব্যাংককর্মী গড়ে তোলা খুবই জরুরি। কর্মীদের এই পদ্ধতিতে পুরোপুরি আস্থা রাখতে হবে। তবেই সেই কর্মী সফল হবেন, সক্ষম হবেন গ্রাহকদের মধ্যে থেকে দারিদ্র নামক অভিশাপ সম্পূর্ণ দূর করে দিতে।

www.pathagar.com

১৩
গ্রামীণ ব্যাংক: যোগদানের নিয়ম

দরিদ্রদের ব্যাংক কীভাবে চালাতে হয় সে ব্যাপারে আমাদের মনে স্পষ্ট কোনও ধারণা ছিল না। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে একদম গোড়া থেকে আমাদের আরম্ভ করতে হয়েছিল।

১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রামীণ ব্যাংকের পত্তনের একেবারে গোড়ার দিকে, আমরা খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলাম, অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান কীভাবে ঋণদান করে থাকে। তাদের ভুল-ভ্রান্তি থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলাম।

বাংলাদেশের সনাতন ব্যাংক ও ঋণ সমবায়গুলির নিয়ম অনুসারে ঋণগ্রহীতাকে ঋণের মেয়াদ শেষে একসঙ্গে সুদ আসলে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তারা একসঙ্গে টাকা পরিশোধ করতে হিমসিম খেয়ে যেতেন। গ্রহীতাদের উপর এর জন্য সর্বদা ভয়ানক মানসিক চাপ থাকত। ঋণশোধ সম্ভব করে তোলা এক সমস্যা হয়ে উঠত। গ্রাহক কেবলই চাইত ঋণ পরিশোধ বিলম্বিত করতে—ফলত সুদের পরিমাণ আরও বেড়ে যেত—দেনার দায় হয়ে উঠত বোঝাবিশেষ। অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণশোধ করতে পারত না।

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদানের পরিকাঠামো তৈরির সময় আমি পরিকল্পনা করলাম একেবারে বিপরীত ভাবে। স্থির করলাম ঋণ পরিশোধ করতে হবে খুব স্বল্পমাত্রার কিস্তিতে, যাতে করে শোধ করতে গ্রাহকের কষ্ট না হয়। আমাদের বিনিয়োগ যেন ঠিকঠাক উদ্ধার হয়, অথচ তা করতে গ্রাহকের গায়ে আঁচটুকুও লাগে না। নগদ টাকা পকেট থেকে বার করে দিতে সবার একটা মানসিক বাধা থাকে—সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্যও এটাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। নিয়ম করলাম গ্রাহকদের প্রতিদিন কিছু পরিমাণ টাকা শোধ করতে হবে। এই পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। কে নিয়মিত শোধ করছে আর কে করছে না তা সরাসরি বুঝে নেওয়া সম্ভব।

আমি ভাবলাম এর ফলে গ্রাহকদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জন্মাবে। যারা জীবনে কোনওদিন ধার নেয়নি, তারাও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে এই ভেবে, যে ঋণ তাদের বোঝা নয়, তারা ঋণ মোকাবিলা করতে পুরোপুরি সক্ষম।

হিসেবরক্ষার সুবিধার্থে আমি ঋণশোধের জন্য এক বছরের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করলাম। দৈনিক কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা করলাম। অর্থাৎ ৩৬৫ টাকা ধার নিলে, বছরে প্রতিদিন ১ টাকা করে শোধ দিলেই হল।

'দিনে ১ টাকা করে শোধ' শুনে অন্যরা হাসাহাসি করত। যেন এমন আজব কথা তারা জীবনে শোনেনি। আমি কিন্তু তাতে দমে যাইনি। একসঙ্গে আমার একটা গল্প মনে পড়ত। সামান্য হলেও যে-কোনও জিনিস নিয়মিতভাবে অগ্রসর হলে এটা যে কত বড় হয়ে দাঁড়াতে পারে এ গল্পটা তা একেবারে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

www.pathagar.com

গল্পটা হল এইরকম। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক আসামীকে রাজার কাছে আনা হল, তার শেষ ইচ্ছা জানাবার। রাজ-সিংহাসনের ডানপাশে রাখা ছিল দাবার ছক। তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বন্দি বলল, "প্রতিটি চৌকো ঘরে আমি একটি করে চালের দানা চাই, যা পরের ঘরে সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে।"

"এই সামান্য ইচ্ছে?" রাজা সানন্দে সম্মতি দিলেন। গুণোত্তর প্রবৃদ্ধির ব্যাপারটা তাঁর বোধগম্য ছিল না। ফলে শুধু বন্দির মুক্তিলাভই হল না, পুরো রাজত্বও তার অধিকারে এসে গেল। যার কাল ফাঁসি হবার কথা সে হয়ে গেল গোটা রাজ্যের অধীশ্বর।

* * *

ক্রমে ক্রমে আমরা নিজস্ব লেনদেন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হলাম। প্রতি পদে ভুল ভ্রান্তি ছিল অবশ্যম্ভাবী। যত দিন যেতে লাগল আমরা আমাদের নিয়মকানুনকে পরিবর্তিত ও পরিশীলিত করে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শিখলাম।

ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতির কারণে গ্রুপ তৈরি করার দিকে এগিয়ে গেলাম।

দরিদ্র মানুষ একা থাকলেই অনেক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়। দলগত সদস্য হিসেবে তারা নিজেকে অনেক নিরাপদ মনে করে। একক মানুষের আচরণ সংগতিহীন অনিশ্চিত হতে পারে। দলের সদস্য হলে দলের সমর্থন যেমন পাওয়া যায়, তেমন দলের নেতৃত্বের অনুশাসনের ফলে সদস্যদের আচরণে সংগতি ও শৃঙ্খলা আসে। গ্রাহক হিসেবে তারা হয়ে ওঠে অনেক দায়িত্ববান।

দলের মধ্যে বা এক দলের সঙ্গে অন্য দলের সুস্থ প্রতিযোগিতা সবাইকে কোনও একটা সাফল্য অর্জন করবার অনুপ্রেরণা জোগায়। একক গ্রহীতার নিয়মিত খোঁজখবর রাখা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু সদস্য হিসেবে দলে থাকলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যাপারে খেয়াল রেখে চলে। গ্রাহকদের প্রাথমিক নজরদারির কাজটা দলই করে দেয় বলে ব্যাংককর্মীদের কাজের ভার কিছুটা অন্তত লাঘব হয়। দলও এভাবে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে।

দলের কার্যকরী দক্ষতা ও কর্মতৎপরতার গুরুত্ব অসীম, দলই ঠিক করে দেয় কে ঋণ পাবার উপযুক্ত (দলের সম্মতি সাপেক্ষে সদস্য নির্বাচন করা হয়) সেক্ষেত্রে ঋণের নৈতিক দায়িত্ব দলেরই। কোনও সদস্য বিপদে পড়লে দলই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। একজন গরিব মানুষ যিনি ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহী তাঁকে আরও কয়েকজনকে নিয়ে একটা দল গঠন করতে হবে। দলের সদস্যদের মতৈক্য এবং আর্থসামাজিক অবস্থা একই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঋণ দেওয়া হয় একজন সদস্যকে, দলকে নয়। কিন্তু ঋণের অনুমোদন, ব্যবহার ও পরিশোধের ব্যাপার সমষ্টিগতভাবে দায়িত্ব থাকে দলের। প্রথম যদিও চূড়ান্ত হিসেবে প্রতিটি গ্রহীতা নিজেই নিজের ঋণের দায়িত্ব বহন করবেন।

আমরা এও স্থির করলাম গ্রাহকেরা নিজেরাই দল গঠন করবেন—আমরা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না। সদস্যরা নিজেরা আলাপ আলোচনা করে দল গঠন করলে দলের একতা সুদৃঢ় হবে বলে আমার বিশ্বাস।

* * *

দল গঠন সহজ কাজ নয়। একজন সম্ভাব্য গ্রহীতাকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হয়। তার পরিবার বহির্ভূত একজনকে ব্যাংকের কর্মপ্রণালী ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দায়িত্ব তার। ঋণের

www.pathagar.com

ব্যাপারে অন্যপক্ষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করাও তার কাজ।

যে গ্রামে 'গ্রামীণ ব্যাংক' সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা অপরিচিত একটি নাম, সেখানে সদস্য জোগাড় করে দলগঠন আরও কঠিন। প্রথম উদ্যোগীকে বহু মানুষকে বোঝাবার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রথমে মানুষ ভয় পায়। তারা ব্যাপারটায় জড়িত হতে চায় না বলে নানা অজুহাত দেখায়। স্বামীর অনুমতি পাওয়া যাবে না, কারওর কাছে ঋণী হওয়া অনুচিত এই ব্যাপারগুলো তাদের মতামতকে এত প্রভাবিত করে যে, এক কথায় তারা ঋণ-প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। প্রত্যেকেরই এক জবাব, "না, না, কিছুতেই পারব না। অসম্ভব প্রস্তাব।" হাল ছাড়লে চলবে না। কেননা, কোনওদিন পরিচিত কারওর মুখে, সংসারের উন্নতিতে গ্রামীণ ব্যাংকের অবদানের কথা হয়তো তারা শুনবে। তখন বলবে, "আচ্ছা, ভেবে দেখি, কাল এসো।"

দু'জনের মত এক হলে, অতঃপর তারা বেরিয়ে পড়বে তৃতীয় সদস্য খুঁজে বার করতে। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম—এক এক করে সদস্য সংগ্রহ হবে। তখনই গোটা দলটি গঠিত হতে পারবে। সমস্ত প্রস্তুতির পর হয়তো একজন এসে বলবে, "না ভাই, আমার স্বামীর মত বদল হয়েছে,আমার অনুমতি মিলল না।" অতঃপর দল ভেঙে যাবে। হয়তো এক এক করে সবাই নানা কারণে বিদায় নেবে—অবশিষ্ট থাকবে প্রথম উদ্যোগী সদস্যটি। সেই একজনকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

প্রতিটি উদ্যোগী ঋণগ্রহীতাকে আমাদের কাজ সম্বন্ধে বার বার বোঝাতে হবে।

গ্রাহকদের একটি নির্দিষ্ট দিনে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার আগের রাত তাদের কাছে কালরাত্রির সমান। অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সদস্যারা বার বার আল্লার দোয়া ভিক্ষা করে। আগামীকালের কাজ সফল হলে কোনও পীরের দরগায় বাতি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কেউ কেউ এত শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে দলের অন্যদের বলে দেয়, "আমার দ্বারা একাজ হবে না। দল থেকে আমার নাম কেটে আমায় রেহাই দাও ভাই।"

দলের বাকি চারজন অবশ্য হাল ছাড়ে না। গ্রামীণ ব্যাংকের আবেদন জানায় নির্বাচনের পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেবার জন্য। ততদিনে তারা পঞ্চম সদস্য খুঁজে বার করতে পারবে এই আশা রাখে।

নির্বাচনের দিন প্রত্যেক সদস্যকে আলাদাভাবে গ্রামীণ ব্যাংক সম্বন্ধে প্রাপ্ত শিক্ষার ভিত্তিতে, মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়। তারা জানে, প্রত্যেকের ভাল ফল করা অত্যন্ত জরুরি। না হলে বাকি চারজনের সুযোগও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

প্রশ্নের ধরন হল—

গ্রুপ ফাণ্ড (দলগত তহবিল) বলতে কী বুঝেন?

তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। লিখিত কোনও উত্তর তাদের দিতে হয় না। কিন্তু জবাব দেওয়ার সময় তাদের বক্তব্য স্পষ্ট হওয়া খুবই জরুরি।

একজন সম্ভাব্য গ্রাহিকা সঠিক উত্তর দিতে না পারলে পরীক্ষক ব্যাংককর্মী দলের সকল সদস্যকে আর একটু জেনেশুনে নিতে নির্দেশ দেন। "হা আল্লাহ্, এটুকুও ঠিকঠাক বলতে পারো না?" "শুধু নিজেরই নয় আমাদেরও কত বড় ক্ষতি করে দিলে বল তো?" দলের অন্য সদস্যরা হা হুতাশ করে। অসফল প্রার্থীকে দোষারোপ করতে থাকে।

পরীক্ষা পদ্ধতিতে ফাঁকি দেবার কোনও সুযোগ নেই। খুব শক্ত ধাতের, পরিশ্রমী ও মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করার মানসিকতা সম্পন্ন মানুষই গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য নির্বাচিত হয়।

সমালোচকেরা বলেন গ্রামীণ ব্যাংকে আমাদের গ্রামাঞ্চলের গ্রাহকেরা খুবই নরম ধাতের বিনীত মানুষ, তাই তাদের গ্রামীণ ব্যাংকে যোগদানের ব্যাপারে সহজেই আকৃষ্ট করা যায়।

www.pathagar.com

আসলে আমাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উলটো। আমরা গ্রুপে যোগদানকে সহজ না-করে বরং কঠিন করেছি। গ্রামীণ ব্যাংকের নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া খুবই শক্ত। একমাত্র যোগ্যতাই পরীক্ষায় পাশের মাপকাঠি। আমরা চাই আমাদের সদস্যদের কষ্ট ও বাধা বিপর্যয় সহ্য করার মতো ক্ষমতা অর্জিত হোক।

নির্বিচারে গরিব মানুষকে ঋণ না দিয়ে আমরা তাঁদের মধ্যে যাঁরা ঝুঁকি নেবার সাহস নিয়ে এগিয়ে আসেন তাঁদেরকে নিয়ে শুরু করি। কোনও কাজের পথপ্রদর্শক হতে গেলে দরকার সাহস । একজন হতদরিদ্র গ্রাহিকা যদি ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পে যোগদান করে সাফল্য দেখাতে পারেন তবেই তিনি তার প্রতিবেশীর মনে সাহস সঞ্চার করতে পারেন। একবার কাজটা পরিচিত হয়ে গেলে পরবর্তীতে যাঁরা এতে যোগ দেবেন তাঁদের কখনও মনে হবে না যে তাঁরা সম্পূর্ণ অজানা পথে যাত্রা করার ঝুঁকি নিচ্ছেন।

* * *

দল গঠন ও ঋণের ব্যাপারে উদ্যোগের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর আমরা খুব জোর দিয়ে থাকি। সদস্যদের সচেতনতা ও নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা তৈরির প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবার পর ঋণ দান শুরু করা উচিত, কখনও তার আগে নয়।

ব্যাংকের সমস্ত কার্যপদ্ধতি বিস্তারিত জেনে একটি দল তৈরি হতে সময় নেয় কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস। দলের সদস্যরা আমাদের নিয়ম কানুন জানার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণ পাবার পর দলটি যোগ্য হয়ে উঠলে একমাসব্যাপী সাপ্তাহিক সভা করে যান তাঁরা।

তারপর আসবে ঋণের আবেদন জানাবার সময়টি। সাধারণত প্রথম ঋণ হিসেবে একজন সদস্য ৫০০-৭০০ টাকা ঋণের চাহিদা দেন। এর চেয়ে বেশি অঙ্কের টাকা চাওয়ার কথা তিনি সুদূর কল্পনাতেও আনতে পারে না। এই পরিমাণ টাকা তার কাছে বিরাট অঙ্কের টাকা। সব প্রস্তুতির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যখন তাঁর ঋণ নেবার সময় আসে তখন তিনি আনন্দ ও উত্তেজনায় ছটফট করে থাকেন? না, তা মোটেই করেন না। বরং তাঁর প্রতিক্রিয়া হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি অসম্ভব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, শঙ্কিত হয়ে পড়েন। নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে তাঁর বিনিদ্র রজনী কেটে যায়। ঋণ নেবার পথে পা বাড়ানোর কাজটা ঠিক হল নাকি ভুল হল এই নিয়ে সংশয়ে ও দ্বিধায় তিনি সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেন না।

কীসের এত ভয় তাঁর?

ধার শোধ দিতে পারবেন কিনা এই নিয়ে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা। ঋণ শোধ করতে না-পারলে তাঁকে সবার ধিক্কার সহ্য করতে হবে। তা ছাড়া অজানা, অচেনা পথে পা ফেলার অনিশ্চয়তা ঘিরে সংশয় ও শঙ্কা জাগে প্রতি মুহূর্তে।

বিনিদ্র রাত গড়িয়ে ভোর হয়। উঠেই তিনি প্রায় স্থির করে ফেলেন এই চাপ তিনি সহ্য করতে পারবেন না। ঋণ মাত্র ৭০০ টাকা হলেও তা শোধ দেবার দায়িত্ব তাঁর কাছে বিরাট বোঝার সমান। কোনওকালে শোধ দিতে পারবেন কিনা এই নিয়েও তাঁর ঘোরতর সন্দেহ। তাঁর আগে তাঁর পরিবারের কোনও নারী এরকম দুঃসাহসিক কাজে নামেননি।

তাঁর বন্ধুরা তাঁর পাশে দাঁড়ান তখন। সাহস দেন। বলেন—'তুই কি একা? আমরা তো সবাই আছি। আমরা তো তোকে একা ফেলে পালাব না। শুধু শুধু ভয় পাস না। আমরা সবাই তোর সঙ্গে আছি।'

এই সব দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়ের মুহূর্ত কাটিয়ে সেই চরম সময় এসে পড়ে। মাত্র ৭০০ টাকা

www.pathagar.com

ঋণ নেবার সময় প্রকৃতপক্ষে তাঁর হাত কাঁপতে থাকে। টাকা যেন তার হাতের আঙুলগুলি জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। জীবনে যে পরিমাণ টাকা তিনি কখনও চোখে দেখেনি এখন সে পরিমাণ টাকা তাঁর হাতের মুঠোয়। দুচোখে তাঁর পানি নেমে আসে। টাকা যেন সদ্যোজাত পাখির ছানা। অতি সাবধানে, অতি সযতনে তা মুঠোয় ধরেই থাকেন সম্মোহিতের মতো। চমক ভাঙে তখনই, যখন কেউ তাঁকে সতর্ক করে দেয় যে ওভাবে টাকা ধরে থাকলে খোওয়া যেতে পারে।

এত টাকার অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ভাবতে ভাবতে গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহিকার জন্ম হয়।

তিনি সারাজীবন শুনে এসেছেন তিনি অপদার্থ, মেয়ে হয়ে জন্মে পরিবারে শুধুই দুঃখ বয়ে এনেছেন। মেয়ে মানেই বিবাহের পণের টাকা জোগাড়ের অক্ষমতা। মা বাবা পর্যন্ত প্রায়ই বলে আঁতুড়েই তাকে না খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল। ক্রমাগত নিজের সম্বন্ধে খারাপ ভাবতে ভাবতে তিনি পৃথিবীতে নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাবতে শুরু করেন। এতকাল পরিবারের কাছে আরও একটি ক্ষুধার্ত মুখ কিংবা যৌতুকের বিশাল বোঝা ছাড়া আর কোনও পরিচয় তাঁর ছিল না।

জীবনে প্রথম এক প্রতিষ্ঠান তাঁকে ঋণ দিয়ে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দান করল। তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন। এই বিশ্বাসের মর্যাদা তাঁকে রাখতেই হবে। প্রতিটি পাইপয়সা কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দেবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করবেন মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন এবং সত্যি সত্যি তিনি তা করে দেখান।

* * *

প্রাথমিক পর্যায়ে দলের শুধু দু'জন সদস্যকে ঋণ দেওয়া হয়। এই দু'জন নিয়মিত ভাবে ছ' সপ্তাহ ধরে ধার শোধ করলে পরবর্তী দু'জন গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হন। সেই দলের নেতা হবেন পঞ্চম ঋণগ্রহীতা। তিনি সবার শেষে ঋণ পাবেন।

গ্রহীতা যখন প্রথমবার কিস্তি শোধ করেন তখন নিজের মধ্যে বিরাট উত্তেজনা অনুভব করেন। কারণ তিনি নিজের কাছে প্রথমবারের মতো প্রমাণ করলেন যে তিনি উপার্জন করতে পারেন এবং নিজের আয়ের টাকা দিয়ে ঋণ শোধ করতে পারেন। ধীরে ধীরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কিস্তিও শোধ করতে থাকেন। নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা আবিষ্কারের নেশায় তিনি তখন মাতোয়ারা। এ যেন এক সংক্রামক রোগ। তাঁর সঙ্গে যারাই কথা বলে তাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। এতদিন নিজের সম্বন্ধে যা শুনে এসেছেন তা সবই ভুল। আশ্চর্য। তাঁর নিজের ভিতর এত ক্ষমতা আছে তিনি নিজেই কোনওদিন টের পাননি।

গ্রামীণ ব্যাংক শুধু নগদ টাকাই ঋণ দেয় না। নিজেকে অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের পথের সন্ধানও দেয়। গ্রাহিকা তাঁর সৃজনশীলতা, কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে সচেতন হন।

গ্রামীণ ব্যাংকের ২০ লক্ষ গ্রাহকের প্রত্যেকেরই আত্ম-অনুসন্ধানের কাহিনী খুবই বিস্ময়কর ও রোমাঞ্চকর।

* * *

দুর্যোগের কারণে কারওর ধার শোধে অসুবিধা হতে পারে ভেবে আমরা একটা আপদকালীন তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

www.pathagar.com

স্থির হল প্রতিটি ঋণের টাকার ৫ শতাংশ একটি দলগত তহবিলে জমা রাখা হবে। এ ছাড়া প্রতিটি সদস্যকে প্রতি সপ্তাহে এই তহবিলে এক টাকা করে জমা রাখার নিয়ম বেঁধে দেয়া হল। একজনের কিস্তি বাকি পড়লে সেই দলের অন্য সদস্যরা ঋণ পাবেন না। এটাই নিয়ম। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, কোনও কারণে কারওর কিস্তি বাকি পড়লে, দলের আর সবাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসে। পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করে অনাদায়ের কারণ খুঁজে বার করে। নিজেরাই সমাধানের পথ বাতলে দেয়। যাতে ভবিষ্যতে এরকম বাকি না পড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়।

আটটি গ্রুপ নিয়ে এক-একটা কেন্দ্র গঠন করা হল। এইভাবে দলগঠনের ফলে গ্রাহকদের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা জন্মায়। নিজেকে সাহায্য করার দক্ষতা অর্জিত হয়। সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে কেন্দ্রবৈঠক হয়। সঙ্গে আলোচনায় বসে। সকালবেলায় সভার আয়োজন করা হয়। এতে সারাদিনের কাজের ক্ষতি হয় না। এই সভায় সদস্যরা ঋণশোধ করেন, সঞ্চয় হিসেবে টাকা জমা রাখেন, নতুন ঋণ মঞ্জুর করার আবেদন জানান ও কোনও জরুরি সমস্যার উপর আলোকপাত করেন।

কোনও সদস্য যদি ঋণ পরিশোধে সমস্যার সম্মুখীন হন তবে কেন্দ্র তাঁকে সমাধান অনুসন্ধানের পথ দেখায়।

টাকার লেনদেন, ঋণ বা অন্য সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা সবই হয় খোলাখুলি ভাবে সবার উপস্থিতিতে। এতে ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সদস্যদের দায়িত্ববোধও কায়েম হয়। প্রতি দলে একজন গ্রুপ চেয়ারম্যান ও একজন সম্পাদক নির্বাচিত হন। কেন্দ্রের জন্য একজন কেন্দ্র প্রধান ও সহকারী কেন্দ্র প্রধান থাকেন। তাঁরা এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন। পরের বছর তাঁরা পুনঃনির্বাচিত হতে পারেন না।

দলের আত্মনির্ভরতা, শক্তিশালী সঞ্চয় কর্মসূচি, ব্যাংককর্মীর দায়িত্ব কমিয়ে দলের দায়িত্ব বাড়ানো সব কিছুর উপর জোর দেয়া হল। গ্রুপ করেও দলের যৌথ আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সহায়ক হবে এটাই আশা করলাম।

www.pathagar.com

১৪
ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি : নতুন পৃথিবীর সন্ধানে

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যপ্রণালী আমরা যতদূর সম্ভব সরল রাখার চেষ্টা করেছি। আমাদের ঋণশোধের নিয়মাবলি এতই সহজ যে গ্রাহকদের বুঝতে কোনও অসুবিধাই হয় না।

—এক বছরের জন্য ঋণ।

—সমান অংকের সাপ্তাহিক কিস্তি।

—ঋণদানের এক সপ্তাহ পরেই ঋণশোধের প্রথম কিস্তি শুরু হয়।

—সুদের হার ২০ শতাংশ। ১০০০ টাকা ঋণ নিয়ে এক বছরে পরিশোধ করে দিলে মোট দিতে হয় ১১০০ টাকা—অর্থাৎ অতিরিক্ত দিতে হয় মাত্র ১০০ টাকা।

—ঋণশোধের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে সাপ্তাহিক দুই শতাংশ হারে ৫০ সপ্তাহ।

—এক হাজার টাকা ঋণের জন্য প্রতি সপ্তাহে ২ টাকা করে সুদ দিতে হবে।

আমরা পরিষ্কার বুঝেছিলাম গ্রামীণ ব্যাংক-কে কাজ চালিয়ে যেতে গেলে গ্রাহকদের উপর আস্থা রাখা ছাড়া উপায় নেই।

প্রথম দিনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে আমাদের কর্মপদ্ধতিতে কোনও শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে তা নিজেরাই সংশোধন করব। কোনও সময় পুলিশ বা আদালতের সাহায্য নেব না।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল ঋণশোধের জন্য আমাদের কখনও আইনের দ্বারস্থ হতে হয়নি। আমরা মনস্থির করে নিয়েছিলাম যে হয় আমরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান বের করতে পারব—অর্থাৎ থানা পুলিশ বা আদালতের কাছে যাব না, অথবা যদি এটা না-পারি তবে ঋণ কর্মসূচি পরিচালনার কাজ থেকে বিদায় নিয়ে নেব। আমরা নিজেরাই সমস্যার সমাধান করে যাই—এ ব্যবসা ছেড়ে আমাদের অন্য কোনও ব্যবসাতে কখনও যেতে হয়নি।

আমাদের ভুললে চলবে না এটাই আমাদের কাজ। ঋণশোধ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে পরনির্ভরশীলতার প্রশ্ন ওঠে না।

গ্রাহক ও ঋণদাতার মাঝে আমরা কোনও আইনি দলিল রাখিনি। দলিল দস্তাবেজ নিয়ে আমাদের কারবার নয়। আমাদের সম্পর্ক মানুষের অন্তরের সঙ্গে। সেই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য বা ব্যর্থতার মাপকাঠি হল গ্রাহকদের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের দৃঢ়তা। মানুষের উপর আমাদের আস্থা অসীম। ফলে আমরাও মানুষের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছি।

'ক্রেডিট' শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'বিশ্বাস'। অথচ আশ্চর্যের কথা হল সনাতন ব্যাংকিং-এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতার উপর।

সনাতন ব্যাংকগুলির ভাব এমন, যেন গ্রহীতা ঋণের টাকা নিয়ে এক্ষুনি চম্পট দেবে। তাই তাদের যতভাবে সম্ভব আইনের দলিলের বাঁধনে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করা হয়।

www.pathagar.com

গ্রহীতার পালিয়ে যাবার সব পথ বন্ধ করার জন্য আইনজীবীরা সেই দলিলে কোনওরকম ফাঁকফোকর রাখতে চান না।

আমাদের কোনও ব্যাংককর্মীর টাকা ছিনতাই হয়ে গেলে (তা অবশ্য খুবই বিরল ঘটনা) গ্রামের অন্য গ্রাহকরা অসম্ভব তৎপর হয়ে ওঠে। তারাই ছিনতাইকারীর পিছু ধাওয়া করে এবং তাদের ধরে ফেলে। যে-কোনও সম্মিলিত প্রচেষ্টার শক্তি অসীম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক কিন্তু বিশ্বাস করে তার প্রতিটি গ্রাহকই সৎ। কার্যপ্রণালী অতিরিক্ত সরল বলে আমাদের অভিযুক্ত করা হয়। অগুন্তি দলিলে লেখালিখি করে আমরা বৃথা সময় অপচয় করি না। ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসের যথার্থতাই প্রমাণিত হয়।

আমাদের অনাদায়ি ঋণের হার মাত্র এক শতাংশ। ব্যর্থ গ্রাহককে আমরা কখনও অসৎ বা মন্দ মানুষ বলে চিহ্নিত করি না। ওই সামান্য ঋণটুকু শোধ করতে পারেনি, তাহলে কতই না অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন বেচারা। তিনি বরং আমাদের আন্তরিক সহানুভূতির দাবিদার। সেই হতভাগ্যদের জন্য উকিল ডেকে একগাদা কাগজে সই করাবার কোনও দরকার নেই আমাদের। এই ব্যবসা চালাবার খরচের মধ্যে ধরে নেওয়া হয় ০.৫ শতাংশ অশোধিত ধারের টাকা। যে-কোনও ব্যাংকের জন্যই এই পরিমাণ অপরিশোধকৃত টাকাকে সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে ধরা যাবে।

* * *

আমি প্রথমেই মন স্থির করেছিলাম যে, ধারশোধের পুরো প্রক্রিয়া একেবারে সরল, সাদাসিধে রাখব।

জোবরা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি ছোট্ট পানের দোকানদারের সঙ্গে আমি একটা বন্দোবস্ত করলাম। মালিক ছোটখাটো চেহারার হাসিখুশি মানুষ। প্রায়দিনই দাড়ি কামান না। দিনরাত তাঁর দোকান খোলা। গ্রামের প্রতিটি খবর তাঁর নখদর্পণে। স্বাভাবিকভাবে সবারই পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ তিনি। আমি তাঁর দোকানকে আমার ঋণশোধের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেবার প্রস্তাব দিলাম। সব কিছু বুঝে নেবার পর তিনি রাজি হয়ে গেলেন। এর জন্যে তিনি কোনও পারিশ্রমিক চাননি।

আমি গ্রাহকদের জানালাম—

"প্রতিদিনের চলার পথে কিস্তির টাকা পান দোকানির কাছে জমা রাখবেন। তার সঙ্গে আপনাদের রোজই দেখাসাক্ষাৎ হয়। আপনাদেরও এতে সুবিধা হবে।"

কিন্তু এই পরীক্ষামূলক বন্দোবস্ত স্থায়ী হল না। শীঘ্রই গ্রাহকদের কাছ থেকে অনুযোগ আসতে লাগল যে তারা দৈনিক কিস্তির টাকা জমা করা সত্ত্বেও পানওয়ালা তা অস্বীকার করছে।

কেউ বলেন, "সেদিন দুপুরবেলা তোমার দোকানে এসে পান কিনলাম। পাঁচ টাকা তোমাকে দিলাম। তুমি টাকা ফেরত দিতে গেলে বললাম বাকিটা আমার কিস্তির টাকা, মনে পড়ছে না?"

"না। তুমি আমাকে কখনও পাঁচ টাকা দাওনি।"

"আমার স্পষ্ট মনে আছে। আশ্চর্য তো। আলবত দিয়েছি।"

"না। তুমি আমাকে একটি বড় নোট দিয়েছিলে। আমি তোমায় বাকিটা পুরোপুরি ফেরত দিয়েছি।"

www.pathagar.com

তর্কাতর্কি চলতেই থাকে। হায় আল্লাহ্! এ তো দেখি পাগলের কারবার। একটা সহজ উপায় খুঁজে বার করতে হবে। একটা নোট বই কিনে এনে দিলাম দোকানিকে। তিনটে কলম করে বাঁদিকের সারিতে গ্রাহকদের নাম, মাঝের সারিতে কিস্তির পরিমাণ ও ডানদিকে জমা দেবার তারিখ লিখবার নির্দেশ দিলাম

গ্রাহকের নাম   কিস্তির পরিমাণ   তারিখ (কিস্তি নং ১, ২, ৩ ইত্যাদি)

এবার দোকানির পক্ষে কাজটা খুবই সহজ হবে। কেউ কিস্তির টাকা শোধ দিতে এলে তাকে শুধু একটা চিহ্ন দিতে হবে নির্দিষ্ট কলমে।

কিছুদিন পর এই ব্যবস্থাও কার্যকরী থাকল না। গ্রাহকেরা অভিযোগ করতে লাগল পানওয়ালা দাগ মারতে ভুলে যাচ্ছে বা ভুল নামে দাগ মারছে।

আমরা বুঝতে পারলাম এই উপায়ে ঋণশোধ পদ্ধতি যতই সহজ হোক না কেন কার্যক্ষেত্রে তা ব্যর্থ। তা থাকার চেয়ে না-থাকা ভাল। জমা-খরচের হিসেব রাখার জন্য আমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। কিন্তু আকাশ পাতাল ভেবেও তা ঠিক করতে পারলাম না। কিন্তু সব সময় আমি বিশ্বাস করে এসেছি যে, সকল সমস্যারই অনেকগুলি সমাধান থাকে। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম উপায়টি বেছে নিতে হবে।

অতএব আমি দৈনিক কিস্তি শোধ দেবার ব্যবস্থা তুলে দিলাম। সাপ্তাহিক টাকা জমা দেওয়ার বন্দোবস্ত বলবৎ করা হল। এটাই মনে হল সবচেয়ে ভাল উপায়।

আজও, ২৩ বছর পরে আমাদের ঋণশোধের ব্যবস্থার আর কোনও পরিবর্তন হয়নি। সাপ্তাহিক বন্দোবস্তই বজায় আছে। শুধু তাই নয়, সারা দুনিয়া জুড়ে এই ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটাই গ্রামীণ ব্যাংকের মস্ত বড় অবদান।

আমাদের পরিশোধের হার সর্বদাই ছিল সন্তোষজনক। পরিশোধের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য সকলেরই বিস্ময় উদ্রেক করত।

বাংলাদেশের ধনী ব্যক্তিদের অভ্যাস হয়ে গেছে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের তোয়াক্কা না করা। ব্যাংকিং-এর নামে এখানে যে প্রহসন চলে তাতে আমি অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের গচ্ছিত ধন, সরকারি ব্যাংকের মারফত বেসরকারি ব্যাংকের হাত ঘুরে পৌঁছে যায় তাদের কাছেই যারা কোনওদিনই এই ঋণ শোধ করবে না।

এর প্রতিকারের উপায় কী? এর রহস্যই বা কী? টাকা একটা আঠালো বস্তু। যখন যেখানে যায় সেখানে সেঁটে থাকার অভ্যাস তার। এই টাকাকে সাঁটানো জায়গা থেকে আলগা করে আনার জন্য প্রচণ্ড বিকর্ষণ শক্তির প্রয়োজন।

ধার নেবার ছয় মাস বা এক বছর পর তা পরিশোধের সময় উপস্থিত হলে, পকেটে প্রচুর অর্থ নিয়েও মানুষ এই বিশাল অঙ্কের অর্থ ফেরত দিতে ইতস্তত করে। টাকার মতো মধুর সম্পদের সঙ্গে বিচ্ছেদ কি এত সহজ?

গ্রহীতাগণ ঋণ ফেরত না-দেবার হাজার অছিলা খুঁজে বের করেন। মানসিক এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এসে পড়ে—"আমার হাতে টাকা রয়েছে। ঋণ পরিশোধ আমার কর্তব্য। তবুও ফেরত না-দেবার সুযোগের অপেক্ষায় আমি বসে থাকব।" আশ্চর্যের বিষয় সমাজ যেন এরকম সুযোগ দেবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের মানুষ আশা করে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসলে সর্বপ্রথম সবার বকেয়া ঋণ মকুব করে দেবে। আদতে রাজনীতিবিদগণ তাদের নির্বাচন প্রচার অভিযানে সর্বদাই এমন আশ্বাস দিয়ে থাকেন—"আমাদের ভোট দিলে আপনাদের বকেয়া সব দেনা আমরা মাপ করে দেব।" এক দল এই প্রতিশ্রুতি দিলে, অন্য দলও সেই ভরসাই দিতে থাকে।

www.pathagar.com

অতএব গ্রহীতা নিশ্চিত থাকেন, যে-দলই ক্ষমতায় আসুক, তাঁদের আর ঋণ পরিশোধের দায় থাকবে না। গ্রহীতারা আগামী নির্বাচনের দিকে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে থাকেন, যাতে তাঁদের ঋণের বোঝা লাঘব হবার উপায় আসন্ন হয়।

এর মোকাবিলার উপায় কী?

ঋণগ্রহীতা কীভাবে চিন্তা করে এটা বুঝা এক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতেই আমি ঠিক করলাম ঋণকে কিস্তিতে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করব। এবং কিস্তিগুলি এত ছোট করব যে কিস্তির পরিমাণ টাকা বের করতে মনে কষ্ট লাগবে না। মানসিক বাধা অতিক্রম করার এটাই হবে শ্রেষ্ঠ উপায়।

গ্রহীতাদের দৈনিক কিস্তিতে ঋণ শোধের ব্যবস্থা করলাম। সুতরাং তাঁদের এমন ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে যাতে তাৎক্ষণিক উপার্জনের সুযোগ থাকে। যেমন গোরু কেনা, যাতে করে প্রতিদিনই দুধ বেচে অর্থ উপার্জন করা যায়। রিকশা কেনা যা তাঁদের প্রতিদিনের অর্থাগমের উপায় হবে। কাপড় কেনা, যা দিয়ে তাঁরা পোশাক বানাতে পারবেন, সাধারণ চুড়ি, যা তিনি নকশা করে আকর্ষণীয় গহনায় রূপান্তরিত করতে পারবেন।

নিজের শ্রম ও ঋণের পুঁজি এই দু'টি একত্র করে এমন উপার্জন সৃষ্টি করবেন ঋণগ্রহীতা যার মাধ্যমে কিস্তির টাকাও আসবে আর নিজের চলারও টাকা আসবে।

* * *

আগেই বলেছি গোড়ার দিকে যখন মাত্র ১০-১৫ জন গ্রাহক নিয়ে কারবার শুরু করেছিলাম প্রতিদিনই কিস্তি জমা নেওয়া হত। গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থায় নানা ঝঞ্ঝাট দেখা দিল।

তখনই আমরা সাপ্তাহিক কিস্তির নিয়ম চালু করি।

মনোবল অর্জনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আত্মবিশ্বাস। পর পর তিনমাস ঠিকঠাক সাপ্তাহিক কিস্তি শোধ করলে গ্রাহকরা অনেকটা নিশ্চিত বোধ করেন কারণ এতে ঋণের এক চতুর্থাংশ শোধ হয়ে যায়। বাকি থাকে তিন চতুর্থাংশ। অর্ধেক শোধ হলে গ্রাহক আরও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। আর তো মাত্র অর্ধেক বাকি রইল বলে তাঁদের মনের উপর থেকে বিরাট গুরুভার নেমে যায়। এতে আরও অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়। নিজেদের ক্ষমতার সম্বন্ধে আস্থাবান হওয়া যায়। এক বছরের মধ্যে সুদ আসল পুরোটাই শোধ হয়ে যায়। অল্প টাকা শোধ করতে গ্রাহকদের কোনও অসুবিধাই হয় না। ঋণ শোধের পর পরম স্বস্তি অনুভব করেন সকলে।

এইভাবে ধাপে ধাপে সদস্যদের আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে। কিস্তির ব্যাপারটা ব্যবহারিক দিক দিয়েই খুবই বাস্তবসম্মত। কারণ মোটা অঙ্কের টাকা একসঙ্গে শোধ দেওয়া খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। একবারে অনেক টাকা হাতে জমা হলে পরিবারের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে খরচ করার একটা প্রচণ্ড চাপ ও ইচ্ছা মনে জাগে। কিন্তু ঋণশোধের জন্য প্রতিদিন সামান্য ক'টা টাকা ব্যয় করতে কোনওই অসুবিধা নেই। এতে মনে কষ্ট হয় না।

একবারে অনেক টাকা শোধের চেয়ে অল্প অল্প করে ক্রমে ক্রমে শোধ করার পদ্ধতি গ্রাহকদের পক্ষে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। এর ফলে অযথা দুশ্চিন্তা করে দুঃসহ জীবনযাপনের হাত থেকে তারা অব্যাহতি পায়।

যদি কোনও গ্রাহকের শোধ দেবার প্রতিকূল কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা তৎক্ষণাৎ আমাদের কর্ণগোচর হয়। আমরা সেই অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তক্ষুনি পরিস্থিতির

www.pathagar.com

মোকাবিলা করা উচিত। দীর্ঘদিন অনাদায়ি সমস্যা ফেলে রাখলে গ্রহীতার হদিশ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ততদিনে তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টাও বিফল হয়।

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের লেনদেন ব্যবস্থা মানুষের উপকারে যেমন আসে, তেমন মানুষের মানসিক শক্তি ও উৎসাহ বৃদ্ধিতে এর অবদান অসীম। ঋণ শোধ দেবার ক্ষমতা অর্জন, যা আপাতদৃষ্টিতে তাদের কাছে প্রথমে অসম্ভব মনে হয়েছিল, আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

* * *

প্রথম থেকেই আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল ধৈর্য, উদ্ভাবনী শক্তি, ধীর অথচ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, ভুলভ্রান্তির সঠিক নির্ধারণ ও তা শুধরে নেবার ইচ্ছা ও দক্ষতা।

একেবারে প্রথম থেকে একটি ব্যাপারে আমি জোর দিয়েছিলাম। ঋণগ্রহীতা ঋণ নিয়ে সেটা কী কাজে ব্যবহার করবেন সেটা স্থির করার পুরোপুরি স্বাধীনতা তাঁর থাকবে। কার জীবিকা অর্জনের উপায় কী সেটা তাঁদেরই ভাল জানা থাকবে। বন্ধু ও দলের অন্য সদস্যদের উপদেশ নিয়ে তাঁরাই সবচেয়ে ভাল জীবিকা নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন।

প্রথম বছর থেকেই আমরা প্রতিটি শাখার কেন্দ্র প্রধানদের নিয়ে বার্ষিক কর্মশালার প্রবর্তন করেছিলাম। এই সপ্তাহব্যাপী কর্মশালায় ঋণগ্রহীতাদের সমস্যার পর্যালোচনা, অগ্রগতি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচন ও নানা আর্থসামাজিক সংকটের উপর আলোকপাত করা হয়। এইসব নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনই এই জাতীয় আয়োজনের উদ্দেশ্য।

এর ফলও হল সন্তোষজনক। ঋণগ্রহীতারা তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করতে সক্ষম হলেন। আমরাও সদস্যদের জীবনযাত্রা ও দুশ্চিন্তার কারণ সম্বন্ধে অবহিত হতে থাকলাম।

দ্বিতীয় বছর বিভিন্ন শাখা থেকে কয়েকজন নির্বাচিত কেন্দ্র প্রধানকে নিয়ে জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হল। এর লক্ষ্য ছিল আরও প্রসারিত। আরও বেশি সংখ্যক দলের সঙ্গে মতামত বিনিময় ও আলোচনার সুযোগ ঘটল এই কর্মশিবিরে।

প্রথম জাতীয় কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে টাঙ্গাইলে। বিভিন্ন আলোচনা থেকে উদ্ভূত চারটি সিদ্ধান্তের একটি তালিকা প্রস্তুত করলাম। প্রত্যেক যোগদানকারীকে একটা করে সিদ্ধান্তসমূহের তালিকা দেওয়া হল।

আমরা এই তালিকাটি অনেকটা কর্মশালার কার্যবিবরণী মনে করে প্রচার করেছিলাম। এর থেকে বৃহত্তর কিছু আশা করিনি। কিন্তু পরে আশ্চর্য হতে থাকলাম যখন সকল শাখা থেকে এই তালিকার আরও অনেক অনুলিপি চেয়ে অনুরোধ আসতে আরম্ভ করল।

১৯৮২ সালে আমাদের দ্বিতীয় কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হল। আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণার আগে একটি তালিকা প্রস্তুত হল—এতে আগের চারটি সহ দশটি সিদ্ধান্ত তালিকাভুক্ত করা হল। এই দশটি সিদ্ধান্ত গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিটি কেন্দ্রে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করল।

১৯৮৪ সালের সম্মেলনে সিদ্ধান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ষোলো। সে বছর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জয়দেবপুরে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রায় ১০০টি কেন্দ্রের প্রধান এতে যোগ দেন।

আমরা কল্পনাও করতে পারিনি এই সিদ্ধান্তগুলি আমাদের সদস্যদের মনের গভীরে এতখানি দাগ কাটতে পারবে। আজ যে-কোনও স্থানে, যে-কোনও শাখায় আমাদের সদস্যরা এই ষোলোটি সিদ্ধান্ত মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে গর্বিত বোধ করেন। যাঁরা গ্রামীণ ব্যাংকের

www.pathagar.com

শাখা সফর করতে আসেন তাঁদের জানান এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনগুলি তাঁরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। যেগুলি পারেননি তার জন্য নিজেদের দোষারোপ করেন। আন্তরিকভাবে সেগুলি বাস্তবায়ন করার আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন।

এখনও আমরা জাতীয় কর্মশালা করি। কিন্তু প্রত্যেক কর্মশালায় আমরা অংশগ্রহণকারীদের কাছে অনুরোধ রাখি সিদ্ধান্তের সংখ্যা যেন আর বাড়ানো না-হয়। যেগুলি নিয়েছি সেগুলি সফলভাবে বাস্তবায়ন করার পর আমরা নতুন সিদ্ধান্তের দিকে যাব, এখন আর নয়।

এই ষোলোটি সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহিত আছে গ্রামীণ ব্যাংক-কে সদস্যদের জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য। এগুলি গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকদের জীবনের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

ষোলোটি সিদ্ধান্ত হল—

(১) শৃঙ্খলা, একতা, সাহস পরিশ্রম—গ্রামীণ ব্যাংকের এই চারনীতি কেন্দ্রের সদস্যের মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি কাজে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলব।

(২) আমরা সংসারের উন্নতি আনবই আনব।

(৩) ভাঙা ঘরে থাকব না। ভাঙা ঘর মেরামত করব। যত তাড়াতাড়ি পারি ভাল দেখে নতুন ঘর বানাব।

(৪) সারা বছর আমরা শাক-সবজি আবাদ করব। নিজেরা খাব। বিক্রি করে আয় বাড়াব।

(৫) চারা লাগানোর মৌসুমে যত পারি চারা লাগাব।

(৬) পরিবার ছোট রাখব। খরচ কমাব। স্বাস্থ্য ভাল রাখব।

(৭) কেন্দ্রের সকল সদস্যের ছেলে-মেয়েদের অবশ্যই পড়াশোনার ব্যবস্থা করব। ছেলে-মেয়েরা যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ পড়াশোনার খরচ চালাতে পারে সেজন্য তাদের আয়ের ব্যবস্থা করে দেব।

(৮) ছেলে-মেয়ে, বাড়ি-ঘর সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব।

(৯) গর্ত করে পায়খানা বানাব।

(১০) টিপকলের পানি খাব। টিপকল না থাকলে পানি সেদ্ধ করে খাব।

(১১) ছেলের-মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেব না, যৌতুক নেব না। কেন্দ্রকে যৌতুকের রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করব। কম বয়সে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেব না।

(১২) নিজে অন্যায় করব না, অন্যকেও অন্যায় করতে দেব না।

(১৩) বেশি আয়ের জন্য সবাই মিলে যৌথ উদ্যোগে বড় কাজে হাত দেব।

(১৪) একে অন্যের সাহায্য করব। কেন্দ্রের কেউ কোনও বিপদে পড়লে সবাই মিলে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করব।

(১৫) কোনও কেন্দ্রে কোনওরকম বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া গেলে সবাই মিলে গিয়ে সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনব।

(১৬) কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যায়াম চালু করব। সকল সামাজিক কাজ একসঙ্গে করব।

* * *

শুরুতে গ্রামীণ ব্যাংক একটি ঘনিষ্ঠ পরিবারের মতো ছিল। আজ ২২ বছর পর, ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে, আমাদের ১২ হাজারেরও বেশি কর্মী আছে। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা আগের মতো সম্ভব হয় না। আমাদের ১১১২ টি শাখা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। প্রতি সপ্তাহে কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তেইশ লক্ষের বেশি গ্রাহকের সঙ্গে সামনাসামনি বসে

www.pathagar.com

ব্যাংকের কাজকর্ম সমাধান করে। আমরা প্রতি মাসে মোট দেড়শো কোটি টাকা ঋণ দান করি। প্রায় একই অঙ্কের টাকা প্রতি মাসে ঋণ শোধের মাধ্যমে আমাদের কাছে জমা পড়ে।

আমার কিছু সহকর্মী গ্রামীণ ব্যাংকের পুরোনো দিনের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার কথা ভেবে স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েন। কিন্তু আমার বিশ্বাস সাফল্যের জন্য এই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার সম্প্রসারণ অবশ্যই প্রয়োজন ছিল।

* * *

গ্রামীণ ব্যাংকের কলেবর বৃদ্ধি হলেও তা এখনও সারা পৃথিবী, এমনকী বাংলাদেশের প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

ঋণ প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করে গ্রাহকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গঠনের উপর। এই ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে কীভাবে ঋণগ্রহীতাদের মানবিক শক্তি সমূহকে বিকশিত করার আয়োজন করাই হল প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা।

গ্রামীণ ব্যাংক যত বড়ই হোক আমরা যেন কখনও ব্যাংক ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং মানবিক অনুভূতিগুলি হারিয়ে না-ফেলি।

www.pathagar.com

১৫
প্রথাগত ব্যাংকগুলির সঙ্গে তুলনা

এখন আমাকে প্রায়ই অনেকে প্রশ্ন করেন "কী ভাবে আপনার মনে এসব নতুন ধারণা জন্মাল? আপনার তো ব্যাংকিং-এর প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেই। কীভাবে আপনি গ্রামীণ ব্যাংক গড়ে তুললেন?" উত্তরে আমি বলি, "কাজটা আসলে সোজা করে নিয়েছিলাম। আমি প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির দিকে তাকাতাম, আর সেটার উলটো কাজ করতাম। এর মাধ্যমেই গ্রামীণ ব্যাংক হয়ে গেল।"

তাঁরা হেসে উড়িয়ে দেন। কিন্তু এক দিক দিয়ে বিচার করলে এটাই সত্যি। গ্রামীণ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করলে সত্যিই বোঝা যাবে দু'টি পদ্ধতি কেমন ভিন্নমুখী। লেনদেন করার জন্য সনাতন ব্যাংক তার গ্রাহকদের অফিসে আসতে বলে। যে কোনও চকচকে ফিটফাট অফিসঘর নিরক্ষর গরিব মানুষের মনে ভীতির উদ্রেক করে। ওইরকম স্থানে হাজির হবার চিন্তা তাদের শঙ্কিত করে তোলে। এই বাধা দূর করতে আমরা বদ্ধপরিকর ছিলাম। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম আমরা নিজেরাই গ্রাহকদের কাছে যাব। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রকল্পের প্রধানতম নীতি হিসেবে গ্রহণ করলাম, মানুষকে ব্যাংকে আসতে হবে না, ব্যাংকই মানুষের কাছে যাবে।

জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য এটা কোনও চটকদার কায়দা ছিল না। বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল দেশে মহিলাদের নিয়ে কর্মসূচি গড়ে তুলতে গেলে এ ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। মানুষ ব্যাংকে হাজিরা দেবে এই কানুন প্রথম থেকেই বর্জন করা হল। তার বদলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আমরাই মানুষের কাছে উপস্থিত হব। গ্রামীণ ব্যাংকের কোনও শাখা পরিদর্শনকালে কখনও কেউ মানুষকে কাউন্টারের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে দেখতে পাবেন না। হয় দেখবেন অফিস ঘর ফাঁকা কিংবা দেখবেন গ্রামীণ ব্যাংকের কয়েকজন কর্মী নিজ নিজ কাজ করে চলেছেন।

অতীতে দেওয়ালে নোটিশ ঝুলত—

"কোনও কর্মীকে অফিসে দেখতে পেলেই তাকে গ্রামীণ ব্যাংকের নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে।"

নবনিযুক্ত কর্মীরা এমন নির্দেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রশ্ন তোলেন, "তাহলে আমাদের কোথায় থাকা উচিত?"

আমরা তাদের বলি, "অফিসে তোমাদের আসা চলবে না। গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে কাটাও। চায়ের দোকানে আড্ডা জমাও কিন্তু অফিসকে তোমাদের কাজের জায়গা মনে করা চলবে না।"

কেউ কেউ অভিযোগ করেন, "ব্যাংকের নিরাপত্তার স্বার্থে ও যথাযথ নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে অফিসে আসা খুবই জরুরি।"

www.pathagar.com

আমরা সহজ সমাধান বাতলে দিই, "যে সময় অফিসে কাজ করতে চাও ঠিক সেই নির্দিষ্ট সময়টুকু আমাদের জানাও। ওই সময় অফিসে হাজির থাকলে তোমার মাপ। এ ছাড়া অফিসে সময় কাটালে তোমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চেয়ারে বসে থাকার জন্য নয়, তুমি মাইনে পাও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য।

* * *

গ্রাহকদের কত পরিমাণ যে সম্পদ বা সঞ্চয় আছে তা জানতে আমরা আগ্রহী নই। আমাদের ঋণগ্রহীতা হতে হলে উলটো কাজ করতে হয়। প্রমাণ দিতে হয় তারা সত্যিই কতটা হতদরিদ্র ও সম্বলহীন।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসা করছে তাদের মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি করার জন্য। গ্রামীণ ব্যাংকও মালিকদের কাছে জবাবদিহিতায় আবদ্ধ। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতারা এই ব্যাংকের ৯২ শতাংশ শেয়ারের মালিক। যে-অর্থে গ্রামীণ ব্যাংক একটা সমবায়ের মতো বা সেভিংস অ্যান্ড লোন অ্যাসোসিয়েশনের মতো।

যে-ব্যাংক যত বেশি মুনাফা অর্জন করে মালিককে দেয় সে ব্যাংক তত বেশি সফল বলে গণ্য হয়ে যায়। আমরাও আমাদের মালিকদের লভ্যাংশ দিই।

কিন্তু নগদে না দিয়ে আমরা আমাদের মালিকদের তা অন্যভাবে ফেরত দিয়ে থাকি। তাদের গৃহনির্মাণের জন্য ও উন্নত মানের জীবনযাপনে সহায়তা করা হয়। ভবিষ্যতে মালিকদের আমাদের নগদ লভ্যাংশ দেবার আশা রাখি। কিন্তু এখন লভ্যাংশ নগদে না দিয়ে অন্য সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে দিই। যা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবে তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুদের হার কমিয়ে দিয়েও আমরা প্রত্যক্ষভাবে তাদের উপকারে লাগতে পারি।

গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মোদ্যোগের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষের চাহিদা মিটানো ও মঙ্গলসাধনের উপর জোর দেওয়া। গ্রাহক ও তাঁদের উপর নির্ভরশীল মানুষদের জীবনে ইতিবাচক রূপান্তর ঘটানো আমাদের কর্মপন্থার উদ্দেশ্য।

ঋণ পরিশোধের পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু তা আমাদের সাফল্যের মাপকাঠি নয়। ব্যাংকের নিজস্ব নিয়ম শৃঙ্খলার জন্য এই সব পরিসংখ্যানের হিসেব আমাদের রাখতে হয়। আমাদের গ্রাহকদের অনিশ্চিত, বিপদসংকুল, দুঃখময় জীবনযন্ত্রণা কতটা উপশম হল, তাই নির্ধারণ করে আমাদের সার্থকতা।

শ্রেণীকক্ষে দেয়া প্রশিক্ষণ গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মী-প্রশিক্ষণের সামান্য অংশ মাত্র। মানুষের মধ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যেই আমাদের কর্মীদের প্রকৃত শিক্ষালাভ ঘটে।

গ্রামীণ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রথাগত ব্যাংকের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই রিপোর্টে ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগের সাফল্যের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। এই সব উদ্যোগের কথা মানুষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবে না। অথচ এগুলি আমাদের গ্রাহকদের জীবনে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সূচিত করে— তাঁদের জীবনে এদের ভূমিকা অপরিহার্য। গ্রামীণ ব্যাংকের সাম্প্রতিকতম হিসেবের খতিয়ানের জন্য শেষের পাতাগুলি দেখুন।

গ্রাহক কী ধরনের অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তার উপর গ্রামীণ ব্যাংক কোনও জোর খাটায় না। নানা রকম ঋণের সুযোগ রয়েছে তাঁদের জন্য। বার্ষিক রিপোর্টে ৫০০ টি বিভিন্ন ধরনের কর্মোদ্যোগে দেয়া ঋণের হিসেব দেওয়া আছে। ছবি বাঁধাই থেকে শুরু করে টায়ার সারানো, রকমারি জিনিস তৈরির জন্য আমাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন ঋণগ্রহীতারা। আরও আছে সুগন্ধী, নানা প্রসাধন সামগ্রী, খেলনা, মশারি, চুলের ফিতে, মোমবাতি, জুতো, আচার,

www.pathagar.com

পাউরুটি, লেপ, নৌকা, ঘড়ি, ছাতা, ঠান্ডা পানীয়, মশলা, সর্ষের তেল, বাজি আরও কত কী!

ঋণ মঞ্জুর করার আগে বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের পক্ষ থেকে জামানত চায়। ঋণ দেওয়া হয়ে গেলে গ্রহীতার সঙ্গে আর বিশেষ যোগাযোগ থাকে না। আবার তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় ঋণ অনাদায়ি থাকলে।

প্রতি সপ্তাহে গ্রামীণ ব্যাংকের তরফ থেকে গ্রহীতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা, ঋণ শোধ দেবার সামর্থ্য, ঋণের দ্বারা পারিবারিক উপকারের মূল্যায়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া হয়।

বাণিজ্যিক/প্রথাগত ব্যাংকের ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হয়েছে অবিশ্বাসের ভিত্তিতে। অথচ "ক্রেডিট" শব্দটির অর্থই হল 'বিশ্বাস' বা 'আস্থা'। দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের মূল মন্ত্র আমরা পুনরুদ্ধার করেছি। পারস্পরিক গভীর আস্থার ভিত্তিতে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। গ্রামীণ ব্যাংকের দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কোনও আইনি বন্ধনের অস্তিত্ব নেই।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রাহকরা প্রত্যেকেই দারিদ্রসীমার অনেক উপরের স্তরের বাসিন্দা। আমাদের গ্রাহকরা প্রত্যেকেই আছেন দারিদ্রসীমার নীচে। গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য হল, আমাদের ঋণগ্রহীতাদের ক্রমান্বয়ে দারিদ্রসীমার ওপরে নিয়ে যাওয়া। এর অর্থ হল—

- তাঁর পরিবারের জন্য একটা মজবুত বাসগৃহ,
- একটি স্বাস্থ্যবিধি সম্মত পায়খানা,
- বিশুদ্ধ পানীয় জল
- সপ্তাহে ৩০০ টাকা কিস্তি চালাবার মতো উপার্জনের সংস্থান,
- তাঁর পরিবারে সমস্ত স্কুল পড়ুয়া বয়সের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়াশুনায় থাকা,
- সমগ্র পরিবারের দিনে তিনবার পেটভরে আহার,
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ।

আমাদের গ্রাহকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য আমরা নিজেরা বহু সময় দিই।

মাথার ওপর শক্তপোক্ত চাল সমেত বাড়ি তৈরির জন্য ৪ লক্ষ ২৫ হাজার পরিবারকে গৃহনির্মাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া আরও ১ লক্ষ ৫০ হাজার ঋণগ্রহীতা গ্রামীণ ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের সহায়তায় পরিচালিত বিভিন্ন উদ্যোগ থেকে উপার্জন করে নিজেরাই নিজেদের গৃহনির্মাণে সক্ষম হয়েছে।

শুধু অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন নয়, গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য হল সামাজিক পরিবর্তনের আন্তরিক প্রচেষ্টা। আমাদের সমাজে মহিলারা সর্বদাই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য হন। আমরা চাই তাঁরা যেন নিজেদের ভাগ্য ও পরিবারের উন্নতির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারেন।

* * *

উন্নয়নশীল দেশের ব্যাংকগুলির ঋণশোধের রেকর্ড খুবই হতাশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশের শিল্প ব্যাংক মাত্র ১০ শতাংশ ঋণ ফেরত পায়।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সঙ্গে একবার আমার কথা হচ্ছিল। আমার প্রশ্ন ছিল, "আপনারা নিজেদেরকে 'ব্যাংক' বলে কেন পরিচয় দিচ্ছেন?" তিনি অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার অর্থ?"

"বিগত ১২ বছরে আপনারা প্রদত্ত ঋণের মাত্র ১০ শতাংশ উদ্ধার করতে পেরেছেন। ফেরত পাবার বিন্দুমাত্র আশা না-থাকা সত্ত্বেও কীভাবে যে একটা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যাংক ঋণী

www.pathagar.com

মানুষদের কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়ে যায় এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

তিনি ব্যাখ্যা করলেন, "দেখুন নানা সমস্যার কারণে এরকম হচ্ছে। নিদারুণ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বহু ভাল উদ্যোগ দেউলিয়া হয়ে গেছে। আমাদের মতো দেশে শিল্পোদ্যোগ চালানোই খুব কঠিন।"

"'বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক' এই পরিচিতি মুছে ফেলে আপনারা বরং নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করুন—'ধনীদের জন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান' নামটি মনে হয় আপনাদের জন্য উপযুক্ত হবে।"

তিনি অট্টহাস্য করে উঠলেন। অত সহজে তাঁকে বিবেক দংশন থেকে রেহাই না দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলাম, "পরিশোধের আশা ছাড়াই ধনবান ও সচ্ছলদের দিকে কোটি কোটি দিয়ে দিতে কেমন বোধ হয় আপনাদের? একটু বলে বোঝান তো!"

তিনি স্বীকার করলেন, "একেবারেই স্বস্তি বোধ হয় না।" তাঁর জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, "জামানতের উপর আপনারা এত গুরুত্ব দেন, অথচ তা কোনওভাবেই ব্যাংকের বিনিয়োগকে সুরক্ষিত করে না। এর আসল উদ্দেশ্য গরিব মানুষকে ব্যাংকের ধারে কাছে ঘেঁষতে না দেওয়া।"

খবরের কাগজ মেলে ধরে তাঁকে আমি সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত নামজাদা ধনী ব্যক্তিদের তালিকা দেখালাম যাঁরা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। তাতে প্রায় সমস্ত অভিজাত পরিবারের নাম আছে। তিনিও স্বীকার করলেন। আমি বললাম, "আমার উপর ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্ব পুরোপুরি ছেড়ে দিলে আমি কীভাবে তা পালন করব জানেন?"

"খুব জানি, আপনি সুদক্ষ আইনজ্ঞদের নিযুক্ত করে এদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি এবং ব্যবহারিক অসম্পূর্ণতার জন্য শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না।"

"আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।" আমি বললাম, "আমি পুরো ব্যাপারটা একেবারে সরল করে দেব। হেলিকপ্টারে টাকা বস্তা বোঝাই করে আমি গোটা দেশের উপর চক্কর দেব। ইচ্ছামতো টাকা জানালা দিয়ে নীচে ছুড়ে দেব। তারপর খবরের কাগজে ও রেডিয়োতে বিজ্ঞাপন দেব এই মর্মে যে যাদের উপর শিল্প ব্যাংকের নোট বৃষ্টি হয়েছে তারা যদি সে টাকা নিয়ে থাকেন তো দয়া করে সুদ সমেত অমুক সময়ের মধ্যে ফেরত দিলে বাধিত হব। এও বলতে ভুলব না, এ টাকা যথাযোগ্য কারণে খরচ হলে আমরা খুবই কৃতার্থ হব।"

তিনি আবার জোরে হেসে উঠলেন। আমি কিন্তু ব্যাপারটা লঘু করার সুযোগই দিলাম না।

"আমি বাজি ধরে বলতে পারি এই উপায়ে টাকা বণ্টন করলে ঋণ পরিশোধের হার ১০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পাবে। ব্যাংকের কাছে দাখিলকৃত ঋণ প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করার খাতে টাকার অপব্যয় বন্ধ হবে। কর্মী, প্রযুক্তিবিদ, কারিগর, ঋণদানকারী অফিসার, উকিল সবার বেতন বাবদ অপচয় হবে না। কোনও দলিলপত্র লাগবে না। প্রকৃত অর্থে কোনও খরচই ব্যাংকের হবে না। শুধু হেলিকপ্টারের জ্বালানি ও বিজ্ঞাপনের ব্যয়ভার বহন করতে হবে।"

প্রতিষ্ঠানগুলি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কী ধরনের বিভেদ ও পক্ষপাতমূলক আচরণ করে থাকে তার দৃষ্টান্ত এটি। ঋণ শোধ না করে বাংলাদেশের ধনী সম্প্রদায় স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করল, "আমাদের শিল্পগুলি সবই রুগ্ন। আমরা সেগুলির উন্নতি করতে চাই। দয়া করে আরও টাকা ঋণ দিন।"

ঋণশোধে ব্যর্থ সবাই সরকারের বন্ধুস্থানীয়, আত্মীয়, রাজনৈতিক সমর্থক, অভিজাত মানুষ—এক কথায় সমাজের মেরুদণ্ড। সরকার তাই তাঁদের শাস্তি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত।

www.pathagar.com

১৬
গ্রামীণ প্রকল্প: কৃষি ব্যাংকের পরীক্ষামূলক শাখা

ঋণের মাধ্যমে জোবরার দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনবার প্রচেষ্টাকে আরও বলিষ্ঠ করে তোলার সুযোগ ঘটেছিল একটি জাতীয় ব্যাংকের আন্তরিক সহযোগিতায়। এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে, আমার ঢাকা সফরের সময়।

সম্পূর্ণ ঘটনাচক্রে একবার ওই ব্যাংকে গিয়েছিলাম। হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টার জনাব আনিসুজ্জামান আমার পূর্ব পরিচিত। এই সাক্ষাৎ একেবারেই আচমকা। পরিকল্পনা ছাড়া জীবনে এরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কখনও সখনও ঘটে যায়। ঋণ নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিল ঘটনাটি।

জনাব আনিসুজ্জামান খুব কথা বলেন। স্পষ্টবক্তা। আমাকে দেখেই তিনি আমার সঙ্গে তর্কে লেগে গেলেন। আমাকে ও অন্যান্য শিক্ষাবিদদের আক্রমণ করে লম্বা এক বক্তৃতা দিলেন। তাঁর মতে আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য কিছুই করি না। তাঁর প্রতিটি কথা গায়ে ফোসকা পড়ার মতো। নিঃশব্দে হজম করে যাচ্ছিলাম। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল যখন তিনি বলতে শুরু করলেন, "আপনারা শিক্ষকেরা একেবারে ব্যর্থ। সামাজিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম। আমাদের দেশের ব্যাংকিং পরিকাঠামো পুরোপুরি ভেঙে যেতে বসেছে। সর্বত্র তছরুপ চলছে। গোটা ব্যবস্থা দুর্নীতিতে কর্দমাক্ত। কোটি কোটি টাকা প্রতি বছর ব্যাংক থেকে কীভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে তার হদিশ নেই। ম্যানেজিং ডিরেক্টার হিসেবে তা আমার জানা উচিত। কারও কোনও দায় নেই। আপনাদের মতো পাকা মাথাওয়ালা অধ্যাপকেরাও দায়িত্বজ্ঞানহীন। আপনারা শুধু মোটা মাইনের আরামের চাকরি ও বিলাসবহুল বিদেশ সফর নিয়ে মেতে আছেন। সব্বাই, সব্বাই আপনারা অপদার্থ, বুঝলেন জনাব। এক্কেবারে অকর্মণ্য। এই সমাজের উপর আমি বীতশ্রদ্ধ। সবাই স্বার্থপর, কেউ গরিবের কথা ভাবে না, গরিব দিনকে দিন আরও গরিব হয়ে যাচ্ছে। কেউ তাদের উন্নতির জন্য কিছু করার কথা ভাবে না। আমাদের কৃষিব্যাংকও দেউলিয়া হতে বসেছে। কী কলঙ্কময় দেশ! এদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার—চিরদিনই সমস্যায় ডুবে থাকবে।"

আনিসুজ্জামান সাহেবের থামবার কোনও লক্ষণই নেই, বকেই চলেছেন। তিনি একজন প্রাণচঞ্চল লোক। তাঁর বাক্যবাণ নিক্ষেপের ক্ষমতা অসীম। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলে অবশেষে আমাকে 'অপদার্থ' আখ্যা দিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করলেন। এতক্ষণে আমি কথা বলার সুযোগ পেলাম। "আপনার সব কথা ঠিক। আপনার বক্তব্যে আমার পূর্ণ সায় আছে। আমি খুব খুশি হলাম, কারণ এই মুহূর্তে আমার হাতে একটি প্রস্তাব

www.pathagar.com

আছে, যাতে আপনার উৎসাহ জাগতে পারে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে আমি যে পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালাচ্ছি তার কথা তাঁকে খুলে বললাম। বিনা পারিশ্রমিকে আমার ছাত্ররা খেটে যাচ্ছে। তারা তাদের পড়ার সময় এই কাজে ব্যয় করছে। আর আমি মাঠ পর্যায়ের গবেষণার অনুদান থেকে প্রকল্পের ব্যয় আংশিক বহন করছি। ধার শোধ হচ্ছে। আমাদের গ্রহীতাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন উন্নতির দিকে যাচ্ছে। কিন্তু ছাত্রদের জন্য আমার কষ্ট লাগে। আমার আহ্বানে হাসিমুখে সাড়া দিয়ে তারা এগিয়ে এসেছে। তাদের হাতে যা হোক কিছু দেওয়া উচিত। তা দেয়া তো দূরের কথা, পুরো প্রকল্পের ব্যয়ভারই সুতোয় ঝুলছে। একটি প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা খুবই জরুরি।

তিনি আমার প্রতিটি কথা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। দেখতে পেলাম, শুনতে শুনতে তাঁর সারা মুখ উত্তেজনা ও উৎসাহে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

"জনতা ব্যাংকে আপনার কী অসুবিধা হচ্ছে?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

"প্রতিটি ক্ষুদ্র-ঋণের জামিনদার হবার জন্য তারা আমায় পীড়াপীড়ি করে। আমি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে তিন মাসের জন্য আমেরিকায় গেলেও তাঁরা প্রতিটি আবেদনপত্র ডাক যোগে আমার সই-এর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কতখানি অবাস্তব কাণ্ড ভাবুন।"

তিনি সায় দিয়ে বললেন, "বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?"

ভীষণ আনন্দ হল আমার। আজ অবধি কোনও ব্যাংকারকে কখনও আমি সর্বান্তকরণে আমাদের সমর্থন করতে দেখিনি। আমি তাঁকে বোঝাতে শুরু করলাম।

"জনতা ব্যাংক কোনও আপত্তি তুলতে পারে না। তাদের কোনও বকেয়া পাওনা নেই। প্রতিটি ক্ষুদ্র-ঋণ মঞ্জুর হবার জন্য তাদের ঢাকার হেড অফিসের অনুমতির প্রয়োজন। তাদের অসংখ্য জিজ্ঞাসা থাকে। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত এই নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খল বারংবার পরিক্রমা করতে মাসখানেকের বেশি সময় লেগে যায়। সব মিলিয়ে প্রতিটি ঋণের প্রস্তাব অনুমোদন হতে ২-৩ মাস সময় লাগে। এইভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া খুবই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।"

আনিসুজ্জামান সাহেব আমার সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন। বললেন, "এভাবে চলা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যাপারটা সম্ভব অসম্ভবের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বলুন, কীভাবে আমি আপনার সাহায্যে আসতে পারি।"

"কৃষি ব্যাংকের তরফ থেকে সাহায্য?"

"অবশ্যই।"

আমার হৃদ্স্পন্দন শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি স্বস্তির হাসি হাসলাম, "আমার প্রস্তাব জোবরায় কৃষি ব্যাংকের একটি শাখা খুলে আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন। এর নিয়মকানুন ও কর্মপদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে থাকবে। সর্বসাকুল্যে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণদানের অনুমতি আমাকে দেবেন। কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা দরকার। আমার হাতে ১০ লাখ টাকা ও এক বছর সময় দিয়ে তার উপর ঢাকনা চেপে দিয়ে আপনি চুপচাপ বসে থাকুন। আমায় কাজ করতে দিন। এক বছর পর ঢাকনা খুলে দেখাবেন আমি কী অবস্থায় আছি। দেখবেন আমি তখনও জীবিত আছি কিনা। আমার গড়ে তোলা কার্যপদ্ধতি আপনার পছন্দ হলে, তা আপনার ব্যাংকে প্রয়োগ করুন। ফলাফল সন্তোষজনক হলে সারাদেশে তা কাজে লাগাবেন। একবছর পরে তেমন কিছু ঘটতে না দেখলে, আমার শাখায় তালা লাগিয়ে গোটা ব্যাপারটা ভুলে যাবেন। আপাতত ঝুঁকি নিতে হলেও আমাকে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে দেখুন। যদি আমাদের সব গ্রাহকেরই দেনা বকেয়া থাকে,

www.pathagar.com

তাহলে খুব বেশি হলেও আপনাকে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিস্বীকার করতে হবে। তার চেয়ে খারাপ তো কিছু হবে না।"

আমি তখনও আমার প্রচেষ্টাকে শিক্ষাজগতের এক গবেষণামূলক পরীক্ষা বলে গণ্য করছিলাম। জানতাম একবার সফলভাবে কিছু করে দেখালে ব্যাংক তার পুরো দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবে।

"ঠিক আছে, হয়ে যাবে। আর কিছু দরকার নেই?" ভরসা দিয়ে আনিসুজ্জামান সাহেব প্রশ্ন করলেন।

"এটুকু দিলে আর আমার কোনও চাহিদা থাকবে না। ব্যাংকের একটি শাখার সর্বময় কর্তার ভার আমাকে দিতে চলেছেন—এর চেয়ে আর বেশি কী চাইবার থাকতে পারে আমার?"

"ঠিক তো?"

"হ্যাঁ, এতেই আমার সব প্রয়োজন মিটে যাবে। আপনার এই ঋণ আমি কীভাবে শোধ করব জানি না।"

"দাঁড়ান, আগে ব্যাপারটা সফলভাবে সম্পন্ন হোক। প্রথম কাজ ব্যাপারটা আমলাদের বিশদভাবে বোঝানো। কাজটা খুবই দুরূহ। অতএব আমরা এখনও সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত নই। পথের কাঁটা এখনও দূর হয়নি।" আনিসুজ্জামান ফোন তুলে তাঁর সচিবের সঙ্গে কথা বললেন, "চট্টগ্রাম জেলার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।" রিসিভারের উপর হাত চাপা দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে চট্টগ্রাম ফিরে যাচ্ছেন?"

"কাল দুপুরের পর।"

"বিকেলের ফ্লাইটে?"

"হ্যাঁ।"

ম্যানেজার ওদিকের লাইনে এলে আনিসুজ্জামান সাহেব বললেন, "আগামীকাল আমার বন্ধু অধ্যাপক ইউনূস চট্টগ্রাম ফিরে যাচ্ছেন। বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পৌঁছে যাবেন। আমি চাই আপনি ওনার জন্য তাঁর বাড়িতে অপেক্ষা করবেন। তাঁর নির্দেশমতো কাজ করবেন। তিনি যা চান, যা বলেন সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করা চাই। এটা আমার আদেশ, বুঝেছেন?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?" জনাব আনিসুজ্জামান এপাশ থেকে বললেন।

"না, স্যার।"

"ঠিক আছে। আমি চাই আপনি ওনার সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করে চলবেন। অধ্যাপক ইউনূসকে যেন আমার অফিসে এসে অভিযোগ করতে না হয়। বুঝলেন?"

তাঁর ঘরে বসে সমস্ত ঘটনা পরপর সাজিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম, একটি মেয়ে রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে। অসম্ভব রোগা, খালি পা, গয়নার মধ্যে শুধু নাকে একটা নথ। ঢাকা শহরের অসংখ্য ঝাড়ুদারনির একজন সে। সপ্তাহে প্রতিদিন কাজ করে সে যা রোজগার করে তাতে কোনওরকমে অস্তিত্বটুকুই খালি টিকিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ নিজের ও সন্তানদের শুধু মাত্র দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটাতে তার উদয়াস্ত পরিশ্রম। তবু সে ভাগ্যবতী, একটা বাঁধা চাকরি আছে তাঁর। এইরকম মহিলাদের জন্য এবং আরও অসংখ্য মহিলা যাঁদের এটুকু কাজও জোটে না, তাদের জন্য আমি ঋণ প্রকল্প গড়ে তুলতে চাইছি।

www.pathagar.com

* * *

পরের দিন আনিসুজ্জামান সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম কৃষি ব্যাংকের আঞ্চলিক ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল। আমার বসবার ঘরে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন আমি তাঁর কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চলেছি। স্বাভাবিকভাবেই তিনি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন।

তাঁকে সব বিস্তারিত জানালাম—কীভাবে জনাব আনিসুজ্জামানের সঙ্গে আমার দেখা হল। এবং ওই আশ্চর্য মানুষটি আমার ও আমার ছাত্রদের কাজের বিষয় নিয়ে কতখানি উৎসাহ দেখিয়েছেন।

"কিন্তু আমার প্রস্তাব বাস্তবায়নে এখনও কীভাবে অগ্রসর হব বুঝতে পারছি না। এই প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে আপনার সাহায্য একান্ত দরকার।"

ম্যানেজার সাহেব আমাকে প্রকল্পের একটি পরিকল্পনা লিখে জমা দিতে বললেন। সঠিকভাবে লিখবার জন্য তাঁর সাহায্য চাইলাম। বললাম কী লিখতে হবে তা আমি জানি না। আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন, আমি জবাব দেব। সেগুলি লিখলে আপনার প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি হয়ে যাবে। তিনি বললেন, কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে তিনি আমার বাড়ি আসবেন। তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করে জবাবগুলি নেবেন। পরে জবাবগুলির উপর ভিত্তি করে একটি নিয়মমাফিক প্রকল্প প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করবেন।

পরের সোমবার তাঁরা পাঁচজন আমার বাড়িতে এলেন। আঞ্চলিক ম্যানেজার অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন আমাকে। সেসব বিষয় আগে কখনও আমার মনে উদয় হয়নি, কতজন করে গ্রাহক ও কত কর্মী আমার দরকার হবে। কোন পর্যায়ের কতগুলো সিন্দুক আমার চাই, ইত্যাদি। যতদূর সম্ভব ভেবে উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম।

তারপর তাঁরা চট্টগ্রাম শহরে ফিরে গেলেন, কয়েক সপ্তাহ পর তাঁদের কাছ থেকে একটি খাম পেলাম। ধৈর্য ধরে কাগজপত্র পড়ে চমকে গেলাম। বিরক্তিতে মন ভরে গেল। একগাদা লম্বা কাগজের বাণ্ডিল, আমলাদের বাগাড়ম্বরে ভর্তি। একটি পাতা পড়ে মানে উদ্ধার করাই মুশকিল।

এবার আমি কাগজ কলম নিয়ে পরিষ্কার ভাষায় লিখে ফেললাম আমি প্রকৃতপক্ষে কী করতে চাই। একটা সংক্ষিপ্ত, যথাযথ, প্রত্যক্ষ প্রস্তাব—অপ্রয়োজনীয় কথা একটিও রইল না। প্রথম কাজ হল আমার শাখার একটা উপযুক্ত নাম নির্ধারণ। লিখলাম,

"কৃষি ব্যাংক" নামের "কৃষি" শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে এর কাজ হল চাষবাস সংক্রান্ত কাজে ঋণ দেয়া। আমার পরিচালিত শাখায় আমি চাই না শুধু কৃষিকেন্দ্রিক কাজ নিয়ে এটা ব্যস্ত থাকুক। কৃষকেরা বাংলাদেশের দরিদ্রতম মানুষ নয়। জমি বা খামারের মালিকদের অবস্থা সচ্ছল। সর্বহারা ভূমিহীন কৃষক, যারা শ্রম দান করে জীবিকা নির্বাহ করে তারাই প্রকৃত অর্থে হতদরিদ্র। আমার শাখা গ্রামীণ জীবনের সবক্ষেত্রে সাহায্য করবে—ছোটখাটো ব্যবসা, উৎপাদন ও বিক্রয় এমনকী, ফেরিওয়ালা পর্যন্ত সবার উদ্যোগকে আমরা সহায়তা করতে চাই। শুধুমাত্র খামার ও ফসল উৎপাদনের সঙ্গে আমার প্রস্তাবিত শাখার সম্পর্ক থাকবে তা নয়। আমি একে পুরোপুরি 'গ্রামীণ ব্যাংক' হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। তাই আমি 'কৃষি'র পরিবর্তে 'গ্রামীণ' শব্দটি ব্যবহার করতে চাই। আমার প্রস্তাবিত নাম হল 'পরীক্ষামূলক গ্রামীণ শাখা'।

www.pathagar.com

* * *

এরপর বেশ ক'মাস কেটে গেল। জনাব আনিসুজ্জামান ঢাকায় আমাকে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠালেন। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ছয় ঘণ্টার ট্রেনের পথ। তাঁর অফিসে পৌঁছে দেখা করলাম। তিনি বললেন, "দেখুন আপনার প্রস্তাব আমাকে পরিচালক পর্ষদের কাছে পেশ করতে হয়েছিল। তাঁরা সবাই একমত যে, আমি যা করতে চাইছি তা আমার অধিকারের বাইরে। আমার ক্ষমতাবলে আমি আপনাকে কোনওরকম বিশেষ সুযোগ দিতে পারি না। কারণ আপনি বহিরাগত, এই ব্যাংকের কর্মী নন।"

জনাব আনিসুজ্জামান চিন্তা করবার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "ইউনূস সাহেব, আপনি সত্যিই আমাদের ব্যাংকের একটি নতুন শাখা খুলতে আগ্রহী?"

"না, না, একেবারে নয়। আমি শুধু গরিবদের ধার দিতে ইচ্ছুক।"

"আপনি কি একাজের সাথে অধ্যাপনার কাজও চালিয়ে যাবেন?"

"দেখুন, শিক্ষকতা ছাড়া আমি আর কোনও কাজ জানি না। আমি সত্যিই পড়াতে ভালবাসি।"

"আমি আপনাকে চাপ দিচ্ছি না। যা মনে আসছে তাই আপনাকে বললাম", ছাদের দিকে সিগারেটের ধোঁওয়া ছেড়ে তিনি বললেন, "আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ইস্তফা দিয়ে স্বচ্ছন্দে আমাদের ব্যাংকে যোগ দিতে পারেন। তাহলে আপনাকে আমার সহযোগীর পদে নিযুক্ত করে নেব। এটা করা আমার পক্ষে খুবই সহজ হবে। সেক্ষেত্রে আমার পদের ক্ষমতার সুযোগ আপনি গ্রহণ করতে পারবেন—কারওর কোনও অনুযোগের সুযোগ থাকবে না।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তবে ব্যাংকার হবার সত্যিই কোনও ইচ্ছা আমার নেই। তার চেয়ে অধ্যাপনা আমার খুবই ভাল লাগবে। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ চালাতে হয়। ছাত্র ও অধ্যাপকদের দেখাশুনা করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে চাপ সামলাতে হয়। এই সব নানা কর্তব্য কর্মের ফাঁকে দারিদ্র দূরীকরণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছি।"

"একটা উপায় আমি বার করবই। চিন্তা করবেন না।" আনিসুজ্জামান সাহেব জানালা দিয়ে বাইরে থাকিয়ে রইলেন। তাঁর সিগারেটের ধোঁওয়ার রিং জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

বুঝতে পারছিলাম তাঁর মাথায় অনেক ভাবনা চিন্তা খেলা করছে। "আচ্ছা যদি কাগজে কলমে আপনাকে শাখার দায়িত্বভার না দিয়ে, আঞ্চলিক ম্যানেজারকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়, অথচ তিনি আপনার নির্দেশমতো সব কাজ করেন, তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।"

"সেটা আপনার উপর। আপনি যা ভাল বোঝেন।"

"আমি তাঁকে আপনার নির্দেশানুযায়ী কাজ চালিয়ে যেতে আদেশ দেব। যা আপনার করা উচিত মনে হয় সব ওকে জানাবেন। সাধারণ নিয়মের বাইরে কিছু করতে হলে তিনি প্রধান কার্যালয়ে আসবেন—আমাকে সব জানাবেন। তারপর সিদ্ধান্তের ভার আমার।"

"এ তো খুব ভাল প্রস্তাব। পর্ষদ এটা মেনে নেবে তো?"

"সে দায়িত্ব আমার। যে সব ছাত্র এখন জোবরায় আপনার হয়ে কাজ করছে তাদের একটা নামের তালিকা আমাকে দিন। তাদের একজন শাখার ম্যানেজার হতে পারে। অন্যরা ব্যাংকের নিয়মমাফিক কর্মী হতে পারে।"

www.pathagar.com

"ধন্যবাদ। এসব চাকরি তো ওদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে।"

"আরও শুনুন, এর জন্য তাদের কোনও সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে হবে না।"

আমার কী যে আনন্দ হল তা বর্ণনা করা যায় না। আমার সহকারী আসাদ, নূরজাহান ও জান্নাত শেষ পর্যন্ত জীবনে প্রথম ভাল মাইনের চাকরি পেতে চলেছে।

"শাখার নাম ঠিক করেছি গ্রামীণ শাখা।"

মি. আনিসুজ্জামান সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা 'কৃষি ব্যাংকের পরীক্ষামূলক গ্রামীণ শাখা' নামটি আপনার কেমন লাগছে?"

"এক্কেবারে সঠিক।"

আমরা দুজনেই হাসছিলাম। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দু'জনে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। শহরের রাস্তায় গাড়ি চলাচলের বিরাম নেই। তারই মধ্যে অতি পরিচিত বহুবার দেখা এক দৃশ্য দুজনেরই চোখের সামনে। বাচ্চা কোলে ভিখারি মা। বাচ্চারা ফুটপাতে শুয়ে আছে। তাদের অনেকেই বিকলাঙ্গ ও নানা রোগে আক্রান্ত। এসব দেখে বর্তমানে কেউই আর দুঃখে কাতর হয় না। কারণ এই শহরে বেঁচে থাকতে গেলে দুঃখ, দুর্দশায় ক্লিষ্ট মানুষের তীব্র যন্ত্রণার প্রতি আমাদের একেবারে অন্ধ, উদাসীন হয়ে থাকতে হবে।

"শহরের গরিব মানুষ আর এক ভয়ংকর সমস্যা..." তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন।

"গ্রামের সংকট সামাল দিতে পারলেই, দিশেহারা গরিব মানুষের দলে দলে শহরে চলে আসবার প্রবণতা অনেক কমে যাবে।" আমি বললাম।

তিনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। বললেন, "প্রফেসর, আপনার চলার পথে আমার শুভেচ্ছা রইল।"

আমাদের জীবনে কত কী অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়। একদম আচমকাই। ঠিক জায়গায়, ঠিক সময়, ঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে গেলে সবকিছুই ঠিকঠাক হয়ে যায়। কয়েক মাস আগেও ঠিক ছিল না, দরিদ্রদের প্রতি আমার পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে। হঠাৎ করে সঠিক মানুষটির দেখা পেয়ে গেলাম। এর ফলে এত সহজে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট্ট প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প ব্যাংকিং ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চলেছে।

www.pathagar.com

১৭
ঈদ-উল ফিতর (১৯৭৭)

১৯৭৭ সাল অর্থাৎ গ্রামে আমাদের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতার প্রথম বছরে ঈদ-উল ফিতর উৎসব উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আমাদের বাড়িতে গেলাম।

এই পবিত্র পরবে বাড়ি যাওয়া আমার পক্ষে খুবই জরুরি। পরিবারের সবার সঙ্গে সময় কাটাবার জন্য। আমার আব্বা, আম্মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ। ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তাঁরা সন্তানদের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। এই ধর্মীয় উৎসবে আমাদের উপস্থিতি তাঁদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঈদ উপলক্ষ্যে তিনদিন অফিস, কাছারি, স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। একমাস রোজা রাখার পর ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে খুশির পরব।

ছুটিটা আদতে তিনদিনের হলেও অধিকাংশ বাংলাদেশির মতো আমিও এই সময় এক সপ্তাহের ছুটি নিতাম। যে সব আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে বহুকাল আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি তাদের সঙ্গেও মিলিত হবার এই ছিল সুযোগ, বিগত বৎসরের ছিন্ন যোগসূত্রগুলিকে আবার নতুন করে সুদৃঢ় করতে।

আমরা সবাই 'নিরিবিলি'-তে জমায়েত হতাম। ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রামের পাঁচলাইশের আবাসিক এলাকাতে আব্বা যে বাড়ি বানিয়েছিলেন তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'নিরিবিলি'। সেই অঞ্চলে সেটাই প্রথম বড় বাড়ি। বহু স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি প্রায় আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছে।

আব্বার নিজস্ব কিছু সেকেলে পদ্ধতি ছিল। বেশ ক'দিন তিনি শহরের নানা অঞ্চলে পছন্দসই বাড়ির খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। একটি বড়সড় দোতলা বাড়ি তাঁর মনোমতো হল। একজন দক্ষ স্থপতিকে দিয়ে তিনি তার নকশা আঁকিয়ে নিলেন। তারপর একজন ঠিকাদারকে সেই নকশা অনুযায়ী বাড়ি তৈরির ভার দিলেন।

বিশাল বাড়ি তৈরি হল। চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা বাগান। বাগান ঘিরে সুপুরি, নারকেল, আম, কলা, পেয়ারা ইত্যাদির বিশাল বিশাল গাছ। বড় বড় বারান্দা ও বহু খোলা জায়গা বাড়ির সর্বত্র ছড়ানো। বাড়িটায় অনেক খুঁত। কামরাগুলো বেয়াড়া রকমের বড়। বারান্দা এত অত্যধিক বিশাল যে অযথা জায়গার অপব্যবহার হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। ওই বিরাট পরিসর আরও ভালভাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল। এত সত্ত্বেও বাড়িটা ছিল আমাদের ভীষণ প্রিয়। এখন 'নিরিবিলি'র চারটে আলাদা অংশে আমার ভাইরা থাকে। বাবা থাকেন একতলায়, ভাইরা তাঁকে ঘিরে থাকে। বাবা এরকম সকলকে নিয়ে জড়িয়ে থাকতে ভালবাসেন। এই বাড়িটা আমাদের পারিবারিক একতা ও শক্তির প্রতীক।

আমার ভাইদের মধ্যে বড়দা সালাম, অনুজ আইয়ুব, আজম ও মঈনু সপরিবারে চট্টগ্রামে

www.pathagar.com

বসবাস করে। ইব্রাহীম ও জাহাঙ্গীর থাকে ঢাকায়। বড় বোন মমতাজ ও বোন টুনু চট্টগ্রামেই থাকে। তাদের পরিবারও এসময় আসে। মাঝে মাঝে আমরা বাথুয়া গ্রামে আমাদের পৈতৃক ভিটেতে যাই। এই ভিটেতে আমার জন্ম হয়েছিল। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমার সময়ের অনেকটাই কেটেছে। এখনও আব্বার অনেক জমিজমা এখানে রয়েছে।

গোটা রমজান মাসে আব্বা জাকাত দেন। প্রথমে অভাবী আত্মীয়দের, তারপর দরিদ্র প্রতিবেশীদের এবং শেষে সাধারণ গরিব মানুষদের আর্থিক সাহায্য করে থাকেন।

ঈদের দিন প্রথানুযায়ী খুব ভোরে উঠে আমরা গোসল সেরে নিই। আটটায় আমরা ঈদগা ময়দানে নামাজ পড়তে যাই। আব্বা থাকেন সবার আগে, তারপর আমরা সাত ভাই। আমাদের মধ্যে সর্বাধিক ধর্মপ্রাণ হলেন আব্বা। তিনি এ ব্যাপারে সবচেয়ে একনিষ্ঠ। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রীতি—আমি কখনও এ দিনটি অন্যত্র কাটাবার কথা চিন্তাই করতে পারি না।

নামাজের পর আমরা কবরস্থানে গিয়ে প্রিয়জনদের উদ্দেশ্যে মোনাজাত করি। মরহুমদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

প্রতিবার ঈদে মা জোরে জোরে কোরআন থেকে পাঠ করেন। এটা তাঁকে শক্তি ও নিরাপত্তা দান করে। তিনি বরাবরই ধর্মভীরু ছিলেন। রোগের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে কোরআনের একই সুরা বার বার উচ্চারণ করা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছিল।

সবরকম চেষ্টার পরও আব্বা চিকিৎসা করে মাকে রোগমুক্ত করতে পারেননি। সবরকম চিকিৎসা মার উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল, আশা ছিল অলৌকিক কিছু ঘটে যাবে। মনস্তত্ত্ববিদ, জ্যোতিষ, বাত-চিকিৎসক, স্নায়ুরোগবিশেষজ্ঞ, শল্যবিদ, জীববিজ্ঞানী, ওঝা—কাউকে ডাকতে বাকি ছিল না। কিন্তু রোগের উপশম হয়নি।

আমরা মাকে প্রাণাধিক ভালবাসতাম। সবসময় ভালবাসায় ঘিরে রাখতে চাইতাম। বড়দা সালাম, বড়বোন মমতাজ ও আমি, তাঁর তিন জ্যেষ্ঠ সন্তান, সুস্থ অবস্থায় তাঁর ব্যক্তিত্বময়ী, সবল ও পারিবারিক মর্যাদাদায়িনী রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের পক্ষে তাঁর রোগক্লিষ্ট চেহারা সহ্য করা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ছিল। আব্বার পক্ষে যে তা আরও কতটা অসহনীয় ছিল ভাবলে হতবাক হই।

আম্মার অবস্থার জন্য আব্বা তাঁকে কখনও দোষারোপ করেননি। ভাগ্যকেও অভিযুক্ত করেননি। তাঁর ধৈর্য ও মনোবল ছিল অসীম। আম্মার প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ও অবিচল বিশ্বস্ততা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছিল।

* * *

প্রতি ঈদে বড় বোন মমতাজের বাড়ি যেতাম। এর জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। তার হাতের রান্না ছিল খুবই সুস্বাদু।

আমার চেয়ে বুবু ১২ বছরের বড়। তার পানপাতার মতো মুখ। চোখদুটি বড় মায়াভরা। ১৭ বছর বয়সে সে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। কিন্তু সেখান থেকে সে নিয়মিত বাড়িতে যাওয়া আসা করত। তার প্রধান কারণ ছিল ভাইবোনদের প্রতি গভীর মমতা। সত্যি অর্থে মায়ের স্থান পূরণ করেছিল সে।

১৯৭৭ সালের ঈদে সবাই আনন্দ স্ফূর্তি করছে এমন সময় মমতাজ গভীর মমতায় আমার হাতদুটো ধরল। সব ভাইবোনসহ আমার প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি ও অপার স্নেহ। তার চোখের দিকে তাকিয়ে অতীতের কত না স্মৃতিতে ফিরে গেলাম আমি। মনে পড়ল ১৯৫০

www.pathagar.com

সালের সেই দিনটির কথা যেদিন, আমি রুদ্ধশ্বাসে কিছুটা বাসে কিছুটা পায়ে ছুটতে ছুটতে তার বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম, ভাই আইয়ুবের জন্মসংবাদ জানাতে। তখন আমার বয়স দশ—সে কি উত্তেজনা ও আনন্দ আমার—যেন দম রাখতে পারছি না। মমতাজ শুনে খুশিতে আমায় জড়িয়ে ধরল। পাড়া-প্রতিবেশীকে আনন্দের খবর জানাতে লাগল।

আমাকে কত কী খাওয়াল বুবু। সারারাত আনন্দ করে, সকালে ব্যাগ গুছিয়ে সে আমার সঙ্গে রওনা হল প্রসূতি মা ও নবজাত ভাই-এর পরিচর্যা করতে।

১৯৪৭ সালের আর একটি দিনের কথা আমার মনে পড়ল। আমি ও ভাই ইব্রাহীম বুবুর বাড়ি রাত কাটিয়েছিলাম। ইব্রাহীমকে বুবুর হেফাজতে রেখে আমি সিনেমা দেখতে গেছিলাম। ফিরে এসে দেখি ও তারস্বরে কাঁদছে—ওকে একা ছেড়ে গেছি বলে অভিমানে ওর ফোলা ফোলা গালদুটি লাল হয়ে গেছে। কিছুতেই ওকে শান্ত করা যাচ্ছিল না। মাত্র দু' বছরের বাচ্চা তখন ও। উপায় না দেখে ঘোড়ার গাড়ি ডেকে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

১৯৭৭ সালের ঈদ অন্যান্যবারের চেয়ে আলাদা। আমার স্ত্রী ভিরা ও মেয়ে মনিকা সেবার আমার সাথে ছিল না। তাদের অনুপস্থিতিতে সবাই গভীর দুঃখ পেয়েছিল। কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার অভ্যাস আমাদের ছিল না। তাই এর কারণ সম্বন্ধে আমায় কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি। মমতাজ আমার হাতদুটো ধরে বলল, "ওরা আমেরিকা চলে গেছে। তাই না?"

আমি ঘাড় নাড়লাম। বললাম ব্যাপারটা সাময়িক। কিন্তু দুজনেই জানতাম ঘটনাটা অত সরল নয়। আমাদের মনোমালিন্যের শিকড় অনেক গভীরে চলে গেছে, যা আমার মন মানতে চাইছে না। গভীর সাংস্কৃতিক পার্থক্যের জন্য বাংলাদেশে আমার জীবনযাত্রা ভিরার পক্ষে মেনে নেওয়া এক কথায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

১৯৭৭ সালের পহেলা মার্চ মনিকার জন্মের পর ভিরা উঠে পড়ে লাগল বাচ্চা পালনের যাবতীয় আমেরিকান উপকরণ সংগ্রহ করতে—বিপ, ন্যাপি, খেলনা এরকম হরেকরকম জিনিস কেনার জন্য আমায় পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তখন থেকেই আমেরিকায় ফিরে যাবার জন্য সে প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিল। তার ধারণায় বাংলাদেশে সঠিকভাবে সন্তান পালন তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এর কোনও সমাধান আমি অনেক ভেবেও বার করতে পারিনি। আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার কোনও অভাব ছিল না। কিন্তু বিয়ের আগে যে সমস্যার কথা ক্রমাগত আমার মনে উদয় হয়েছে তাই প্রকটভাবে সত্যি হয়ে উঠল। ভিরা ও মনিকা আমেরিকা চলে গেল। বেশ কিছুদিন সাজানো সংসারের কিছু বদল না করে অপেক্ষা করে রইলাম। মনিকার দোলনা, খেলনাপাতি যেমনটি ছিল তেমনটি রেখে দিলাম, ওরা ফিরে আসতে পারে এই আশায়। ওদের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। আমি কোনওমতেই তা মেনে নিতে পারছিলাম না।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আমি বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে অক্টোবর মাসে আমেরিকা গেলাম। ওই সময় খুব চেষ্টা করলাম ভিরাকে বোঝাতে যাতে ও ফিরে আসে।

কৃষি ব্যাংকের প্রস্তাব তখনও গৃহীত হয়নি। তখনও গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের ঋণ প্রস্তাব তা ব্যাংকের কাছেই জমা দিই। প্রতিটি আবেদনপত্র নিউইয়র্কে আমার কাছে পাঠানো হয়। প্রতিজনের জামিনদার হিসেবে আমাকে সই করতে হয়। এমন অবাস্তব দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপারও আমাকে মেনে নিতে হচ্ছিল। এদিকে ভিরা আমাকে নিউ জার্সিতে পাকাপাকিভাবে থেকে যাবার জন্য চাপাচাপি করছিল।

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে জন্মের মতো ছেড়ে আসা সুদূর কল্পনাতেও আনা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভিরার প্রস্তাবে রাজি হতে পারলাম না। আমাদের দশ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন হল। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই বুবু আমাকে আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করে সঠিক কর্তব্য পালন করেছিল। তবে আমার আফসোস নেই। আমি ভিরাকে শ্রদ্ধা করি। তার সঙ্গে আমার দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থন করে আনন্দ পাই।

বিচ্ছেদের পর আমার সন্তান মনিকার কথা খুব মনে পড়ে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় পর্ব

সৃষ্টি

১৯৭৮-৯০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৮
প্রকল্প থেকে ব্যাংক (১৯৭৮-৮৩)

তিনমাস আমেরিকায় কাটাবার পর দেশে ফিরলাম। আমার সদ্য বিয়ে বিচ্ছেদ হয়েছে। এসেই কাজের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তখনও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কৃষি ব্যাংকের অধীনে আমাদের জোবরা শাখায় তখন আমার প্রাক্তন ছাত্ররা কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছে। প্রতিটি ঋণের জন্য আর আমাকে নিজে জামিনদারের দায়িত্ব নিতে হয় না। কাজ আরও দ্রুত গতিতে এগোনো উচিত। কিন্তু তখনও আমাদের গ্রাহক সংখ্যা মাত্র পাঁচশত বলে আমরা খুব হতাশ বোধ করছিলাম।

১৯৭৮ সালে কয়েকমাস পর, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে 'গ্রামের দরিদ্রদের অর্থ জোগান' সংক্রান্ত আলোচনা সভার একটি অধিবেশনে সভাপতির পদ অলংকৃত করার আমন্ত্রণ পেলাম। এর উদ্যোক্তা ছিল USAID (United State Agency for International Development) এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওহাইয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিশেষজ্ঞ এই সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন।

আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের মতে, ঋণশোধ প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য কৃষিঋণের সুদের হার বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। আমার কাছে এটা অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল। প্রতিবাদ জানিয়ে আমি বললাম, "কৃষকেরা সুদের হারের তোয়াক্কা না করেই ঋণ নেয়। তারা মরিয়া হয়ে গেছে। মহাজনের কাছে সর্বস্ব বন্ধক দিয়েও তারা টাকা ধার করতে দ্বিধা করে না।"

আমার কথায় কাজ হল না। আলোচনা কক্ষে সবার সঙ্গে প্রবল বাকবিতণ্ডা হয়ে গেল। সবাই আমার দিকে এমনভাবে দৃষ্টিপাত করতে লাগল যেন আমি একজন বদ্ধ পাগল ছাড়া কিছু নই।

আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম, "আমি হলে কৃষকদের নেগেটিভ সুদে টাকা ধার দিতাম। আমি ১০০ টাকা ঋণের বিনিময়ে কৃষক যদি ৯০ টাকা ফেরত দেন তাঁদের ঋণের সম্পূর্ণ টাকা আদায় হয়েছে বলে ধরে নিতাম। বর্তমানে কৃষিঋণের মূল সমস্যা হল আসল টাকা ফেরত পাওয়া—সুদের কথা তো আসছেই না।"

আমি ইচ্ছা করেই বিতর্কে উসকানি দিচ্ছিলাম। আমার বক্তব্য জাতীয় স্তরে আলোড়ন তুলুক এই ছিল আমার একান্ত মনোগত বাসনা। চড়া সুদ ধার্য করার পিছনে বিশেষজ্ঞদের যুক্তি ছিল অদ্ভুত। তাঁদের মতে উচ্চ সুদে তাঁরাই কেবল ঋণ নেবেন, যাঁদের সত্যিই ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আছে। আমার যুক্তি ছিল মানুষের কাছে ঋণের শর্তগুলি সহজ হলে তারা ঋণশোধের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেষ্ট হবে।

জোবরা গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংকের পরীক্ষামূলক কর্মসূচিতে ঋণশোধের ব্যাপারে আমাদের সাফল্যের কথা তাঁদের বিস্তারিত বললাম। কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে এ ধরনের একটা প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য আমি তাঁদের চ্যালেঞ্জ জানালাম।

www.pathagar.com

একজন সিনিয়র ব্যাংকার রাগে ফেটে পড়ে বললেন, "প্রফেসর ইউনূস, জোবরায় আপনার অতটুকু পরীক্ষার কোনও মূল্য নেই। বড় বড় জাতীয় ব্যাংকে আমাদের যে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয় তার তুলনায় এ তো একটা পিন ফোটানোর মতো তুচ্ছ ব্যাপার। শুধু শুধু আমাদের চুলে পাক ধরেনি। আপনার অভিজ্ঞতা নির্ভুল প্রমাণ করতে হলে শুধু ছোট্ট গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গোটা জেলায় এটা করে দেখান।"

আমি তৎক্ষণাৎ সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। অধিকাংশ ব্যাংকার আমার এই রাজি হওয়ার ব্যাপারটা আমল দেননি। আমার পরিকল্পনা সম্প্রসারণ করার ইচ্ছাকে তাঁরা বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছুই ভাবলেন না। এটা জাতীয় স্তরে সার্থক করে তোলা সম্ভব নয়—এই বিশ্বাস থেকে তাঁরা এক চুলও নড়লেন না।

আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মি. গঙ্গোপাধ্যায় শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন। পরে তিনি তাঁর অফিসে আমাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমার প্রকল্প সম্প্রসারণের ব্যাপারে সত্যিই আমি উৎসাহী কি না।

"নিশ্চয়ই।"

"জোবরায় আপনার ছোট্ট পরীক্ষা জাতীয় স্তরে সফল হবে বলে সত্যিই আপনি নিশ্চিত?"

"আমি একশোভাগ নিঃসন্দেহ।"

"বলুন আপনার কী দরকার?"

আমি বরাবরই বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক-কে দরিদ্র, মহিলা ও নিরক্ষরদের উন্নয়নের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন বলে দোষারোপ করি, কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক-কে প্রথম বিশাল পরিসরে কাজ করতে সুযোগ করে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের সক্রিয় অবদানের কথা কোনওদিন ভোলার নয়। গ্রামীণ ব্যাংক এর জন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এক মাস পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সরকারি সব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের এক আলোচনাসভায় আমন্ত্রণ পেলাম। আমার প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য সেই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন মি. গঙ্গোপাধ্যায়।

সভায় উপস্থিত সবাই এক ছিটগ্রস্ত শিক্ষাবিদের প্রস্তাবকে প্রশ্রয়ের পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করলেন। মি. গঙ্গোপাধ্যায় এ ব্যাপারে তাঁদের সমর্থনের আবেদন জানালে, সবাই একযোগে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এ তো খুব ভাল প্রস্তাব। এতে আর সমস্যা কোথায়? ইত্যাদি ইত্যাদি।" কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সেগুলো কেবলই কথার কথা।

দুটি বিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন। প্রথমত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গ্রাহকরা ঋণ শোধ করছে। দ্বিতীয়ত, আমি চট্টগ্রামের মানুষ বলেই আমার এই প্রচেষ্টা সফল। অন্য জেলায় তা একইভাবে সার্থকতা লাভ করবে না।

আমি বুঝাবার চেষ্টা করলাম যে গরিব মানুষেরা কখনও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে না। তাদের পরিবারের সবাই নিরক্ষর। একজন শিক্ষক হিসেবে তাদের উপর আমার প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নই ওঠে না। এই কথাগুলো তাদের বোঝাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। বৈঠকে সবাই একযোগে সায় দিলেন যে আমি যদি এই প্রকল্প এমনভাবে তৈরি করতে চাই যাতে পরবর্তীকালে এই প্রকল্প যে-কোনও ব্যাংকের পক্ষে গ্রহণ করা ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তা হলে আমাকে অধ্যাপকের কাজে ইস্তফা দিয়ে পুরো সময়ের জন্য ব্যাংকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আমি জানালাম দু'বছরের ছুটি নিয়ে তাঁদের মনোনীত অন্য যে-কোনও জেলায় প্রকল্প

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের জন্য যেতে সম্মত আছি। পদত্যাগ করার দরকার দেখি না। তাঁরা এমন জেলা বাছাই করতে পারেন যেই জেলার সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় থাকবে না। জেলা নির্বাচনের ব্যাপারে আমার কোনও পছন্দ থাকবে না।

তাঁরা টাঙ্গাইল জেলাকে বেছে নিলেন। আয়তনে এই জেলা ছোট। তার উপর ঢাকার কাছাকাছি। প্রকল্পের ফলাফল যাচাই করা তাঁদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

সেদিনের আলোচনার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রকল্প পরিকল্পনা কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিলাম। এবং শীঘ্রই তা অনুমোদন পেয়ে গেল।

* * *

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমার দু' বছরের ছুটি মঞ্জুর করল। ১৯৭৯ সালের ৬ জুন, ঢাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসে পরে টাঙ্গাইল চলে গেলাম। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলাম।

প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের তিনটি করে শাখায় আমাদের কাজ করতে দেবার কথা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত মোট ২৫টি শাখায় আমরা কাজ করার সুযোগ পেলাম—টাঙ্গাইলে ১৯টি শাখা (তার মধ্যে ছোট্ট একটি ব্যাংকের একটি মাত্র শাখাও ছিল) ও চট্টগ্রামে কৃষি ব্যাংক সহ ছ'টি শাখা।

আমার তরুণ সহকর্মীদের জোবরা থেকে টাঙ্গাইলে আনিয়ে নিলাম। এদের মধ্যে আসাদ, দীপাল ও দাইয়ান ছিল। মোহাম্মদ আলি ও শামীম চট্টগ্রাম প্রকল্পে নিযুক্ত থাকল।

টাঙ্গাইল জেলায় তখন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। 'গণবাহিনী' নামক একটি সশস্ত্র গেরিলাবাহিনী গ্রামাঞ্চলে তখন সন্ত্রাস চালাচ্ছে। গেরিলারা নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে। প্রতি গ্রামেই কেউ না কেউ মাঠের মধ্যে মরে পড়ে আছে। কোথাও মৃতদেহ গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। কেউ বা দেওয়ালের গায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হয়েছে। স্থানীয় নেতারা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে গেছেন। লুকিয়ে আছেন আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশীর বাড়ি। অথবা শহরাঞ্চলে কোনও হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন। কোথাও নিয়ম শৃঙ্খলার বালাই নেই।

একটা সদ্যোজাত ব্যাংক প্রকল্প এই খুন, জখম, রক্তপাতের মাঝখানে কী করতে পারে? নবনিযুক্ত শাখা ম্যানেজার ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে আমি খুবই দুশ্চিন্তায় রইলাম। কর্মীদের এই শর্তে চাকুরি দেয়া হয়েছিল যে তারা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে থাকতে ও কাজ করতে রাজি থাকবেন। কিন্তু এটা তো এক ভয়ানক আতঙ্কের পরিবেশ।

কোনও কারণ ছাড়াই নিরীহ মানুষদের বন্দুক উঁচিয়ে গুলি করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধে অব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রামকে গ্রাম শেষ করে দেবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমাদের অধিকাংশ কর্মীই ছিল আমার প্রাক্তন ছাত্র। তারা অনেকেই নিজেরা বামপন্থী মনোভাব পোষণ করত। তারা এই গেরিলা আন্দোলনের লক্ষ্যের প্রতি নিজেদের নীরব সমর্থন অনুভব করতে পারত।

তখন আবার প্রচণ্ড গরমের সময়। দিনের বেলা রাস্তা ফাঁকা। শুনশান। মানুষ বসে রয়েছে গাছের ছায়ায় বৃষ্টি বা আচমকা কোনও কালবৈশাখী ঝড়ের আশায়। সে সবের কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। এই তাপদগ্ধ ঋতুতে সামান্যতম পরিশ্রমেও ক্লান্তি এসে যায়। যে-গ্রামগুলি আমরা পরিদর্শন করছিলাম সেখানে ভাগ্য নিপীড়িত, হতদরিদ্র কঙ্কালসার মানুষের বাস। আমার মনে হল একেবারে উপযুক্ত পরিবেশে এসে পড়েছি। এখানেই আমাদের কাজ করে যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ রয়েছে। সতর্কভাবে তা কাজে লাগাতে হবে।

www.pathagar.com

যে ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে আমাদের কাজ করার কথা তারা আমাদেরকে পছন্দ করল না। তাদের কর্মকর্তারা এইসব জায়গায় থেকে আমাদের কাজ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি তুললেন। তাঁদের কাজের বোঝা বাড়াবার জন্য আমাদের উপর বিরক্ত হলেন। অসংখ্যবার তাঁরা সরাসরি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলেন। কখনও সক্রিয়ভাবে বাধা দেবার চেষ্টাও করলেন। পরিস্থিতি এত খারাপ হয়ে পড়ল যে আমাদেরই এক কর্মী, বাণিজ্যিক ব্যাংকের এক ম্যানেজারকে বন্দুক উঁচিয়ে প্রাণের ভয় দেখাল। উদ্দেশ্য গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য আরও টাকার ঋণ মঞ্জুর করা। আমরা অবিলম্বে সেই কর্মীকে বরখাস্ত করলাম। তাতে এক ভয়ানক সংকটের সূত্রপাত হল। নিগৃহীত ম্যানেজার ঢাকায় বদলির জন্য আবেদন জানালেন। ব্যাংকের অন্য স্টাফরা আর আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলেন।

আমরা কিন্তু দমে গেলাম না। স্থানীয় গরিব মানুষদের কাজে নিযুক্ত করতে শুরু করলাম। যতটা সম্ভব কাজ নিজেরাই করে নিতে উদ্যোগী হলাম। জানতাম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর নির্ভর করে কার্যোদ্ধার অসম্ভব। যাদের নিলাম তাদের মধ্যে ছিল আঠারো, উনিশ, কুড়ি বছরের প্রাক্তন গণবাহিনীর সদস্যরা। প্রকৃতপক্ষে তারা সৎ, পরিশ্রমী ও আত্ম উৎসর্গীকৃত তরুণ। তারা বন্দুক ত্যাগ করলে আমাদের প্রকল্পে তাদের কর্মী হিসেবে নিয়োগ করতে আমাদের কোনওই আপত্তি ছিল না।

গণবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যরা গ্রামীণ ব্যাংকের সুদক্ষ নির্ভরশীল কর্মী হয়ে উঠল। যারা বন্দুক ও বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে দেশের মুক্তি ও অগ্রগতি চেয়েছিল, তারা তখন গ্রামের পথে পথে হেঁটে হতদরিদ্রদের ক্ষুদ্র-ঋণের আওতায় আনার কাজে লেগে পড়ল। তারা কোনও আদর্শে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল। কোনও বৃহত্তর কারণের জন্য সংগ্রাম করতে চেয়েছিল। দেশের মঙ্গল কামনায় আত্মবলিদানে প্রস্তুত ছিল। আমরা সেই অদম্য যুবশক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলাম। সন্ত্রাসের পথে নয়। হতাশাজনিত শক্তিকে কোনও অর্থবহ কাজে রূপান্তরিত করতে না পারলে সংগ্রামের অর্থ কী? টাঙ্গাইলের গণবাহিনীর সংগ্রামের ক্ষমতা ছিল। ছিল না সঠিক পথের সন্ধান। সমাজ গঠনের কাজে আমরা কেন তাদের সুযোগ করে দেব না?

টাঙ্গাইলে প্রকল্পের প্রথম দিনগুলিতে আমার মনোবল তুঙ্গে উঠেছিল। শুধু কর্মোন্মাদনা নয়, আমার মানসিক শক্তির মূল উৎস ছিল গরিব মানুষের উদারতা ও মহত্ত্ব। প্রায়শই দেখতাম বৃদ্ধ অশক্ত দরিদ্র মানুষ তাদের ফুটোফাটা খড়ের চালাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের উষ্ণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, তাঁদের সবার সঙ্গে বসে দুটি পান্তাভাত খাবার জন্য। কিন্তু গ্রহীতা বা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খাবার বা কোনওরকম উপহার গ্রহণ করা গ্রামীণ ব্যাংকের রীতিবিরুদ্ধ ছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমাকে একটা টয়োটা মাইক্রোবাস ব্যবহার করতে দিয়েছিল। ওটা চড়ে সারা টাঙ্গাইল জেলা চষে বেড়াতাম। গাড়িটা থাকার জন্য বিন্দুমাত্র সময়ের অপব্যবহার হত না। সারাক্ষণই কাজ করতে পারতাম। প্রথমদিকে জোবরা থেকে আগত ক'জন মাত্র কর্মীকে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। আমি, আসাদ, দীপাল ও দাইয়ান। পরে পরিস্থিতি অনেকটা নিরাপদ হলে জোবরা থেকে নূরজাহান ও জান্নাতকেও আনিয়ে নিলাম।

আমি সেই শিক্ষকই রয়ে গেলাম। কিন্তু এখানে আমার ছাত্ররা অন্যরকম। তারা সব গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা এবং ব্যাংকের সমস্ত কর্মী।

একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির একখানা ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। চতুর্দিকে মিস্ত্রিরা কাজ করছে। রমজান মাস এভাবে চলল।

www.pathagar.com

আমার অফিসে কোনও শৌচালয় ছিল না। দিনের বেলা প্রাকৃতিক ক্রিয়া সারবার জন্য আমাকে প্রতিবেশীদের বাড়ি গিয়ে তাদের বিরক্ত করতে হত। অথবা জোর করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হত। সারা বছরটা এভাবেই কাটল। রাতে আমার অস্থায়ী ডেরায় ফিরে আসতাম, বাড়িটার চারতলার অসম্পূর্ণ ঘরটিতে।

প্রতি মাসে ঢাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠক বসত। তাতে আরও সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ উপস্থিত থাকতেন। সেই বৈঠকে উপস্থিত থেকে আমাকে প্রতিটি ছোটখাটো সিদ্ধান্তের কথা জানাতে হত তাঁদের অনুমতি ও পর্যালোচনার জন্য। একঘেয়ে শম্বুকগতি পদ্ধতি ছিল এটা।

৩৭ নং সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব গোলমাল হল। বিষয়টি ছিল: প্রতি ব্যাংককর্মীকে গ্রামের পথে চলার জন্য একটি করে টর্চলাইট দিতে হবে। এই নিয়ে দু' ঘণ্টা বাকবিতণ্ডা হল। কারণ এই প্রস্তাবে উপস্থিত একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের প্রবল আপত্তি ছিল। ব্যাটারির খরচের জন্য নয়—সমস্যা ছিল অন্য জায়গায়। তাঁর মতে টর্চলাইটের প্রচলন গ্রাম বাংলার পরিবেশকে যান্ত্রিক করে তুলবে। ব্যাংককর্মীদের হ্যারিকেন লণ্ঠন বা কেরোসিন ল্যাম্প নিয়ে চলাফেরার অভ্যাস করা উচিত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সবাই আমাদের মতেই সায় দিলেন। তার জন্য বেশ লড়াই করতে হয়েছিল। সময় ও শক্তির কী অপচয়!

নৃতত্ত্ববিদগণ গ্রামীণ ব্যাংক-কে সামাজিক প্রকৌশলবিদ্যা প্রয়োগ করে ও সমাজ পরিবর্তনের জন্য দায়ী করেন। কিন্তু পরিবর্তনে ক্ষতিটা কোথায়? কিছু রীতি অবশ্য শাশ্বত, চিরন্তন। সেগুলোকে অস্বীকার না করেও, আমি কিন্তু বদলের পক্ষপাতী। এর ফলে পুরোনো প্রথা ভেঙে নতুনের জন্ম হয়। পরিবর্তন না হলে নতুন কিছু সৃষ্টি সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার হলে পুরাতনকে বর্জন করতে হবে। অবশ্য মঙ্গলজনক ও জনহিতকর কোনও প্রথা পরিবর্তনে আমি আগ্রহী নই।

* * *

১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে আমরা টাঙ্গাইলে ভূমিহীনদের মধ্যে ঋণ বন্টন করতে শুরু করলাম।

১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে আমি আফরোজীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। ঢাকায় ঘটা করে উৎসবের আয়োজন হল। বেশ কয়েক বছর আগে এক বন্ধু মারফত আমাদের পরিচয় হয়েছিল। আফরোজী পেশায় শিক্ষিকা। তখন সে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করছিল। আমারই মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই সমাজেরই সঙ্গে তার সহজ সাবলীল সম্পর্ক ছিল।

কয়েকমাস আফরোজী রইল ইংল্যান্ডে তার গবেষণা সমাপ্ত করবার জন্য। আমি টাঙ্গাইলে রইলাম। তারপর ইংল্যান্ডের পাট চুকিয়ে আফরোজী দেশে ফিরে এল। তিনতলার সেই অফিসঘরে শুরু হল আমাদের নতুন সংসার। তখন থেকেই বরাবর আমরা অফিসের কাছাকাছিই থাকি। আজ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই চলে আসছে। এর মধ্যে ১৯৮৬ সালের ২৪ জানুয়ারি আমাদের পরম আদরের সন্তান দীনা ইউনূসের জন্ম হয়েছে। কিন্তু আমি আসল কাহিনী থেকে অনেকদূর সরে এসেছি।

১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে আমাদের গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৮ হাজার। এর মধ্যে ১১ হাজার হলেন মহিলা।

১৯৭৯ সালে জোবরায় পাঁচ শত জনের কম থেকে গ্রাহক সংখ্যা লাফিয়ে কী করে এতটা

www.pathagar.com

বেড়ে গেল? এর রহস্য একটাই। ধীর ও সতর্ক পদক্ষেপ।

গ্রামীণ ব্যাংক কোনও নতুন জায়গায় কাজ শুরু করলে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কখনও তাড়াহুড়ো করে না। এটাই আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। যাঁরা আমাদের ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ ও বিরুদ্ধতা করতে পারেন বলে মনে হয়, আমাদের তরফ থেকে কখনও তাদের চটানো হয় না। আমরা বিশ্বাস করি ধীরে সুস্থে এগোলে কাজটা নিখুঁত হয়। অতিরিক্ত ব্যস্ততায় থাকে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা।

যত ধীরে সম্ভব এগোনো উচিত। সূচনায় শান্ত পদক্ষেপই কাম্য। সবকিছুর সুবন্দোবস্ত হয়ে গেলে কাজ আপনা থেকেই তর তর করে এগিয়ে যাবে।

আমাদের কর্মোদ্যোগের মূল মন্ত্রই হল সূচনা হবে সহজ, সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত বা স্বল্প পরিসর।

একজন গ্রাহকের ঋণের টাকা পুরোপুরি বিনা বাধায় সুষ্ঠুভাবে এক বছরে ফেরত পেলে তখনই কর্মপদ্ধতি ঠিকঠাক এগোচ্ছে বলে বিবেচনা করা হয়। (অবশ্য প্রকল্পের সাংগঠনিক গলদ ধরার জন্য এক বছরও যথেষ্ট নয়, পুরো দু' বছর ধরে প্রকল্প চালু থাকা দরকার)

তাড়াহুড়ো কীসের? এত শতাব্দী ধরে যদি গ্রামীণ ব্যাংকের সাহায্য ছাড়াই গরিব মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকে, আরও কয়েক বছরও তারা বিনা ভরসায় চলতে পারবে।

আমাদের লক্ষ্য হল এক সুদৃঢ়, সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলা। মরিয়া হয়ে হন্তদন্ত হবার মতো দৌড়ঝাঁপ করে মানুষের কাছে সার্ভিস পৌঁছনো আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

গ্রামীণ ব্যাংক গড়ে উঠেছে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলার একটি সংস্থা হিসেবে। মানুষের অন্তর্নিহিত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে গ্রামীণ ব্যাংক তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করে, যারা এ কাজে উৎসাহী নয় গ্রামীণ ব্যাংক কখনও তাদের উপর চাপ দেয় না।

* * *

টাঙ্গাইলে প্রকল্প চালু করার সময় আমরা একটা কর্মকৌশল অবলম্বন করেছিলাম। পরের অধ্যায়গুলিতে অনেকবারই সেই কথা আসবে।

যে-গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক শাখা খোলার উদ্যোগ নেয়, সেখানে ম্যানেজার হিসেবে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীকে পাঠানো হয়। সঙ্গে থাকেন সহকারী ম্যানেজার, যিনি তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এঁদের দু'জনেরই উপযুক্ত বাসস্থান বা অফিসঘর থাকে না। কোনও পূর্ব পরিচিতি ছাড়াই সম্পূর্ণ অজানা গ্রামটিতে তাঁরা কাজে নিযুক্ত হন। তাঁদের প্রথম কাজ হল অঞ্চলের সমগ্র বিষয় ভালভাবে বুঝে নিয়ে লিখে ফেলা।

শুধু দু'জন মানুষ। সঙ্গে তেমন মালপত্র নেই। প্রথমে গ্রামবাসীরা তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখেন। তাঁদের অবস্থা দুই অসহায় শিশুর মতো। কোথায় রাত কাটাবেন তাই তাঁদের জানা থাকে না।

আমাদের কর্মীদের সরকারি কর্মচারীদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রামবাসীদের চোখে তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। সরকারি কর্মচারীরা গ্রামে এলে তাঁদের ঘিরে এক অলৌকিক সম্মোহন সৃষ্টি হয়। গ্রামের প্রধান তাঁদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে রাখবেন এটা হয়ে ওঠে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। ধনী ব্যক্তিদের গৃহে তাঁদের জন্য মহা সমারোহে ভোজের আয়োজন হবে এটাও তাঁদের জানা। অতীতে সরকারি কর্মচারীদের সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মনে যে ধারণা তৈরি হয়েছে, সেই ধারণায় আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য গ্রামীণ ব্যাংক সততই সচেষ্ট।

www.pathagar.com

আমাদের কর্মপদ্ধতি, চিন্তাধারা, আদর্শ সবই ভিন্ন। সেটা আমরা প্রথম থেকেই গ্রামের মানুষজনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চাই।

তাই আমাদের ম্যানেজার ও তার সহকারীকে নেহাতই সাদামাটা একটা ঘর ভাড়া নিতে হয়। পরিত্যক্ত বাড়ি, স্কুলের ছাত্রাবাস বা ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে সাধারণত তাদের থাকবার নির্দেশ দেওয়া হয়। সচ্ছল পরিবার থেকে খাদ্যগ্রহণ তাদের নিষিদ্ধ। তাদের নিজের রান্না হয় সাদামাটা আহার—দেখে গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

প্রথমে গ্রামের মানুষ বিশ্বাসই করত না তারা প্রকৃতই ব্যাংকের ম্যানেজার। তারা যে অফিসার পদের অধিকারী সেটা তো কোনওমতেই মানতে রাজি হত না। ব্যাংকের ম্যানেজার হলে কোথায় তাদের অফিস? বাকি কর্মচারীরাই বা কোথায়? তারা যদি ব্যাংক ম্যানেজারই হবে কেন তাদের জীবনযাত্রা পিয়নের মতো? কেন তারা নিজের হাতে রান্না করে খায়? কেন তারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে উপযুক্ত বাসস্থান আয়োজনের জন্য আবেদন জানায় না? কেন তাদের মাইলের পর মাইল হেঁটে গ্রামের তথ্য জোগাড় করে আনতে হয়?

দিন কয়েক পর এও জানা যায় এই দুই অপরিচিত যুবক এম.এ. পাস। তারা উচ্চশিক্ষিত, বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। এ খবর আবার প্রথম সংগ্রহ করেন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক। যাঁরা নিজেরা কোনওদিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করার সুযোগ পাননি। তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা এরকম প্রত্যন্ত দারিদ্রপীড়িত গ্রামে, তাঁদের মতো গরিব মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছেন। প্রতিদিন এতটা পথ পায়ে হাঁটছেন। অফিস তো দূরের কথা তাদের ঘরে চেয়ার, টেবিল পর্যন্ত নেই। কোনও চটক বা চমক নেই। সেইজন্য গ্রামের মধ্যে শিক্ষকেরাই সর্বপ্রথম নতুন শাখার গোড়াপত্তনের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

এইসব তরুণ স্নাতকদের বেশ ক'দিন পর্যবেক্ষণ করার পর, গ্রামের মানুষ এবার বুঝতে শুরু করেন যে সত্যিই তাঁরা স্বেচ্ছায় এই গ্রামের কাজে এসেছেন। এবং কাজ তাঁরা সানন্দে উপভোগ করছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মীদের ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকের মনোভাব দরিদ্র জনগণ বিশেষভাবে লক্ষ করেছেন। তরুণ ম্যানেজারদের প্রশংসায় তাঁরা পঞ্চমুখ হয়েছেন।

অতএব স্থানীয় লোকজন খুঁজে দেখবার চেষ্টা করেন তাঁদের গ্রামে কেউ বি. এ. পাশ করেছে কিনা। যদিও বা কারওর কথা মনে পড়ে তারা কেউই আর গ্রামে ফিরে আসেনি। দশ মাইল দূরত্বের মধ্যে তাঁদের জানা এম. এ. পাশ একমাত্র মানুষটি হল গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার।

ম্যানেজার কাজ শুরু করা মাত্র তাঁর নামে চারিদিকে বিরোধীপক্ষের নানা অভিযোগ ও গুজব ছড়াতে থাকে। গ্রামের মহাজন ও ধর্মীয় নেতারা এর হোতা।

* * *

প্রতিদিন ম্যানেজার ও তাঁর সহকারী মাইলের পর মাইল হেঁটে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের অগণিত প্রশ্নের উত্তর দেন। সংগঠনের ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ দেন। গ্রামীণ ব্যাংকের শাখার প্রস্তাবিত অঞ্চল থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলাদের নিয়ে এক একটি ছোট দল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমরা যে ভাগ্যনিপীড়িত অভাবীদের সাহায্য করতে চাই এটা প্রমাণ করাই এর উদ্দেশ্য। গরিব নয় অথচ গরিবের ভান করে থাকে যারা তারাও যদি গরিবদের দলে ভিড়ে যায় তো, যে-কোনও উদ্যোগই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা প্রকল্প

www.pathagar.com

চালু করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করি। তার ফলে যারা সত্যিই গরিব নয় তারা এই দলে প্রবেশ করতে চাইলে তাদের ফাঁকি ধরা পড়বেই।

গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজারদের প্রতিনিয়ত কঠোর পরিশ্রম গ্রামের মানুষের নজর এড়ায় না। প্রখর রোদ, দারুণ ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে তাঁরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিছু স্থানীয় মানুষকে দালাল হিসেবে ব্যবহার করে তাঁরা কাজের পরিমাণকে সংক্ষিপ্ত বা সহজসাধ্য করার চেষ্টা করেন না। স্থানীয় লোকজন অন্তর দিয়ে অনুভব করতে শুরু করে যে তারা নিজেদের সম্পর্কে যা জানে, তার থেকে অনেক বেশি জ্ঞান ও সমঝদারির অধিকারী হলেন গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজারেরা।

অবশেষে শুধু কথা নয়, তাঁদের কাজই গ্রামের মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়। তাঁদের সাহায্য করার আগ্রহে কোনও খাদ নেই এবং এর থেকে কোনও ব্যক্তিগত ফায়দা লোটার ধান্দাও তাদের নেই। গ্রামের মানুষজন এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন। তাঁদের মতামত বা কর্মপদ্ধতি সবসময় পছন্দ না হলেও তাঁরা যে সত্যিই গরিবের অবস্থার উন্নতি করতে চান এই বিশ্বাস তাঁরা পূর্ণমাত্রায় অর্জন করতে সক্ষম হন।

ম্যানেজার শাখা স্থাপনে সফল হলে তাঁদের সুনাম বাড়ে। এটা একটা রোমাঞ্চকর অভিযানে সার্থকতা লাভের সমান। তাঁরা দুর্গম পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। এখন তাঁরা উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করতে চান। তাঁরা এমন আস্থা অর্জন করেছেন যে এখন আর কোনও কিছুই তাঁদের কাছে অসম্ভব নয়।

পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করে ম্যানেজারই স্থির করেন শাখা স্থাপনের কাজে অগ্রসর হবেন, না সেখানেই প্রচেষ্টার ইতি টানবেন। সিদ্ধান্ত স্থির হলে ম্যানেজার আঞ্চলিক মানচিত্র এঁকে শাখা অফিসের সম্ভাব্য ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করেন। গ্রামবাসীদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, অর্থনৈতিক অবস্থা ও গোটা অঞ্চলের দারিদ্রসমস্যার ব্যাপারে সবিস্তারে লিখে রিপোর্ট দাখিল করেন।

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য যথাযথ প্রচারের জন্য গ্রামের মুরব্বি, মাতব্বর ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারীদের ডেকে বৈঠক করা হয়। সেখানে গ্রামীণ ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সবিস্তারে প্রকল্পের ব্যাখ্যা করেন। সব নিয়মকানুন, কর্মপন্থা জেনে নেবার পর তাঁরা গ্রামীণ ব্যাংক-কে গ্রহণ বা বর্জন করবেন কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন রাখা হয়। তবে আজ অবধি কোনও গ্রাম আমাদের বিদায় নিতে বলেনি। তাদের বিবেচনার সুযোগ দেবার কারণে তারা কখনও গ্রামীণ ব্যাংক-কে তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করে না।

* * *

১৯৮১ সালের শেষের দিকে, টাঙ্গাইলে আমাদের আড়াই বছরের অভিজ্ঞতার পর, কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। এই দায়িত্ব দেওয়া হয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর। এরপরে আমাদের কোথায় কাজ করতে হবে তাও স্থির করার ভার তাদের উপর ছিল। তাদের প্রতিক্রিয়া আমাকে অবাক করে দিল। তারা মত দিল গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যকারিতা চমৎকার। প্রফেসর ইউনূস ও তাঁর কর্মীরা সমস্ত দিনরাত কাজ করে এই প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। দিনের পর দিন প্রফেসর ইউনূস রাত জেগে কাজ করেছেন। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মচারীদের দিয়ে এটা চালানো সম্ভব নয়। তারা এরকম পরিশ্রম করবে না।

www.pathagar.com

আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলাম। এটা প্রত্যাখ্যানের একটা অছিলা। আমাদের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে আমাদের এ কী ধরনের শাস্তি পেতে হচ্ছে!

"গ্রামীণ ব্যাংক প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক নয়," আরেকজন বললেন। "গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীরা অফিসে বসে ঘড়ি ধরে কাজ করেন না। বয় স্কাউটের মতো তাঁরা মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়।"

"গ্রামীণ ব্যাংকের মতো অসাধারণ সাফল্য আমরা কখনও অর্জন করতে পারব না।" আরেকজন বললেন। "এই প্রয়াসের একটা অবিকল কর্মসূচি আমাদের দ্বারা চালু করা অসম্ভব। এটা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই প্রফেসর ইউনূসের উপর নির্ভরশীল। প্রতি শাখায় একজন করে ইউনূস আমরা পাব কোথায়?"

এরকম ব্যাখ্যায় আমার খুবই রাগ হল।

ব্যাংকিং জগতে আমরা সম্পূর্ণ এক নতুন পরিকাঠামো তৈরি করেছি। এনেছি এক নতুন ভাবনা যা ব্যাংকিং পদ্ধতি ও আবহমানকাল ধরে প্রচলিত ব্যাংকিং রীতিনীতিতে আনতে চলেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এক নতুন দিগন্তের সূচনা হতে চলেছে। এই পরিচালন পদ্ধতিকে প্রশংসা করার পরিবর্তে তাঁরা সাফল্যের বাহবা দিতে চান আমার ও আমার সহকর্মীদের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্য। দু'বছর আগে জোবরা গ্রামে আমাদের প্রচেষ্টার অভাবনীয় সাফল্যের পর সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া একই হয়েছিল।

আমাদের কর্মপদ্ধতির আরও অনেক দিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে অসুবিধাজনক বলে মনে হয়েছিল। আমরা এমন গ্রাহকবর্গের সঙ্গে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, যারা প্রথম প্রথম লাভজনক বলে একেবারেই বিবেচিত হবে না। আমাদের বার্ষিক টাঙ্গাইল রিপোর্টে শ খানেক নানা ধরনের ছোটখাটো ব্যবসার কথা জানানো হয়েছিল যেমন ধান মাড়াই, আইসক্রিমের কাঠি থেকে শুরু করে তামা, পিতল ইত্যাদির নানা জিনিস বানানো, রেডিয়ো মেরামত, সরষে পেষাই করে তেলের উৎপাদন, কাঁঠাল চাষ, আরও কত কী। প্রতিটির জন্য গ্রহীতাদের সংখ্যা ও ঋণ বণ্টনের পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ সহ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল।

প্রথাগত ব্যাংকার একটি ব্যবসায় মোটা অঙ্কের ঋণদানে আগ্রহী থাকেন। সেক্ষেত্রে ঋণদানের প্রক্রিয়া হয় সহজ—তার জন্য কোনও পরিশ্রমের দরকার হয় না। অন্যদিকে আমরা আমাদের গ্রহীতাদের সংখ্যা নিয়ে গর্ব করি। বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র-ঋণ নিয়ে কাজ করা ব্যাংকারদের পছন্দের ব্যাপার নয়। একটি পাঁচশালা সম্প্রসারণ প্রকল্পের ক্ষুদ্র-ঋণের লেনদেনের ঝক্কি সামলানো খুবই পরিশ্রমসাপেক্ষ। বড় অঙ্কের দীর্ঘমেয়াদি ঋণে এসব ঝঞ্ঝাটের বালাই নেই।

আমি তাদের যুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললাম, "বেশ তো। আমাদের পরীক্ষা আপনারা বিশাল বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে করে দেখুন না। সর্বাপেক্ষা দারিদ্রপীড়িত অঞ্চল নির্বাচন করুন। কিন্তু সে এলাকা এত বিস্তীর্ণ হতে হবে যে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের দূরত্ব হবে বিরাট। সেক্ষেত্রে আমার পক্ষে একসঙ্গে দু' জায়গায় উপস্থিত থাকা কোনওমতেই সম্ভব হবে না। তা হলে আমার ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রতি অঞ্চলে পড়ার কোনও সুদূরতম সম্ভাবনাও থাকে না।"

গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের পরবর্তী আদলের রূপরেখা তখনই আমি সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে লিখে ফেললাম। প্রতিজ্ঞা করলাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের মর্জির উপর নির্ভর করব না। আন্তর্জাতিক ঋণদায়ক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি ঋণের টাকার জন্য গ্যারান্টি জোগাড় করব।

ওখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও আমাদের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়

www.pathagar.com

উপস্থিত ছিলেন বলে সেই প্রস্তাবে কোনও আপত্তি উঠতে পারল না। টাঙ্গাইলে সাফল্যই আমাদের সক্ষমতা ও কৃতিত্বের জলজ্যান্ত প্রমাণ। অন্যদের সায় না দিয়ে উপায় কী?

* * *

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দিনগুলি থেকে শুরু করে যখনই দরকার পড়েছে ফোর্ড ফাউন্ডেশান নির্দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অতীতে ফোর্ড ফাউন্ডেশানের স্থানীয় কর্মকর্তা লিঙ্কন চেন, স্টিফেন বিগস, বিল ফুলার প্রত্যেকেই এগিয়ে এসে উদারভাবে আমাদের কাজে সাহায্য করেছেন। সে সময় ওই সংস্থা আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সরেজমিনে খতিয়ে দেখছিলেন। উদ্দেশ্য প্রথাগত ব্যাংকারদের বিরুদ্ধাচরণকে জয় করবার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য জুগিয়ে যাওয়া।

অ্যাড্রিয়েন জারমেন তখন বাংলাদেশে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রধান। ১৯৮১ সালের শেষের দিকে তাঁকে জানালাম একটি বিশেষ কাজে আমাদের টাকার প্রয়োজন। প্রতিদিনের কাজে আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হই, তা সমাধানের জন্য এ টাকা খুবই জরুরি। যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংকের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ প্রকল্পে সহযোগী হচ্ছে তাদের কাছে এই টাকা তাদের টাকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হিসাবে জমা রাখব। তাহলে তাদের টাকা খেলাপি হওয়ার আশঙ্কায় তারা পিছিয়ে যাবার সুযোগ পাবে না।

ফোর্ড ফাউন্ডেশান রাজি হল। আমি গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য আট লাখ ডলার একটি ব্যাংকে পৃথকভাবে রেখে দেবার প্রস্তাব দিলাম। আমাদের পূর্ববর্তী ফলাফলের ভিত্তিতে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে গ্যারান্টি হিসেবে দেয়া ওই টাকা আমাদের কোনওদিনই ব্যয় করার দরকার পড়বে না। টাকাটা রয়েছে এই সংবাদই ম্যাজিকের মতো কাজ করবে।

কার্যসিদ্ধি হল। লন্ডনের এক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সে টাকা আমরা জমা করে দিলাম।

রোমে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাড) স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ৩৪ লক্ষ ডলার আমাদেরকে ঋণ দেবার জন্য এগিয়ে এল। এরই সমপরিমাণ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের প্রকল্পে ঋণ দেবে। দুই প্রতিষ্ঠানের এই মোট অঙ্ক ব্যবহৃত হবে বাংলাদেশের পাঁচটি জেলায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পে।

১৯৮২ সালে ৫টি জেলায় বিস্তৃত হল গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প। একটি জেলার সঙ্গে অপরটির দূরত্ব অনেক। জেলাগুলির কেন্দ্রে ঢাকা, দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে চট্টগ্রাম, উত্তর পূর্বে রংপুর, দক্ষিণে পটুয়াখালি ও উত্তরে টাঙ্গাইল।

১৯৮১ সালের শেষ দিকে আমরা ৩৪ কোটি টাকা মোট ঋণ বন্টন করেছিলাম। ১৯৮২ সালে এটি হল ৪২ কোটি টাকা।

www.pathagar.com

১৯
মানসিকতার জগদ্দল পাথরের বিরুদ্ধে

মানুষ যখন বিশ্বাস করতে শুরু করল ক্ষুদ্র-ঋণ সত্যিই বাংলাদেশের দারিদ্র দূরীকরণের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য, তখন একটি মন্তব্য প্রায়ই আমার কানে আসত, "যাই বলুন, একটি বিশেষ সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছাড়া এই প্রকল্পের সাফল্য সম্ভব নয়, যা আপনি বাংলাদেশে পেয়েছেন।"

আমার শুনে হাসি পেত। বাংলাদেশে সাফল্যের জন্য গ্রামীণ ব্যাংককে তার কর্মোদ্যোগের সহায়ক এক বিকল্প পরিবেশ তৈরি করতে হয়। তার জন্য চলে কঠোর সংগ্রাম। সেজন্য অনেক সমীক্ষক বলেন, আমরা একটি সামাজিক বিপ্লবের পটভূমিকা তৈরি করছি।

ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প আমাদের জাতীয় কর্মনীতির অনুসরণ করে না। যৌতুকপ্রথা, অপরিণত বয়সে বিবাহ, স্ত্রী বা বধূ নির্যাতন এইসব মর্মন্তুদ সমস্যার বিরুদ্ধে গ্রামীণ ব্যাংক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

হতদরিদ্র সর্বহারা মহিলারা নিজের জীবিকা অর্জন করে যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন তাতে আমরা সাহায্য করি। গ্রামীণ ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান না থাকলে বাংলাদেশে এ কাজ কোনওদিন সম্ভবপর হত কি না সন্দেহ।

* * *

যখনই নতুন কোনও গ্রামে আমরা কর্মোদ্যোগ নিতে শুরু করি তখনই আমাদের ধর্মীয় নেতাদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁরা অশিক্ষিত, সরল, সহজ, নিষ্পাপ, দরিদ্র গ্রামবাসীদের ভয় দেখায়। কোনও মহিলা গ্রামীণ ব্যাংকে ঋণ গ্রহণ করলেই, তার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুর পর তার লাশ ইসলামী মতে দাফন করা যাবে না। সর্বহারা মহিলাদের কাছে এই হুমকি অত্যন্ত আতঙ্কের কারণ। তিনি ভাবেন, "এ জন্মে আমার কিছুই নাই। মৃত্যুর পর জানাজার অধিকারটুকুও হারিয়ে বসব। তার চাইতে ঋণ না নেওয়াই ভাল।"

ধর্মীয় বিরুদ্ধতা যখন ভয়ংকর চাপ সৃষ্টি করে, কর্মীদের প্রতি আমাদের নির্দেশ থাকে সবরকম হিংসাত্মক ঘটনা এড়িয়ে চলা। হিংসাশ্রয়ী কোনও প্ররোচনাকেই যথেষ্ট সতর্কভাবে মোকাবিলা করা হয়।

সেক্ষেত্রে কর্মীদের প্রত্যন্ত গ্রামের এক ছোট্ট অঞ্চলে খুব ধীর গতিতে কাজ শুরু করতে হয়। মাত্র কয়েকজন মহিলাকে ঋণ গ্রহণ করাতে সক্ষম হলেও অনেক কাজ হবে। কারণ, তখন তাঁদের প্রতিবেশীরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাবে যে ঋণগ্রহণের ফলে তাদের কোনও

www.pathagar.com

মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেনি।

অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখেছি, প্রাথমিক বাধার সময়টুকু সাবধানে অতিক্রম করতে পারলেই দ্রুত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যে মহিলারা আমাদের মুখের উপর স্পষ্ট 'না' করে দিয়েছিলেন, তাঁরা এবার বলতে শুরু করেন, "কেন নয়? আমার টাকার দরকার। অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি অভাব আমার।"

এইভাবে গ্রামজুড়ে ঋণ গ্রহণের সপক্ষে ইতিবাচক মনোভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। বিরুদ্ধপক্ষ শীঘ্রই রণে ভঙ্গ দেয়।

কিন্তু প্রতিটি নতুন গ্রামে প্রাথমিক সংগ্রামের দুরূহতম কাজটি আমাদেরই করতে হয়।

ধর্মীয় নেতারা নানাবিধ কাল্পনিক গুজব ছড়াতে শুরু করেন। পটুয়াখালির সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের ৩৫ বছর বয়স্ক মহারানী দাসকে এঁরা ভয় দেখিয়েছিলেন যে গ্রামীণ ব্যাংক তাঁকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করবে। ১৯৮৭ সালে গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ তার স্বামী তাকে মারধোর করেছে। এখন সেসব দিনের কথা ভাবলে তার কৌতুক উদ্রেক হয়। মনে হয় দুঃস্বপ্নের মতো। সেদিন যারা তাকে নিষেধ করেছিল আজ তারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রামীণ ব্যাংক যোগদানের জন্য সবাইকে উৎসাহিত করছে। ফরিদপুরে ২০ বছরের তরুণী কুটি বেগমের মা ও নানী বড়লোকের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করতেন। গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দিলে মধ্যপ্রাচ্যে ক্রীতদাস ব্যবসাদারদের কাছে বিক্রি হয়ে যাবার ভয় দেখানো হয়েছিল সেই তরুণীকে। সেই আতঙ্ক উপেক্ষা করে সে গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দিয়েছিল। পাইকপাড়া গ্রামের ৩৫ বছরের মানিকজান বিবি বলেন, "বড়লোক ও মহাজনেরা একযোগে বলেছিল গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দিলে আমি মুসলমান ধর্ম থেকে খারেজ বলে গণ্য হব। ব্যাংক আমাকে সমুদ্রের অতল গভীরে ডুবিয়ে দেবে। সেখান থেকে আর তীরে উঠবার সুযোগ পাব না।"

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের ৩৮ বছর বয়স্ক সখিনা খাতুনকে ভয় দেখানো হয়েছিল যে গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দিলে তার পবিত্র গোরস্থানে কবরস্থ হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। রাজশাহি জেলার একই বয়সি মনজিরা খাতুনকে ভয় দেখানো হয়েছিল যে তাকে নির্যাতন করে উল্কি এঁকে, হাতে নম্বর বসিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হবে।

গ্রামীণ সম্বন্ধে প্রচলিত আরও অভিযোগের গুজবগুলি এইরকম

—ধর্মান্তর (খ্রিস্ট ধর্ম অবলম্বনে বাধ্য করা)।

—বাড়ি, জমি আত্মসাৎ করা।

—ক্রীতদাস ব্যবসার এক গোপন প্রতিষ্ঠান।

—খ্রিস্টান যাজক সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশের পথ।

—মহিলা গ্রহীতাদের অপহরণ, যাদের আর কখনও পরে দেখতে পাওয়া যায় না।

—টাকা তছরুপ করে পলায়ন।

—আসলে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদানের কোনও উদ্দেশ্যই নেই। ঋণদানের প্রস্তাব এক উছিলা মাত্র।

—আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী চক্রের অংশবিশেষ।

নতুন এক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হল গ্রামীণ ব্যাংক। পাশ্চাত্য দুনিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার চক্রান্তের সহকারী আড়াই শতাব্দী পূর্বের ইতিহাস পুনরায় রচনা করতে একান্তভাবে উদ্যমী।

—গ্রামবাসীদের খ্রিস্টান করে তোলার উদ্দেশ্যে কর্মীরা গোপন শপথ গ্রহণ করে।

—মহিলাদের পর্দাপ্রথার বাইরে নিয়ে এসে পবিত্র ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করতে চায়।

—গ্রামবাসীদের ইসলাম ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নেবার মতলব এসেছে।

www.pathagar.com

—ম্যানেজাররা কুমতলবে মহিলাদের পিছু নিয়েছে।

—মৃতদেহগুলি কবর খুঁড়ে উদ্ধার করলে দেখা যাবে গ্রহীতাদের অঙ্গে উল্কি করে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত তালিকায় আরও বহু অভিযোগ ও বদনাম সংযোজন হতেই থাকত। পরিস্থিতি হয়ে উঠত খুবই সংবেদনশীল ও উত্তেজনাপূর্ণ। উভয় পক্ষই কাজের গতি স্তিমিত করতে থাকত। শুরু হয়ে যেত ঠান্ডা লড়াই।

ধর্মীয় নেতারা যতই ভয় দেখান—হতদরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলারা গ্রামীণে যোগদানের সিদ্ধান্তে অটল থাকতেন। তাঁদের অনাহারে থাকতে হত। ভিক্ষা ভিন্ন ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় ছিল না, নতুবা সন্তানদের উপবাস সহ্য করতে হত। সাহায্য করার, ভরসা দেবার মতো কেউই নেই। অতএব তাদের কিছু হারাবার ভয়ও নেই।

দু'টি পথ তাদের সামনে খোলা—আমাদের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ অথবা অনাহারে মৃত্যুবরণের ঘটনাকে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় স্বীকার করে নেওয়া।

যাঁরা এইসব গুজবকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারতেন না, মনের মধ্যে দোটানা চলত যাঁদের, তাঁরাও স্বচক্ষে দেখতেন, গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজারদের কোনওমতেই ইসলাম বিরোধী আখ্যা দেওয়া যায় না। ধর্মীয় ব্যাপারেও তাঁরা অন্যদের চেয়ে অনেকগুণ নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী।

* * *

প্রহার বা প্রাণনাশের আশঙ্কার আভাস পেলেই, ব্যাংককর্মীদের উপর নির্দেশ আছে অবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করার। একটি ভয়ানক রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের কাহিনী বর্ণনা করলে আমাদের কর্মকৌশল বুঝতে সুবিধা হবে।

সেই গ্রামে জনৈক ধর্মীয় নেতা গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে এসে বলেছিলেন, "এই গ্রামে প্রবেশ করার ইচ্ছা থাকলে নিজের দায়িত্বে তা করবেন। আপনি বা আপনার কর্মীদের দৈহিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারব না।"

ম্যানেজার যুক্তি দিয়ে সেই নেতাকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। যখন দেখলেন কোনওক্রমেই তাঁর মনোভাব নরম হবার নয়, তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সম্ভাব্য সদস্যরা এসে তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করল। তিনি ব্যাখ্যা করলেন।

"আমাকে অমুক সাহেব বলেছে, এই গ্রামে ঢুকলে আমার প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। আপনারা যদি গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য হতে ইচ্ছুক হন তা হলে আপনাদেরই উদ্যোগী হয়ে প্রতিবেশী গ্রামের প্রাথমিক সভায় অংশ নিতে হবে।"

কয়েকজন মহিলা রোজ পাশের গ্রামে যেতে শুরু করলেন। 'দল' গঠন ও গ্রামীণ ব্যাংকে যোগদানের ব্যাপারে তারা সংগঠিত হবার কাজে লেগে গেলেন। বাকিরা যাঁরা অন্য গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁরা সোজা চলে গেলেন সেই ধর্মীয় নেতার কাছে। সরাসরি প্রশ্ন করলেন, "কেন আপনি গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজারকে ভয় দেখিয়েছেন?"

মৌলভি সাহেব পালটা প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি দোজখে যেতে চাও?"

"গ্রামীণ ব্যাংক আমাদের গ্রামে এসেছে মঙ্গল করার জন্য, আর কোনও উদ্দেশ্য তাদের নেই।"

"এটা একটা খ্রিস্টান সংস্থা।"

www.pathagar.com

"গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার একজন মুসলমান। তিনি আপনার চেয়েও ভাল কোরাআন বোঝেন।"

"গ্রামীণ ব্যাংক পর্দাপ্রথা উচ্ছেদ করতে চায়। সেই উদ্দেশ্যেই ওদের গ্রামে আগমন।"

"একেবারেই নয়, হাতের কাজ তো আমরা বাড়িতেই করি। ধান ভানা মাদুর বোনা, বাঁশের মোড়া বানানো, গোরু বাছুর পালন, বাচ্চাদের ভালভাবে মানুষ করা এসব কাজের জন্য কি আমাদের বাইরে পা দিতে হয়? ব্যাংককর্মী নিজে আমাদের বাড়ি আসেন। তাঁরা পর্দাপ্রথার বিরোধী বললেই মেনে নিতে হবে? বরং আপনারাই পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করছেন। আপনার জন্যই সব বিষয়ে জানতে আমাদের মাইলের পর মাইল হেঁটে দূর গ্রামে যেতে হয়। আপনারাই আমাদের জীবন নষ্ট করেছেন, গ্রামীণ ব্যাংক নয়।"

"মহাজনের কাছে যাও। সেও ধর্মপ্রাণ মুসলমান।"

"কিন্তু সে সপ্তাহে ১০ শতাংশ সুদ নেয় এটাও সত্যি।"

"তোমাদের আত্মা দোজখে পচবে।"

"যদি গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ দেওয়া আপনাদের এতই অপছন্দ তা হলে আপনারাই বরং আমাদের ঋণ দিন।"

"দূর হও। দিনরাত কেবল একই কথা নিয়ে ক্রমাগত জ্বালাতন করে চলেছ।"

"গ্রামীণ ব্যাংক-কে গ্রামে ঢোকার অনুমতি দিলে তবেই যাব। তার আগে নয়।"

"রাস্তা দেখো। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।"

"যাচ্ছি। তবে রোজ আসব। একই ভাবে আপনাকে বিরক্ত করে যাব, যতক্ষণ না গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামে ঢোকার সম্মতি পায়।"

"ঠিক আছে। উচ্ছন্নে যাও সব। যদি হাবিয়া দোজখে বাস করতে চাও তো গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দাও। তোমাদের রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তোমাদের সাবধান করিনি বলে কেউ আমায় দোষ দিতে পারবে না। যাও, ধার কর। নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আন।"

মহিলারা তো আহ্লাদে আটখানা। দল বেঁধে তাঁরা হাজির হলেন পাশের গ্রামে। গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজারকে সুখবর দিলেন।

"আপনারা নির্ভয়ে গ্রামে ফিরে আসুন। আমরা মৌলভিসাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি—তাঁর আর আপত্তি নেই।"

তাঁদের ধৈর্য ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতি অসীম আস্থার জন্য ম্যানেজার তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, "যেহেতু কিছু লোক আমাদের দৈহিক নির্যাতন করবে বলে শাসিয়েছে, তারা যদি নিজে এসে আমাদের অনুরোধ করেন তবেই আমরা গ্রামে প্রবেশ করব। আমি সবরকম ভুল বোঝাবুঝি একেবারে পরিষ্কার করে নিতে চাই। আমার ও আমার সহকর্মীদের প্রাণের ভয় নিয়ে, মাথার উপর খাঁড়া ঝুলিয়ে রেখে আমি কাজ করতে পারব না।"

মহিলারা গ্রামে ফিরে গিয়ে ফের মৌলভিসাহেবকে ধরলেন। ক্রমাগত তর্ক করে যেতে লাগলেন। তাঁদের কোনও ক্লান্তি নেই। কিন্তু মৌলভিসাহেব ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল প্রথম থেকে ব্যাপারটায় জড়িয়ে পড়ে কী ভুলই না করেছেন। আর কাঁহাতক যুক্তি খাড়া করবেন? শেষ রক্ষা করা আর তাঁর বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না। মহিলাদের দৈনিক জেরার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য তিনি নিরুপায় হয়ে রাজি হলেন। পাশের গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক অফিসে মৌলভিসাহেব নিজে এলেন। অফিসে আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের গ্রামে ফিরে যেতে বললেন, যদিও খুব আন্তরিক আমন্ত্রণ নয় তবু তাঁর সম্মতির সাক্ষী রইলেন সবাই। প্রত্যেকে শুনল মৌলভিসাহেব বলছেন, "শুনুন। আগে যা বলেছি ভুলে যান। গ্রামে ফিরে আসুন, নির্ভয়ে থাকুন। আপনাদের প্রাণনাশ বা সম্পত্তির ক্ষতি হবার কোনও

www.pathagar.com

সম্ভাবনা নেই। মহিলারা চায় আপনারা গ্রামে আসুন। আমারও কোনও আপত্তি নেই।"

স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রামীণ ব্যাংক ধীর গতিতে কাজ এগিয়ে নিয়ে গেল। কোনও ব্যাপারেই তার তাড়াহুড়ো নেই। আমরা সময় নিয়ে কাজ করার পক্ষপাতী।

* * *

ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ইসলাম বিরুদ্ধ নয়। মহিলাদের নিজেদের জীবিকা অর্জনের বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অধিকারের জন্য কোনও অন্তর্নিহিত বাধা নিষেধ নেই।

১৯৯৪ সালে ইরানের মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারের উপদেষ্টা ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় গ্রামীণ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, "আপনার কাজের সঙ্গে শরিয়তের কোনও বিরোধ নেই। মহিলারা কেন ক্ষুধা ও দারিদ্রের যন্ত্রণা ভোগ করবে? বরং আপনি যা করছেন তা এক কথায় অতুলনীয়, অতিশয় চমৎকার। একটি গোটা প্রজন্মের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা আপনি করেছেন। গ্রামীণের ঋণের সুবাদে মহিলারা শুধু ঘরে বসে না থেকে খেটে উপার্জন করতে পারছেন। এ তো তাদের পরম সৌভাগ্য। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য ধন্যবাদ।"

সুদ সংক্রান্ত বিষয়েও কোনও সমস্যা থাকল না। গ্রহীতারাই গ্রামীণ ব্যাংকের মালিক। ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বহু পণ্ডিত আমাকে বলেছেন যেহেতু গ্রামীণ ব্যাংক গ্রাহকদেরই মালিকানার প্রতিষ্ঠান তাই ব্যাংক তাদের কাছ থেকে যা নিচ্ছে সেটাকে 'সুদ' বললে এটা ধর্মবিরোধী কোনও কাজ হবে না। সুদের ব্যাপারে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য গরিব মানুষদের মহাজনদের কবল থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু গরিব যেখানে নিজেই ব্যাংকের মালিক, সুদ তারা নিজস্ব সংস্থা বা সংগঠনকে দিচ্ছে। ব্যাংকের মুনাফা তাদের কাছেই ফিরে আসছে।

আমাদের বিশ্বাস গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে তর্কাতর্কির ফলাফল কখনও ভাল হয় না। তাঁদের মত সর্বদাই আমাদের বিপক্ষে। একটা সাধারণ অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলতে এঁদের জুড়ি মেলা ভার। মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে গাঁথা সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করে অন্যভাবে ভাবতে তাঁরা কখনও সাহায্য করেন না। সব দিক থেকে পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে যায়।

গ্রামীণ ব্যাংক সততই ব্যক্তিগত উন্নয়নের সপক্ষে। উন্নয়নই পরিবর্তনের ধারক ও বাহক। প্রতিটি জীবনের মান উন্নয়নই দিন বদলের সূচনা চিহ্নিত করে। এই পরিবর্তনের অর্থ অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ নয়। এর প্রকৃত ভূমিকা হল দারিদ্রের ভয়ংকর পরিস্থিতিকে পরাস্ত করা। জীবনযাপনের মান উন্নয়ন পরিবর্তনের অন্যতম ব্যঞ্জনা।

* * *

গ্রামীণ ব্যাংক কোনও ব্যক্তি বা দর্শনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে না। গ্রামীণ ব্যাংক মানুষকে দারিদ্র নামক পিশাচের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে চাইছে, আশাহীন জীবনের প্রতি অন্যায় অবিচারের অবসানের স্বপ্ন দেখছে।

দারিদ্রের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের কাহিনী এখন প্রায় সারা বিশ্বে প্রচারিত। কিন্তু একটি অধ্যায় কারওরই জানা নেই তা হল ক্ষুদ্র-ঋণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। শুধু ক্ষুধার কবল থেকেই নয়, ক্ষুদ্র-ঋণ মানুষকে রাজনৈতিক ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নির্বাচনের সময়কার এক ঘটনার কথা বলি।

www.pathagar.com

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ক্ষুদ্র-ঋণ কেবল দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার নয়। পিতৃতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও চরমপন্থীদের কবল থেকে পদদলিত হতদরিদ্রের মুক্তি পাবার অন্যতম অস্ত্রও বটে।

১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৭৩ শতাংশ ভোট পড়েছিল। এর মধ্যে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা কোথাও প্রকাশিত হয়নি। গ্রামীণ ব্যাংকের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে, পুরুষের তুলনায় মহিলারা ছিলেন সংখ্যায় অধিক।

এর আগে মহিলারা কম সংখ্যায় ভোট দিতে আসতেন বলে নির্বাচন কর্মীরা পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট বুথের সংখ্যা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট বুথের দ্বিগুণ রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন যেহেতু মহিলারা বিপুল সংখ্যায় ভোট দিতে এসেছেন তার ফলে মহিলা ভোটারদের সারিবদ্ধভাবে ঘণ্টা তিনেকের বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে। যেখানে পুরুষদের অপেক্ষা করতে হয়েছে এক ঘণ্টারও কম সময়। কাকে ভোট দেবেন তা মহিলাদের শিখিয়ে দিতে হয়নি। তাঁদের অনেকেই পিতৃতান্ত্রিক গোঁড়া মৌলবাদীদের দ্বারা মানসিকভাবে নির্যাতিতা হয়েছেন। তাঁদের বেঁধে দেওয়া নিয়মের বিরুদ্ধে যাবার জন্য সর্বদা শাসানি সহ্য করতে হয়েছে।

মহাজনদের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য, ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য, ধার করার জন্য অদম্য সাহস, ইচ্ছাশক্তি ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। তাই ভোট দেবার সাহসও তারা অর্জন করবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। ভোটাধিকার তাদের কাছে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের জন্য আবেদন জানাবার এক অধিকার বিশেষ।

আগের জাতীয় সংসদে ইসলামিক দলের ১৭টি আসন ছিল। ১৯৯৬ সালে তারা ১৪টি আসন হারাল। এই দলের ব্যর্থতার যা যা কারণ সমীক্ষায় দেখানো হয়েছিল তার একটি হল মহিলা ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধি। তাঁরা যখন ভোট দিয়েছেন তখন শুধু কেবলমাত্র একটি প্রার্থীর নামের পাশে ছাপ মারেননি, তাঁরা ভোট দিয়েছেন ধর্মীয় গোঁড়ামির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য।

* * *

১৯৯৫ সালে নিউইয়র্কে বিশ্বনীতি নির্ধারণকারীদের সঙ্গে একবার বৈঠকে বসেছিলাম। দারিদ্র দূরীকরণের জন্য তাঁদের তেমন কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয়নি। ইসলামী ধর্মান্ধতার মোকাবিলা কীভাবে করা যায় সে ব্যাপারে তাঁরা আমাকে সমানে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে গেলেন। আমি তাদের স্পষ্টভাবে জানালাম যে কারওর সঙ্গে বাদানুবাদ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা গ্রামীণ ব্যাংকের নেই। ধর্মান্ধতার সঙ্গে যুদ্ধবিবাদের প্রশ্নই ওঠে না। দরিদ্র ও সর্বহারাদের ঋণলাভের যোগ্যতা প্রমাণ করে, তাদের সেই সুযোগ করে দেওয়াই আমার কাজ, যাতে কেবলমাত্র এতদিন ধনীদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। সমাজে এতদিন যা ছিল অনড়, অচল, পরিবর্তনের অযোগ্য বলে বিবেচিত, এই কাজ সেই বন্ধ দরজা উন্মুক্ত করে দিতে সাহায্য করল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের গ্রহীতারা চরমপন্থীদের ঢালাও বিধিনিষেধ আগ্রহ্য করার সৎসাহস ও ভরসা লাভ করেছেন।

শ্রোতারা মনোযোগ সহকারে আমার বক্তৃতা শুনলেন। তাঁদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল এই ধর্মীয় আগ্রাসন রোধ করার উপায় অনুসন্ধান। দারিদ্র দূরীকরণ ও দরিদ্রদের মানবিক অধিকার অর্জনের স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবেই এই অন্যায় আগ্রাসনের প্রতিকার আসবে বলেই আমার একান্ত বিশ্বাস।

অত্যাশ্চর্য ঘটনা হল ক্ষুদ্র-ঋণের সহজ ও স্বাভাবিক কার্যকারিতা। বড় অঙ্কের মূলধন

www.pathagar.com

বিনিয়োগ যেমন সুফল দেয় তারই ক্ষুদ্র এবং আপাত গুরুত্বহীন সংস্করণের ভূমিকাও একইভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি সৃজনশীল ও অর্থনৈতিক জীবনধারার স্বাভাবিক উৎস। সেইজন্য মানুষ তাদের পুঁজি বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে এর মাধ্যমে অর্জন করে মানবিক অধিকার। তাদের জীবন হয়ে ওঠে উন্নত, অর্থপূর্ণ। সারা পৃথিবীতে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

পশ্চিমের বিখ্যাত কিছু বিশ্ব কৌশল নির্ধারকরা মনে করেন যে পৃথিবীতে ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কোনও কোনও চরমপন্থী গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদের প্রবল পরাক্রমকে তারা এটার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

গ্রামীণ ব্যাংকে আমরা সবাই পৃথিবীকে অন্যভাবে দেখি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সব মহিলাদের আমরা ঋণ দিই। আমাদের পরিচালক মণ্ডলীতে সব ধর্মের মানুষ রয়েছে।

গরিব মানুষ যদি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, নিজের মূলধনের দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ, কর্মঠ, চিন্তাশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তিমানুষে পরিণত হয়, তাহলে ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের সুযোগ কোথায়?

বাংলাদেশে আমরা যা শিখেছি, আশা করি পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদের প্রবক্তাদের তা বুঝতে এবং শিখতে অসুবিধা হবে না।

ক্ষুদ্র-ঋণের অতিরিক্ত সুফলগুলি শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক পরিবর্তনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অশেষ ধন্যবাদ। বাংলাদেশের দরিদ্রতম মহিলারা যাঁরা পর্দাপ্রথার কড়াকড়িতে ঘরের বাইরে পা রাখতে পারতেন না, তাঁরা এখন দূরে গিয়ে অন্য মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। নরওয়ের আর্কটিক অঞ্চলে মহিলারা সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিল। ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প সেই দ্বীপপুঞ্জে মহিলাদের তথা অধিবাসীদের পুনর্বাসনে সাহায্য করেছে। শিকাগো ও আরকানস-তে মহিলাদের রাষ্ট্রীয় সাহায্য নির্ভরতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বনির্ভর করে তুলতে সহায়তা করেছে। উত্তর আমেরিকায় আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় অতিমাত্রায় মদ্যপান বন্ধ করে মানুষজনকে কর্মঠ করে তুলতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-ঋণ ধর্মীয় মৌলবাদকে পরাজিত করেছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই।

ক্ষুদ্র-ঋণ সব ব্যাধির নিরাময় নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে পরিবর্তনের পিছনে এক বিরাট শক্তির উৎস। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনও বটে।

www.pathagar.com

২০
প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য অন্তরায়

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দেশ। দুর্ভাগ্যবশত এর মধ্যেই আমাদের কাজ করতে হয়।

বিপদসংকুল আবহাওয়া বা ব্যক্তিগত সংকট যাই ঘটুক না কেন ঋণের কিস্তি শোধের জন্য আমরা গ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হই। এই আমাদের কর্মদর্শন। যার অন্যতম উদ্দেশ্য হল গ্রহীতাদের এতদিনের গড়ে তোলা আত্মবিশ্বাস, গর্ব ও মর্যাদাবোধকে আরও উজ্জীবিত করে তোলা। কোনও প্রতিকূল অবস্থায় ঋণ মকুব করে দিলে ঠিক তার বিপরীত চিত্র দেখা যাবে—তারপর গ্রহীতাদের আত্মমর্যাদা পুনর্গঠন করা দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠবে।

বন্যা বা খরা একটা গ্রামকে বিধ্বস্ত করে দেয়। গ্রাহকদের ফসলের ক্ষতি করে। গৃহপালিত পশুদের মড়ক লাগে। সেক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ সম্ভব করে তোলবার জন্য আমরা তাদের তৎক্ষণাৎ ঋণ দেবার ব্যবস্থা করি। পুরনো অনাদায়ি ঋণ থেকে কিন্তু তাদের অব্যহতি দেওয়া হয় না। বরং আগের ঋণের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে তা শোধের সুযোগ করে দেওয়া হয়।

চরম কোনও পরিস্থিতির দরুণ গ্রাহক বা গ্রাহিকার মৃত্যু ঘটলে আমাদের কেন্দ্রীয় জরুরি আপৎকালীন তহবিল (জীবনবীমা তহবিল) থেকে তাৎক্ষণিকভাবে মরহুমের পরিবারকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। মরহুমের স্থানে পরিবারের অন্য কোনও সদস্যকে গ্রাহক পদ দেবার ব্যবস্থা করা থাকে।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এত বেশি ঘটে যে, কখনও কখনও কোনও অঞ্চলকে একই সঙ্গে একাধিক দুর্বিপাকের শিকার হতে হয়। একই বছরে কোনও গ্রাম বা জেলা বা গোটা অঞ্চল বন্যার কবলে পড়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এসব ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের সব সম্বল ও সঞ্চয় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে গ্রামীণ ব্যাংক সর্বদা একই নীতি ও কার্যপ্রণালী অবলম্বন করে চলে।

প্রথমেই ব্যাংকের সব নিয়ম কানুন শিথিল করে দেওয়া হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের স্থানীয় ম্যানেজার ও কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া থাকে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাপ করতে, দুর্গতদের খাদ্য, আশ্রয়, ওষুধপত্রের সংস্থান, বৃদ্ধ ও শিশুদের যথাযোগ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগী হতে। তাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের ত্রাণকার্যের মূল লক্ষ্য হবে সকলের জীবন রক্ষা।

ব্যাপারটা বলা যতটা সহজ, কাজে পরিণত করা ততটাই কঠিন। ১৯৯১ সালে দক্ষিণ বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের জলোচ্ছ্বাস প্রায় এক লাখ পঞ্চাশ হাজার মানুষের প্রাণনাশ করেছিল। যাঁরা রক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁরা আতঙ্ক ও মানসিক আঘাতে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে গেছিলেন।

সেই ভয়ংকর রাতে সতর্কতামূলক সাইরেনের সুতীক্ষ্ণ আওয়াজে তাদের ঘুম ভেঙে গেছিল। অতীতে বহুবার এরকম সতর্কবার্তা প্রচারিত হয়েছে। বহুবার এমন শব্দ শুনেছে সবাই। অনেকেই প্রথমে ব্যাপারটার ততটা গুরুত্ব দেয়নি। পরিস্থিতি যে এমন ভয়াল রূপ ধারণ করবে তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। প্রায় সম্পূর্ণ অতর্কিতে রাত দু'টোর সময় প্রবল ঘূর্ণিঝড় প্রচণ্ড দাপটে আছড়ে পড়ল উপকূলবর্তী এলাকায়। গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার ও কর্মীরা গুরুতর ভাবে আহত হলেন। প্রাথমিক বিহ্বল অসাড় অবস্থা কাটিয়ে তাঁরা নৌকা চড়ে বার হলেন দুর্গত মানুষদের উদ্ধার করতে। চারিদিকে তখন পড়ে আছে মানুষ ও পশুর শবদেহ। পচন ধরে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।

জীবিত মানুষদের উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তাদের অনেকেই হাল ছেড়ে হতভম্বের মতো বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুণছিল। কী করবে, কোথায় যাবে তার কোনও হদিশ ছিল না। অধিকাংশই বসে ছিল ধসে পড়া ঘরের পাশে। সাইক্লোনের হাত থেকে সামান্য যা সম্বলটুকু রক্ষা করতে পেরেছে তা লুঠ হয়ে যাবার আশঙ্কায় অতন্দ্র পাহারায় সজাগ ছিল তারা। এইরকম ভয়ংকর দুর্যোগের মধ্যে যারাও বা বেঁচেবর্তে থাকে তার পরের মানসিক প্রচণ্ড আঘাতে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। অনেক নিরাশ্রয় মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে।

ব্যাংককর্মীদের দ্বিতীয় কর্তব্য হল তৎক্ষণাৎ আমাদের গ্রাহক ও সদস্যদের বাড়ি গিয়ে ভরসা দেওয়া। দুর্গতদের সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া। তাদের হৃত আত্মবিশ্বাস পুনরায় গড়ে তোলবার উদ্দীপনা জোগায় এই সব কর্মীরা। নতুন করে অস্তিত্ব ফিরে পেলে কীভাবে আবার তারা জীবন শুরু করবে তার ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে যায় একই সঙ্গে। সেই সুযোগ তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ নেওয়া হয়।

দুর্গতদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় ও স্যালাইন সরবরাহ করা হয় ডায়রিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে। বীজ বন্টন করা হয়। গবাদি পশু ক্রয়ের জন্য, নতুন করে মূলধন গড়ে তোলার জন্য নগদ টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

মানসিক শক্তি অর্জন করতে এই সদ্য প্রদত্ত ঋণের গুরুত্ব অসীম। প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথা প্রশমনের জন্য তাদের দরকার সময়। তাই বলে হতাশায় পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়ে উদ্যম হারিয়ে একদম নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকাটাও কাম্য নয়।

ভগ্নদশা থেকে আবার উঠে দাঁড়াবার জন্য তাদের আলো দেখায় আমাদের কর্মীরা। যা তারা হারিয়েছে তা ফিরে পাবার, নতুন করে সব গড়ে তোলবার উৎসাহ জোগায় তারা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহায্য পৌঁছতে দেরি হয়। উপরন্তু তা যথেষ্ট নয়। তাদের যন্ত্রণা ও ধ্বংসের আঘাত থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ভেঙে না পড়া—নতুন উদ্যমে আবার সব গড়তে শুরু করা।

আমাদের ব্যাংক তাদের সাহায্যকল্পে অঙ্গীকারবদ্ধ। এটা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তাদেরও এ ছাড়া গতি নেই। আমরা বদ্ধপরিকর, সদস্যদের আমরা এভাবে মৃত্যুর কাছে হার মানতে দেব না। আবার তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেব।

তৃতীয়ত, পুরোনো ঋণগুলিকে নতুনভাবে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ফেরত দেবার জন্য সময় অনেক দুর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষগুলিকে কতদিন পর্যন্ত সময় দেওয়া যেতে পারে তার সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রের উপর। এক জরুরি সভা ডেকে এই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থত, বিপর্যস্ত, সংবেদনশীল অঞ্চলগুলির নিরাপত্তার জন্য আমাদের পরিকল্পনা হয় দীর্ঘমেয়াদি। সাইক্লোনের জন্য বিশেষভাবে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। প্রশিক্ষণ চালু করা হয়, যাতে করে সঠিক সময়ে গ্রামবাসী বাচ্চাদের নিয়ে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাণ বাঁচাতে পারে।

আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে কতগুলি বিপর্যয়ে গ্রামীণ ব্যাংক সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে তার কোনও পরিসংখ্যান গ্রামীণ ব্যাংক রাখে না। আমার অনুমান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের করাল আগ্রাসন থেকে যারা জীবন ফিরে পেয়েছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য আমাদের প্রদত্ত মোট ঋণের পাঁচ শতাংশ ব্যয় হয়।

বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার কাজে আমরা দক্ষতা অর্জন করেছি। উপকূলবর্তী গ্রামীণ ব্যাংক শাখা-অফিসগুলির গাঁথুনি শক্ত সিমেন্ট কংক্রিটের দ্বারা নির্মিত। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় থেকে বাঁচবার জন্য সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল বানানো হয়েছে। নিজেদের সর্বদা অসহায় প্রতিপন্ন করে আন্তর্জাতিক দাতাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা একজাতীয় অভ্যাস। বিদেশি রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পাবার জন্য সরকারের অন্যতম কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অজুহাত দেখানো। এই বই যখন মুদ্রণের কাজ চলছে (১৯৯৮) তখন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের অনেকেই গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহক, বন্যার দাপটে নিঃস্ব, উপার্জনহীন, গৃহহারা হয়েছে। বিরাট বিপর্যয় ঘটলেও এখন তা আন্তর্জাতিক মনোযোগ সেভাবে আকর্ষণ করতে পারছে না।

এ ব্যাপারে অতীতের সরকারি নীতি সম্পূর্ণ উলটো ফল দিয়েছে। সরকার যদি নামমাত্র সুদে বা বিনা সুদে ধার দেন ও দরিদ্র জনগণের কাছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সুদ নেবার জন্য ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচির সমালোচনা করেন, তাহলে স্বনির্ভর ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালু রাখা এক কথায় অসম্ভব।

সরকার যখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির প্রদত্ত ঋণ অবলীলাক্রমে মকুব করে দেন, তখন ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের ঋণ আদায় করা অসম্ভব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

* * *

প্রমীলার কাহিনী শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন কীভাবে আমাদের গ্রহীতাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। ১৯৭১ সালের জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরে অক্টোবর মাসে দু'-দু'বার পাকবাহিনীর সেনারা প্রমীলার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৮৬ সালে তিনি তন্ত্র প্রদাহ রোগে আক্রান্ত হয়ে টাঙ্গাইল হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে অস্ত্রোপচারের পর ডাক্তাররা কয়েক বছর তাঁকে ভারী কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে দলগত তহবিল থেকে ধার করার পরামর্শ দিল সহযোগী সদস্যরা। কিন্তু তাতেও তিনি টাকায় কুলোতে পারলেন না। গোরু, ছাগল ও নিজের মুদির দোকান বেচে দিতে বাধ্য হলেন তিনি।

তাঁর জন্য আলাদাভাবে নতুন ঋণের সংস্থান করা হয়। তা দিয়ে তিনি দুধেলা গাই কিনেছিলেন। সেই গাই আবার অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়ল। তখন তিনি কেন্দ্রের সাপ্তাহিক বৈঠকে আর্জি জানান তাঁকে আরও কিছু টাকার সংস্থান করে দেবার জন্য। ৩০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তিনি আবার একটি গোরু কিনেছিলেন।

১৯৮৮ সালের বন্যায় প্রমীলাদের ছাব্বিশ গ্রাম পানির অতলে তলিয়ে যায়। প্রমীলার ঘর-বাড়ি ফসল সব আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গ্রামে নানা অসুখ, এককথায় মহামারীর

www.pathagar.com

প্রাদুর্ভাব হওয়ায় গ্রামীণ ব্যাংক তিন সপ্তাহের জন্য তাদের কেন্দ্রের বৈঠক স্থগিত রাখে। ব্যাংককর্মীরা এসময় প্রতিদিন গ্রামে যেতেন, পানি পরিশোধনের ট্যাবলেট বিতরণ করতেন। দূষিত পানি পান করার মারাত্মক ফল সম্পর্কে তাদের অবহিত করতেন। গ্রামীণ ব্যাংক থেকে প্রমীলা ৪০ কেজি গম ও শস্যবীজ পেয়েছিলেন। তার মূল্য তিনি ফেরত দিয়েছিলেন, তা গ্রামীণ ব্যাংকের দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিলে জমা রাখা হয়েছিলেন। তিন সপ্তাহ পরে অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেলে তিনি তাঁর মুদির দোকান চালু করেছিলেন।

১৯৯২ সালে কেরোসিনের বাতি থেকে আগুন লেগে তাঁর ঘর আবার সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রতিবেশীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও আগুনের লেলিহান শিখা থেকে শস্য, খাদ্য, মুদির দোকানের মালপত্র, দুটো গোরু কিছুই রক্ষা করতে পারেনি। শুধু পরনের কাপড় ছাড়া সঞ্চয় বলতে পরিবারের আর কিছুই ছিল না।

পরদিন সকালে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁদের সাহায্যকল্পে একটি বিশেষ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তাতে স্থির হল কেন্দ্রীয় দুর্যোগ তহবিল থেকে তাঁদের ঋণ দেওয়া হবে। তাতে রাজি না হয়ে মৌসুমী ঋণ ও দলীয় তহবিল থেকে ঋণ নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রমীলা। কিছু টাকা দিয়ে তিনি একটি ছোট্ট মুদির দোকান খুললেন। বাকি টাকায় তিনি চাষের জমির জন্য সার কিনলেন। তিনটি কর্মঠ সাবালক ছেলের সাহায্যে তিনি ঋণ পরিশোধ করতে শুরু করলেন। তিনমাস পরে গ্রামীণ ব্যাংক তাঁকে গৃহনির্মাণ ঋণ মঞ্জুর করল। তার নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হল।

সম্প্রতি তার দ্বাদশতম ঋণ চলছে। তিনি এখন জমির মালিক। তা ভাগচাষে দিয়ে সারা পরিবারের আহারের সংস্থানের পরও তিনি বছরে ১০ মণ ধান বিক্রি করেন।

www.pathagar.com

২১
গ্রামীণ ব্যাংককর্মীদের প্রশিক্ষণ

আমাদের সাফল্যের রহস্য অনেক। তার মধ্যে অন্যতম হল আমাদের কর্মীদের কঠিন পরিশ্রম ও অভাবনীয় নিষ্ঠা।

কর্মীদের কাজের উদ্যম ও আত্ম উৎসর্গের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি করার জন্য আমরা তাজা নবীন তরুণদের শাখা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে থাকি। যাঁদের অন্য কাজের অভিজ্ঞতা নেই তারাই এই কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

গ্রামীণ ব্যাংকে চাকুরি প্রার্থীদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে কোনও চাকরিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তাদেরকে আমরা পারতপক্ষে বাছাই করি না। আমরা মনে করি পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে ব্যাঘাত করবে। আমরা যেভাবে কর্মীদের গড়ে তুলতে চাই তার সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করবে।

অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজে ইস্তফা দিয়ে যাঁরা গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দিতে যান তাঁদের তুলনায় আমাদের নিজস্ব কর্মীদের কর্মনিষ্ঠা অনেক বেশি লক্ষ করা যায়। আমাদের কর্মীদের কর্তব্যে বিশ্বস্ততা বোধ আরও বেশি জাগিয়ে তুলতে আমরা একান্ত আগ্রহী।

বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করলে সমস্যাই শুধু সৃষ্টি হয়। তাঁরা একই ভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন। একই পদ্ধতিতে সে প্রশ্নের বিচার করবেন। অবশেষে সিদ্ধান্তও হবে একই ছাঁচে ঢালা। একটু বুদ্ধি খরচ করে অন্যভাবে বিষয়গুলি উপস্থাপনা করলে যে অর্থ অন্যরকম দাঁড়ায়, একথা বিশেষজ্ঞদের বোঝানো অসম্ভব।

অনেক সময় বিশেষজ্ঞরা নতুন প্রতিষ্ঠানের মেজাজ বুঝে তাঁদের ভাষা পরিবর্তন করেন। কিন্তু মন পরিবর্তন করতে পারেন না। এটা হয়ে ওঠে প্রতিষ্ঠানের জন্য আরও ভয়াবহ। এজন্য আমরা বিশেষজ্ঞ নেয়া পরিহার করে গেছি। শুধু শুধু এরকম বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সময়ের অপচয় করার দরকার কী? এই ঝুঁকি নেবারও বা প্রয়োজন কেন?

একটি শাখা পরিচালনার জন্য যদি পাঁচজন কর্মী দরকার হয় আমরা দশজন কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। প্রশিক্ষণকালীন কৃতিত্বের ভিত্তিতে পাঁচজনকে নির্বাচিত করা হয়।

শুধুমাত্র গরিবদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এরকম একটা প্রকল্পের কাজকে একটা বিশেষায়িত কাজ এটি প্রথম থেকেই গ্রহণ করে এগুতে হবে। পরিকল্পনা থেকে শুরু করে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়েই একই কথা প্রযোজ্য।

'দরিদ্রদের জন্য ব্যাংক' যদি এক ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে কর্মীদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মের কর্মী।

www.pathagar.com

* * *

সাধারণ এক যুবকের সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মী বা ম্যানেজারের পার্থক্য কোথায়? প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ সফল করার অদম্য উৎসাহ বা আগ্রহই কি এই পার্থক্যের গোড়ার কথা?

আমাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই প্রশ্নের উত্তর।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতির অসাধারণত্ব কিছুই নেই, শুধু তা হল খুবই কঠিন ও শ্রমসাধ্য। পদ্ধতিটি সাধারণ কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীকে নিজে নিজে শিখতে হবে। মুখস্থ করার জন্য কোনও পাঠক্রম বা পাঠ্য পুস্তক নেই। আমাদের বিশ্বাস বাংলাদেশের গ্রামগুলি নবীন যুবকদের যে-শিক্ষা দিতে পারে, পৃথিবীর কোনও বইয়ের পাতায় তা পাওয়া সম্ভব নয়।

যে-কোনও বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ২৭ বৎসর অনুত্তীর্ণ যুবক গ্রামীণে ব্যাংক ম্যানেজার পদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

আমরা জাতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিই। হাজার হাজার আবেদনপত্র জমা পড়ে। বড় ইচ্ছা হয় সব প্রার্থীকেই নিয়োগ দিয়ে দিই। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। এদের অর্ধেকেই ব্যাংক ম্যানেজার হিসেবে অসম্ভব দক্ষতা লাভ করবে এ বিশ্বাস আমার পুরোপুরি আছে। গ্রামীণ ব্যাংকে সুযোগ সীমিত বলে আমরা ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে যোগ্যতর কয়েকজনকে নির্বাচিত করে থাকি।

নির্বাচিত প্রার্থীদের আমাদের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রথম দু'দিন আলোচনার আয়োজন করা হয়। তারপরের ছ'মাসের জন্য প্রার্থীদের বিভিন্ন শাখায় পাঠানো হয়। যাবার আগে তাদের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের দৃঢ় নির্দেশ হল, "সব কিছু খুব যত্ন সহকারে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যে শাখায় প্রথম ছ' মাস কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছে; নতুন স্থাপন শাখার কর্মধারা আরও উন্নত করাই হবে এই ছ' মাসের প্রশিক্ষণের প্রধান লক্ষ্য। সেদিকে সজাগ সচেতনতা বজায় রাখতে হবে।"

গ্রামীণ ব্যাংকের শাখাগুলির কর্মপদ্ধতি শিক্ষার্থীরা নিজেরাই খুঁটিয়ে আবিষ্কার করে। এই ছ' মাসের অভিজ্ঞতাকালে তাদের সব বিষয়ের সমালোচনা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়—প্রতিটি কাজের ভাল-মন্দ বিচারের ব্যাপারে তাদের অনুপ্রাণিত করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংক পদ্ধতির উন্নতি সাধনে কী কী বিষয়ে পরিবর্তন আনা দরকার সে বিষয়ে প্রস্তাব তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয় তাদের। দু' মাস বাদে ঢাকার মূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একই ব্যাংকের শিক্ষার্থীরা আবার একত্র হয়। এবার নিজ নিজ প্রস্তাব উত্থাপন করে তার ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের তার মতে আনার চেষ্টা করা যে তার প্রস্তাব সত্যিই গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য উপকার নিয়ে আসবে। সপ্তাহব্যাপী এই বৈঠকের সময় প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা। পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষার ক্ষমতা কার কতটা তারই যেন পরীক্ষা দিতে বসেছে সবাই। প্রচলিত কর্মনীতির গলদ খুঁজে বার করা, নতুন নিয়ম বা প্রস্তাব পেশ করা, সব কিছুতেই তাদের পরম উৎসাহ লক্ষ করা যায়। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য এক, গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যকারিতা আরও নিখুঁত করে তোলা।

শিক্ষার্থীরা তাদের সংশ্লিষ্ট শাখার সমালোচনায় প্রায়শই মুখর হয়ে ওঠে। কাজ যথেষ্ট হচ্ছে না, পদ্ধতি সঠিক নয়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবল যুক্তি তর্ক চলে বৈঠকে।

ছ' মাসের এই প্রশিক্ষণ কালে, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সময়, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ স্নাতকেরা এই প্রথম বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়।

এ ব্যাপারে এর আগে তারা কোনও শিক্ষা লাভ করেনি। এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে

www.pathagar.com

পড়ে তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় পালিয়ে বাঁচার। গ্রামীণ ব্যাংকে চাকুরি গ্রহণ করার জন্য মনে মনে খুব আফসোস হয়। একটু ধাতস্থ হয়ে দেখতে পায় তাদেরই সহযোগীরা অনেকেই বিষয়গুলি খুবই মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করতে সচেষ্ট। তখন মনে হয়, আমিই বা কেন পিছিয়ে পড়ব? সকলেই একনিষ্ঠভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। লক্ষ করে যারা আগেই গ্রামীণ ব্যাংকে যোগদান করেছে তাদেরকে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের, নিজের বিভাগের উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা নিষ্ঠুর বাস্তবের রূপান্তর ঘটাবার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করছে, তা তাদের নজর কাড়ে। তারা মুগ্ধ হয়।

তাদের কাছে সবচেয়ে আশার কথা হল পরিশ্রম যতই কষ্টসাধ্য হোক, ফলাফল হবে অসাধারণ এবং নিশ্চিত। মানুষের মধ্যে পরিবর্তন যা ঘটল তা একেবারে প্রত্যক্ষ, তা স্পর্শ করা যায়, অনুভব করা যায়। সব কিছু দেখে তাদের শিহরন জাগে শিরায় শিরায়। পরিবর্তন তার সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে একেবারে চোখের সামনে, নাগালের মধ্যে। অদূর ভবিষ্যতের কোনও একদিনে এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে তাদের বসে থাকতে হবে না। তারা কাজে প্রবল আকর্ষণ বোধ করে। পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ রূপকার হবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রাহকদের কাছ থেকে যে সম্মান পাওয়া যায় তা কতটা মহামূল্যবান বুঝতে শুরু করে।

ব্যবহারিক কর্মজগতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। প্রত্যেকেই পূর্বসূরির তুলনায় আরও কর্মদক্ষতা দেখাবার জন্য সচেতনভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

* * *

কর্মজগতে দু' মাস ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার পর গ্রামীণ ব্যাংকের শিক্ষার্থীরা যখন আবার ঢাকার প্রশিক্ষণকেন্দ্র সপ্তাহব্যাপী বৈঠকে মিলিত হয়, তারা যেন এক ঝলক টাটকা বাতাস বহন করে নিয়ে আসে। নিপুণ পর্যবেক্ষণের অনেক সংবাদে তাদের ঝুলি ভরা থাকে।

আমরা যখন প্রধান কার্যালয়ে বসে বিরাট কিছু করেছি এই আনন্দে আত্মপ্রশংসায় অলস হয়ে উঠি, তখন আমাদের শিক্ষানবিশরা প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্র থেকে তাদের দেখা ভয়ংকর এবং অকল্পনীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়। কীভাবে আমাদের বহুকষ্টে চালু করা বিশ্বাস ও নিয়মগুলি লঙ্ঘন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে। যে-পদ্ধতিগুলি ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়ম মেনে চলবে বলে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম অনেকক্ষেত্রেই সেগুলিতে ভাঙন ধরেছে। আমাদের নিয়ম পুনঃপ্রচলিত করার জন্য তারা আমাদের নানান উপদেশ দেয়। নিয়মভঙ্গের অপরাধে দোষীদের গুরুতর শাস্তির জন্য আমাদের কাছে দাবি জানায়। আমরা উচ্চপদে আসীন উদ্যমহীন প্রৌঢ়রা নড়ে চড়ে বসি। তাদের সাম্প্রতিকতম কার্যসমীক্ষা মন দিয়ে শুনি। আমাদের আধুনিকতম কর্মকৌশল পর্যালোচনা করতে বাধ্য হই। এইসব ভুলভ্রান্তি, গলদের প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হই।

সব বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা ও বিতর্কের জন্য আমরা সর্বদা তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে থাকি। অনেক কঠোর ধারালো সমালোচনা, শ্রেণীকক্ষে নমনীয় ভাষায় বিবৃত করে শিক্ষার্থীরা। এটা অনস্বীকার্য যে তাদের প্রতিবেদনে অনেক সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়।

বিতর্ক শেষে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হই। যাবতীয় তথ্য আমাদের অবলোকন ও মূল্যায়ন বিভাগে পাঠিয়ে দিই। এই সব সমস্যা সত্যিই ঘটছে কিনা সে ব্যাপারে এই বিভাগকে নজরদারি করার নির্দেশ দিই। নিরন্তর সেগুলো খতিয়ে দেখবার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা নেবার কথা বলি।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত মতামতের ধরন বিবিধ হলেও শিক্ষার্থীদের নির্দ্বিধায় তা জানাতে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়। কৌতূহল, বিভিন্নতা ও ধৈর্যের মধ্যেই নতুন ধারণা জন্ম নেয়। নিয়মের ব্যাপারে খুব রক্ষণশীল হলে সৃজনশীলতার আশা বৃথা।

আমাদের শিক্ষানবিশ তরুণ ম্যানেজাররা যেসব প্রস্তাব দিয়েছেন তার ভিত্তিতে গ্রামীণ ব্যাংকের অনেক গতিতে পরিবর্তন এসেছে, নতুন নিয়ম চালু হয়েছে, কিংবা নিয়ম বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে মজার সিদ্ধান্তগুলি ছিল: প্রতি শাখায় সদস্যদের সন্তানদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন, শাখার জন্মদিন পালনের জন্য অনুষ্ঠান করা। আমাদের একজন ব্যায়ামবীর কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডেট কোরের সদস্য ছিল। সদস্যদের শরীরচর্চার প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রস্তাব তার কাছ থেকে আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলাম।

প্রথমে আমি সহ গ্রামীণ ব্যাংকের অনেকেই ভেবেছিলেন এইরকম শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক হবার জন্য সদস্যরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন। আমাদের সব শাখা ও কেন্দ্রের পুরনো সদস্যরা যখন স্বেচ্ছায় উৎসাহের সঙ্গে খোলা মাঠে জমায়েত হয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শরীরচর্চা ও প্যারেড করতে শুরু করলেন, তখন আমরা সত্যিই অবাক হলাম। তাঁরা বুঝেছিলেন এতে তাঁদের আত্মসংযম ও শৃঙ্খলাবোধ বৃদ্ধি পাবে। দারিদ্র মুক্তির সংগ্রামে এগুলি হয়ে উঠবে শক্তিশালী হাতিয়ার। আমরা তখন গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা আরও বর্ধিত আকারে প্রচলিত করলাম।

সাধারণত বাংলাদেশি যুবক-যুবতীদের সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ প্রখর। যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে থাকে ছাত্ররা। তারাই ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের হোতা, সামনের সারির সৈনিক। এখনও তারা জাতীয় স্বার্থে ব্যক্তিগত সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত।

আমাদের যুবকর্মীদের আমরা প্রভূত দায়িত্ব দিয়ে থাকি। তাতে সৃজনশীলতার যথেষ্ট সুযোগও দেয়া হয়।

* * *

আমাদের কর্মীরা প্রত্যেকেই এক-একজন একধরনের 'শিক্ষক'। এটা বাণিজ্যিক ব্যাংকে কল্পনাও করা যায় না। গ্রামীণ ব্যাংককর্মী, গ্রাহকদের ক্ষমতা পুরোপুরি বিকশিত করে তোলে, তাদের শক্তির উৎস আবিষ্কার করে। তাদের কাজের পরিধি ও দক্ষতাকে অভাবনীয় গতিতে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়। কাজেই শিক্ষক হিসেবে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জ্ঞান, কল্পনাশক্তি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কর্মীদের এক একজন প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠবার জন্য, আমরা সবরকম সুযোগ ও প্রেরণা দিয়ে থাকি। একজন ম্যানেজারের কাজ হবে তার একান্ত ব্যক্তিগত রোমহর্ষক রোমাঞ্চকর অভিযানের মতো। এই রকম চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার সুযোগ ছাত্রজীবনে তারা কখনও পায়নি।

আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল শিক্ষক হওয়া। গ্রামীণ ব্যাংকের বহু উচ্চপদস্থ অফিসার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিল। তারা আমাকে উর্ধ্বতন অফিসার হিসেবে না দেখে তাদের শিক্ষক হিসেবেই দেখে। এতে আমি অত্যন্ত খুশি। উপরওয়ালার সঙ্গে সৌজন্যমূলক দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যিক। কিন্তু একজন শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্কের মধ্যে নিষ্প্রাণ সৌজন্যের কোনও স্থান নেই। সেই সম্পর্ক একান্ত আত্মিক ও অতীন্দ্রিয়।

নিজের সমস্যা ও দুর্বলতার কথা একজন ছাত্র তার শিক্ষককে অকপটে খুলে বলতে পারে। ব্যক্তিগত ভুলের কথাও স্বীকার করা যায়, কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আশঙ্কা না করে।

www.pathagar.com

একজন কর্মচারীর অফিসঘর, ফাইলপত্র, টেবিলচেয়ার, টেলিফোন থাকা একান্তই জরুরি। এগুলো ছাড়া তারা পদাধিকারের সম্বন্ধে হীনম্মন্যতায় ভোগে, অসহায় বোধ করে। গ্রামীণ ব্যাংককর্মীদের কিন্তু এসব কিছুরই দরকার হয় না, তবুও তাঁদের অন্তরে বিরাজ করে প্রকৃত শিক্ষক সত্তা।

* * *

আমাদের ব্যাংককর্মীদের কিন্তু ম্যানেজারদের মতো স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকে না। তাদের পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করতে হয়। সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে এই যোগ্যতায় বড়জোর কেরানি বা পিয়নের কাজ জোটে। অফিসের নিম্নতম পদেই চিরকাল পড়ে থাকতে হয় তাদের।

এইরকম ছেলেদের কাছ থেকে প্রতি বছর আমরা হাজার হাজার দরখাস্ত পাই। দুর্ভাগ্যবশত দশজনের মধ্যে একজনকে মাত্র আমরা নিয়োগ করতে পারি। দুর্ভাগ্যজনক বললাম কারণ আমি জানি তাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ ছেলেমেয়েই ব্যাংককর্মী হিসেবে সুনাম অর্জন করার যোগ্যতা রাখে। এদের সকলকে নিয়োগ করার ক্ষমতা আমার নেই। সেই অক্ষমতা আমাকে ব্যথিত করে। অধিকাংশেরই চাকুরির অত্যন্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে চাকুরির অনুসন্ধান ব্যয়সাপেক্ষ নির্মম এক অভিজ্ঞতা বিশেষ।

সব প্রতিষ্ঠানেই চাকুরির দরখাস্তের সঙ্গে কিছু টাকাও পাঠাতে হয়, যা ফেরত দেয়া হয় না। আমরা এরকম কোনও টাকা আবেদনপত্রের সঙ্গে চাই না। আবেদনপত্র পাঠাতে যত খরচ হয় তার দশ গুণ বেশি টাকা খরচ হয় ইন্টারভিউতে উপস্থিত হওয়ার জন্য। কিছু ধান্দাবাজ ভুয়ো প্রতিষ্ঠান প্রার্থীদের ভুলিয়ে টাকা রোজগারের ব্যবসা ফাঁদে। তারা চাকুরির বিজ্ঞাপন দেয় শুধু আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠানো টাকাটা হাতিয়ে নেবার জন্য। আবেদনকারীকে কোনও দিন আর চিঠি দেয়া হয় না। বাংলাদেশে চাকুরি পেতে হলে বড় অঙ্কের ঘুষ দিতে হয়। এটাও প্রতিষ্ঠিত নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশে অলিখিত ভাবে নিয়ম চালু হয়ে গেছে যে প্রত্যাশিত চাকুরির মাসিক বেতনের দুই থেকে বিশগুণ পর্যন্ত টাকা ঘুষ হিসেবে দিতে হবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রার্থীকে চাকুরি লাভের বিনিময়ে সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা কারও কন্যাকে বিয়ে করতে রাজি হতে হয়। এটা তাদের কাছে বিরাট আঘাত। গ্রামীণ ব্যাংকে শুধুমাত্র গুণগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। আবেদনপত্রের জন্য কোনও টাকা জমা দিতে হয় না, চাকুরি পাবার পর কোনও টাকাও জমা রাখতে হয় না। কোনও রকম ঘুষ কিংবা তদবির ছাড়াই এই ব্যাংকে চাকুরি পাওয়া যায়। এটা মানুষের মনে হয় সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য।

আমাদের অধিকাংশ আবেদনকারীই, (৮৫ শতাংশ পুরুষ ও ৯৭ শতাংশ মহিলা) যারা ইন্টারভিউ দিতে আসে, তাদের এর আগে কখনও ঢাকা আসবার সুযোগ হয়নি। তাদের ঢাকা যাতায়াতের খরচ জোগাতে অনেকেরই বাবা মাকে যথাসর্বস্ব, ফসল থেকে শুরু করে বড় গাছ, গরু, ছাগল, এমনকী গয়না পর্যন্ত বেচতে হয়। এই সফরের টাকা জোগাতে কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক প্রার্থীর মা বাবাকে মহাজনের কাছে ধার করতে হয়।

অর্ধেকের বেশি প্রার্থীই সাক্ষাতের দিনই ঢাকায় এসে পৌঁছয়। কারণ, ঢাকায় তাদের পরিচিত কেউ না থাকায় রাত কাটাবার উপায় থাকে না। কোনও হোটেলে থাকা তাদের পক্ষে খুবই ব্যয়সাপেক্ষ।

এক চতুর্থাংশ চাকুরিপ্রার্থী রাতটা রেলস্টেশনেই কাটিয়ে দেয়, এদের ফিরবার জন্য

www.pathagar.com

ভোরের ট্রেন ধরতেই হবে।

প্রার্থীরা প্রায় সকলেই সৎ। তাদের নীতিবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা অগাধ।

আমাদের ব্যাংকের কাজ অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ। কিন্তু তা নির্বাচিত প্রার্থীদের মনোমতো হয়ে ওঠে যেহেতু এ কাজে তারা নিরাপত্তা, মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের স্বাদ পায়। নিষ্ঠাভরে আত্মসমর্পণ করে এ কাজ করলে কর্মজীবনের শীর্ষস্থানে পৌঁছানো নিশ্চিত। কোনও কারণে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কাজ ছাড়লেও এ অভিজ্ঞতা তাদের অন্য চাকুরিতেও উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয়।

প্রশ্ন জাগে আমাদের কর্মীদের একনিষ্ঠতা ও দায়বদ্ধতার আসল কারণ কী? তা কি শুধুই কাজের প্রতি আগ্রহ? তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের সুযোগ? সবার সঙ্গে গড়ে ওঠা দুর্লভ বন্ধুত্বের প্রতি আকর্ষণ? না অদম্য যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার সুবর্ণ সুযোগ? নিজের প্রকৃত মূল্যায়নের অদম্য বাসনা, অথবা দেশের কাজে আত্মনিয়োগের পথিকৃত হিসেবে সুদৃঢ় অঙ্গীকারের দায়বদ্ধতা? এদের যে-কোনওকেই কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায়। তবে আমার অনুমান, প্রত্যেক কর্মীর পছন্দের কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

* * *

শিক্ষার্থীদের আমরা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিই যে আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হল মানুষের কাজে লাগা। নিয়মরক্ষা বা কর্ম পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষের সেবা। যেসব রীতিনীতি, নিয়মকানুন এই গন্তব্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে তা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া অনেক বেশি জরুরি। আমাদের প্রথম কর্তব্য হল উন্নয়নের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের পথে শিক্ষার্থীর নিজস্ব মতামত সংগ্রহ করা। এর থেকে দু'টি সুফল পাওয়া যায়। প্রতি শিক্ষার্থী প্রচলিত পদ্ধতি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে তার ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়। তাতে তাদের শিক্ষার ভিত হয় সুদৃঢ়। শুধুমাত্র আমাদের কার্যপ্রণালী নীরসভাবে অনুসরণ করে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে, এই ধরনের মনোনিবেশ বা নিষ্ঠা কখনওই আশা করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, সব কর্মীকে আমরা একই ছাঁচে ফেলতে চাই না। সেক্ষেত্রে ভাবনার পরিধি হয় সীমিত, সবাই একই ধারায় ভাবতে চেষ্টা করে। তাদের নিজস্বতা এবং মতের উদারতা বজায় রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

এই বিভিন্নতাই শক্তির আধার। ঘোর বিপর্যয়ের সময় সব কর্মীর সমাধান চিন্তা একই স্রোতে পাক খেতে থাকলে সমাধানের সূত্র পাওয়া যায় না। সেই প্রতিষ্ঠানের ভাঙন অনিবার্য।

বিভিন্ন আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে বেছে আমরা শিক্ষার্থী নিয়োগ করি। তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। বাস্তব পরিস্থিতি খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করার মতো দক্ষতা অর্জন করতে হয় তাদের, যাতে করে প্রয়োজনে নিজেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সর্বোপরি আমরা কর্মীদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের উপযোগী ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে চাই। আজকের যুগে দারিদ্রই মানবজাতির বৃহত্তম সমস্যা। প্রতিদিন যারা এই সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করে তাদের আরও অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিটি সমস্যারই সমাধান আছে। প্রকৃতপক্ষে একটি নয়, সমাধান

www.pathagar.com

বহু ভাবেই হতে পারে। আমাদের কাজ হল তার মধ্যে সেরাটি বেছে নেওয়া।

সমস্যার যত গভীরে প্রবেশ করা যায়, সমাধানের পথ ততই কাছে চলে আসে। তখনই অন্য কৌশল খুঁজে নিয়ে বা তৈরি করে সমস্যাকে একদম সমূলে বিনাশ করার লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

* * *

গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীসংখ্যা এখন বারো হাজারের কাছাকাছি।

একজন কর্মীর দৈনন্দিন কর্মসূচি দেওয়া হল।

নাম	—	আখতার
বয়স	—	২৭ বছর
মাসিক বেতন	—	২,২০০ টাকা (বাড়ির ভাড়া বাবদ ভাতা, চিকিৎসার অনুদান ও যাতায়াতের ভাড়া সমেত)।
বোনাস	—	দু' মাসের বেতন যা দুইটি ঈদের সময় প্রদান করা হয়।
সকাল ৬টা	—	শয্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্য, গোসল, নামাজ ও নাস্তা।
সকাল ৭টা	—	আখতার শাখা অফিসে হাজিরা দেবে। সেখান থেকে ফাইলপত্র ব্যাগে ভরে, ব্যাগ কাঁধে সাইকেলে করে সে পৌঁছবে একটি কেন্দ্রে।
সকাল ৭টা ৩০ মি.	—	একটি বাঁশের কুটিরে ৪০ জন গ্রাহক আখতারের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। এই কুটির তাদের সামান্য অবসর সময়ের মধ্যে নিজেদের হাতে বানানো।

গ্রাহকেরা নিজেদের দলের সদস্যদের সঙ্গে অর্ধ গোলাকৃতি বসেন। প্রতি দলের সভাপতি নিজের সহ আর পাঁচজন দলগত সদস্যের পাসবই বার করেন। সভার শুরুতে তাঁরা শরীরচর্চা করেন। তারপর আখতার তাঁদের কাছ থেকে ঋণের কিস্তি ও আমানত গ্রহণ করে।

সকাল ৯টা ৩০ মি.—দ্বিতীয় বৈঠকের জন্য আখতার সাইকেল করে অন্য কেন্দ্রে যায়। সারা সপ্তাহে সে, তার তত্ত্বাবধানের অন্তর্গত ১০টি বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করে। যে ৪০০ জন গ্রাহকের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত আছে তাঁদের সঙ্গে আখতার দেখা করে। সাধারণ ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ, মরশুমি ঋণ ইত্যাদির কিস্তি গ্রহণ ও টাকা জমা রাখা তার কাজ।

বেলা ১১টা—আখতার সদস্যদের বাড়ি পরিদর্শনে যায়। তাদের দরকারি পরামর্শ দেয়। এটা তার কর্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও প্রশিক্ষণের অন্যতম ব্যবহারিক প্রয়োগ। এর দ্বারা সে গ্রহীতাদের চাহিদা ও সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে পারে।

বেলা ১২টা—শাখা অফিসে প্রত্যাবর্তন। এখানে আখতার দিনের কাজের বিবরণ লিখিতভাবে লেজার বইয়ে সব নথিভুক্ত করে। শাখা ম্যানেজার দেখে সই করে দিলে আখতারের কাজ তখনকার মতো শেষ। প্রতিটি পাই পয়সার হিসেব মেলানোর উপর কড়া নির্দেশ থাকে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সারাদিনের কাজের খতিয়ান সম্পূর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ সে শান্ত মনে বিশ্রামটুকু পর্যন্ত করতে পারে না।

দুপুর ১টা ৩০ মি.থেকে ২টা—দুপুরের আহার শেষে সহকর্মীদের সান্নিধ্যে এক কাপ চা পান।

www.pathagar.com

দুপুর ২টা—সকালে যা তহবিলে জমা পড়েছিল তাই দিয়ে বিকেলে নতুন ঋণ দেওয়া শুরু করতে হয়। কর্মীরা সকলে এ কাজে শাখা ম্যানেজারকে সাহায্য করেন।

বেলা ৩টা—ঋণ বণ্টন সারা হলে, আখতার ও তার সহকর্মীরা ঋণ সংক্রান্ত সব তথ্য লেজার বইয়ে নথিভুক্ত করে রাখে।

বিকেল ৪টা ৩০ মি.—চা পান করতে করতে সহকর্মী ও সহযোগীদের সাথে গল্পগুজব।

বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩০মি.—যে-কেন্দ্রে ঋণ সংক্রান্ত কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে আখতার সেখানে যায়। নতুবা বাচ্চাদের শিক্ষাদানের জন্য কোনও প্রকল্প সংগঠনের কাজে মনোনিবেশ করে।

সন্ধ্যা ৭টা—আখতার অফিসে ফিরে আসে। কিছু জরুরি লেখালিখির কাজ করে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর এবার তার বিশ্রামের অবকাশ।

গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীর রোজনামচা হল এইরকম। ঢাকার হেড অফিস প্রশাসনের কাজ চালায়। এখানে অন্য যে-কোনও অফিসের মতোই কাজের ধারা।

www.pathagar.com

২২
গ্রামীণ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক জন্ম (১৯৮২-৮৩)

বাংলাদেশে ১২ কোটি মানুষের বাস। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। তাদের অধিকাংশই পরস্পর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু। ব্যাপারটি অবশ্য বহুবার গ্রামীণ ব্যাংককে আমলাতন্ত্রের দুস্তর বাধা অতিক্রম করতে সহায়ক হয়েছে।

জনাব এ. এম. এ. মুহিত ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সিলর ছিলেন। তখন আমি আমেরিকায় অধ্যাপনা করছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সংগ্রামে আমেরিকার সরকার ও জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য আমি তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছিলাম। এই সুবাদে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।

প্রায় দশ বছর পর তিনি বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। এই নিয়োগ ছিল এক কথায় অপ্রত্যাশিত। এই আকস্মিক ঘটনা গ্রামীণ ব্যাংকের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিলাভের সহায়ক হয়েছিল।

১৯৮২ সালে কুমিল্লায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন অ্যাকাডেমিতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। সেখানে গ্রামীণ ব্যাংকের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ পাঠ করার কথা ছিল। আলোচনা-সভা ঘরে সমবেত হবার পর আমরা খবর পেলাম গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়ে সামরিক সরকারের অভ্যুত্থান ঘটেছে। সামরিক বাহিনীপ্রধান জেনারেল এরশাদ শাসন ক্ষমতায় এসেছেন। সভা তৎক্ষণাৎ বেআইনি ঘোষিত হল, সামরিক আইন ব্যবস্থা জারি হবার ফলে। সমস্ত দিন আমি ও মুহিতভাই অ্যাকাডেমির কাফেটারিয়াতে বসে অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে সাধারণ আলাপ আলোচনা করে সময় কাটালাম। যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। আমাদের ঢাকায় ফিরে যাবার কোনও উপায় ছিল না। আমরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছিলাম। সেদিনটা ছিল অসম্ভব দুশ্চিন্তার দিন। চারিদিকে নানারকম উলটোপালটা গুজব শোনা যাচ্ছিল।

জনাব এ. এম. এ. মুহিত যখন সরকারি চাকরিতে বহাল ছিলেন তখন থেকেই তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের একজন গুণগ্রাহী। নিজের চেষ্টায় নিজের গ্রামে এরকম এক প্রকল্প শুরু করবার পরিকল্পনাও করেছিলেন। গ্রামীণ ব্যাংক-কে সম্পূর্ণ স্বাধীন এক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপায়িত করার ব্যাপারে আমার স্বপ্নের কথা তাঁকে সারাদিন ধরে বিস্তারিত ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। সরকারি কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমলারা কীভাবে আমার বিরুদ্ধতা করছেন তাও সবিস্তারে তাঁকে জানালাম। দিনের শেষে সামরিক বাহিনী সাধারণ নাগরিকের যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করল। আমরা ঢাকায় ফিরে এলাম।

কয়েক দিনের মধ্যেই মুহিতভাই নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করলেন। সেদিন অ্যাকাডেমিতে যে-দিনটা অপচয় হল বলে ভেবেছিলাম, তা গ্রামীণ ব্যাংকের নিশ্চিত

www.pathagar.com

ভবিষ্যতের সূচনায় শুভলগ্ন হয়ে রইল। কয়েক মাস পরে আমি নিজে মুহিত ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাহায্য চাইলাম। কিছু দিন কেটে গেল। তারপর তাঁর ডাক পেলাম। বললেন, "ইউনূস, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আগামী মাসের অধিবেশনে আমি গ্রামীণ ব্যাংকের নতুন আকারে স্বীকৃতি লাভের পক্ষে কিছু কথা বলব ঠিক করেছি।"

আমি বললাম, "এটা নিশ্চিত জানবেন সবার তরফ থেকে দুস্তর বাধা আসবে।"

"হ্যাঁ, তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। কিন্তু আলোচ্য বিষয়সূচিতে ব্যাপারটি অবশ্যই রাখব।"

তিনি কথা রেখেছিলেন। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের উচ্চপদস্থ অফিসারদের পক্ষ থেকে প্রবল বাধা এসেছিল ঝড়ের মতো। গ্রামীণ ব্যাংক-কে একটি পৃথক ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতিদানের বিপক্ষে ডজন ডজন যুক্তি খাড়া করেছিলেন উপস্থিত সকলে।

বৈঠকের শেষে মুহিত ভাই আমাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইউনূস, আপনার ধৈর্য আছে তো?" আমি বললাম, "অবশ্যই। ওটাই তো আমাদের অন্যতম সম্বল।"

"শুনে খুশি হলাম। তাহলে ব্যাপারটা আমার মতো করে সামাল দিতে দিন।"

কয়েক মাস পরে মুহিতভাই আবার সাতটি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টারদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। এই ব্যাংকগুলির শাখার মাধ্যমেই গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প অর্থ সাহায্য লাভ করছিল। তিনি আবার গ্রামীণ ব্যাংকের ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। পুনরায় সকলে বলল গ্রামীণ ব্যাংক খুব ভাল কাজ করছে এ সত্য অনস্বীকার্য। কিন্তু তাকে স্বাধীন ব্যাংকে রূপান্তরিত করার ফল হবে মারাত্মক।

একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টার বললেন, "ইউনূসকে তাহলে প্রশাসনিক খরচ সম্পূর্ণ বহন করতে হবে। এখন তিনি সেই ব্যয়ভার অনায়াসে আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারছেন। তাঁর প্রকল্পিত দরিদ্রদের জন্য ব্যাংকিং পদ্ধতিতে স্বনির্ভর হওয়া কতটা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল তা সম্বন্ধে তাঁর কোনও ধারণাই নেই।"

আরেকজন বললেন, "প্রফেসর ইউনূস, আপনি আমাদের ব্যাংকেরই একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে আমাদেরই মাধ্যমে কাজ চালাতে পারেন। সেটা কি আপনার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে না?"

"না, হবে না", আমি উত্তর দিলাম, "কারণ, সেক্ষেত্রে আমাকে আপনার ব্যাংকের নিয়ম ও কর্মপদ্ধতি মেনে কাজ চালাতে হবে। আমরা টাঙ্গাইলে সেভাবে কাজ করতে গিয়ে অত্যন্ত বিপর্যয় ও বাধার সম্মুখীন হয়েছি। এক কথায় এভাবে কাজ চালানো অসম্ভব।"

আরেকজন ডিরেক্টার বললেন, "বুঝতে চেষ্টা করুন প্রফেসর সাহেব, কী বিরাট আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে আপনার।"

আরেকজনের মত হল: এই প্রচেষ্টা কখনওই সফল হতে পারে না। তিনি বললেন, "কর্মীরা আপনাকে প্রতারণা করতে শুরু করবে। আপনার জানা নেই অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ কতখানি কঠিন কাজ। আপনি তো ব্যাংকার নন। ব্যাংক পরিচালনার অভিজ্ঞতা আপনার নেই। আপনি তো বরাবর অধ্যাপনার কাজই করে এসেছেন। অধ্যাপনাই আপনার প্রকৃত কর্মজগৎ।"

সৌভাগ্যবশত অর্থসচিব জনাব সাইদুজ্জামান ছিলেন গ্রামীণ ব্যাংকের আরেকজন অতি গুণমুগ্ধ সুহৃদ। জনাব মুহিত তাঁর লিখিত সমর্থন সহ স্বয়ং রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানালেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করার সৌভাগ্য এখনও পর্যন্ত আমার হয়নি। হয়তো গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দান তাঁর কাছে ছিল এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তিনি যাই ভেবে থাকুন, তা আমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক হয়েছিল। মুহিত ভাই জানতেন ঠিক কোন সময়, কীভাবে তাঁর কাছে প্রস্তাবটি পেশ করতে হবে। তাঁর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ অবশ্যই হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি

www.pathagar.com

আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন।

স্বয়ং রাষ্ট্রপতি যে প্রস্তাব সমর্থন করেছেন তা মন্ত্রিসভায় পেশ করা নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। তিনিই মন্ত্রিসভার প্রধান। মন্ত্রিসভার কাজই হল তাঁর কার্যভার লাঘব করা। অতএব মন্ত্রিসভা কোনও প্রশ্ন না তুলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করল। অর্থমন্ত্রণালয়ের উপর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ভার দেওয়া হল।

গ্রামীণ ব্যাংক হয়ে উঠবে সম্পূর্ণভাবে তার গ্রাহকদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। বরাবর এই ছিল আমার সাধ ও স্বপ্ন। সেভাবেই আগাগোড়া আমি আমার বিষয়টি বিবৃত করে গেছি। কিন্তু অর্থমন্ত্রী মুহিত ভাই ইঙ্গিত দিলেন যে, যদি আমি সরকারকে মালিকানার কিছু অংশ প্রদান করতে রাজি থাকি তাহলে আমার প্রস্তাব পাশ হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

অর্থমন্ত্রী আমাকে আমার ব্যাংকের ভবিষ্যৎ আইনি পরিকাঠামোর খসড়া জমা দেবার নির্দেশ দিলেন।

আমি ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বাংলাদেশের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। শেখ মুজিব পূর্ব বাংলায় বিপুল ভোটে জয়ী হবার পর যখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন, তখন ড. কামাল ছিলেন তাঁর অন্যতম মন্ত্রণাদাতা। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনার দায়িত্ব কামাল হোসেন পালন করেন।

আমার সহকর্মী মোজাম্মেল, ড. হোসেনের খুবই পরিচিত। ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে, আমার অধ্যাপনার প্রথম দিনগুলিতে মোজাম্মেল আমার ছাত্র ছিল। মোজাম্মেল জানত ড. হোসেন গ্রামীণ ব্যাংক সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহী। সে যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, ড. হোসেন সেখানে আবাসিক ফেলো ছিলেন। সে-ই আমাকে প্রথম ড. হোসেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

গ্রামীণ ব্যাংকের গুণগ্রাহী, ড. হোসেন তক্ষুনি আমাদের জন্য আইন তৈরির কাজে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। তিনি ৪০ শতাংশ শেয়ার সরকারকে প্রদান করতে পরামর্শ দিলেন। বাকি ৬০ শতাংশ গ্রাহকদের অধিকারে থাকুক। আমি খুব উৎসাহ না দেখিয়ে রাজি হয়ে গেলাম। বার বার খসড়া তৈরি হল। প্রতিটি অনুচ্ছেদ, প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি শব্দ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করলাম আমরা। এরপর আমরা অর্থমন্ত্রণালয়ের দপ্তরে চূড়ান্ত খসড়া জমা দিলাম। তারপর চলল অপেক্ষার পর্ব।

১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে রংপুরে সফরকালে ঢাকা থেকে মোজাম্মেলের ফোন পেলাম। সে সুখবর দিল। রাষ্ট্রপতি আমাদের প্রস্তাবে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করেছেন। অতঃপর গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম হল।

দিনটি ছিল খুশির দিন, উৎসবের দিন। আমরা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উৎসব পালনে মেতে উঠলাম। জোবরা গ্রামের সেই ছোট্ট প্রকল্প থেকে আজ আমরা অন্যতম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি, এর চেয়ে সুখের আর কী হতে পারে?

ঢাকায় ফিরে এলাম। ঘোষণার পুরো বয়ান পড়ে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। অংশীদারিত্ব সম্বন্ধে যা কথা হয়েছিল তার অনুপাত সম্পূর্ণ উলটে দেওয়া হয়েছে। সরকারের থাকবে ৬০ শতাংশ, গ্রহীতাদের প্রাপ্য হতে চলেছে মাত্র ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ 'গ্রামীণ ব্যাংক' একটি সরকারি মালিকানার ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটা আমি একেবারেই চাইনি। বুঝলাম আমার মূল বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। অসহ্য আঘাতে ভেঙে পড়লাম।

তক্ষুনি অর্থমন্ত্রীকে ফোন করে জানালাম, এই খবর আমার পক্ষে কতখানি মর্মান্তিক ও হতাশাব্যঞ্জক। তিনি ধৈর্যশীল মানুষ। এতটুকু উত্তেজিত হলেন না। তাঁর কৌশল সঠিকভাবে

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করে বোঝাবার জন্য আমাকে তাঁর অফিসে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি এত ভেঙে পড়েছিলাম যে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ, সে মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিছুক্ষণ ধরে মনের মধ্যে তোলপাড় চলল এবার আমি কী করব। কী করা উচিত আমার? সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব গ্রহণ করব না প্রত্যাখ্যান করব? করলে কী লাভ? না করলে কী ক্ষতি? শেষ অবধি স্থির করলাম ক্ষতি যা হবার যখন হয়েই গেছে, আর আমার হারাবার কিছু নেই। আমি তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। দেখাই যাক তাঁর স্বপক্ষে কী বক্তব্য আছে।

মুহিত ভাই আমার মানসিক অবস্থার জন্য আন্তরিক সমবেদনা জানালেন। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইলেন যে যতটা মনে হচ্ছে পরিস্থিতি ততটা গুরুতর নয়। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য এটা হল প্রথম পদক্ষেপ।

"ইউনূস, জানি আপনি আমার ওপর অত্যন্ত রাগ করেছেন। কিন্তু আপনি চেয়েছিলেন একটি বেসরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে, নয় কি? তা সম্ভব করে তোলার জন্য এ ছাড়া অন্য কোনও পথ ছিল না।"

"কিন্তু আমি যে জন্য এতটা প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি এ সিদ্ধান্ত তার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

"না, তা নয়। আপনার ব্যাংকের জন্য আমি খুবই সুষ্ঠু ভাবে পরিকল্পনা করেছি। তা ব্যর্থ হবার নয়। আমি হারবার পাত্র নই। যদি আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনা পেশ করতাম, আমার বিবেচনায় তা মন্ত্রিসভা পর্যন্ত পৌঁছতেই পারত না। আমি এটাকে মন্ত্রিসভায় সমর্থন আদায়ের জন্য উপযুক্ত ভাবে রদবদল করেছি। আপনি প্রথম ব্যাংক স্থাপনের কাজে মনোনিবেশ করুন। একবার ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে আপনি স্বচ্ছন্দে মন্ত্রণালয়ে মালিকানার পরিকাঠামো বদলের প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারেন। সেটা কার্যকর করা খুবই সহজ হবে। প্রতিজ্ঞা করছি দু' বছরের মধ্যে তা আপনাকে করে দিতে পারব। কথা দিলাম। মালিকানার অনুপাত উলটে দিতে সক্ষম হবই।"

তাঁর কথায় তেমন আস্থা রাখতে পারলাম না। একবার সরকারি ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলে, কর্মীদের মনোভাব আর কি পরিবর্তন করা সম্ভব হবে? ফিরে গিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। মোজাম্মেল, মাহবুব, দীপাল, নূরজাহান এবং আরও অনেকেই সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিল। আলোচনার পর সবাই একমত হলাম যে আমাদের সামনে এ ছাড়া আর পথ খোলা নেই। এইভাবেই কোনওরকমে মেনে নিয়ে, দোনোমনার মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম হল। যা পেয়েছি তাই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আমাদের সুদৃঢ় পদক্ষেপ ফেলে সঠিক পথে চলতে হবে। সরকারি হস্তক্ষেপ বা রাষ্ট্রের কবল থেকে এর মালিকানাকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে হবে।

আমাদের একেবারে তৃণমূল স্তরের কর্মীরা তখনও আনন্দে মেতে রয়েছে। তাদের কাছে সরকারি ব্যাংকের অর্থই হল সরকারি চাকুরির নিরাপত্তা এবং অপেক্ষাকৃত অনায়াস জীবন যাপনের সুযোগ।

মুখ বেজার করে থাকার পরিবর্তে ঠিক হল আমরাও ওদের খুশির উৎসবে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেব। আমাদের কর্মীরা যাতে নিজেদের সরকারি কর্মচারী ভাবতে শুরু না করে তার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের কাজ শুরু করার দিনটি নির্বাচন করা হল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, দেরি না করে কাজ চালু করে দেওয়া। সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ ঋণসংক্রান্ত চুক্তিপত্রে সইসাবুদের পালা সাঙ্গ হল। ঠিক হল পয়লা অক্টোবর, ১৯৮৩ থেকে এ সমস্ত নির্দেশ কার্যকর হবে। ওই দিনটি ছিল রবিবার। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন। কাজেই আমাদের প্রথম কাজের দিনটি হবে ২ অক্টোবর। আমরা একটি উদ্বোধনী

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হল সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করবার জন্য। টাঙ্গাইলের গ্রামাঞ্চলের একটি শাখায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শুনে অর্থমন্ত্রণালয় তৎক্ষণাৎ আমন্ত্রণ নাকচ করে দিলেন। তাঁদের মতে একটি ব্যাংকের সূচনার জন্য স্থানটি একেবারেই উপযুক্ত নয়। অনুষ্ঠান হবার উপযুক্ত স্থান তাঁদের মতে হওয়া উচিত ঢাকা, যেখানে সব সরকারি অফিসার যোগ দিতে পারবেন।

আমরা তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে শহরকে কেন্দ্র করে আমরা কারবার চালাই না। প্রস্তাবিত অঞ্চলে একজন গ্রাহকও উপস্থিত থাকতে না পারলে অনুষ্ঠানের অর্থ কী?

"ঢাকায় অনুষ্ঠান হলে, আমাদের ব্যাংকের ৪০ শতাংশ মালিকানার অধিকারী গ্রাহকেরা যোগদান করতে পারবেন না। এটা কীভাবে মেনে নেওয়া যায়?" আমি প্রশ্ন করলাম। "সরকারি আমলারা গ্রামে যেতে পারবেন না বলে, গরিব গ্রাহকদের শহরে টেনে আনা কি যুক্তিযুক্ত হবে, না আদৌ সম্ভব?"

গ্রামের পরিবেশেই আমরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করব—এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত থেকে আমরা বিচ্যুত হলাম না। গ্রামেই আমরা কাজ করি। চারিদিকে গ্রাহকদের বসবাস। এক কথায় তারা আমাদের সর্বদা ঘিরে থাকে। গ্রামের মানুষদেরই নিজস্ব ব্যাংক—তাদের জন্যই আমাদের যাবতীয় আয়োজন। সেই ব্যাংকের সূচনার প্রতীক হবে গ্রাম। কারওর খাতিরেই তার নড়চড় হবে না।

গ্রামীণ ব্যাংকের দায়িত্বে অর্থমন্ত্রণালয়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসার বললেন যে গ্রামে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা বাতিল না করলে অর্থমন্ত্রী হয়তো তাতে যোগ দেবার সময় করে উঠতে পারবেন না। আমি বললাম তাঁর সময় হবে কি হবে না সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোনওক্রমে আমাদের অনুষ্ঠানের স্থান বদল বা পরিকল্পনার নড়চড় হবে না।

এইরকম অচলাবস্থা চলাকালীন আমি জনাব মুহিতকে ফোন করে অনুষ্ঠানের তারিখ, স্থান ও অনুষ্ঠানসূচি সম্বন্ধে জানালাম। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর আরও ক'জন আগ্রহী বন্ধুর নাম জানিয়ে তাঁদেরও আমন্ত্রণপত্র পাঠাতে অনুরোধ করলেন। জনাব মুহিতের মতে এই বিশিষ্ট মানুষজনেরও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া খুবই জরুরি। এবার আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। মন্ত্রীরা নন, আসলে মন্ত্রণালয়ের আমলারাই ঢাকায় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আগ্রহী। এ সম্বন্ধে জানালে জনাব মুহিত বললেন, "তারা বদ্ধ উন্মাদেরও অধম। গ্রামীণ ব্যাংকের জন্মানুষ্ঠান কি শহরে হতে পারে? এমন অবাস্তব কথা জন্মে কেউ শুনেছে?"

* * *

ব্যাংকের আইনি পরিকাঠামো মুসাবিদা করার সঙ্গে সঙ্গে এর লোগো (প্রতীক চিহ্ন) কী হবে সে ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা চলছিল। এটাই হবে গ্রামীণ ব্যাংক কর্মবিস্তৃতির উত্তরসূরি, তাই আমার মনে হল প্রকল্প আসল শেষ হবার আগেই লোগো খুঁজে নেওয়া উচিত। তা হলে পরে ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে নতুন সৃষ্ট বোর্ড অফ ডিরেক্টারদের সঙ্গে (অধিকাংশই সরকারি অফিসার) লোগো নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘ তর্কেরও সুযোগ থাকবে না।

যেসব সভায় আমার বক্তৃতা দেবার কথা থাকে না, সেখানে প্রায়শই আমি কাগজে হিজিবিজি লিখি বা আঁকিবুকি কাটি। বর্তমানে আমার সব আঁকাজোঁকাই চলছিল সম্ভাব্য লোগোকে কেন্দ্র করে। 'গ্রাম' সংক্রান্ত তিনটি ভাবনা আমার মাথায় খেলছিল। তার একটি হল বেত বোনা—এটা অসাধারণ প্রতীক হতে পারে। বেতের প্রতিটি কঞ্চি আলাদাভাবে দেখলে পাতলা ফিনফিনে

www.pathagar.com

কিন্তু একসঙ্গে বোনার পর চাহিদা অনুযায়ী যত খুশি বড় করে তোলা সম্ভব। বুননের নানান নকশা বানাচ্ছিলাম কিন্তু একটাও আমার পছন্দসই হচ্ছিল না।

আর একটি বিষয় হল—'পাঁচনম্বর', গ্রুপের মধ্যে সদস্য সংখ্যা পাঁচ। পাঁচটা লাঠি, পাঁচজন মানুষ, পাঁচটি আঙুল, পাঁচটি মুখ—নানাভাবে পাঁচ সংখ্যাটির গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করছিলাম।

আমার তৃতীয় ভাবনা ছিল গ্রামের কুঁড়েঘর। অতি সাধারণ, অথচ তা গ্রামীণ জীবন ও পরিবেশের কথা সোচ্চারভাবে ঘোষণা করতে থাকে।

এই সময়ে যখনই গ্রামে সফর করতে গেছি খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেছি অসমাপ্ত বেতের কাজ, ধান ঝাড়াই, গ্রামের লোকেদের নানা ধরনের কারিগরি ও কুটির শিল্প, কুঁড়েঘর, তার সজ্জা এবং কার্যকরী প্রয়োগের থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে তা লোগোতে রূপান্তরিত করা যায় কিনা বিবেচনা করতাম। ঝুড়ি তৈরির প্রথম অবস্থায় বেতের শর কীভাবে সাজানো হয় তা আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। আমার কল্পনাশক্তি খেলা করে বেড়াত। এর থেকে বিভিন্ন নকশা তৈরি করতে চেষ্টা করতাম।

ব্যাংককে একটা সেমিনারে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ করে একটি লোগোর কল্পনা আমার মাথায় এল। আমি বক্তৃতায় মন দিতে পারছিলাম না। নোট প্যাডে হিজিবিজি আঁকছিলাম কুঁড়েঘর সংক্রান্ত প্রতীকের ব্যাপারে। আচমকা একটা নকশা এঁকে ফেললাম। বার বার আঁকলাম সামান্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। একটা নমুনা আমার ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল। বুঝলাম গ্রামীণ ব্যাংকের লোগো স্থির হয়ে গেল। আর দ্বিধার অবকাশ নেই। রঙের ব্যবহার সম্বন্ধেও সবিস্তারে লিখে ফেললাম।

ঢাকায় ফিরেই ভাল করে এঁকে রং করে খুব ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের ডেকে দেখালাম। মোজাম্মেল, মাহবুব, দীপাল, নূরজাহান ও দাইয়ান সবাই দেখল। যেহেতু পুরোটাই আমার পরিকল্পনা, সরাসরি অপছন্দের কথা ওরা বলতে পারল না। ভদ্রতা রক্ষা করে চলল। তারা খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে থাকল। এটা কীসের প্রতীক বলে মনে হচ্ছে তাদের? রংগুলির অর্থ কী? আমার নিজের ভাবনাচিন্তার কথাও তাদের জানালাম। আমার বিবেচনায় 'কুঁড়েঘর' ও গ্রাম সমার্থক। মাথায় ঊর্ধ্বমুখী গাঢ় লাল তীরচিহ্নের অর্থ তীব্র গতিবেগ, সবুজ হল নবজীবনের প্রতীক। সেই নতুন জীবনের দিকেই তীরের নিশানা।

প্রথমে আমার সহকর্মীরা ততটা আগ্রহী হল না। আমি নানারকম যুক্তি দিয়ে তাদের এই লোগোর অর্থ বোঝালাম। বললাম আজ থেকে এটা হল গ্রামীণ ব্যাংকের 'লোগো', খাম, চিঠি লেখার কাগজ, সবরকম কাগজপত্রের উপর এর ছাপ থাকবে। এটা আমাদের প্রকল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গেল। নতুন ব্যাংক এর উত্তরাধিকার বহন করবে।

সহকর্মীরা এবার আমার সঙ্গে একমত হল। আমাদের পত্র-পত্রিকা, কাগজ ইত্যাদির ওপর এই লোগো চিহ্ন ছাপানো হল। লোগোটি হয়ে গেল গ্রামীণ ব্যাংকের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই প্রতীক চিহ্নের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হল। বাঁশ ও রঙিন কাগজ দিয়ে প্রতীক চিহ্নের মডেল তৈরি হল। গ্রামীণ ব্যাংকের গেটের ওপর এই মডেল আটকে দেওয়া হল। দরজার রং করা হল সবুজ—যা খুলে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় প্রবেশ করতে হবে।

বোর্ড কখনও আমাদের 'লোগো' নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। গ্রামীণ ব্যাংকের অঙ্গ হিসেবে এটা খুব পরিচিতি লাভ করল। আজ অবধি সকলেই প্রথম দর্শনে এই প্রতীক চিহ্ন পছন্দ করেছে এবং গ্রামীণ ব্যাংক-কে চিহ্নিত করেছে এর দ্বারা।

* * *

১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর অবশেষে 'গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প' 'গ্রামীণ ব্যাংক' পরিচয়ে স্বীকৃত হল।

www.pathagar.com

এতদিন পর্যন্ত কর্মীদের নিয়োগপত্র ছিল অস্থায়ী। সর্বদা তাদের ভয়ে ভয়ে থাকতে হত এই বুঝি গোটা প্রকল্প ব্যর্থ হয়ে গেল। তাদেরও চাকরি থাকল না। যেই গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করল, তারা নতুন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মী হয়ে গেল। এর চেয়ে সুখের ও স্বস্তির খবর আর কী হতে পারে? তারা আনন্দ ফুর্তিতে মেতে উঠল।

টাঙ্গাইলের জামুরকি গ্রামের হাইস্কুলের খোলা মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি শাখা থেকে কিছু গ্রাহক নির্বাচন করে আমরা তাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালাম। স্থানীয় শাখাগুলির সব কর্মীদেরও আমন্ত্রণ রইল। ভিড়ে মাঠ উপছে পড়ল। ঢাকা থেকে মাননীয় অতিথিরাও এলেন। অর্থমন্ত্রী জনাব মুহিত, ঋণ গ্রহীতাদের প্রতিনিধি ও আরও অনেকে মঞ্চের উপর বসলেন।

রোদ ঝলমলে চমৎকার দিনটিতে অনুষ্ঠানের সূচনা হল পবিত্র কোরাআন পাঠের মধ্যে দিয়ে। ঋণ গ্রহীতাদের বক্তৃতা ছিল তার পর। প্রতিটি বক্তৃতাই ছিল আবেগবিহ্বল, একেবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত। আমরা এই লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছি। আমাদের স্বপ্ন আজ সার্থক।

চারিদিকে লাল, সবুজ, গোলাপি শাড়ি পরা ঋণগ্রহীতা ও দর্শকের সমাবেশ—যেন রঙের সমুদ্রে ঢেউ খেলছে। খালি পায়ে হেঁটে তাঁরা কতটা পথ পাড়ি দিয়েছেন শুধু এই আনন্দ উৎসবে যোগ দেবার জন্য। আমি নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। তাঁরা প্রাণ দিয়ে অধিকার অর্জন করেছেন। দারিদ্র থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাঁরা সম্পূর্ণভাবে বদ্ধপরিকর। কী চমৎকার উদ্দীপক দৃশ্য!

টাঙ্গাইল জেলার বেলতৈল গ্রামের এক সদস্যা ছিলেন জরিমন। সেদিন তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫২ সালের কাছাকাছি তাঁর জন্ম হয়। ছ' বছর বয়সে দুরারোগ্য চর্মরোগে তিনি প্রায় মরতে বসেছিলেন। এখনও সেই অসুখের দাগ সারা গায়ে। ছোটবেলায় আরও নানা রকম চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন তিনি। দশ বছর বয়সে, বাইশ বছর বয়সি এক বাড়ির চাকর রুস্তম খানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর দুই ছেলে, এক মেয়ে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের বছরটা সন্তানসহ প্রায় অনাহারে কাটিয়েছিলেন। যে-কোনও ছুতোয় স্বামী তাকে মারধোর করতেন। তালাক দেবার ভয় দেখাতেন। দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনির পর সেই দম্পতির ভাগ্যে ক্ষুধা, যন্ত্রণা ও বেদনা ছাড়া কিছুই জুটত না।

১৯৭৯ সালের ২০ ডিসেম্বর তিনি আরও চারজন মহিলার সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পে যোগ দেন। প্রথম ঋণ পেয়েছিলেন ৬০০ টাকা। ধানভানার ব্যবসার উপার্জন থেকে জরিমন ১৯৮১ সালের পয়লা জানুয়ারি দেনার প্রথম কিস্তি শোধ করেন। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের সুবাদে তাঁর যে রোজগার হত তাতে, প্রথম বছর থেকেই তাঁদের আর অনাহারে কাল কাটাতে হয়নি। পুরো পরিবারে সম্বচ্ছরের পোশাক কিনেও তিনি কিছু সঞ্চয় পর্যন্ত করতে পেরেছিলেন। প্রথম দিকে তাঁর স্বামী স্ত্রীর গ্রামীণ ব্যাংকে যোগদানের ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে থাকতেন। পরে যখন দেখলেন এতে কোনও গোলমাল নেই, তিনি খুশিমনে ব্যাপারটা মেনে নিলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে জরিমন গাই গোরু কিনলেন, বাড়ি তৈরি করলেন নিজের।

অনুষ্ঠানে জরিমন বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি বললেন: "আগে আমরা দিনের পর দিন না খেয়ে কাটাতাম। মালিকের বাড়িতে আমাকে ক্রীতদাসীর মতো খাটতে হত। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে দূর জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ মাথায় বয়ে নিয়ে আসতে হত সামান্য কিছু পারিশ্রমিকের আশায়। আমাদের নিজের কোনও ঘর ছিল না। সবাই বঞ্চনা করত। অবহেলা ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী। মর্যাদা তো দূরের কথা কেউ কখনও সহানুভূতির চোখে আমাদের দেখেনি। আজ ব্যাংক-ঋণের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সুখের মুখ দেখিয়েছেন।"

www.pathagar.com

২৩
গ্রামীণ ব্যাংকের বেসরকারিকরণ

অর্থমন্ত্রী জনাব মুহিত ১৯৮৫ সালে পদত্যাগ করেন। খবরটা ছিল আমাদের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গ্রামীণ ব্যাংক-কে বেসরকারি করে দেবার ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করার আগেই তাঁকে পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হল।

তবু আমাদের ভাগ্য একেবারে অপ্রসন্ন নয় কারণ, অর্থমন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সাইদুজ্জামান জনাব মুহিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁরা একই সঙ্গে সরকারি চাকরি করেছেন। গ্রামীণ ব্যাংক সম্বন্ধে উভয়েই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। গ্রামীণ ব্যাংকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জনাব মুহিত যে আশ্বাসের কথা বলেছিলেন তা জনাব সাইদুজ্জামানের অজানা ছিল না। আমি যখন তাঁকে অসমাপ্ত কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম, তিনি আমাকে কথা দিলেন যে জনাব মুহিতের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

তিনি কথা রেখেছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের মালিকানা সংক্রান্ত পরিকাঠামোয় পরিবর্তন আনলেন। গ্রাহকদের মালিকানা হল ৭৫ শতাংশ। বাকি ২৫ শতাংশ সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক ও বাংলাদেশের কৃষি ব্যাংকের মালিকানায় রইল।

* * *

১৯৮৬ সালে মালিকানার পরিবর্তন আনার ফলে পরিচালকমণ্ডলীর কাঠামোগত বিরাট পরিবর্তন আসল। এখন মোট ১৩ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জনই হবেন ঋণগ্রহীতাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি।

এবার গ্রামীণ ব্যাংক এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। বেসরকারি ব্যাংক হল বটে তবে প্রধান নির্বাহী, অর্থাৎ আমি হয়ে রইলাম একজন সরকারি আমলা। কারণ আইন মোতাবেক আমি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টার। আমাকে সরকারি চাকুরের সব নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে। এমনকী দেশের বাইরে কোনও সভায় যোগদানের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। (উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নারী সম্মেলনে আমি যোগ দিতে পারিনি কারণ, আমার অনুমতির আবেদন রাষ্ট্রপতি নাকচ করে দিয়েছিলেন। প্রশ্ন তুলেছিলেন, "জাতিসংঘের মহিলাদের সম্মেলনে একজন পুরুষের যোগ দেবার দরকার কী?")

আমার নিযুক্তিকরণও সরু সুতোয় ঝুলছিল। কারণ আমার নিয়োগপত্রে উল্লেখ ছিল, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পদে অধিষ্ঠিত থাকব। তার মানে

www.pathagar.com

যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার আমার উপর "সন্তুষ্ট" থাকছেন শুধু ততক্ষণই আমি এই পদে বহাল থাকব। যে-কোনও দিন সকালে উঠে সংবাদপত্র খুলে দেখতে পারি যে আমার জায়গায় অন্য কেউ এই পদে নিযুক্ত হয়েছেন। আমার বরখাস্তের কারণ নিয়ে সরকারের কাছে কোনও প্রশ্ন তোলা চলবে না। এরপর আমার কী কর্তব্য সে নির্দেশ দিতেও সরকার বাধ্য নন।

এটা আমার জন্য হয়ে রইল একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতি। আরও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির আশঙ্কায় আমি সর্বদা চিন্তাগ্রস্ত থাকতাম। বুঝলাম সরকার আমাকে হটিয়ে দেবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবার আগেই আমাকে সাবধান হতে হবে।

আমি আইনবিদ ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। গ্রামীণ ব্যাংকের আইনি পরিকাঠামো জাতীয় সংসদে পুনর্বিবেচনা করাবার জন্য আমরা একটি আবেদনপত্রের খসড়া তৈরি করলাম। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের আমলারা আইন সংশোধনের ব্যাপারে একেবারেই উৎসাহী ছিলেন না। এক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে বিদায় করতে যেখানে কোনও ব্যাখ্যা বা জবাব দিতে হয় না, সেক্ষেত্রে এহেন ক্ষমতার অধিকার থেকে নিজেদের তারা কেন বঞ্চিত করবে? তাদের কাছ থেকে আইনি পুনর্বিবেচনার জন্য সাহায্য আশা করাই বৃথা।

আমার প্রস্তাবের প্রতি অর্থমন্ত্রণালয় একেবারেই মনোযোগ দিল না। আমি তখন প্রস্তাবটি পেশ করলাম আরও উচ্চতর পদাধিকারীদের কাছে, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলে, যার সদস্যরা সকলেই মন্ত্রী। তাঁরা আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

জনাব সাইদুজ্জামানের পরবর্তী অর্থসচিব দুর্ভাগ্যবশত প্রস্তাবটি থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তিনি বললেন জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল আর সরকার সমার্থক নয়—অতএব অর্থমন্ত্রণালয় কাউন্সিলের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়। সরকারের শাসনযন্ত্রের সম্বন্ধে এই নতুন জ্ঞান আমার কাছে চিরস্মরণীয় ও চিরশিক্ষণীয় পাঠ হয়ে থাকবে। সরকারি যন্ত্র কোনওমতে ক্ষমতার একচুলও ছাড়তে চায় না, আরও একবার তার প্রমাণ পেলাম।

সম্ভাব্য প্রতিটি দরজায় আমি চেষ্টা চালাতে শুরু করলাম। শেষপর্যন্ত একেবারে গিয়ে হাজির হলাম স্বয়ং রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের কাছে। তিনি মন্ত্রী পরিষদের পরবর্তী সভায় এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে আদেশ দিলেন। অর্থসচিব আমাদের প্রস্তাবটি নাকচ করেই, ফাইলপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি কিন্তু হাল ছাড়লাম না।

রাষ্ট্রপতির দপ্তরের মুখ্য সচিবের কাছে আমার সমস্যাটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে, লিখিত আবেদন জানালাম। বোল্ডারে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন অধ্যাপনা করি তখন তিনি সেখানে আমার ছাত্র ছিলেন। এই অতীতের পরিচয়টুকুর সুবাদে তিনি আমাকে সর্বদা 'স্যার' বলে ডাকতেন। আমাকে সাহায্যপ্রার্থী দেখে তিনি আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। তিনি রাষ্ট্রপতিকে রাজি করিয়ে এই বিষয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করলেন। সেই বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, অর্থমন্ত্রী, অর্থসচিব, পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী এবং বিশেষ আমন্ত্রণে আমি। রাষ্ট্রপতি ছিলেন এই বৈঠকের সভাপতি।

আমার প্রস্তাবের সমর্থনে আমি জোরালো যুক্তি দিয়ে বক্তব্য রাখলাম। বৈঠকে উপস্থিত সবাই আমাকে সমর্থন করলেন—ব্যতিক্রমী ছিলেন কেবল অর্থসচিব। তিনি বোঝাবার চেষ্টা করলেন এই প্রস্তাব গৃহীত হলে ব্যাংকের উপর নজরদারি করার ক্ষমতা আর সরকারের হাতে থাকবে না এবং অধ্যাপক ইউনূসের অবর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের দায়িত্বভার সরকারের গ্রহণ করার প্রয়োজন হলে তখন সরকার তা করতে পারবে না।

www.pathagar.com

অর্থসচিবের বিপুল আপত্তি সত্ত্বেও আমার প্রস্তাব অনুমোদন করা হল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল আইন সংশোধনের। তবুও মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গড়িমসি করছিল। ভাগ্যক্রমে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হবার ঠিক আগের বৈঠকে আইন সংশোধনের প্রস্তাবটি পাশ হয়ে গেল। এর পরপরই গণ অভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন হল।

সংশোধিত আইন অনুযায়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। সরকারের এ ব্যাপারে আর ক্ষমতা রইল না। এরপর পরিচালকমণ্ডলী যখন আমাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগ করল তখন আমি আর সরকারি কর্মচারী থাকলাম না। হয়ে গেলাম গ্রামীণ ব্যাংকের একজন কর্মী।

আইনের এই পরিবর্তন ছিল গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য সর্বাপেক্ষা জরুরি দৃঢ় পদক্ষেপ। আইন কাঠামোতে এটা না হলে গ্রামীণ ব্যাংক যে-কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারত।

গ্রামীণ ব্যাংকের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান নিয়োগ সংক্রান্ত আইনে একটি পরিবর্তন এখনও অত্যন্ত জরুরি। এখনও পর্যন্ত সরকার চেয়ারম্যান নিয়োগ করে যাচ্ছেন এমন একটি ব্যাংকে যেটি বেসরকারি মালিকানাধীন। এটি অপ্রয়োজনীয়। ভবিষ্যতে এর থেকে অনেক বিপদ সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে যায়।

আমার বিশ্বাস গ্রামীণ ব্যাংকের বন্ধু ও গুণগ্রাহীরা আইনের এই অংশটি আশু পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে পারবেন। গ্রামীণ ব্যাংকের কোনও বিপর্যয় ঘটবার আগেই আইনের সংশোধনী পাশ করা জরুরি। আমার বিবেচনায় গ্রামীণ ব্যাংক-কে সুরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হল চেয়ারম্যান নিয়োগের ক্ষমতা পরিচালকমণ্ডলীর উপর ছেড়ে দেয়া, অর্থাৎ ব্যাংকের মালিকদের উপর ছেড়ে দেয়া।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্থ পর্ব

গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২৪
গ্রামীণ ব্যাংক: নানা দেশে

গ্রামীণ ব্যাংক-কে অনুসরণের অর্থ হল, এর আদর্শ ও কার্যপদ্ধতি অবলম্বনে নতুন অনুগামী সংস্থা গঠন করা। গ্রামীণ ব্যাংকের অনেক কর্মভাবনা আমাদের দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, অনুগামী প্রতিষ্ঠান গঠনের সময় সেগুলি সবক্ষেত্রে জরুরি নয়। এই সব ক্ষেত্রে আমরা নতুন কিছুর প্রবর্তন ও পরিবর্তনের পক্ষপাতী।

গ্রামীণ ব্যাংকের অনুগামী প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের শুরু থেকে খেয়াল রাখতে হবে যে, ঋণশোধের হার ১০০ শতাংশ বা তার কাছাকাছি হওয়া উচিত। অন্যথায় তাদের কর্মসূচিকে কখনও গ্রামীণ ব্যাংকের অনুগামী আখ্যা দেওয়া যাবে না। ঋণশোধের নিখুঁত হার গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের সাফল্য বাস্তবায়নের মাপকাঠি। ঋণ পরিশোধের মধ্য দিয়ে টাকা লেনদেন যত না গুরুত্ব পায় তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় শৃঙ্খলাবোধ।

গ্রামীণ ব্যাংকের অনুগামী প্রতিষ্ঠানগুলিকে আপোসহীন ভাবে যত বেশি সংখ্যক সম্ভব গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে যেতে হবে। সব অনুগামী সংগঠন প্রথম কাজ শুরু করবে সবচাইতে গরিব নীচের ২৫ শতাংশের মানুষকে নিয়ে। হতদরিদ্র মহিলাদের উপর গুরুত্ব দিতে হবে সবচেয়ে বেশি।

গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি ও জীবনদর্শন সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা খুবই জরুরি। গ্রামীণ ব্যাংক থেকে নিবিড়ভাবে সবকিছু শিখে নিতে হবে। সম্ভাব্য সমস্যাগুলি সম্পর্কে আগাম সচেতন হতে হবে।

গ্রামীণ ট্রাস্ট পরিচালিত আন্তর্জাতিক গ্রামীণ সংলাপ কর্মসূচি (Grameen Dialogue Programme) বছরে চার বার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যৎ অনুগামীদের পক্ষে এটা গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

* * *

আজ পর্যন্ত উনষাটটি দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের মতো ঋণ প্রকল্প চালু হয়েছে। এর মধ্যে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ দুই-ই আছে।

আফ্রিকার অনেক দেশে এর প্রয়োগ আছে। যেমন: বুর্কিনা ফাসো, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, চাদ, মিশর, ইথিওপিয়া, ঘানা, কেনিয়া, লেসেথো, মালি, মালাওয়ি, মরিতানিয়া, মরোক্কো, নাইজেরিয়া, সিয়েরো লিওন, সোমালিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, তানজানিয়া, টোগো, উগান্ডা, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে।

এশিয়ার দেশ হল—আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, কাম্বোডিয়া, চিন, ফিজি, ভারত,

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়া, কিরগিজস্তান, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, লেবানন, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম।

অস্ট্রেলিয়াতে পাপুয়া নিউ গিনি।

আমেরিকার দেশ হল—আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, ব্রাজিল, কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকোয়েডর, এল স্যালভাদর, গুয়াতেমালা, গায়ানা, জামাইকা, মেক্সিকো, পেরু ও যুক্তরাষ্ট্র।

ইউরোপের দেশ হল আলবেনিয়া, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, কসোভো, বসনিয়া, ইংল্যান্ড, পোল্যান্ড।

আফ্রিকা

এখানে এখনও আমরা পুরনোপন্থী চিন্তাধারার সম্মুখীন হই। সরকারি পরিকল্পনাদাতা, ঋণদাতা সংস্থা, ব্যাংকার এরা অধিকাংশই পুরনো ধ্যানধারণা আঁকড়ে থাকেন। প্রতিটি আন্তর্জাতিক বৈঠকে সমাজ বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীরা আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক ভাব পোষণ করেন। এঁদের ধারণা ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প কখনওই সফল হতে পারে না।

সম্প্রতি ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয় প্যারিসে একজন বুদ্ধিদীপ্ত, স্পষ্টবাদী মালির অধিবাসী গ্রামীণ ব্যাংক-কে সরাসরি আক্রমণ করে বললেন বামাকোয় দারিদ্র অতি প্রকট। সেখানকার মানুষ এতই হতদরিদ্র ও অজ্ঞ যে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের সদ্ব্যবহার করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব। সবচেয়ে আগে তাদের প্রয়োজন শিক্ষা। সামাজিক সেবা তাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, অবৈতনিক বিদ্যালয়, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ, বিনামূল্যে বস্ত্র বিতরণ তাদের অবশ্য প্রয়োজন। যে-মহিলা একথা বলছেন তিনি নিজে কখনও ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প নিয়ে পরীক্ষা চালাননি। এই অপ্রিয় সত্য কথাটা বলার থাকলেও ইচ্ছা সংযত করলাম। আবু টেল, এফ.এ.এ.আর.এফ.-এর (FAARF) টেকনিকাল ম্যানেজার। তিনি টোগোতে একজন সফল গ্রামীণ অনুগামী। তাঁকে ব্যাপারটি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ জানালাম। তিনি বললেন তাঁর সংস্থার সদস্য সংখ্যা আঠারো হাজার। সকলেই টোগোর গ্রামাঞ্চলের হতদরিদ্র বস্তিবাসী। এই সংস্থার ঋণ পরিশোধের হার ৯৭ শতাংশ, ঋণের টাকার লেনদেনের অঙ্কের পরিমাণ ১০ লক্ষ ডলার। কাজের ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক ও উন্নয়নমুখী।

আমার বন্ধু মারিয়া নোওয়াক গায়না ও বুর্কিনা ফাসোতে গ্রামীণের অনুগামী সংস্থা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর। ১৯৮৬ সালে মারিয়া এক সম্মেলনে প্রথম আমার বক্তৃতা শোনেন। তারপর তিনি বাংলাদেশে আসেন গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে। সব দেখে শুনে মারিয়া অসম্ভব উদ্দীপনা লাভ করেন। ইকোয়াটোরিয়াল আফ্রিকায় আমাদের অনুসরণ করে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প সংগঠনে উদ্যোগী হন।

বাংলাদেশের মতোই একই অভিজ্ঞতা হল এখানে। দরিদ্রদের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ঋণের টাকা হাতে পাওয়া। সুদের হার সেখানে কোনও বাধা নয়। ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিতে গরিব মানুষের কোনও অসুবিধাই হয় না। ঋণ থেকে এত শক্তি উদ্ভূত হয় যে গ্রহীতা তা দিয়ে অনেক অর্থকরী কাজের উদ্যোগ নিতে পারেন। এইরকম কর্মোদ্যোগ সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা কোনও পরিকল্পনাদাতা বা সমাজবিজ্ঞানী স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি।

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে মারিয়া নোওয়াক বোবো ডায়োলাসো শহরে মূসা নামক এক জুতো পালিশওয়ালার সঙ্গে আলাপ করেন।

"রোজগারের টাকা দিয়ে আপনি কী করেন?"

"অর্ধেক টাকা আমার, বাকি অর্ধেক মালিককে দিতে হয়।"

"আপনার মালিক কে?"

"জুতোর বাক্স ও ব্রাশ যিনি ব্যবহার করতে দিয়েছেন তিনিই মালিক।"

দুই দশক আগে জোবরা গ্রামে মানুষের হাতে পুঁজি থাকার গুরুত্ব বিষয়ে আমি যে জ্ঞানলাভ করেছিলাম, মূসার বক্তব্য ঠিক তারই প্রতিধ্বনি। হতদরিদ্রের উপার্জনের জন্য মূলধন কতটা জরুরি তাই সোচ্চারভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এইসব উদাহরণে। মাত্র চল্লিশ ডলার বা ৫০০০ CFA ফ্রাঙ্ক (স্থানীয় টাকা) ঋণ মূসার জীবন চিরদিনের জন্য বদলে দিতে পারে। এই ধরনের ঋণের সহায়তা না পেলে মালিক মূসার দৈনিক রোজগারের পরিমাণ যতটা সম্ভব কম রাখতে সচেষ্ট হবে যাতে সারাজীবন সে ক্রীতদাসত্ব করে কোনওরকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বেশি আর কিছু করে উঠতে না পারে।

বুর্কিনা ফাসোর সবচেয়ে শুষ্ক ও প্রত্যন্ত মরুঅঞ্চল ইয়াটেঙ্গাতে গ্রহীতারা ঋণের টাকা দিয়ে ভেড়া প্রতিপালন করে। তাদের পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে বিক্রির উপযুক্ত করে তোলে। তারপর ভেড়ার বাচ্চা কিনে তাদেরও অনুরূপভাবে স্বাস্থ্যবান করে তোলে। অতি শীঘ্রই তারা এক পাল ভেড়ার মালিক বনে যায়। আরও অনেক জীবিকা রয়েছে। পাইকারি দামে সাবান কিনে বিক্রি, এ ছাড়া ভাজা মাছ মুখরোচক নাস্তা হিসেবে বাজারে বিক্রি করে দিব্যি দিন চলে যায় অনেকের। ঋণের টাকায় খননের যন্ত্রপাতি কিনে কেউ কেউ সোনার খনির অনুসন্ধানে মন দেয়। অনেকের ঋণের টাকা একসঙ্গে করে পুরনো শস্যকল কেনা হয় সারা গ্রামের ব্যবহারের জন্য। গোটা অঞ্চল নানা কাজে মেতে রয়েছে—ঝিমিয়ে পড়া গ্রামটিতে প্রাণচাঞ্চল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের প্রাপ্য।

* * *

দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, কেনিয়া, ইথিওপিয়া ও মিশর এই দেশগুলিতে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুগামী সংস্থা পরিদর্শন করার সুযোগ ঘটেছে আমার।

কেনিয়ার মোম্বাসাতে আমি পবিত্র রমজান মাসে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম তিনি বললেন গ্রামের কেউ ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী হবে না। এদের ধর্মীয় গোঁড়ামি কল্পনার অতীত। গ্রামবাসীরা রমজানের উপবাসের জন্য খুবই দুর্বল। এখন গরম, শুকনো মরশুম, কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার পক্ষে অনুপযুক্ত। সর্বোপরি ক্ষুদ্র-ঋণের বিষয়টিই তাদের মানসিকতায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তিনি আরও বললেন, আমার আবেদন তাঁদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করবে। আমিও একজন মুসলমান। জীবনের উন্নতির প্রচেষ্টার জন্য রমজান মাসে উদ্যোগ নেওয়ার মধ্যে আমি কোনও অন্যায় দেখি না। ঘটলও তাই। যেই আমি টাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম গ্রামের সব মহিলা উপবাসের দুর্বলতা, আব্রু সব ভুলে আমাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন শুরু করে দিলেন।

যখন সেখান থেকে ফিরে আসছিলাম স্থানীয় মহিলারা আমায় বিদায় দিতে ফেরিঘাট পর্যন্ত এসেছিলেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত মোম্বাসার উদ্দেশ্যে আমার নৌকো ছাড়ল তাঁরা ঘাটে অপেক্ষা করছিলেন। সমানে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে যাচ্ছিলেন যার মধ্যে অধিকাংশ

www.pathagar.com

প্রশ্নই ছিল, "আবার কবে আসছেন? এবার এলে সঙ্গে টাকা আনবেন তো?"

ভাবতে তাজ্জব লাগে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যতই আলাদা হোক, গ্রামীণ ব্যাংকের আদর্শ অনুসরণ করে তার অনুগামী সংস্থা গড়ে তোলা একেবারেই কঠিন কাজ নয়।

* * *

দক্ষিণ আফ্রিকাতে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরে, জানিন অঞ্চলে, ছ'টি আসন বিশিষ্ট একটি বিমানে একবার উড়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে এক বাওবাব গাছের নীচে বেঞ্চে বসে একটি ছোট উদ্যোগ সংগঠনের গ্রাহকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলাম (এখানে ব্যাংকার কথাটির মূল অর্থ অনুসরণ করা হয়েছিল—ফরাসিতে বেঞ্চের সমার্থক শব্দ থেকে; মানে হল বেঞ্চের উপর খোলা জায়গায় যেভাবে ব্যাংকের কাজ চলছে সেটি ব্যাংকের আদি অর্থই পূরণ করেছে।) গ্রুপের সদস্যরা দূর দূর থেকে জমায়েত হয়েছেন—গান, নাচ, খাওয়া-দাওয়া চলছে—চারিদিকে খুশির মেজাজ।

প্রথমে প্রত্যেক গ্রহীতার সঙ্গে কথা হল। তারপর কর্মীদের সঙ্গে। তাদের পরামর্শ দিলাম মহিলা ও পুরুষদের কেন্দ্র সর্বদা পৃথক রাখতে। না হলে পুরুষরা অনতিবিলম্বে মহিলাদের উপর খবরদারি করে নিজেরাই কেন্দ্রের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠবে।

আফ্রিকায় আমাদের অনুগামী সংস্থার প্রয়াস, 'দারিদ্র' নামক বিপুলায়তন সমস্যার উপর একটা আঁচড় মাত্র। আমাদের এখনও অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে।

এশিয়া

নেপাল, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি এশিয়ান দেশগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থা বাংলাদেশেরই মতো। এই দেশগুলির পরিবেশে গ্রামীণের মতো ঋণ প্রকল্প চালু করা খুবই সুবিধাজনক। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলিতে, যেমন ভারতে, জাতিভেদ প্রথা ভয়ংকর, সেখানেও গ্রামীণের অনুগামী সংস্থাগুলি অসম্ভব সাদরে গৃহীত হয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণের জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট উপায়, কারণ বিশ্বের দরিদ্র জনগণের পাঁচভাগের চারভাগই এশিয়ায় বসবাস করে। সব গ্রামীণ ব্যাংকের অনুগামী প্রকল্পের বিষয় বর্ণনা করা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। পড়তে ভাল লাগবে, কৌতূহল জাগবে এমন কতকগুলি কথাই এখানে বলব।

মালয়েশিয়া

অধ্যাপক ডেভিড এস গিবনস গ্রামীণের প্রাথমিক পর্যায়ের অনুকরণে এখানে একটি প্রকল্প চালু করেছেন। ১৯৮৩ সালে তিনি প্রথম বাংলাদেশে আসেন আমাদের শাখাগুলির কাজকর্ম পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে।

কয়েকমাস পর তিনি ও তাঁর সহকর্মী শুকুর কাসিম রংপুরে আমাদের কাজের মূল্যায়ন

www.pathagar.com

করতে এলেন। রংপুরে এসে দুজনের মাথাতেই গ্রামীণ ব্যাংকের পোকা চাপল।

ফলত ১৯৮৪ সালের দ্বিতীয় ভাগে তাঁরা প্রথম প্রকৃত গ্রামীণ ব্যাংকের অনুসরণকারী সংস্থা গড়ে তুললেন। অর্থ জোগালেন সেলাংগর রাজ্য সরকার, মালয়েশিয়ার বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুয়ালালামপুরে অবস্থিত এশিয়া প্যাসিফিক উন্নয়ন কেন্দ্র। কয়েকমাস পরে অধ্যাপক গিবন্‌স আমায় ফোনে জানালেন কিছুই সামলানো যাচ্ছে না। আমি আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী নুরজাহান ও শাহ্ আলমকে ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে পাঠালাম। তারা ফিরে এসে সঠিক উত্তর দিতে পারল না। শুধু বলল, "এখানে গ্রামীণ-এর চিহ্নমাত্র দেখলাম না। অধ্যাপক গিবন্‌স-এর প্রয়াস আদৌ গ্রামীণ অনুসারী নয়, সন্তোষজনকও নয়।"

কারণ অনুসন্ধান সম্বন্ধে তাদের মতামতের ভাষার রাখঢাক ছিল না বলে প্রথমে অধ্যাপক গিবন্‌স খুব রাগ করলেন। তাঁর অভিযোগ তাঁর কাজকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। ধীরে ধীরে আমরা তাঁকে গ্রামীণ ব্যাংকের মূলনীতি সম্বন্ধে বোঝাতে শুরু করলাম। শৃঙ্খলা, দলগত একতা ও শুধুমাত্র মহিলাদের মধ্যে ঋণ সীমাবদ্ধ রাখার গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হলাম। তাঁরা বুঝতে পারলেন গ্রামীণ ব্যাংক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করলে বিপর্যয়ের আশঙ্কা অনেক বেশি। অন্যভাষায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে যা দেখে এসেছেন হুবহু তার অনুসরণ করতে পারলে তবেই তাঁরা সফল হবেন।

বর্তমানে 'আমানা ইখ্‌তিয়ার মালয়েশিয়া' ৩০ হাজার দরিদ্র পরিবারের কাছে পৌঁছে গেছে। এই অনুসরণ এত সফল যে এখন গিবন্‌স 'ক্যাশপর' (Cashpor) বলে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন—উদ্দেশ্য গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের সম্প্রসারণ ও প্রসার সম্বন্ধে এশিয়ার দেশগুলিকে সহায়তা করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।

ফিলিপাইনস

ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প পরিদর্শন করতে অনেকবার আমি ফিলিপাইনস গিয়েছি। প্রধানত নিগ্রোস অক্সিডেন্টাল প্রদেশে এবং বন্যা, অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও গৃহযুদ্ধের প্রকোপে বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি সফর করেছি। আজ পর্যন্ত ফিলিপাইনসে ৩২টি গ্রামীণ অনুগামী প্রকল্প চালু আছে যেগুলির মধ্যে সি.এ.আর.ডি (CARD), প্রজেক্ট ডুনগানন, এ.এস.এইচ.আই. (ASHI) এবং টি.এস.পি.আই. (TSPI) অন্যতম।

চিন

যদি কর্তৃপক্ষ দরিদ্রদের সাহায্য করার ব্যাপারে সত্যিই আগ্রহী হন তো কমিউনিস্ট দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের কাজ করতে কোনও বাধা নেই।

চিন সরকার স্বীকার করেছেন যে সেখানে প্রায় ৮ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী এই পরিসংখ্যান হল মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ বা ১২ কোটি। যেটাই সঠিক হোক চিনে বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস। সরকার এই সমস্যার মোকাবিলায় অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন কিন্তু কোনওটাই সমস্যার উপর একটি আঁচড়ও কাটতে পারেনি, যেসব অঞ্চলের আবহাওয়া অনুকূল নয়, যেমন পাহাড়ি অঞ্চল, সেখানে ভূমিক্ষয় প্রবল এবং সেখানেই দারিদ্র অত্যন্ত প্রকট।

www.pathagar.com

চিনে দুটি প্রদেশ আমি পরিদর্শন করেছি। এখানে গ্রামীণের মতো সংস্থা চালু হয়েছে। কাজ করছে গ্রামোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সংস্থাগুলির নাম হল—হেনান প্রদেশে 'নানঝাও প্রকল্প' (Nanzhao project) ও 'ইউচেং প্রকল্প' (Yucheng project), হেবাই প্রদেশে 'ইশিয়ান প্রকল্প' (Yixian project), সাওনোসি প্রদেশের ডানগানন-এ আর.ডি.আই. (RDI)-এর আর একটি প্রকল্প আছে। বেজিং-এ RDI-এর সঙ্গে যুক্ত এই চারটি প্রকল্প অধ্যাপক দু শাওশানের (Du Xiaoshan) তত্ত্বাবধানে কাজ করছে।

উত্তরাঞ্চলে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। ভাবলে শিউরে উঠতে হয় যে এখানে তাপাঙ্ক -২৫°C-এ নেমে যায়। দরিদ্র মানুষ শীত থেকে বাঁচবার আদিম, দেশজ উপায় অবলম্বন করে। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালায়। গোটা পরিবারের শয্যা রাখা হয় সেই গর্তের উপর। সারা ঘর ধোঁয়ায় ভরে যায়। এক বিছানায় পুরো পরিবার শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য কোনওমতে জড়সড় হয়ে বসে থাকে। খাবার জোগাড় বা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সারবার জন্য বাইরে যাবার প্রয়োজনটুকুও যেন জীবন মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শীতে প্রায় জমে যেতে যেতে ও কাশতে কাশতে তারা কোনওক্রমে এক দৌড়ে সেই বিছানার ওপরে ফিরে আসে, হাঁফ ছাড়ে, শরীর গরম করতে করতে ভাবে এবারের মতো বেঁচে গেলাম, জন্তু জানোয়ারদের কষ্ট চোখে দেখা যায় না। পরিস্থিতি খুবই প্রতিকূল, নিষ্ঠুর ও ভয়াল।

গরমের সময় পশুরা জঙ্গলে ও মাঠে স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াতে পারে। হতদরিদ্র এক চিনা রমণীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি ঋণের টাকা পশুপালনের জন্য ব্যয় করছেন। শুয়োর, ছাগল, গোরু সব পশুদের ভাল ভাল খাবার-দাবার খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট হলে বিক্রি করে দেবেন। ১৯৯৭ সালে লি পেন, তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল, সরকারি ভাবে গ্রামীণের সাফল্যের তারিফ করেছেন। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দান। একটি দলের একনায়কতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এটা হল আমাদের উদ্যোগের যৌক্তিকতার দলিল বা প্রমাণপত্র। নীতির বিচারে এই পার্টির আমাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব থাকাই স্বাভাবিক। সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে গ্রামীণ অনুগামী সংস্থাগুলিকে আগলে রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও এর থেকে প্রমাণিত হয়। সরকার কমিউনিস্ট বা পুঁজিবাদী যাই হোক না কেন, কোনওরকম সরকারি হস্তক্ষেপের মধ্যে গ্রামীণের সাফল্য ও অগ্রগতি একেবারেই সম্ভব নয়।

আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকা

সেন্ট্রাল ও ল্যাটিন আমেরিকায় বহু ক্ষুদ্র-ঋণ সংস্থা কাজ করছে। এক্সিয়ন (Accion) এদের মধ্যে বৃহত্তম। এঁদের ২৫টি সহযোগী সংস্থা ১৩টি ল্যাটিন আমেরিকান দেশে ছড়িয়ে আছে। এ ছাড়া ৬টি আমেরিকান শহরও আছে। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এক্সিয়ন ১৭০ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে। ১৩ লাখেরও বেশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে প্রত্যেকে ৬০০ ডলার ঋণের অধিকারী হয়েছে। এইসব উদ্যোগীদের মধ্যে প্রাচীনতম একটি হল ব্যাংকোসল (Bancosol)। ১৯৮৩ সালে এই সংস্থা কাজ শুরু করে। বলিভিয়াতে এর গ্রাহক সংখ্যা হল ৭২,৪৩২। যাঁদের মধ্যে ৬০ শতাংশ মহিলা।

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র-ঋণ নির্ভর অন্যান্য সংগঠনও রয়েছে যেমন ফিনকা (Foundation for International Community Assistance—FINCA), ক্যাটালিসিস (Katalysis)। এঁরা ল্যাটিন আমেরিকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন।আমেরিকার গ্রামীণ ফাউন্ডেশান (Grameen Foundation) ল্যাটিন আমেরিকায় নির্দিষ্ট দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর উপর কাজ করতে ইচ্ছুক গ্রামীণ ব্যাংক অনুগামী সংস্থাগুলিকে সবরকম সহায়তা দান করে থাকে।

উত্তর আমেরিকা

পরিসংখ্যানের হিসেব অনুযায়ী উন্নত দেশগুলির দরিদ্র মানুষের আর্থিক ও ধনসম্পদের অবস্থা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র জনগণের তুলনায় অনেক ভাল। তবুও এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুস্তর মানসিক পার্থক্য বর্তমান। উন্নত দেশগুলির অতি প্রাচুর্যময় পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দারিদ্রের যন্ত্রণা সহ্য করা সম্ভবত অধিক কষ্টকর।

বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের টেলিভিশন, গাড়ি, শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র কিছুই নেই। এর মধ্যে লক্ষ করবার বিষয় হল গ্রাম বাংলার ধনী সম্প্রদায়ের ঘরেও এসব আয়োজন নেই। তৃতীয় বিশ্বে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য থাকলেও দুই সম্প্রদায় একই সঙ্গে দিনযাপন করে—একে অপরের উপর নির্ভর করে। সেই অর্থে কিছু একটা সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে।

তৃতীয় বিশ্বের হতদরিদ্র সম্প্রদায় একঘরে হয়ে থাকে না, তাদের আলাদা করে রাখা হয় না। আমার স্কুল বয়সের বন্ধুরা অনেকেই ছিল গ্রামের প্রতিবেশীদের সন্তান। তারা সবাই প্রায় নিরক্ষর। এই সব বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলেছি, পুকুরে সাঁতার কেটেছি, ইঁদুরের গর্তে জড়ো করা ধানের খোঁজ করে বেড়িয়েছি। আমাদের নিজেদের জমি থেকে ধান চুরি করে সেই সব বন্ধুদের ধান সংগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছি। ধান জোগাড়ের তাগিদে তাদের খেলার সময় যাতে নষ্ট না হয় সেটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। তাদের কাজে গাফিলতির জন্য বাবা মায়ের বকুনি থেকে বাঁচাবার আন্তরিক প্রচেষ্টাও ছিল আমাদের ওইরকম অনৈতিক কাজের পিছনে।

শিকাগোতে এইরকম ঘটনা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ধনী মানুষদের সাদা চামড়ার বাচ্চা কালো গরিবদের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছে এ দৃশ্য সহজে চিন্তা করা যায় না।

* * *

কানাডার 'ক্যালমিডো ফাউন্ডেশান' (Calmeadow Foundation) এক উদ্দীপক ও চমকপ্রদ ঋণদান প্রকল্প চালু করেছে আদি বাসিন্দাদের জন্য। আমেরিকায় একই প্রকল্প চালু হয়েছে দক্ষিণ ডাকোটায় স্যু-দের (Sioux) নিয়ে। ক্যালমিডোর মার্টিন কোনেল বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি আমাদের অত্যন্ত উপকারী সুহৃদ হয়ে উঠলেন। ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের উদ্যোগ তিনি অসম্ভব পারদর্শিতার সঙ্গে সংগঠিত করে দেখিয়েছেন। ক্যালমিডো নিজেরাই ক্ষুদ্র উদ্যোগী সংস্থাকে ৫০,০০০ ডলার পর্যন্ত ঋণদান করে থাকে।

আমেরিকায় ৫০টিরও বেশি গ্রামীণের ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালু আছে। অধিকাংশ সার্থক এবং সফল।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের কেমব্রিজ ম্যাসাচুসেটসের সংস্থা 'ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল' (Working Capital) প্রতিষ্ঠা করেন জেফ্রি অ্যাশ (Jeffrey Ashe) ১৯৯০ সালে। এঁদের লক্ষ্য হল 'অভাবী উদ্যোক্তারা'। যেসব মানুষ রোজগারের হদিশ খুঁজে পেয়েছেন কিন্তু পুঁজি ও অন্যান্য নির্ভরতার অভাবে এগোতে পারছেন না, তাদের সাহায্য করা।

৫ বছরের মধ্যে 'ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল' ১৫ লক্ষ ডলার ঋণ দিতে সক্ষম হয়েছে। ৫০০ ডলার থেকে শুরু ৫০০০ ডলার, মোট ১১০০টি বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে। ঋণ পরিশোধের মাত্রা হল ৯৮ শতাংশ। দিলওয়ার ও দক্ষিণ মায়ামিতে তারা প্রতিনিধি সংস্থা স্থাপন করেছে। জেফ্রি অ্যাশের বিরাট পরিকল্পনা: তিনি ১৯৯৭ সালের শেষভাগ পর্যন্ত কম করে ৭০০০টি ছোটখাটো কারবারে সহায়তা দানে ইচ্ছুক যাতে করে ৬ কোটি ডলারের সমমূল্যের কর্মসংস্থান হয়। পরের দুটি অধ্যায়ে আমেরিকায় ক্ষুদ্র-ঋণের অনুসরণ সম্বন্ধে আরও তথ্যাবলি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউরোপ

পূর্ব ইউরোপ

প্রাক্তন কমিউনিস্ট দেশ পোল্যান্ড ও সাম্প্রতিকতম বসনিয়াতেও ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প কাজ করছে। চার বছর আগে বিশ্বব্যাংক আলবানিয়াতে এক চমকপ্রদ গ্রামীণ অনুগামী প্রকল্প চালু করেছিল। তার প্রতিটিরই পরিশোধের মাত্রা ১০০ শতাংশ। প্রতিটি দেশে এই অনুগামী সংস্থাগুলির জন্ম এক একটি ইতিহাস—সেসবের তালিকা বা বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

কিন্তু ব্রিটেনের বার্মিংহাম, কভেনট্রি, নরউইচ ও গ্লাসগোতে যেসব ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পও সদ্যোজাত, সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ সেগুলির আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস।

পোল্যান্ড-এর রোসালিন্ড কোপিসারো অক্সফোর্ড ও ওয়ার্টন স্কুল অফ বিজনেস-এর (Warthon School of Business) একজন স্নাতক। তিনি ছিলেন জে.পি. মরগান বিনিয়োগ ব্যাংকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। জীবনে কখনও তিনি দশ কোটি ডলারের কম অর্থের কোনও অর্থের কোনও ঋণ দেননি। বিমানে লন্ডন থেকে ওয়ারশ যাবার পথে 'ফিনানশিয়াল টাইমস'-এ গ্রামীণ ব্যাংক সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন পড়বার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। তৎক্ষণাৎ তিনি অনুভব করেন যে ঠিক এইরকম প্রতিষ্ঠানই পোল্যান্ডের জন্য উপযোগী। দেশে ফিরে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। যদিও কীভাবে আলোচ্য প্রকল্পটি কার্যকরী করে তোলা যায় সে ব্যাপারে তখনও তিনি সম্যক ধারণা করতে পারেননি। অর্থমন্ত্রী তাঁকে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে, পোল্যান্ডে একটি গ্রামীণ প্রকল্প চালু করতে আহ্বান জানান। ১৯৯৩ সালের খ্রিস্টমাসের সময় রোসালিন্ড সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। প্যোলান্ডে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের ধারণা প্রবর্তন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বলাবাহুল্য এর জন্য তিনি জে.পি. মরগানের লোভনীয় চাকুরি ছেড়ে দেন।

রোসালিন্ড তাঁর ছোট্ট দলের সহযোগিতায় ২০০টি ঋণদান প্রকল্পের মূল্যায়ন করেন। তার মধ্যে ছাগল পালনের জন্য প্রদত্ত ঋণও ছিল। এই প্রকল্পে ছাগলের প্রথম দু'টি মাদি

www.pathagar.com

বাচ্চার জন্য মালিককে বিশেষ ছাড় দেওয়া হত। প্রকল্পের উপযুক্ত পরিকাঠামো গঠনের উদ্দেশ্যে একবছর ধরে তারা নয়টি আদর্শ নমুনার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। কোন নমুনা দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তারই সঠিক অনুসন্ধান করা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। অবশেষে তাঁরা গ্রামীণ প্রবর্তিত পদ্ধতিতেই প্রকল্প পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আজ তাঁদের ২০টি শাখা ৪০০০ জন গ্রাহককে ঋণদান করছে। পরিশোধের হার ৯৮ শতাংশ ও ঋণের অঙ্কের পরিমাণ ১০ কোটি ডলার। তাঁদের উদ্ভাবিত এবং পরিকল্পিত নতুন ব্যবসায় ২০০০-এর ওপর মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাঁদের ৩০০০ প্রাক্তন সদস্য অর্থনৈতিক যোগ্যতা অর্জন করেছে।

২০০২ সালের মধ্যে তাঁদের প্রতিষ্ঠান ফুন্ডুস মাইক্রো (Fundusz Micro) ব্যাংকিং লাইসেন্স পেয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে চলেছে।

রোসালিন্ডকে ইদানীং প্রায়ই বলতে শুনেছি, "আগের কর্মজীবন ছিল দ্বিমাত্রিক। সে কাজ ছিল আত্মাবর্জিত। বর্তমানে আমি যা করছি সেখানে আমার কর্মপ্রচেষ্টার এবং সেই সঙ্গে জীবনেরও প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেয়েছি।" তিনি যথার্থই সামাজিক উদ্যোগীদের মধ্যে একজন। এরা সবাই দরিদ্রদের কাছে ক্ষুদ্র-ঋণের সুযোগ পৌঁছে দেবার কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছে।

পশ্চিম ইউরোপ

ইউরোপের বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, (বুদ্ধিজীবী, ব্যাংকার ও সাংবাদিকরা তো বটেই) আমাদের আইডিয়ায় অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি সংস্থা ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালু করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

বন-এ আমি জার্মান পার্লামেন্টারি কমিটি ও জার্মান বিশপদের সভায় বক্তব্য রেখেছি। এ ছাড়া ফরাসি টেলিভিশনের দর্শকদের কাছে আমার বক্তব্য পেশ করেছি। ইংল্যান্ডে সাম্মানিক ডিগ্রি লাভ করেছি। কিন্তু প্রকৃত কাজের প্রত্যক্ষ ফলাফল খুব ধীর গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।

হতে পারে গ্রামীণ ব্যাংক একটি প্রথাবিরুদ্ধ আদর্শ এবং এর বক্তব্য ও কার্যপদ্ধতি প্রচলিত প্রথা থেকে স্বতন্ত্র। আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল তথাকথিত সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থাগুলি। উন্নয়নের নাম করে তাঁরা যে কর্মকাণ্ড চালিয়ে থাকেন, আমাদেরকে প্রায় সময় ওই ধরনের চিন্তাধারা পরিবর্তন করার কাজে লেগে থাকতে হয়।

সর্বত্র আমাদের অনুগামী সংস্থাগুলি একই সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। সরকারি দাক্ষিণ্যে যাদের সামান্য মাসিক খোরপোষ ভাতা ছাড়া আর কিছুই জোটে না, তারা ব্যক্তিগত ঋণ পাবার কথা ও তা দিয়ে নতুন কারবার করবার সম্ভাবনার ভাবনায় অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত বোধ করেন। অনেকেই আবার হিসেব করতে বসে যে কত পরিমাণ সরকারি খোরপোষ ভাতা বা বীমার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। সব হিসেবনিকেশের পর তারা সিদ্ধান্তে আসে যে 'গ্রামীণে' যোগ দিলে লাভের বদলে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা।

অনেক গ্রহীতা আবার ঋণ নেওয়ার ব্যাপারটা সযতনে গোপন রাখতে চেষ্টা করেন। আশা করেন সরকারপক্ষ টেরও পাবে না। যাঁরা প্রাণপণে নিজের অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টায় কোনও খোরপোষ গ্রহণ করছেন তাঁরা সরকারি পরিদর্শকদের চোখে প্রতারক বলে চিহ্নিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা রাষ্ট্রীয় ভাতার সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। শিল্পোন্নত দেশে

www.pathagar.com

অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মকে বেআইনি আজে-বাজে কাজ বলে গণ্য করা হয়। আইনসংগত কাজ করতে গেলে স্বনিযুক্ত দরিদ্র মানুষটিকে সমস্ত দলিল দস্তাবেজ আমলাদের কাছে দাখিল করতে হবে। জমা খরচের খাতা রাখতে হবে। একটি অনভিজ্ঞ গরিব মানুষের পক্ষে সরকারি আমলাতন্ত্রের সকল চাহিদা মেটানোর আশা করাই অবাস্তব ব্যাপার। সেইজন্য ইউরোপে আমাদের অনুগামী সংস্থার অনেক গ্রহীতা প্রথম প্রথম নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করছিলেন।

সবটাই উম্মাদের কাণ্ড কারখানা। ফ্রান্সে আমাদের অনুগামী সংস্থা স্থির করেছিলেন যে গ্রাহকদের ঋণ দেবার কাজটা গোপনে গোপনে সারতে হবে। ক্ষুদ্র-ঋণ গ্রহীতা এ ব্যাপারে কোনও নথিপত্র রাখবে না।

(আমেরিকায় ইলিনয়ে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প এই ঝঞ্ঝাট এড়াতে পেরেছিল। এদেশের সরকার ক্ষুদ্র-ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের অনুমতি দেন। কারবার যতদিন না পর্যন্ত স্বনির্ভর হয়ে উঠছে, ততদিন গ্রহীতাদের রাষ্ট্রের সব সুযোগ-সুবিধা দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।)

আবার আইন যখন গরিব মানুষের স্ব-উপার্জনের সপক্ষে, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির উপদেষ্টাগণ তখন তা মানতে রাজি নন। সদ্য জেল ফেরত এক যুবক নতুন করে জীবন ও জীবিকা শুরু করতে চেয়েছিল। আলু ভাজা বিক্রির জন্য একটি ফাস্ট ফুডের স্টল খোলার ইচ্ছা ছিল তার। প্যারিশিয়ান-চ্যারিটি নামক সংস্থা যারা তাকে সাহায্য করছিল তারা তাকে কিছুতেই স্বাধীন জীবিকা অবলম্বনের সুযোগ দেয়নি। ওদেরই নিজস্ব দোকানে মাইনে করা কর্মী হিসেবে তারা তাকে নিযুক্ত করতে চাইল। সে নিজে একটি দোকানের মালিক হবে এটা মেনে নিতে পারল না 'প্যারিশিয়ান চ্যারিটি'।

স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে দাক্ষিণ্য ও ভালবাসা কখনও কখনও জেলখানার মতোই কঠোর।

কিন্তু যত ধীর গতিতেই হোক না কেন দিন বদলাচ্ছে। ১৯৬০-এর দশকে যেমন বুদ্ধিজীবী ও সমাজবিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রের ত্রাণকর্তা মনে করা হত, সেই ধারণায় এসেছে আমূল পরিবর্তন।

যুক্তরাজ্য

ক্ষুদ্র-ঋণ যে সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করে, সেই সমস্যা সম্বন্ধে এখানে ক্রমে ক্রমে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এস্টন পুনর্বিনিয়োগ সংস্থা (Aston Reinvestment Trust), সমাজের বিনিয়োগকারী সংস্থা (Investors in Society) এবং স্থানীয় বিনিয়োগ তহবিল (Local Investment fund), শিল্প ও সমবায় মালিকানা তহবিল (Industrial and Common Owernership fund) এবং সমবায় পুঁজির অংশীদার সংস্থা (Community Capital Share Issue)—এই জাতীয় উদ্যোগসমূহ দরিদ্রদের নানাভাবে সহায়তা দানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাজ্যে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প প্রচলনের চেষ্টা আজ অবধি হয়নি।

উওমেনস এমপ্লয়মেন্ট এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ট্রেনিং ইউনিট (WEETU), গ্রামীণের আদর্শ অনুসরণ করে ব্রিটেনের কিছু শহর ও নরফোক গ্রামাঞ্চলে, 'ফুল সার্কেল ফান্ড' (Full Circle Fund) নামক একটি প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। ব্রিটেনের আর সব অঞ্চলের তুলনায় নরফোকে মহিলারা সর্বাপেক্ষা কম বেতন পান। এঁরা যে জনগোষ্ঠীকে লক্ষ করেছিলেন

www.pathagar.com

তাঁরা মূলত পূর্ব নরউইচ, উত্তর ওয়ালসাম এবং থেটফোর্ডের অধিবাসী। 'নিউহ্যাম বাঙালি গোষ্ঠী' সম্প্রতি নিজস্ব ক্ষুদ্র-ঋণ প্রতিষ্ঠান চালু করেছে। নিজেদের গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ পরিষেবার জন্য এই সংস্থাকে তাঁরা স্বনির্ভর করে তুলতে চান।

ফ্রান্স

আমাদের অনুগামী সংস্থাগুলির একটির নাম এ.ডি. আই.ই. (ADIE: I' Association Pour Le Dvoit a e initative)। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ড. মারিয়া নোওয়াক। তিনি একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে ফ্রান্সে একটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ১২ লক্ষ ফ্রাঙ্ক খরচ, কিন্তু ক্ষুদ্র-ঋণের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একজনের জীবিকাসংস্থান করতে খরচ মাত্র ৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক। ADIE-র গ্রাহক নির্বাচনের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। জায়েরের একজন প্রাক্তন ধর্মপ্রচারক, লিও রাত কাটাতেন গাড়ি রাখবার জায়গায়। তার স্ত্রী জায়েরের বন্দিদশায় অত্যাচারিত ও ধর্ষিত হয়েছিলেন। লিও একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজে একটি ক্যালকুলেটর কিনে পছন্দমতো কাজ করবার প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর। ঋণ তাঁকে নিজের জীবিকা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছিল।

মাদাম সালেমা একজন উত্তর আফ্রিকান মহিলা। প্রাপ্ত ঋণের টাকা দিয়ে একটি মনোহারী দোকান খুলেছিল সে। তরুণ বার্নার্ড চোখে কম দেখত। একদিন তার চশমা ভেঙে যায় ফলে রেস্তোরাঁয় সামান্য ডিশ ধোওয়ার কাজও সে করতে পারছিল না। সেন্ট লেজেয়ার রেলস্টেশনে সে বাস করত তার বান্ধবীর সঙ্গে। সেখানে মাল রাখবার লকার ভাড়া করতে পারেনি বলে যা কিছু সম্বল প্লাস্টিকের ব্যাগ বোঝাই করে, সঙ্গে নিয়ে সর্বত্র ঘুরতে হত।

এদের আলাদা আলাদা করে ঋণ দেবার ফলে, অন্যরা ঋণ পরিশোধ করছে কিনা তাই নিয়ে এরা কেউই মাথা ঘামাত না। গ্রহীতাদের সামাজিক একতার বন্ধন সুদৃঢ় না হলে সমমনস্ক সমর্থন গড়ে ওঠে না। গ্রামীণ ব্যাংক পদ্ধতিতে ঋণদানের সেটাই হল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ফ্রান্সের প্রাথমিক স্তরের অনুগামী সংস্থাগুলি পর্যালোচনা করে গ্রামীণ ব্যাংকের বিশ্লেষকগণ অভিমত দিলেন যে পরস্পর নির্ভরশীল ঋণবণ্টন শহরের পরিমণ্ডলে সম্ভব নয়। যে-কোনও নতুন প্রকল্পের সূচনাপর্ব খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে। চার বছর চালু থাকার পর গ্রামীণ প্রকল্প মাত্র ৫০০ জন গ্রাহক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালু করতে গিয়ে আমরা বহু মূল্যবান জ্ঞান অর্জন করেছি। সেইজন্য ১৯৭৯ সালের পর থেকে আর আমাদের পিছিয়ে পড়তে হয়নি এবং উলটোটাই ঘটেছে। উন্নতি এসেছে অসম্ভব দ্রুতগতিতে। কঠিন ব্যর্থতার পথ ধীর পদক্ষেপে অতিক্রম করাই সাফল্যের চাবিকাঠি। যাঁরাই ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালু করতে চান তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন হল, ঋণের প্রথম কয়েকটি বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে থাকা উচিত। স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ও কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দানের মধ্যেই এই সময়টুকু অতিবাহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক পর্যায়ের এই কাজ গ্রহীতাদের তেমন কোনও উপকারে আসে না। এটা হল সমস্যা মোকাবিলার সময়। এই সময়টুকু সতর্কতার সঙ্গে অতিক্রম করলে তবেই প্রতিষ্ঠানটি সাফল্য অর্জন করে। গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পরিষেবার মান উন্নয়নও ঘটে।

শহরাঞ্চলে নানান অসুবিধা সত্ত্বেও দেখা গেছে গ্রামীণের অনুসরণ সর্বত্রই সাফল্যের স্বীকৃতি রাখতে পারছে। শিকাগোয় 'মহিলাদের স্বকর্ম সংস্থান প্রকল্প' (Women's Self

www.pathagar.com

Employment Project: WSEP)-এর সাফল্যের কাহিনী অতিশয় চমকপ্রদ। ঢাকার 'শক্তি ফাউন্ডেশান' ১৮০০০ বস্তিবাসীদের কাছে ঋণের টাকা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। ম্যানিলার টি.এস.পি.আই. (TSPI) সার্থকতার আর এক নজির সৃষ্টি করেছে।

আজ অবধি ফ্রান্সের ADIE ১৫০০ ছোটখাটো ব্যবসায় ঋণ দিয়েছে। গ্রহীতারা ছিলেন সবাই বেকার ও সরকারি কল্যাণ অনুদানের মুখাপেক্ষী। ১৮ মাস পরও ওই সংস্থার ক্ষুদ্র-ঋণের গ্রাহকদের ৭০ শতাংশের অস্তিত্ব টিকে আছে। যা ফ্রান্সে প্রচলিত আর্থিক সাহায্যের দ্বারা গড়ে ওঠা নতুন সংস্থার গড় সংখ্যার সমান।

নরওয়ে

১৯৮৬ সালে বোদিল মাল তাঁর স্বামীর সাথে দেখা করতে বাংলাদেশে আসেন। তাঁর স্বামী ছিলেন এখানে নোরাদের অর্থায়নের পরিচালিত একটি প্রকল্পের উপদেষ্টা। এখানে থাকার সময় তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের কাজকর্মে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। বোদিল নরওয়ে সরকারের মৎস্য মন্ত্রণালয়ে কাজ করতেন। তাঁর হাতে একটি বিশেষ সমস্যা সমাধানের ভার ছিল। যেসব তরুণীরা তাদের জন্মস্থান লোফোটেন দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে চলে গেছে তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ছিল তার উপর।

বিগত কয়েকবছর ধরে নরওয়ের উত্তর উপকূলে নারভিক শহরের কাছে লোফোটেন দ্বীপপুঞ্জ ভয়ংকরভাবে প্রায় জনশূন্য হতে বসেছিল। ছেলেরা স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে দ্বীপে ফিরে এসে মৎস্যজীবীর কাজ করত। কিন্তু মেয়েরা কিছুতেই আর জন্মভূমিতে ফিরতে চাইত না। এখানে তাদের উপযোগী কোনও কাজের সুযোগ ছিল না। মৎস্যজীবী স্বামী বা বাবার সমুদ্র থেকে ফেরবার জন্য যখন তারা অপেক্ষা করে বসে থাকত, তাদের সময় কাটাবার জন্য কোনও কাজই থাকত না। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বা জীবিকা নির্বাহের কোনও পন্থাই ছিল না সেখানে। মেয়েরা ভীষণভাবে একাকিত্বের যন্ত্রণায় ভুগত। তারা দ্বীপ পরিত্যাগ করতে চাইত বলে ছেলেরাও ওই পথ অনুসরণ করতে শুরু করে।

উত্তর ফিনল্যান্ড এবং উত্তর রাশিয়ার সংলগ্ন অঞ্চলেও একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বোদিল মালের নিরলস প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাতে হয়। মৎস্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে, তাঁরই তত্ত্বাবধানে, নরওয়ে সরকার সেখানে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প চালু করতে সচেষ্ট হন। এর উদ্দেশ্য ছিল জীবিকা সৃষ্টি যার দ্বারা মেয়েদের দ্বীপ পরিত্যাগ থেকে বিরত করা যায়। আশা ছিল এতে করে তাদের নিঃসঙ্গতা দূর হবে। কিছু কাজ করে দৈনন্দিন একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে।

এর আগে মেরু অঞ্চলে, এবং এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে গ্রামীণের কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়নি। আমাদের অনুগামীদের পক্ষে তো বটেই, আমাদের কাছেও এই প্রকল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত শিক্ষণীয় হয়েছিল।

উত্তর নরওয়ের এই প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দেখে তো আমার তাক লেগে গেল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। বাংলাদেশের মতোই এখানেও পুরোপুরি সামাজিক বিপ্লব ঘটে গেছে। অথচ প্রাকৃতিক দিক দিয়ে দুটি দেশের কোনও সাদৃশ্যই নেই।

এই প্রথম, মেরু অঞ্চলের মহিলারা প্রকল্পের আওতায় আসবার সুযোগ লাভ করলেন। সৌভাগ্যবশত এই প্রকল্প আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সহায়তা ও পরামর্শ লাভ করেছিল। এর আগে

www.pathagar.com

মহিলাদের নিজস্ব প্রতিভার ব্যবহারিক প্রয়োগের কোনও উপায় ছিল না। এখন তারা নানারকম কাজ করছে—উল বোনা, সিল মাছ, পাখি ও নানান আকারে কাগজ চাপা বানানো, নানা ধরনের স্মারক, পোস্টকার্ড, ছোট্ট কাঠের 'ট্রল'-এর মূর্তি গড়া, প্রকৃতির ছবি আঁকা, আরও কত কী। অলস অবসর থেকে মুক্তি দেওয়া ছাড়াও, এই কাজগুলি মহিলাদের রোজগারের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এতে করে তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। জীবন হয়ে উঠেছে স্বাচ্ছন্দ্যময় ও উপভোগ্য।

নরওয়ের অভিজ্ঞতা এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। এখানে ক্ষুদ্র-ঋণ দারিদ্র দূরীকরণের উপায় মাত্র নয়। এখানে তা মানুষের সামাজিক একাত্মতার বার্তা বহন করে এনেছে। জনশূন্য ও পরিত্যক্ত হবার হাত থেকে একটি দ্বীপপুঞ্জকে রক্ষা করেছে। অন্যভাবে বলা যায় যে ক্ষুদ্র-ঋণ কেবলমাত্র উপার্জনের যন্ত্র নয়—তা সামাজিক পরিবর্তনেরও এক শক্তিশালী হাতিয়ার। ক্ষুদ্র-ঋণ মানুষকে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাবার পথ দেখায়।

ফিনল্যান্ড

ফিনল্যান্ডে ফিনিশ ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প হেলসিঙ্কি জেলায় প্রথাগত ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সমবায় সংস্থা ইকো অসুশ্রহা একটি 'সবুজ' ঋণ প্রকল্প চালনা করে। পরিবেশ ও সামাজিক সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য এই সংস্থা সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে। ফিনল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে অভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে আরও চারটি ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প কাজ করছে। এরা সবাই নরওয়ের লোফোটেন দ্বীপের আদর্শ অনুসরণ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সুইডেন

১৯৬০ সালে সুইডেন সরকার দারিদ্র দূরীকরণের জন্য আজীবন সামাজিক সাহায্য দানের নীতি গ্রহণ করে। যাদের প্রয়োজন তাদের বা অভাবীদের জন্য এখানেও ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালু করে দেখা হয়েছে। মধ্য সুইডেনের ওলারানা প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে এরিকসন একটি গ্রামীণ প্রকল্প চালু করেন। চার বছর চলবার পর সেই মুখ্য প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। এই বছর এরিকসন আবার ফালুনের (Falun) ডালারনা শহরাঞ্চলে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। এঁর সহযোগিতায় আছেন শ্রম দপ্তর ও বেকার কল্যাণ দপ্তর।

* * *

আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় গ্রামীণের আদর্শ অনুসরণের জন্য যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, তার সুফল দেখে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে সাংস্কৃতিক, জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে যতই পার্থক্য থাকুক, বিশ্বজুড়ে দরিদ্র মানুষের সমস্যা মূলত এক। সমাজ মানুষকে দারিদ্রের যে বন্দিশালায় আবদ্ধ রাখে তা জাতি, ভাষা, রীতিনীতির বেড়া ডিঙিয়ে সর্বত্র দারিদ্রের একই চিত্র ফুটিয়ে তোলে।

এই কারণেই বিশ্বব্যাপী প্রায় সর্বত্র ক্ষুদ্র-ঋণের প্রয়োগ করা সম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঋণ একটি বিশাল চাবিকাঠি যা দিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করা সম্ভব। অ্যান্ডিস থেকে আর্কটিক প্রদেশ, শিকাগো থেকে চিন পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা

www.pathagar.com

থেকে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে গ্রামীণের সাফল্যের জন্য বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলই একমাত্র উপযুক্ত নয়।

সব কিছু পর্যালোচনা করে আমার সিদ্ধান্ত হল যে যা কিছু মঙ্গল, যা কিছু ন্যায় তার জয় হবেই। যদি কখনও কোনও কারণে গ্রামীণ ব্যাংকের অস্তিত্বও মুছে যায়, ক্ষুদ্র-ঋণ সংক্রান্ত যে কর্মাদর্শ আমরা প্রচার করতে পেরেছি তা আমাদের সাহায্য ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আর কখনওই আগের মতো রাখা যাবে না।

বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন উদ্ভাবনকর্তার আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু তৃণমূল স্তরের এই ক্ষুদ্র পুঁজিপ্রতিষ্ঠার সম্যক দর্শন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের দাবিদার হবে। হয়তো এদের কর্ণধার হবে এমন গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান, যাদের সঙ্গে আমাদের এখন কোনও যোগই নেই।

www.pathagar.com

২৫
আমেরিকার শহরাঞ্চলের অভিজ্ঞতা

মেরি হুটন ও রোনাল্ড গ্রেজিউইনস্কি হলেন শিকাগোর দু'জন ব্যাংকার। তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? জীবন আমাদের পরিচয় নিবিড় করেছে। বহু চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর অভিযানে আমরা ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে কাজ করেছি।

এঁরা শিকাগোর সাউথ শো'র এলাকার একটি অত্যন্ত রুগ্ন আঞ্চলিক ব্যাংক কিনেছিলেন। এই এলাকার সাদা চামড়ার দোকানদার ও ব্যবসাদাররা ব্যবসা গুটিয়ে চলে যেতে আরম্ভ করেছিল কারণ, কালো চামড়ার মানুষরা এখানে বসতি স্থাপন করছিল। সাউথ শো'রের এই ব্যাংকটি এদের দু'জনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আবার এই এলাকায় লোকসমাজের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। নতুন করে টাকা জমা পড়তে শুরু করে এবং প্রথাগত ব্যাংক যেসব মানুষদের অবহেলা করেছে তাদের টাকা ধার দিতে শুরু করে। যখন ফোর্ড ফাউন্ডেশান আমার প্রস্তাবিত নিরাপত্তা তহবিল মূল্যায়নে উদারমনা স্বাধীন ব্যাংকারদের সাহায্য নিয়েছিলেন, তখন তাঁরা রন ও মেরিকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের কর্মপদ্ধতি তাঁদের অবাক করেছিল। একই জিনিস তাঁরা শিকাগোর গরিবদের মধ্যে চালু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও অসীম নিষ্ঠা উত্তর আমেরিকায় গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতাকে ফলপ্রসূ করে তুলেছিল।

রন ও মেরির অনুরোধে আমি শিকাগো সফর করতে গিয়েছিলাম ১৯৮৫ সালে। সে সময় তারা সমাজকর্মী, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও জননেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবার বেশ কয়েকটি বড় বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। প্রায় প্রত্যেকেই এক কথায় আমার বক্তব্য নস্যাৎ করে বলেছিলেন বাংলাদেশের পটভূমিকায় যা সম্ভব হয়েছে, আমেরিকার দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হতেই পারে না।

যুক্তি হিসেবে তারা এ কথাও বলেছিল যে দুটি সমাজব্যবস্থা আলাদা এবং ভৌগোলিক অবস্থানেও প্রায় বিপরীত। ক্ষুদ্র-ঋণ কার দরকার? মানুষের দরকার চাকরি, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, ড্রাগের নেশা ও হিংসা-সন্ত্রাস থেকে মুক্তি। নিজের উপার্জনের পথ আবিষ্কার করা তো প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। একমাত্র তৃতীয় বিশ্ব ও আদিম সমাজে তা প্রয়োজন হলেও হতে পারে। শিকাগোর নিম্নবিত্ত মানুষের টাকার দরকার ঘরভাড়া দেবার জন্য। কোনও বিনিয়োগের জন্য নয়। কী কাজেই বা তারা বিনিয়োগ করবে। তাদের কাজের দক্ষতা কোথায়? এরকম হাজারো প্রশ্নের ঝড় উঠেছিল সে সব আলোচনা সভায়।

বাংলাদেশের ব্যাংকারদের যা উত্তর দিয়েছি সেই একই যুক্তি আমি তাদেরও দিলাম। "গরিব মানুষের সৃজনশীলতা অসীম। জীবিকা নির্বাহের উপায় তাদের ভালই জানা আছে। এমনকী জীবন পরিবর্তনের উপায়ও তাদের অজানা নয়। তাদের দরকার শুধু সুযোগের।

www.pathagar.com

ঋণই তাদের কাছে সে সুযোগ নিয়ে আসতে পারে।" আরও বললাম, "সত্যিই আমাদের দুই সমাজব্যবস্থার আকাশ পাতাল তফাত—দু' দেশের দূরত্বও অনেক। কিন্তু বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষ ও শিকাগোর দরিদ্র মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। দারিদ্রের সমস্যা ও উৎপত্তির কারণ সর্বত্র এক।

কিন্তু তাদের মতামতকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করতে পারলাম না। শুধু রন ও মেরি আমার বক্তব্যে আস্থা রাখল এবং ওরাই শিকাগোতে গ্রামীণ ব্যাংকের মতো ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালু করে দেখবার সিদ্ধান্ত নিল।

* * *

রন ও মেরির হাতে গড়া 'মহিলাদের জন্য স্বকর্ম সংস্থান প্রকল্প (Women's Self Employment Programme : WSEP) আমেরিকায় গ্রামীণ ব্যাংকের অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। স্বকর্মসংস্থান শুধু তৃতীয় বিশ্বেই প্রযোজ্য নয়, উন্নত ও প্রগতিশীল সামাজিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও তা অনেক সমস্যার নিষ্পত্তি করতে সক্ষম। এই সত্য সোচ্চার ও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল ওদের ওই প্রয়াসের মাধ্যমে।

আজ ডবলিউ. এস. ই. পি.-র প্রধান কার্যালয় শিকাগোর ডাউনটন এলাকার প্রাণকেন্দ্র ওয়াশিংটন স্ট্রিটে এক বিশাল অট্টালিকার আট তলায়। ২৫ জন মহিলা উদ্যোগ প্রতিনিধি, যার দুই-তৃতীয়াংশ কৃষ্ণকায়-আমেরিকান ঋণগ্রহীতাদের ব্যবসার সুলুক সন্ধান রাখে, ঋণ সংগ্রহ করে ও গ্রহীতাদের সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে। তাদের সাহায্য করে শিক্ষানবিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও সহায়ক কর্মী। ডবলিউ. এস. ই. পি. শিকাগোর ৩০০-র বেশি কর্মকাণ্ডে ১০ লক্ষ ডলার ঋণ দিয়েছে এবং ৫০০০ জন মহিলাকে ব্যবসা সংক্রান্ত পরামর্শ পরিষেবা দান করেছে। এর সাম্প্রতিকতম ঋণ পরিশোধের মাত্রা হল ৯৩ শতাংশ।

* * *

শিকাগোতে এই 'মহিলাদের জন্য স্বকর্ম সংস্থান' প্রকল্প চালু করতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। এদের তৈরি 'পূর্ণবৃত্ত তহবিল' (Full Circle Fund) ছিল সবচেয়ে বিতর্কিত। ১৯৮৮ সালে সূচনার পর থেকে এই প্রকল্প অবহেলিত গোষ্ঠীর মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে। এঁরা মহিলাদের ৩০০ থেকে ১৫০০ ডলার পর্যন্ত মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে দেন। অবশ্য যদি তাঁরা পাঁচজনের একটি দল গঠনে রাজি থাকেন এবং ব্যবসার প্রস্তাব ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। এই ঋণদানের পদ্ধতিতে গ্রহীতাদের ঋণলাভের যোগ্যতার বিচার করা হয় না। জামিন ও অতিরিক্ত নিরাপত্তারও কোনও দরকার হয় না।

কনি ইভান্স, ডবলিউ. এস. ই. পি-র কার্যনির্বাহী আধিকারিক, এই কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কিন্তু তাঁর ছিল অদম্য শেখবার আগ্রহ। শিকাগো শহর জুড়ে তাঁদের কর্মকাণ্ড পুরোপুরি কার্যকর করে তুলতেও তিনি ছিলেন খুবই আগ্রহী। সুসান ম্যাটিউসি এম. আই. টি. থেকে সদ্য স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছে। সে কনির সঙ্গে এফ. সি. এফ.-এ (FCF) কর্মী হিসেবে যোগ দিল। এফ. সি. এফ.-কে শিকাগো শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'গ্রামীণ ব্যাংক' প্রকল্পের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

এফ. সি. এফ. প্রকল্প চালু করার আগে কনি ও সুসানকে আমাদের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে পূর্ণ

www.pathagar.com

পরিচয়ের জন্য ঢাকায় আমন্ত্রণ জানালাম। তারা এসে 'গ্রামীণ ব্যাংকের' সেবার অন্তর্ভুক্ত গ্রামে বসবাস করল গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের জন্য। আমাদের সাধারণ কর্মী ও আঞ্চলিক পরিচালকদের সঙ্গে তারা অনেক সময় ধরে নানাবিষয় আলোচনা করল। শিকাগোয় ফিরে তারা যখন এইসব অভিজ্ঞতার বাস্তব রূপ দান করল, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। গ্রামীণ ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যগুলো তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। এবং তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল।

এফ. সি. এফ. সংগঠনের সময় আমি নিজে চোখে দেখেছি কীভাবে আমেরিকার জনকল্যাণ ভাতা আইন গ্রহীতাদের নিরুৎসাহী করে তোলে। প্রকৃত অর্থে তাদের এই জনকল্যাণ ভাতা বর্জনের অভিমুখ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই ভাতার আওতায় যারাই আসে তাদের উপার্জনের সব দরজা, জানলা শক্ত করে বন্ধ করে তালা দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বাইরে বেরোবার কোনও রন্ধ্রপথ তাদের না থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ হল বন্দিদশারই নামান্তর। তারা বন্দিদশা ভোগ করে শুধুমাত্র দারিদ্রের শিকলে আবদ্ধ থেকে নয়, পরাধীন তারা তাদের সাহায্যকারীর হাতেও। তারা এক ডলার রোজগার করলেও কর্তৃপক্ষকে জানানো তা অবশ্য কর্তব্য। তখন তাদের কল্যাণমূলক ভাতার প্রাপ্য অঙ্ক থেকে এক ডলার কেটে নেওয়া হবে। কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেবার অনুমতিও তাদের নেই।

ইলিনয়ের তৎকালীন আইন অনুযায়ী জনকল্যাণ ভাতার গ্রহীতাদের নিয়ে এফ. সি. এফ. এর মতো ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালানোর কোনও অধিকার নেই। ডবলিউ. এস. ই. পি.-কে এ ব্যাপারে বিশেষ ছাড় পাবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ, আলোচনা ও বৈঠকে বসতে হয়েছে। রাজ্য জনকল্যাণ ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সামনে আমাকে আনানো হল প্রমাণ করার জন্য যে ঋণ পেলে মানুষের অনেক উপকার হয়। তাদের আর জনকল্যাণ ভাতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। ঋণের সুযোগ, জনকল্যাণ ভাতার প্রাপকদের পক্ষে অত্যন্ত সুফলদায়ী। তদানীন্তন আইনের ছাড় দিয়ে, পরীক্ষামূলকভাবে তিন বছরের জন্য এদের এফ. সি. এফ.-এর সদস্য করে এই ফললাভের সুযোগ দেওয়া হোক। দীর্ঘমেয়াদি আলাপ-আলোচনার পর ইলিনয় রাজ্য সরকার এক বছরের জন্য এই অনুমতি দিলেন। পর্যায়ক্রমে বছরে বছরে এই আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভাগ্যক্রমে ইলিনয় এখন আইন পরিবর্তন করে কল্যাণভাতার অন্তর্ভুক্ত মানুষজনকেও এই ঋণগ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটাই এখানে এফ. সি. এফ.-এর প্রথম সাফল্য।

এফ. সি. এফ.-এর প্রচেষ্টা সব প্রচলিত প্রথাকে পরিহার করার এক সাহসী পদক্ষেপ। অনেকেরই যুক্তি ছিল পাঁচ সদস্য মিলে গ্রুপ গঠন করার নিয়মটি আমেরিকায় কিছুতেই গ্রহণযোগ্য করা যাবে না। যেহেতু আমেরিকায় সবাই খুব স্বাধীনচেতা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এটা সহজেই সদস্যরা গ্রহণ করল। এই প্রকল্প কার্যকরী হওয়া যেমন আশ্চর্যের তার চেয়েও চমকপ্রদ হল, এই সাফল্য ঘটেছিল শিকাগোর এক কেন্দ্রীয় শহরাঞ্চলে। সদস্যদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়েছিল দল গঠনের সঙ্গী খুঁজে বার করা। এফ. সি. এফ.-কে নিয়মিত 'পার্টি' দিতে হত মানুষের পারস্পরিক পরিচিতির সুযোগের জন্য।

যখন এফ. সি. এফ. ভালভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, তখন ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমার আমন্ত্রণ এল। তাদের বাড়ি গেলাম, নানা উৎসবে যোগ দিলাম। বাংলাদেশ ও শিকাগোয় এতখানি মিল। আমি চমকিত হলাম। এরকম সাদৃশ্যের অস্তিত্ব আমার কল্পনায় ছিল কিন্তু তা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাবার অভিজ্ঞতা হবে, কোনও দিন ভাবিনি। ইলিনয়ের গরিব মানুষদের মধ্যে আমি টাঙ্গাইলের দরিদ্রদের মতোই উত্তেজনা দেখতে পেলাম, আত্মউন্মোচনের একই কাহিনী শুনলাম। একই স্পৃহা, গলার সুরে একইরকম

www.pathagar.com

আত্মীয়তার উষ্ণ পরশ।

অবশ্যই তারা বাংলাদেশি মহিলাদের মতো মুরগি পালন বা ধান মাড়াইয়ের কারবার করছিল না। কিন্তু উপার্জনের নানা উপায় তাদের জানা। আমি অনুমানও করতে পারিনি, কতখানি এদের সৃজনশীলতা ও কর্মনৈপুণ্য, যা বাজারে ক্রেতা মহলে এতটা প্রভাব ফেলতে পারবে। অবশ্য তা নিয়ে তাদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না।

একজন গ্রহীতা বললেন, "আমার এক বন্ধু বলে আমার তৈরি কফিকেক পৃথিবীর সেরা। তার অতিথিদের জন্য কেক তৈরি করে দিতে সে সর্বদা আমায় অনুরোধ করত। এখন এটাই আমার ব্যবসা। ডবলিউ. এস. ই. পি.-কে ধন্যবাদ, তাদের ঋণের টাকায় আমার শখের কাজকে আমি ব্যবসায় রূপান্তরিত করতে পেরেছি। আমার খদ্দেরের সংখ্যা প্রচুর। এখনও আমার তৈরি কেকের সমান কেক পৃথিবীতে কেউ বানাতে পারে না। আসুন, চেখে দেখুন।"

আর এক মহিলা বললেন, গল্প বলার শখ তাঁর বহু দিনের। এখন তাঁর ব্যবসা হল গল্প বলা। গল্প বলে যে উপার্জন হয় তা কি ভাবা যায়? "হরদম পার্টিতে গল্প বলার জন্য আমার ডাক পড়ে। আমাকে টাকা দিয়ে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় লোকে। মানুষ আমার গল্প শুনতে ভালবাসে। ক্ষুদ্র-ঋণ দিয়ে আমি গল্পের ক্যাসেট বানিয়েছি। কাছের দোকানে সেগুলো বিক্রি হয়। দেখুন আমার 'পোস্টার', কী চমৎকার, তাই না?"

সত্যিই সেটি চমৎকার।

শিকাগোর আরও দু'জন গ্রহীতা তাদের ঋণের টাকা ফ্যাশন ব্যাবসায় লাগিয়েছে। তারা নিজেরাই পোশাকের নকশা করে বিক্রি করে। তাদের নতুন দোকানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছিল। দু'জনে একসঙ্গে দোকানটি ভাড়া নিয়েছে। তারা বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছিল। এফ. সি. এফ.-এর সব গ্রহীতারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। এইসব মহিলারা তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বনির্ভরতাকে উপলক্ষ করে উৎসব করছেন—এ এক হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য। এতদিন তাঁদের বাঁচবার জন্য সরকারের মাসিক ভাতার চেকের উপর নির্ভর করে থাকতে হত। মানুষ হিসেবে সেটা খুব মর্যাদার ব্যাপার নয়।

যখন ইঙ্গেলউডে এফ. সি. এফ. প্রকল্প চালু হল, তারা তখন সেই অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য আমাকে নিয়ে গেল। আমাকে নিয়ে আসতে তারা যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিল তা দেখে অবাক হলাম। সেখানকার প্রাত্যহিক জীবনের স্পর্শ অনুভব করার জন্য আমি রাস্তায় হাঁটতে চাইলাম। কিন্তু তারা নিষেধ করল। একটা ঘরে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। সম্ভাব্য জনা দু-চার গ্রহীতার বাড়িও গেলাম। কিন্তু সর্বত্র যেন আশঙ্কা ও ভীতির পরিবেশ। ডবলিউ. এস. ই. পি.-র দপ্তরে ফিরে আমার সঙ্গী আমায় কারণটা বোঝাল। ইঙ্গেলউড ভীষণ সন্ত্রাসের এলাকা। কেউই নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। সূর্যাস্তের পর স্থানীয় মানুষও রাস্তায় হাঁটতে সাহস করে না।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। ডবলিউ. এস. ই. পি. ইঙ্গেলউডের মতো স্থানেও সাফল্যের সঙ্গে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। শিকাগোর পশ্চিমাঞ্চলের একটি হিসপ্যানিক এলাকায় এক মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতার কথা আমার স্মৃতিতে আজও স্পষ্ট হয়ে আছে। আমার সফরকালে ডবলিউ. এস. ই. পি. ওই এলাকায় বিগত দু'বছর ধরে কাজ চালাচ্ছিল। আমি পৌঁছবামাত্র হতবাক হলাম মুহূর্তে ইংরেজি ভাষা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই স্প্যানিশ বলতে শুরু করল, যার এক বর্ণও আমি বুঝি না। আমি একে বিদেশি, এতে করে আরও বিদেশি হয়ে গেলাম। ডবলিউ. এস. ই. পি.-এর কর্মীরা উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী। তাদের উপরই বাক্যালাপের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হল। গ্রাহক দলের অনেকের কাছেই তারা আমাকে

www.pathagar.com

নিয়ে গেল। একজন চল্লিশোর্ধ সদস্যার ভীত সন্ত্রস্ত ভাব ও মুখের স্প্যানিশ ভাষা আমি জীবনেও ভুলব না।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এত সুন্দর লেপ ও তার এমব্রয়ডারির নকশা আপনি বানিয়েছেন। কবে থেকে এগুলো তৈরি করে বিক্রির কথা ভাবলেন?"

দোভাষীর মাধ্যমে সে সবিস্তারে তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আমায় জানাল। বলল, "ডবলিউ. এস. ই. পি.-র কর্মী জেনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। ভয় পেলাম, তার কথা বিশ্বাসও করলাম না, ভাবলাম সে-ই আমায় কিছু গছাতে চায়। আমি এড়িয়ে গেলাম। সে কিন্তু আবার এল। সঙ্গে একজন স্থানীয় হিস্প্যানিক মহিলা, তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। বলব কী, ভাবতেই আমার ভয় করছিল। তারা কারবারের কথা বলছিল। আমি ব্যবসা বুঝি না। আমার স্বামী সারাদিন কারখানায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। বাইরের কারওর সঙ্গে কথা বললেই সে খুব ক্ষেপে যায়। নিজের ঘর ছেড়ে আমার একা বেরোনোতেও তার আপত্তি। শিকাগোতে কাউকে আমি চিনি না। অথচ মেক্সিকো থেকে এসে এখানে আমি ১৫ বছরের উপর স্বামীর সঙ্গে বাস করছি।

জেনির আসা বন্ধ হল না। সে আমায় বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের কথা বলল। কত দূরে বাংলাদেশ। সেখানে মহিলারা কীভাবে তাদের জীবন পরিবর্তন করেছে তার গল্প আমায় শোনাতে লাগল। আমার ভীষণ ভাল লাগত সেসব গল্প ভাবতাম যদি সে দেশের মেয়ে হয়ে জন্মাতাম কি ভালই না হত। এখানে কারওরই কোনও সহানুভূতি নেই। নিজে কিছু করার সাহসই আমার নেই, কোনও গোলমাল দেখলেই আমার স্বামী বোধহয় আমায় খুনই করে ফেলবে।

ভয় ভাঙল। জেনির সঙ্গে আমি কথা বলতে শুরু করলাম। এলাকার অন্য মহিলাদের সঙ্গে সে আমার আলাপ করিয়ে দিল। তাদের সঙ্গে কত গল্প হত—ছোটবেলা, স্বামী, সন্তান, বাবা মা—সর্বোপরি কঠিন জীবন সংগ্রামের কথা। দেখলাম আমাদের সবারই কত মিল। তাদের দেখলে আর ভয় হত না। আমি আর জেনি, ডবলিউ. এস. ই. পি. গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম। আমরাও বাংলাদেশের মেয়েদের মতো কাজ করব এমন স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। কী ব্যবসা করা যায় তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা হত। পরস্পরকে উৎসাহ দিতাম। পরস্পরের কাছ থেকে নানান তথ্য সংগ্রহ করতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা একটা দল গঠন করলাম। দু'জন দু'জন করে টাকা ধার নিলাম। একে অপরকে ব্যবসায় সাহায্য করলাম। আমি আমার প্রথম ঋণের ৬০০ ডলার শোধ করেছি। এখন আমার দ্বিতীয় ঋণের পর্ব চলছে। এবার ১০০০ ডলার ধার নিয়েছি।"

"তৈরি মাল বেচতে আপনার কোনও অসুবিধা হয়?"

"না, একেবারেই না, এত অর্ডার পাচ্ছি যে করে ওঠার সময় পাচ্ছি না। আরও বিক্রি করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সবটাই নিজের হাতের কাজ। কেউ নেই সাহায্য করার। ছেলে স্কুল যায়। সবসময় বাড়ির বাইরে। আমিই একমাত্র বাড়ি থাকি।"

"আপনার রোজগারে আপনি সন্তুষ্ট তো?"

অনেকক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর খুব ফিসফিস করে স্বগতোক্তির মতো কথা বলতে লাগল। ভাবলাম বুঝি বলছে—টাকাটা তেমন কিছু নয় তবে আমার সাহায্যে লেগেছিল, এমন কিছু বলতে চায়। কিন্তু সে থামলে দোভাষী ইংরেজিতে বলতে শুরু করল, "আমি কখনও কল্পনাও করিনি আমার দ্বারা উপার্জন করা সম্ভব হবে। আমার স্বামী কখনও আমাকে একটাও টাকা খরচের জন্য দেন না। বিগত ১৫ বছর আমেরিকায় বাস করলেও আমার কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। এখন আমার টাকা হয়েছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টও

www.pathagar.com

হয়েছে। আমার চেকবই আছে। আমার স্বামী এর বিন্দুবিসর্গও জানে না। এখনও তাকে বলার সাহস হয়নি।”

কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। আমার আবেগ গোপন করার জন্য বললাম, “অনেকে আমায় বলছেন ডবলিউ.এস.ই.পি. যদি দল গঠনের আবশ্যিকতার উপর জোর না করত তবে মানুষের পক্ষে ধার নেওয়া সহজ হত।”

“আপনার কী মত?”

দোভাষী যখন আমার কথা তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল সে তখন একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে ছিল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, “এই পনেরো বছরে এখানে আমার একজনও বন্ধু ছিল না। কাউকে চিনতাম না। সম্পূর্ণ একা ছিলাম আমি। এখন আমার কত বন্ধু। আমার দলের চারজন তো আমার বোনের মতো। যদি ডবলিউ. এস. ই. পি. আমাদের টাকা নাও দেয় তবুও আমি দল ছাড়ব না।”

তার দু'চোখ পানিতে ভরে গিয়েছিল। যখন দোভাষীর অনুবাদ চলছিল, তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে ছিল সে। আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

২৬
আমেরিকার গ্রামাঞ্চলের অভিজ্ঞতা

১৯৮৫ সালে আরকানসাসের গভর্নর বিল ক্লিন্টন, তাঁর রাজ্যে স্বল্প রোজগারের মানুষজনের নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার অনুসন্ধান করছিলেন। হিলারি রডাম ক্লিন্টনের কলেজের রুমমেট জান-পিয়ারসি তখন এক আমেরিকান বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে কাজ করে সদ্য বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। ফিরে এসে তিনি শিকাগোর "সাউথ শো'র ব্যাংক"-এ যোগ দিলেন। তিনি রন গ্রেজিউইনস্কি ও মেরি হুটন-এর সঙ্গে ক্লিন্টনের পরিচয় করিয়ে দেন। এঁরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতি আর্থিক সহায়তা দানের জন্য ফোর্ড ফাউন্ডেশানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

রন ও মেরি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে গভর্নর বিল ক্লিন্টনের পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁরা গভর্নর মহোদয়ের নিকট সুপারিশ করলেন যে সত্যিকারের প্রয়োজন হল গ্রামীণ ব্যাংকের মতো প্রকল্প চালু করা। তাঁরা ক্লিন্টনকে আরকানস-তে দরিদ্রদের জন্য একটি ব্যাংক স্থাপন করার উপদেশ দেন। এই হল গভর্নর ক্লিটনের গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতি আগ্রহের সূত্রপাত। গভর্নর ক্লিন্টন গ্রামীণ ব্যাংক কর্মসূচি তাঁর রাজ্যে চালু করার ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য আমাকে জরুরি ভিত্তিতে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকা সফর করি। রণ ও মেরি সহ গভর্নর ক্লিন্টন ও তাঁর স্ত্রী হিলারি ক্লিন্টনের সঙ্গে আমার দীর্ঘ বৈঠক হয়। ক্লিন্টন তখন ওয়াশিংটন ডি. সি.তে গভর্নর সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। তাই বৈঠক সহজেই হতে পেরেছিল। হোটেল 'ফোর সিজনস'-এ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।

সেই সাক্ষাৎকারে ক্লিন্টন গ্রামীণ ব্যাংকের জন্মকাহিনী, কর্মপদ্ধতি জানতে চাইলেন। এর আগে আর কেউ এটা কেন শুরু করেনি সে বিষয়ে তাঁর কৌতূহলের কথাও জানালেন। আমি বলতে শুরু করলাম। স্বামী ও স্ত্রী দুজনে অসীম আগ্রহভরে গ্রামীণ আখ্যান শুনতে লাগলেন। কথাবার্তার মাঝখানে মিসেস ক্লিন্টন বলে উঠলেন, "আমরা এরকমটাই চাই, আরকানস-তে কি এটা চালু করা সম্ভব?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই । কোনও সমস্যা তো দেখি না। গভর্নর নিজে চাইলে আর বাধাটা কোথায়?"

ক্লিন্টন বললেন, "অবশ্যই। আমিও এটা খুবই চাইছি।"

রনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রকল্প চালু হতে কতদিন লাগতে পারে?"

একটা নতুন ব্যাংক চালু করার নিয়মরীতিগুলি রন তাঁকে বোঝাতে লাগল। প্রথমেই দরকার যত সব আইনের ছাড়পত্র ও অনুমতিপত্র। সে বলল, "কমপক্ষে ছ' মাসের ধাক্কা।

ক্লিন্টনের অত ধৈর্য ছিল না। বললেন, "সে তো অনেক সময়। আরও তাড়াতাড়ি চালু

www.pathagar.com

করা যায় না?"

রন নেতিবাচক ভাবে মাথা নাড়ল।

ক্লিন্টন আমার দিকে চাইলেন। যেন জানতে চান আমার তরফ থেকে কোনও উপায় বের করা সম্ভব কিনা। জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, এত সময় কেন দরকার বলুন তো?"

আমি তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে চাইনি। বললাম, "যদি আমাকে দায়িত্ব দেন তো কাল থেকেই প্রকল্প চালু হয়ে যাবে।"

ক্লিন্টন লাফিয়ে উঠলেন। "কী? সত্যিই এত তাড়াতাড়ি সম্ভব? আমি তাই চাই। আমার ইচ্ছা আপনিই, আপনিই এটা শুরু করবার ভার নিন।"

আমার পরিকল্পনা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, বললাম রন একটা ব্যাংক স্থাপনের কথা ভেবেছে। গ্রামীণ প্রকল্প চালু করার জন্য শুরুতেই ব্যাংকের দরকার হয় না। আমরা অনায়াসে একটা ঋণ প্রকল্প চালু করতে পারি। সোজা কথায় মানুষকে টাকা ধার দিতে শুরু করতে পারি। তার জন্য খুব একটা আইনি প্রস্তুতির দরকার হয় না। রন ও মেরি একটি ব্যাংক ক্রয় করতে যাচ্ছে। ঋণদান তাদেরই ব্যাংকের একটা প্রকল্প হতে পারে। ইতিমধ্যে গ্রামীণ প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলতে থাকবে।

হিলারির দেখলাম আগ্রহের শেষ নেই। প্রকল্পের কর্মপদ্ধতি বিস্তারিত জানবার জন্য তিনি আমায় প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন। সেই প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমার কাজের উপর তাঁর সমর্থন সমানভাবে অটুট রয়েছে। তিনি ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সফর করেন। ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য তিনটি মহাদেশ তিনি সফর করেন। ১৯৯৭ সালে ক্ষুদ্র-ঋণের শীর্ষ সম্মেলনে তিনি কো-চেয়ারপার্সনের আসন অলংকৃত করেন।

আমি গভর্নরকে কথা দিলাম এই সফরেই আরকানস যাব। সেখানকার সরকারি আমলা, সম্ভাব্য গ্রহীতা, ব্যাংকার, শিক্ষাবিদ ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে প্রকল্পের একটা খসড়া তৈরি করে দিয়ে আসব।

* * *

পরের সপ্তাহেই আমি আরকানস-তে হাজির হলাম। সঙ্গে ছিল রন ও মেরি।

রাজ্য সরকারের আতিথ্যের তুলনা হয় না। গরিব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য তাঁরা এলাহি আয়োজন করলেন।

স্থানীয় বেতার কেন্দ্রের মালিক, ফাস্ট ফুড দোকানের মালিক, ওষুধ দোকানের মালিক ও খুচরো বিক্রয়কারী এদের সবার সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। আমার বিতৃষ্ণা ক্রমেই বাড়তে থাকল। যাঁদের এঁরা ঠিক করেছেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এসব সাক্ষাৎকারের অর্থই হল অযথা সময় নষ্ট করা। ক্লিন্টন দম্পতি তাঁদের রাজ্যে বিপুল পরিমাণ দারিদ্রের কথা বলেছেন। আমি তো দারিদ্রের চিহ্নমাত্র এখানে দেখছি না যার নিরসনে উদ্যোগী হব।

শেষে আমি এত হতাশ হয়ে গেলাম যে কর্মকর্তাদের অনুরোধ করলাম অবিলম্বে এ ধরনের সাক্ষাৎকার বন্ধ হোক। বললাম, "যাঁদের সঙ্গে দেখা করছি তাঁরা কেউই প্রকৃত অর্থে দরিদ্র নন। আমি গরিব মানুষের সন্ধান পেতে চাই।"

"কিন্তু তারা তো আমাদের রাজ্যে বড় কোনও কারবারের মালিক নন।" তারা বললেন, "এর চাইতে ক্ষুদ্র কারবারি এ রাজ্যে নেই।"

www.pathagar.com

আমি ছোট কারবারে উৎসাহী নই। দৃঢ় ভাবে বললাম, "আমি গরিব মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"আমাদের সমাজে এইসব ব্যবসা তেমন লাভজনক নয়," কর্মকর্তারা বোঝাতে চাইলেন, "আমাদের এই ব্যবসায়ীরাই সবচেয়ে দরিদ্র।"

"আরে না, না," আমি বললাম, "আমি অসফল ব্যবসাদারদের কথা বলছি না। আমি একদম হতদরিদ্র মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

তাঁরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। যেন তাঁদের সঙ্গে আমি বাংলায় কথা বলছি কিছুই তাঁরা যেন বুঝতে পারছেন না। কী করতে হবে, কোথায় আমায় নিয়ে যেতে হবে, কীভাবে ঠিক করবেন তা তাঁদের বুদ্ধিতে কুলোচ্ছিল না।

তখন আমি বললাম, "আপনাদের রাজ্যে সরকারি খোরপোষ ভাতা পায় এমন মানুষ নেই?"

তাঁরা বললেন, "বহু মানুষই তো রাজ্যের উপর নির্ভরশীল।"

"খোরপোষ ভাতা কর্মসূচির কোনও দপ্তর আছে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "কল্যাণকর ভাতা প্রাপকদের কোনও তালিকা কি আছে?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই আছে।"

"বেশ। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তালিকাটি নিয়ে এইসব মানুষদের ঠিকানা খুঁজে তাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিলেন। কয়েক জায়গায় ফোন করলেন। শীঘ্রই একজন নতুন মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি এই ভাতা প্রাপকদের অর্থাৎ রাজ্যের সাহায্য নির্ভর মানুষদের সঙ্গে কাজ করেন।

এবার আমাদের সফর দিনে দিনে সত্যিই রোমাঞ্চকর হয়ে উঠতে লাগল। আমি রাজ্য ভাতা সাহায্যপুষ্ট মানুষদের সঙ্গে দেখা করলাম। একটি দলকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ধরুন কোনও কারবার শুরু করার জন্য আপনাদের ব্যাংক আপনাদের ঋণ দিতে ইচ্ছুক, তাহলে কী ধরনের অর্থসাহায্য আপনারা চাইবেন?"

কামরার সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন প্রশ্নটা ঠিকঠাক শুনেছে কিনা সে সম্পর্কে সন্দিহান। শেষে একজন বলে উঠল, "আমাদের কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই।" "যদি থাকে তাহলে কী করবেন?" আমার প্রশ্ন।

আবার তারা হতচকিতের মতো আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

"আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলে এবং সেই ব্যাংক ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকলে আপনারা প্রাপ্য টাকা নিয়ে কী করবেন? কেউ উত্তর দিতে পারেন? কেউ নতুন কোনও কারবার শুরু করার স্বপ্ন দেখেন না? আপনাদের কোনও শখ আছে যার জন্য পরিপূর্ণ সময় দিতে পারলে তার থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন?"

ঘুরে ঘুরে সবাইকে আলাদা করে করে প্রশ্ন করলাম। আমেরিকার গরিবেরা নিজেকে সাহায্য ও স্বকর্ম সংস্থান সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে তার পরিমাপের চেষ্টা করছিলাম। সমালোচকরা আগেই বলেছেন আমেরিকায় ক্ষুদ্র-ঋণ ব্যর্থ হবে কারণ, বাংলাদেশের মতো এদেশের স্বকর্ম সংস্থানের আবহমান কালের ঐতিহ্য নেই।

দশ জনের একজনেরও কম সংখ্যক আমেরিকান নিজেদের কারবার চালায়, তাদের যুক্তি হল আমেরিকায় স্বকর্ম সংস্থানের জন্য ইচ্ছুক মানুষদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত উপদেশ দরকার। তার জন্য তাদের ব্যবসাকেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ধরনের সমালোচনা আমেরিকানদের ছোট করে। প্রতিদিন

www.pathagar.com

সংবাদপত্রে আমরা পড়ি উচ্চপদস্থ ও নিম্নস্তরের কর্মীরা প্রায়শই তাদের দীর্ঘদিনের মালিকের হাতে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। ভবিষ্যতে এক জীবনেই মানুষ দু'টো, তিনটে করে জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে, এটা আমার অনুমান। তার আর বেশি দেরি নেই। স্বকর্ম সংস্থান সংখ্যায় আরও বেড়ে যাবে। আমেরিকানদের মধ্যে যারা দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় পিষ্ট হচ্ছে, কেউ কেউ দু'-তিন প্রজন্ম ধরে, তারা ঋণদানের প্রস্তাব কীভাবে গ্রহণ করছে এখন আমি তাই দেখছি। পাইন ব্লাফের কমুনিটি হলে যে আতঙ্ক, ভীরুতা ও সুতীক্ষ্ণ অবিশ্বাসের দৃষ্টি দেখলাম তা আমি বাংলাদেশে অসংখ্যবার প্রত্যক্ষ করেছি। সেইজন্য আমি খুব শান্ত সংযত ও স্বাভাবিকভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলাম।

"দেখুন, আমি বাংলাদেশে একটি ব্যাংক চালাই যা সেখানকার গরিব মানুষদের ঋণ দেয়। গত সপ্তাহে আপনাদের গভর্নরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—আপনাদের মধ্যে আমার ব্যাংক-কে কাজ চালাতে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন। আপনাদের এই পাইন ব্লাফেই আমি আমার ব্যাংকের একটি শাখা খোলার পরিকল্পনা করছি। আজ আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হল, আপনাদের কেউ আমার ব্যাংক থেকে ধার নিতে আগ্রহী কিনা তার খোঁজখবর করা।"

আমার কথা শুনে কেউ কেউ অবিশ্বাসের হাসি হাসতে লাগল। আমি কিন্তু হাসলাম না। বলতে লাগলাম, "আমার ব্যাংক শুধু দরিদ্রদের জন্যই নির্দিষ্ট এক বিশেষ ব্যাংক। ধার নিতে গেলে কিছুই জামানত রাখতে হয় না। কোনওরকম নিরাপত্তার প্রমাণের বা প্রাথমিক তদন্তের প্রয়োজন হয় না। আমি শুধু ধার দিতে চাই রাজ্য ভাতা প্রাপকদের। বেকার বা নতুন কর্মোদ্যোগে ইচ্ছুক মানুষকে, যে টাকার ঠিকমতো ব্যবহার করে রোজগার করতে পারবে। কিন্তু ভাবুন এখানে কোনও কারবার না হলে আমারই বা ব্যাংক খোলার দরকার কী? বরং অন্য কোথাও গিয়ে সেখানকার দরিদ্র মানুষদের ধার দেব। সেই কারণেই আমি জানতে চাই ঋণের টাকা কাজে লাগানোর কোনও পরিকল্পনা আপনাদের কারওর আছে কী?"

এক মহিলা খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছিলেন, পাছে আমি দেখতে না পাই তিনি হাত তুলে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "আমি আপনার ব্যাংক থেকে ধার নেব।"

"এই তো কাজের কথা।" আমি হেসে বললাম, "এবার বলুন আপনার কত চাই?"

"৩৭৫ ডলার।"

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কী করবেন, এ দিয়ে?"

"আমি একজন রূপচর্চা বিশেষজ্ঞ, কিন্তু উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবে আমার কারবার বেশি বাড়াতে পারছি না।" তিনি বললেন, "নখ পরিচর্যা সরঞ্জামের একটি বাক্সের দাম ৩৭৫ ডলার। ওটা হলে নির্ঘাত আমার আয় বাড়বে। আপনার ধার শোধ করতে আমার কোনও অসুবিধাই হবে না।"

"আরও বেশি টাকা কি আপনার দরকার?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"না। ওই বাক্সের দামের বেশি একটা পয়সাও আমার চাই না।"

আরেক মহিলা হাত তুলে বললেন, "যে পোশাকের কারখানায় আমি কাজ করতাম তা বন্ধ হয়ে তাইওয়ানে চলে যাবার পর থেকে আমি বেকার। আমি ঋণের টাকা দিয়ে একটি পুরনো ব্যবহৃত সেলাই কল কিনব। নিজে পোশাক তৈরি করে পাড়াপড়শিদের কাছে বিক্রি করব।"

আরেকজন মহিলা হাত তুলে বললেন, "একটা ঠেলাগাড়ি কেনার জন্য আমার ৬০০ ডলার হলেই চলবে। আমি গরম গরম 'তামালে' বানিয়ে ঠেলাগাড়ি করে রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করব। পাড়ায় আমার বানানো 'হট তামালের' খুব নাম। ঠেলাগাড়ি হলে বিক্রির পরিমাণ অনেক বাড়াতে পারব।"

www.pathagar.com

প্রতিটি প্রস্তাবই আশাব্যঞ্জক। আমার খুবই রোমাঞ্চকর লাগছিল। তাদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রতিপদে বাংলাদেশের মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও টোগোর গরিব মানুষের সঙ্গে গরিব আমেরিকানদের চাহিদার কোনও ফারাক নেই। সে দিনটা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেলাম না।

* * *

পাইন ব্লাফে গ্রামীণ ব্যাংকের মুখ্য প্রকল্প ছিল জুলিয়া ভিন্দেসিয়াসের তত্ত্বাবধানে। সে একজন মেধাবী এম. আই. টি-র স্নাতক ও অত্যন্ত কর্মতৎপর মহিলা। লিথুয়ানিয়ান বংশ উদ্ভূত দ্বিতীয় প্রজন্মের আমেরিকান। তাকে প্রথম যখন দেখি সাউথ শোর ব্যাংকে কর্মরতা ছিল। বয়সে তরুণী হলেও তার কর্মদক্ষতা বুঝে, তাকেই 'গ্রামীণের' ভার দেওয়ার নির্দেশ দিলাম। সবাই আমার সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে গেলেন। জীবনে সে কখনও আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল ভ্রমণে যায়নি পর্যন্ত।

প্রকল্পের নামকরণ করা হল 'গ্রামীণ তহবিল' (দি গ্রামীণ ফান্ড)। 'গ্রামীণ' নামের মানে কেউই বোঝে না। তাদের বোঝাতে গিয়ে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়। খানিক পরেই তারা জানায় নামটা খুব খটমট। দু'বছর পর একদিন ঢাকার দপ্তরে আমি শিকাগো থেকে মেরির ফোন পেলাম। সে বলল, প্রকল্পের নাম "গুড ফেইথ ফান্ড" রাখলেই ভাল—তা হলে এর অর্থ আরও স্পষ্ট হবে। প্রমাণিত হবে যে এই ব্যাংক জামানতের পরোয়া করে না—গ্রাহকদের উপর তাদের অগাধ আস্থা। গ্রামীণ ফান্ড শুনলে প্রথমেই লোকজন জানতে চাইছে গ্রামীণ কী। আমরা বাংলাদেশের কথা বললে প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ কোথায়? আমরা ড. ইউনূসের নাম করলে, শুনতে হচ্ছে তিনি কে? এত শত উত্তরের পর আমাদের জামানত বিহীন ঋণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হচ্ছে, প্রায় ঘণ্টাখানেক প্রশ্নোত্তরের পর শ্রোতা বলছেন, "ও, তাই বলুন আপনি আস্থা নির্ভর ঋণের কথা বলছেন। তা হলে এটাকে 'গুড ফেইথ ফান্ড' নাম দিলেই হয়।"

"অবশ্যই এই নামে অর্থ অনেক স্পষ্ট হচ্ছে। নাম বদলে ফেলুন।"

"আমরা তাহলে দু' ঘণ্টা সময় বাঁচাতে পারব। আপনি কিছু মনে করলেন না তো?"

"একেবারেই না। বোঝার পক্ষে সহজ যা তাতেই আমার মত।"

আরকানস-তে গ্রামীণ প্রকল্প চলবে না এই মতের সপক্ষে জুলিয়া যেসব যুক্তির সম্মুখীন হয়েছিল তা আমার কাছে মোটেই আশ্চর্যের নয়। এসব আমি বহু আগেই বাংলাদেশে অনেকবার শুনেছি। গরিবরা লগ্নি করতে পারে না, তাদের দ্বারা সঞ্চয় হয় না, কারবার শুরু করার আগে তাদের প্রশিক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়নমূলক সেবার সঙ্গে যোগাযোগ দরকার, গরিব কখনও ঋণের কিস্তি শোধ করতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার অভিযানে ক্লিন্টন যখন *রোলিং স্টোন* পত্রিকার সম্পাদককে বলেছিলেন যে বাংলাদেশের এক ব্যাংক থেকে তিনি ক্ষুদ্র-ঋণের ধারণা গ্রহণ করেছেন, তারা তাঁকে বিদ্রূপ করে বলেছিল তিনি না-বুঝে অবাস্তব ধ্যানধারণায় মেতে উঠে তাত্ত্বিক হয়ে উঠেছেন।

একজন আমেরিকান বন্ধু আমাকে বুঝিয়েছিল যে কথাটা আশ্চর্যের কিছুই নয়। 'তৃতীয় বিশ্বের প্রযুক্তি রফতানি' বলে গ্রামীণ ব্যাংক পরিগণিত হয়। আমেরিকার অভিজাত সম্প্রদায় এটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নাও থাকতে পারে। তাঁরা বললেন, প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনী অভিযানে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি নিয়ে বিতর্কের সময় আমেরিকানদের, কানাডা,

www.pathagar.com

জার্মানি, ইংল্যান্ডের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যখন হেলথকেয়ার প্রোগ্রাম গছাতে যেখানে খুব কষ্ট পেতে হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশি ব্যাংকের মডেল অনুসরণ করার ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন ক্লিন্টনের পক্ষে এক কথায় দুঃসাধ্য হবে।

বাস্তবে আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু ভিন্ন। আমেরিকানরা 'গ্রামীণ' মডেলকে স্বাগত জানিয়েছে, সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। উৎসাহের দিক দিয়ে তারা ইউরোপীয় দেশগুলির চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে।

প্রেসিডেন্ট হিসেবেও বিল ক্লিন্টন আরকানস-তে 'গুড ফেইথ ফান্ড'-এর প্রতি বরাবর সমান আগ্রহ দেখিয়ে এসেছেন। 'ক্ষুদ্র-ঋণ'-এর প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের কংগ্রেসের বিরোধিতার মুখে তাঁর হেলথকেয়ার প্রোগ্রাম বাতিল হবার পর তিনি এই বিষয়টিকে তাঁর জাতীয় কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন।

তা সত্ত্বেও গ্রামীণ ব্যাংকের সমর্থনে কথা বলার সুযোগ পেলে, তিনি তা কখনও ছাড়েন না। তাঁর পূর্ণ আস্থার কথাও জানাতে ভোলেন না। আন্তর্জাতিক সফরকালে তিনি সময় করে ক্ষুদ্র-ঋণের গ্রাহকদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর কথা ও কাজ অনেক স্থানে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প সৃষ্টি ও প্রসার করতে প্রভূত সাহায্য করেছে।

* * *

আরকানস-তে আমার অভিজ্ঞতা আমেরিকার বহু অঞ্চলে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। দক্ষিণ ডাকোটার সিয়ো আদিগোষ্ঠীর গ্রামীণ প্রকল্প দেখতে গিয়ে আমি জেরাল্ড শেরমনের অতিথি হয়েছিলাম। ইনি লাকোটা তহবিলের সর্বময় কর্তা। একজন প্রাক্তন পানাসক্ত মানুষ। বাড়িতে ছিল তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান। জেরাল্ড ও লাকোটা তহবিলের সব কর্মী সিয়োদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গ্রহীতারা তাদের তৈরি চমৎকার লেপ দেখিয়েছিল আমাকে। হাতের কাজের জন্য তাদের গর্ববোধ আমাকে আপ্লুত করেছিল। মহিলারা আমায় বলেছিলেন, "আমাদের কিছু করার ছিল না। কোনও অর্থকরী কাজ তো নয়ই। এখন আমরা নিজের জিনিস বিক্রি করতে পারি। আমরা গির্জা বা কমুনিটি সেন্টারে সবার সঙ্গে মিলিত হই ও পরস্পরের জিনিস ক্রয় বিক্রি করি।"

ওকলাহোমাতে একজন অত্যন্ত আকর্ষণীয় আদিবাসী নেতা, চিফ উইলমা ম্যানকিলার গ্রামীণ প্রকল্পে সক্রিয় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। যখন আমি চিরোকি অঞ্চল ভ্রমণ করি, ১৫-২০ জন দরিদ্র চিরোকি মহিলার সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন মুখমণ্ডল তাঁদের। গ্রামীণ ব্যাংকের বিষয় বুঝিয়ে বলার পরও তাঁদের কোনওরকম আগ্রহ দেখলাম না। নিরুৎসাহী, পাথরের মতো মুখ নিয়ে তাঁরা চুপচাপ বসে রইলেন। আমি বললাম, "বাংলাদেশে যা পেয়েছি তার থেকে আপনাদের প্রতিক্রিয়া আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ওখানে মহিলারা আমাকে দেখলেই এড়িয়ে যায়। এক কথায় দৌড়ে পালায়। চিৎকার করে বলে, আপনাদের টাকা আমরা চাই না। অতএব আমাদের তাদের পিছু ধাওয়া করতে হয়, বহু চেষ্টা করে তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজে বার করতে হয়—তবু তারা শুনতে চায় না। আপনারা তো তবু বসে আছেন, আমার কথা শুনছেন। এতেই আমার খুব আগ্রহ বোধ হচ্ছে।"

কেউ হাসল না পর্যন্ত।

আমি বললাম, "এখানে কারও টাকার দরকার আছে?"

কোনও উত্তর এল না, একটিও হাত উঠল না, একটি চোখের পলক কাঁপল না।

www.pathagar.com

"আপনাদের দরকার না থাকলে, আপনাদের জানা কোনও বন্ধু বা প্রতিবেশীর টাকার প্রয়োজন আছে কিনা আমায় বলতে পারবেন কি?"

দীর্ঘ নিঃস্তব্ধতার পর একজন হাত তুললেন।

বললেন, "হ্যাঁ আমার একজন প্রতিবেশীর টাকার দরকার থাকতে পারে।"

"কী করার জন্য?"

"স্টোভ বসানো ঠেলাগাড়ি কেনার জন্য, তাহলে সে পিঠে বেচতে পারবে।"

"সে কি এ ব্যাপারে ওস্তাদ? তার হাতের পিঠে খুব সুস্বাদু বুঝি?"

"হ্যাঁ, এ অঞ্চলে ও সবচেয়ে সেরা পিঠে বানায়। সবাই খেতে দারুণ ভালবাসে।"

"আচ্ছা তাকে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা নিশ্চয়ই তাকে টাকা ধার দেব। আর কারওর এরকম জানা কেউ আছে কি?"

"দাঁড়ান, আপনি কি কোনও জামানত ছাড়াই আমার প্রতিবেশীকে ধার দেবেন?"

"হ্যাঁ।"

ঘরে কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর আরও একটি হাত উঠল।

"আমি জানি এই এলাকার লোকজনের কুকুরের বাচ্চা খুব প্রিয়।"

"হ্যাঁ।"

"কুকুরের বাচ্চাদের বড় করে বিক্রি করবার জন্য আমি কি ঋণ পেতে পারি?"

"ঠিক আছে। যদি মনে করেন এই বেচাকেনা আপনাকে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা দেবে অর্থাৎ এগুলো বেচে লাভ করতে পারবেন যা ঋণ শোধের পক্ষে পর্যাপ্ত, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি ঋণ পাবেন।"

"কোনও সমস্যাই হবে না। আমি কুকুরের বাচ্চা খুব ভাল পালতে করতে পারি। কত বাচ্চা বিনাপয়সায় বিলিয়ে দিলাম।"

"কোথায় বেচবেন তা আপনার জানা আছে তো?"

"নিশ্চয়ই। ওটা কোনও সমস্যা নয়। এখনই আমার পালন করা কুকুর ছানার খুব চাহিদা।"

"কত টাকা চাই আপনার?"

"ঠিক বলতে পারব না। কুকুরের ঘর বানানো, বিজ্ঞাপন দেওয়া, কুকুরের খাবার কেনা, সব মিলিয়ে শুরুতে মনে হয় ৫০০ ডলার হলেই চলবে।"

"বেশ, এই তো কাজের কথা। আপনাকে নিশ্চয়ই ৫০০ ডলার ধার দেব।"

ঘরে সবাই এবার হাসতে শুরু করেছে। আমি দেখতে পেলাম সবার চোখে আশার আলো ঝিলিক মারছে। আরও অনেকে হাত তুলতে শুরু করেছে, সবাই নিজেদের নানান প্রস্তাব জানাতে চায়।

"আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে—আমি টবে গাছ বিক্রি করব।"

"আপনি যে পারবেন তা কী করে বুঝলেন?"

"আমি গাছ ভালবাসি। আমার আঙুলের ছোঁয়ায় সব সবুজ হয়ে যায়, গাছ খুব ভাল বাড়ে আমার হাতে।"

"আপনার নিজের জমি আছে?"

"সেটা কোনও সমস্যা নয়। এই অঞ্চলে কোনও জমির নিজস্ব মালিকানা নেই। আমাদের গোষ্ঠীর সবারই তা ব্যবহার করার অধিকার আছে। অপব্যবহার না করলেই হল।"

"আপনি কি টবের গাছ বিক্রি করে লাভ করবেন মনে করেন?"

"হ্যাঁ, একেবারেই কঠিন নয়।"

www.pathagar.com

আমরা ঋণের চুক্তি করলাম। দেখলাম ঘরের অন্যরাও আনন্দে হাসছে। নানা উদ্ভট মতলব বার করছে যা তারা আগে কখনও ভাবেনি।

শেষের সারিতে একজন হাত তুলল, "আগে বছর বছর ধরে আমরাই জমি চাষ করে ফসল ফলাতাম, সম্প্রতি চাষের কাজ সাদা চামড়ার লোকেদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু ওদের চেয়ে অনেক ভাল পারি আমরা। আমরাই আবার চাষ শুরু করব—নিজেদের লাভ কেন হাতছাড়া করব?"

আমি সায় দিলাম। শীঘ্রই আলোচনা খুব সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। সভার শেষে সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "ইউনূস, আপনি আবার কবে আসছেন? পরের বার টাকা আনবেন তো?"

* * *

যত দিন যাচ্ছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাচ্ছে, আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতির যে সমস্যা বাংলাদেশে সনাক্ত করেছি, সে সমস্যা সারা বিশ্বজুড়ে প্রসারিত। সবিস্তারে তার কথা লিখতে গেলে তালিকা অসম্ভব দীর্ঘ হয়ে যাবে। ১৯৯০ সালে আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম, শিরোনাম ছিল: 'কোথাও কি কোনও ভুল হচ্ছে?' আমেরিকান ব্যাংক সাধারণ মানুষকে কীভাবে তাচ্ছিল্য করে সে ছবি তুলে ধরা হয়েছিল সে বক্তৃতায়।

"যে ব্যাংকপদ্ধতি এখন চালু আছে তা মানুষকে স্বীকার করতে চায় না। ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে মানুষকে নিজের পরিচয় দিতে হয়। মানুষের নিজের কোনও পরিচয় নেই। বোধ হচ্ছে মানুষের নিজস্ব চেহারা, সত্তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সবাই কেবল তোমার ক্রেডিট কার্ড দেখবে, তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখবে, তোমার সোশ্যাল সিক্যুরিটি নম্বর দেখবে। যদি নিজের চেহারার চাইতে ড্রাইভিং লাইসেন্সের দাম বেশি তো কী দরকার আমাদের ধড়ের উপর মানুষের মুখের?"

আমেরিকায় দেখলাম চেক ভাঙানো নিয়ে এক রমরমা ব্যবসা চলছে। সরকারি চেক ভাঙাতেও অনেক পয়সা লাগে। প্রধানত খোরপোষ ভাতা প্রাপ্ত বৃদ্ধ ও শ্রমজীবী গরিব মানুষ ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে না, কারণ ব্যাংকে জমা রাখবার মতো সামান্যতম সঞ্চয়টুকুও তাদের নেই। তারা ব্যাংক পরিষেবার খরচ, অথবা চেকপ্রতি খরচ দিতেও অক্ষম। তারা ব্যাংক-কে দেখাতে পারে না তাদের ভাল সঞ্চয় আছে। অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য যে ছবিযুক্ত আই ডি কার্ড লাগে তা জোটাতেও অনেকের অসুবিধা হয়।

কিছু আমেরিকানকে আমি জানি যাঁরা প্রতি সপ্তাহে মাইনের চেক একই ব্যাংকে একই টেলারের কাউন্টারে জমা দেন। সর্বদা প্রতি সপ্তাহেই টেলার তাঁদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাতে বলেন। রাজ্য সরকারের প্রদত্ত ছবি সহ ড্রাইভিং লাইসেন্সও তাঁদের কাছে যথেষ্ট নয়। তাঁরা ক্রেডিট কার্ডও দেখতে চান। সম্ভবত এই কারণে যে তাঁদের ধারণা গরিব মানুষের দেনার দায় থাকলে তারা সৎ হবেই।

আমি পরিষ্কার বুঝলাম গরিবদের প্রতি আমেরিকান ব্যাংকের ব্যবহার বাংলাদেশের থেকে কোনও অংশে বেশি সহানুভূতি সম্পন্ন নয়। অথচ ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের সাহায্যে হাজার হাজার নিম্নবিত্তের মানুষ তাদের পুঁজির অভাব জনিত সংকট কাটাতে পারলে উপার্জন বাড়াতে পারে। এভাবেই তারা নিজেদেরকে দারিদ্র থেকে উদ্ধার করবে। তাদের এই সংগ্রামে একটি বিশেষ শক্তিশালী সংগঠন হল রেজাল্টস (RESULTS) সংস্থা। এটি তৃণমূল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে দারিদ্র নিরসনের প্রচার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে।

www.pathagar.com

* * *

১৯৮৭ সালে আমার আমেরিকা সফরকালে আমাকে ব্যাংকিং ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমূহের জন্য গঠিত কংগ্রেসের সাব-কমিটিতে এবং ক্ষুধা নিরসন সংক্রান্ত কংগ্রেসের সিলেক্ট কমিটিতে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে বক্তব্য রাখা ও প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পরে রেজাল্ট-এর এক স্বেচ্ছাসেবক আমাকে তাদের ওয়াশিংটনস্থ প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে এল। দেখলাম সেখানে একজন স্পিকার ফোন নিয়ে কথা বলতে ব্যস্ত। টেলিফোন-সম্মেলনে প্রশ্নোত্তরের আসর কেমন হয় তখন সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। কেউ এ বিষয় আমাকে বলেওনি, শলাপরামর্শ করার মতোও কেউ ছিল না। হঠাৎ করে আমাকে এক স্পিকার ফোন-এর সামনে হাজির হতে হল, যার সঙ্গে যুক্ত আছেন সমগ্র আমেরিকার নানা শহরের মুখ্য দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলাম লেখক প্রায় জনা ১৫ সাংবাদিক। তাঁরা অপেক্ষা করছেন আমাকে প্রশ্ন করবেন বলে।

স্পিকার-ফোনে এই প্রেস কনফারেন্স পরিচালনকারী ভদ্রলোকের নাম স্যাম ডেলি হ্যারিস। তিনি মায়ামি স্কুলের প্রাক্তন সংগীত শিক্ষক। বর্তমানে সমাজকর্মী। জাতীয়স্তরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছেন, নাম দিয়েছেন রেজাল্টস (RESULTS)। তাঁর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। তিনি টেলিফোনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের প্রেস কনফারেন্সের ব্যবস্থা করেছেন। আমি সাংবাদিক বৈঠকের সম্মুখীন হলাম। স্যাম ভীষণ বিনীত ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। কথাবার্তায় অতি ভদ্র ও ধীরস্থির। তিনি একই সঙ্গে আমাকে ও সাংবাদিকদের পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন, আমি তাদের প্রশ্ন শুনলাম ও 'গ্রামীণ ব্যাংক' সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য তাদের জানালাম।

একঘণ্টা ধরে সেই সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর চলেছিল। ছোট্ট একটু বিরতির পর আবার ২৩টি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমের সাংবাদিকদের জেরার মুখে পড়তে হল। সেদিন আমি বুঝলাম রেজাল্টস সংস্থা কতখানি কর্মতৎপর।

স্যামের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারপর থেকে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিমুগ্ধ ভাব বেড়েই চলেছে। সে একজন জাত সংগ্রামী। যদিও ব্যক্তিত্বে ও চেহারায় আপাতদৃষ্টিতে অতিসাধারণ। দারিদ্র ও ক্ষুধার সঙ্গে সংগ্রামের সময় সে পাথরের মতো অবিচল, অনড় থাকে।

আজ ৬টি দেশে 'রেজাল্টস'-এর সহযোগী সংস্থা আছে—আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া। দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়বার কৌশল হিসেবে তারা ক্ষুদ্র-ঋণকে গ্রহণ করেছে। তাদের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-ঋণের প্রতি সমাজ, গণমাধ্যম, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিনিধি এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। যত দিন যাচ্ছে রেজাল্টস ও গ্রামীণ ব্যাংকের বন্ধন সুদৃঢ় হচ্ছে। রেজাল্টস-এর প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবক হয়ে উঠছে এক একজন 'গ্রামীণ ব্যাংক' বিশেষজ্ঞ।

১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখকদের সঙ্গে টেলিফোন সাংবাদিক সম্মেলনের যা ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, গ্রামীণ ব্যাংক আন্দোলনের ইতিহাসে তা এক স্মরণীয় বিষয়। আমার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যে লেখা ছাপা হয়েছিল তা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সি.বি. এস-এর 'সিক্সটি মিনিটস' অনুষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৯৮৯ সালে অনেক গবেষণার পর সি.বি.এস. টেলিভিশনের দু'দল ক্র্যু একদল লন্ডনের, অন্যদল রোমের, শেষ অবধি ঢাকায় এসে হাজির। সি.বি.এস.-এর বিখ্যাত

www.pathagar.com

প্রতিবেদক মর্লি শেফারকে 'গ্রামীণ ব্যাংক' দেখাবার জন্য আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। তাদের সঙ্গে বেশ ক'টা দিন কাটালাম। তারা প্রায় ১০০ ঘণ্টার চলচ্চিত্র গ্রহণ করল এবং এর ভিত্তিতে ১৪ মিনিটের তথ্যচিত্র তৈরি করল।

১৯৯০ সালের মার্চ মাসে সেই তথ্যচিত্র সি.বি.এস. টেলিভিশনে দেখানো হল। সে কাহিনী সাড়া জাগাল সারা বিশ্বে। তখনও পর্যন্ত ইলেকট্রনিক মাধ্যমের অভাবনীয় ক্ষমতা সম্পর্কে আমি সম্যক অবহিত ছিলাম না। এখনও পৃথিবীর যেখানেই সে তথ্যচিত্র আবার প্রচার করা হয় সেখান থেকেই আমরা চিঠি ও ফোন পেয়ে থাকি।

মাত্র ১৪ মিনিটে সি. বি. এস. গ্রামীণ ব্যাংকের মূল মতাদর্শ তুলে ধরেছে। তাদের তথ্যচিত্র সবাইকে অসম্ভব প্রেরণা দিয়েছে। মানুষ উৎসাহিত হয়ে কাজে ও উদ্যোগে নেমে পড়েছে। এই প্রেরণা আমরা কোনওভাবেই এর আগে মানুষের মধ্যে সঞ্চার করতে পারিনি।

মানুষের চিন্তাভাবনা ও কর্মোদ্দীপনায় পরিবর্তন আনতে গণমাধ্যম কতখানি প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে তা দেখে বার বার আশ্চর্য হয়েছি।

www.pathagar.com

পঞ্চম পর্ব

দর্শন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২৭
অর্থনীতিকে নবরূপে আবিষ্কার : সামাজিক চেতনাতাড়িত মুক্ত বাজার

আমার তরুণ বয়সে আমি বাম ভাবধারায় অনুপ্রাণিত প্রগতিশীল ছিলাম। কারণ যা চিরকাল হয়ে আসছে তাকে অপছন্দ করতাম, পুরনো রক্ষণশীল ধ্যানধারণার প্রতিও আমার শ্রদ্ধা ছিল না। আমার প্রজন্মের বহু বাঙালির মতো আমিও মার্কসীয় অর্থনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমি দল বা অন্ধনীতির অনুসরণ কখনও পছন্দ করিনি যারা আমাকে নির্দেশ দেবে কীভাবে চিন্তা করা উচিত, কী নির্দিষ্ট পদ্ধতি সবসময় পালন করা উচিত।

আমি গোঁড়া মুসলমানও ছিলাম না। তবে আমার নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কখনও সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিনি। আমি কখনও এত প্রবল মুক্তমনা হতে চাইনি যা আমার মনে নিজ ধর্মের প্রতি অনীহা এনে দেবে।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বন্ধুরা ছিল সমাজবাদী, যাঁদের মতে সরকারই সব কিছুর ভার নেবে। ভ্যান্ডারবিল্ট-এ অধ্যাপক জর্জেস্কু রোগেন যদিও কমিউনিস্ট ছিলেন না, মার্কসবাদকে এক যুক্তিবাদী মতবাদ .লে প্রশংসা করতেন। তাই তাঁর দর্শন অর্থনীতিতে এক সামাজিক মাত্রা আনতে সক্ষম হয়েছিল। মানবিকতার স্পর্শ ছাড়া অর্থনীতি পাথরের মতো শক্ত ও শুষ্ক বিষয় হয়ে যায়।

আমেরিকায় আমি দেখেছি বাজার কীভাবে ব্যক্তিমানুষকে মুক্তিদান করে। মানুষ ব্যক্তিগত পছন্দের কথা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারে। কিন্তু এর বিরাট অসুবিধা হল এর ফলে সবকিছু শক্তিমানদের মুঠোর মধ্যে চলে আসে। এর ফলে বাজার কীভাবে মানুষকে নিছক যন্ত্রে পরিণত করে। গরিব মানুষ বাজারের বাইরে থেকে যেতে বাধ্য হয় বলে তারা একেবারে অসহায় শিকারে পরিণত হয়। আমার মনে হয় গরিব মানুষকে বাজারে প্রবেশাধিকার দিলে তারা তাদের শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারবে। গ্রামীণ ব্যাংক একটি বেসরকারি স্বনির্ভর ব্যাংক। নিজেদের আয় বৃদ্ধি হলেই এর সদস্যরা পানির পাম্প, শৌচাগার, স্কুল, স্বাস্থ্য সেবা এরকম আরও অনেক কিছু অর্জন করতে পারেন।

গরিবের অবস্থার পরিবর্তনের এক উপায় হল গরিব নিজে উপার্জন করে তার ভাগ্য পালটানো। আরেক উপায় হল বড়লোকেরা ব্যবসা করে লাভ করুক। সরকার সেই লাভের উপর কর ধার্য করুন। করের টাকা খোরপোষ ভাতা, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণে ব্যয় করা হোক। কিন্তু বাস্তবে তা কখনওই ঘটে না। প্রকৃতপক্ষে করের টাকা যায় সরকারি আমলাদের পেছনে—গরিবদের উন্নতির জন্য বেশি কিছু করা হয় না। সরকারি আমলাদের বেতনের সঙ্গে লাভের কোনও সম্পর্ক নেই বলে তারা কাজের দক্ষতা বাড়ানোর কোনও উৎসাহ অনুভব করে না।

www.pathagar.com

গণবিক্ষোভের ভয়ে সরকার কখনওই তথাকথিত সমাজকল্যাণমূলক কাজ বন্ধ করতে পারে না। তাই সেই অজুহাতে এসব অনর্থক ব্যবস্থা চলতেই থাকে, বছরের পর বছর।

যদি গ্রামীণ ব্যাংক লাভ না করতে পারে, যদি আমাদের কর্মীরা উৎসাহিত না হয়, আমাদের ব্যবসা মার খাবে। গ্রামীণ ব্যাংক-কে একটি লাভের উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিষ্ঠানের লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে পরিচালিত করা যেতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংক মুনাফার প্রলোভনে তাড়িত প্রতিষ্ঠান নয়। তবে গ্রামীণ ব্যাংকে আমরা সর্বদাই সব খরচ মিটিয়ে লাভ করবার চেষ্টা করি। এজন্যে এটা করি যাতে ভবিষ্যতে কোনও বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে না।

আমরা সর্বদা সম্প্রসারণের পক্ষে। আমাদের সংস্থার মূলমন্ত্র হল মালিকদের মঙ্গলসাধন। তাদের মূলধন বিনিয়োগের উপর তাৎক্ষণিক অঢেল লাভের উপর কখনওই জোর দেওয়া হয় না।

* * *

খোলা বাজারি অর্থনীতি যা বর্তমানে চালু আছে তা সব সমস্যার সমাধান কখনওই নয়। দরিদ্রদের অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা, স্বাস্থ্যরক্ষার সুযোগ, শিক্ষা, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি মনোযোগ, এইসব দিক একেবারে অবহেলিত। সমাজের কতদিকে নজর পড়ছে না এগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবুও আমি বিশ্বাস করি সরকার আইন ও বিচার ব্যবস্থা, জাতীয় প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতি এরকম কয়েকটি বিষয় বাদ দিয়ে অন্যান্য দপ্তর থেকে হাত গুটিয়ে নিলে ভাল করবে। সরকার সুযোগ করে দেবেন সমাজ-সচেতনায় উদ্বুদ্ধ সামাজিক উদ্যোক্তা পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে। যাঁরা সমাজ সচেতন তাঁদের হাতে বহু কর্মভার তুলে দিতে হবে। শুরু থেকেই গ্রামীণ ব্যাংক-কে ঘিরে অনেক মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছিল। বামপন্থীরা বলতেন আমরা আসলে আমেরিকার ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। গরিবদের মধ্যে পুঁজিবাদ ছড়িয়ে দেবার চর। গরিবদের হতাশা ও ক্ষোভ নির্মূল করে দিয়ে আমরা বিপ্লবের সম্ভাবনা ধ্বংস করতে চাই। সেইটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

একজন কমিউনিস্ট অধ্যাপক একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সত্যিই আপনারা কী করছেন বলুন তো? গরিব মানুষকে এক টিপ আফিং খাইয়ে দিচ্ছেন, যাতে তারা বড় কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে কখনও না জড়ায়। আপনার অপদার্থ ক্ষুদ্র-ঋণ না কী যেন তা তাদের চোখে কিছুক্ষণের জন্য শান্তির ঘুম নিয়ে আসে এবং তারা সে সময়টা চিৎকার চেঁচামেচি করে না। তাদের বিপ্লবের অদম্য উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। এক কথায় গ্রামীণ ব্যাংক বিপ্লবের শত্রু।"

দক্ষিণপন্থীর দিকে তাকালে দেখি রক্ষণশীল ধর্মনেতারা বলেছেন, আমাদের জন্য ধর্ম ও কৃষ্টি সব গোল্লায় গেল।

যতদূর সম্ভব আমি এইসব সোচ্চার দর্শন তত্ত্ব, ও মতবাদকে এড়িয়ে চলি। আমি বাস্তব সামাজিক অবস্থার বিচার করে আমার কর্মপদ্ধতি ঠিক করি। যাই করি না কেন আমি চেষ্টা করি যতটা সম্ভব বাস্তবসম্মত হতে। আমি হাতেকলমে শিক্ষায় বিশ্বাসী। সর্বদা চেষ্টা করি আমার প্রয়াস যেন সামাজিক কোনও সুফল লাভ করতে সক্ষম হয়। বাম ও দক্ষিণপন্থীদের ধারণাপ্রসূত অর্থে আমি কিন্তু পুঁজিবাদী নই। আমি বিশ্বজুড়ে খোলা বাজারি অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ও পুঁজিবাদের যন্ত্র ব্যবহার করে তাতে অংশ গ্রহণ করছি। আমি খোলা বাজারের শক্তিতে ও বাজারের মূলধনের ক্ষমতায় আস্থাবান। কিন্তু সে-শক্তি শুধু ব্যক্তিগত মুনাফা গড়ার কাজে ব্যবহার হোক এটার আমি বিরোধী। আমি এ-শক্তি সামাজিক বাণিজ্য ও

www.pathagar.com

বিনিয়োগে নিয়োজিত করার দিকে পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বেকারভাতা বা অন্যান্য সুবিধা দরিদ্রদের সমস্যা দূর করতে পারে না এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ ধরনের কর্মসূচির ফলে তাদের সমস্যাগুলো সমাধানের অভাবে অবহেলিতভাবে পড়ে থাকে, জং ধরে। শক্ত সমর্থ দরিদ্র মানুষের দাক্ষিণ্যের কোনও প্রয়োজন নেই। তারা তার প্রত্যাশী নয়। অনুদান ভাতা তাদের দুঃখের ভার আরও বাড়িয়ে দেয়। তাদের উদ্যম একেবারে নষ্ট হয়ে যায়—সবচেয়ে জরুরি কথা হল লুণ্ঠিত হয় তাদের আত্মমর্যাদা।

দারিদ্র গরিবদের নিজেদের সৃষ্টি নয়। সমাজের পরিকাঠামো ও সমাজ অনুসৃত নীতি এর জন্য দায়ী। গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা গরিবদের জন্য একটা আর্থিক কাঠামো সৃষ্টি করেছি। এরকম আরও বহু বহু প্রতিষ্ঠানিক আয়োজন দরকার। তা হলেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যাবে—অর্থাৎ গরিবদের অবস্থার উন্নতি হবে। গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা থেকে একথা স্পষ্ট যে অর্থনৈতিক মূলধনের জোগান দিলে, তা সে যতই কম হোক, গরিব মানুষ তাদের জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনতে পারবে।

কারওর ২ হাজার টাকা দরকার, কারওর ৬ হাজার টাকা, কারওর ২০ হাজার টাকা। কেউ চায় ধান ভানার জন্য, কিংবা মুড়ি, তামা বা মাটির পাত্র বানানোর জন্য। অন্যরা চায় গোরু কেনার জন্য। এবং এটা লক্ষ করার বিষয়—বিশেষত উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা একটু কষ্ট করে খেয়াল করুন, গ্রামীণ ব্যাংকের একজন গ্রহীতারও কোনও বিশেষ প্রশিক্ষণের দরকার পড়েনি। হয় তারা তাদের রোজকার ঘর-গেরস্থালির মধ্যে দিয়ে এই প্রশিক্ষণ পেয়েছে অথবা হাতে কলমে কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছে। তাদের শুধু প্রয়োজন ছিল মূলধনের।

আমাদের বোঝানো হয়েছে যে পুঁজিবাদের অর্থনীতির ইন্ধন হল লালসার আগুন। এই বক্তব্যে বিশ্বাস করার মাধ্যমেই এই বক্তব্যকে বাস্তবে পরিণত করা হয়। ফলে যারা একমাত্র মুনাফা অর্জনে নিবেদিত তারাই আসে বাজার অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করতে। ব্যক্তিগত মুনাফার দিকে যাদের আগ্রহ নেই তারা আর বাজারে ভূমিকা রাখার আগ্রহ দেখায় না।

যাবতীয় ভুলের জন্য বেসরকারি খাত অবশ্যই ভর্ৎসনার যোগ্য। মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা যদি খারাপ হয় আমরা ভালরা কেন পরিবর্তনে উদ্যোগী হই না তার উপযুক্ত যুক্তি কিন্তু আমাদের ভাঁড়ারে নেই। মুক্ত বাজারের দরজা যখন সবার জন্য উন্মুক্ত তখন উন্নয়ন প্রয়াসী কোনও কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ থেকে কেন আমরা বিরত থাকি তা কোনও রকমে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

যাঁরা বেসরকারি উদ্যোগের কঠোর সমালোচক তাঁদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি—যদি আপনি সত্যিই সমাজ সচেতন এবং উদ্যোগী মানুষ হন তবে আপনি কেন ব্যবসায়ে এগিয়ে আসেন না, এমনভাবে ব্যবসা গড়ে তোলেন না যাতে সামাজিক মঙ্গল নিশ্চিত হয়।

২০ বছর গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতার সুবাদে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে একটি উদ্যোগের প্রধান অনুপ্রেরণা শুধু লোভ থেকেই উৎসারিত হবে এটা মোটেই সঠিক নয়। লোভের পরিবর্তে সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছবার অদম্য বাসনাও হতে পারে উদ্যোগের চালকশক্তি। সমাজসচেতন উদ্যোগগুলি লোভতাড়িত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফল হতে সক্ষম। আমার বিশ্বাস ঠিকমতো পদক্ষেপ নিতে জানলে সমাজ সচেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রতিষ্ঠানগুলি বাজারে বড় রকমের সাফল্য দেখাতে পারবে।

www.pathagar.com

* * *

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ প্রয়োগ, ভর্তুকি ও খোরপোষ ভাতা কিছু মানব দরদি মানুষের সৃষ্টি—প্রচলিত পুঁজিবাদের কঠিন দিকগুলিকে নরম করাই এর উদ্দেশ্য।

আমি পুঁজিবাদের মূল বক্তব্যে বিশ্বাসী। একটি মূল বক্তব্য হল: অর্থনৈতিক পদ্ধতি সবসময় প্রতিযোগিতামূলক হবে। সব প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা সৃষ্টির মূলে প্রতিযোগিতা নামক শক্তির অবদান অসীম।

পুঁজিবাদের আরেক মূল কথা হল লাভকে উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এর থেকেই জন্ম নেয় সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রেরণা। কিন্তু পুঁজিবাদের এই মূল নীতি থেকেই পুঁজিবাদের রক্তলোভী চেহারাটি কল্পনা করা হয়ে থাকে। ধরে নেয়া হয় পুঁজিপতিদের সব সামাজিক বোধ রহিত হয়ে যায়। ধরে নেয়া হয় সত্যিকারের উদ্যোক্তা এক বিরল ও অতি স্বতন্ত্র জাত। তাদেরকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই। তাদের প্রতি আমরা এত কৃতজ্ঞ বোধ করি যে তাদের জন্য সবরকম সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দিতে আমরা উন্মুখ—ঋণ, সামাজিক স্বীকৃতি, কর থেকে অব্যাহতি, জমি পাবার অগ্রাধিকার, সংরক্ষিত বাজারের নিশ্চয়তা প্রদান, ইত্যাদি।

পুঁজিবাদের দুই মূল বিষয়ে আমি পরিবর্তন আনতে চাই। প্রথম যে পরিবর্তন আনতে চাই তা হল একটি ফোলানো ফোঁপানো চরিত্রকে পুঁজিবাদ থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়া। তিনি হলেন পুঁজিবাদী উদ্যোক্তা। আমার চোখে তাঁকে কখনওই বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে হয়নি।

আমার মতামত ঠিক তার উলটো। আমি বিশ্বাস করি সব মানুষের ভিতর উদ্যোক্তা হবার ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। কেউ কেউ তার প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ পায়। অন্যরা একবারও চেষ্টা করবার সুযোগটুকু ও পায় না। কারণ আমাদের মনের মধ্যে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সফল উদ্যোক্তা আমাদের চেয়ে সকল বিষয়ে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র ও বিশেষভাবে প্রতিভাবান।

আমার মতো করে সবাই যদি ভাবতে শুরু করে যে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ, এমনকী একজন খালি পা রাস্তার ভিখিরিও একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তা তাহলে আমরা এক অর্থনৈতিক পদ্ধতি চালু করতে পারি যা প্রতিটি মানুষকে, তিনি পুরুষ হোন বা মহিলাই হোন, তাঁর নিজের সুপ্ত ক্ষমতা আবিষ্কার করবার সুযোগ করে দেবে। উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে পুরনো, যে নিশ্ছিদ্র দেয়াল নির্মাণ করে রাখা হয়েছে তাহলে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। এটা হয়ে উঠবে ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় যে একজন মানুষ নিজের উদ্যোগে কিছু করার চেষ্টা করবে, না মাইনে করা শ্রমিক হয়ে থাকবে।

অর্থনীতিতে ব্যক্তিমানুষের ভূমিকা পূর্ব নির্ধারিত একটা নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে দেবার প্রয়োজন নেই। জন্ম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যার উপর তার নিজের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই তার দ্বারা কখনওই তার ভূমিকা নির্ধারণ করা উচিত নয়।

* * *

দ্বিতীয় যে পরিবর্তন আনতে চাই তা হল উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের ইচ্ছা সম্বন্ধীয়। অর্থনীতির তত্ত্বে উদ্যোক্তাকে একজন মুনাফালোভী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে (প্রকৃতপক্ষেই কোনও কোনও দেশে, যেমন আমেরিকায় করপোরেট আইন অনুযায়ী

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ লাভ হওয়া আবশ্যিক। যে কর্মকর্তা বা পরিচালক পর্ষদ কোম্পানির তহবিলের টাকা কোনও সামাজিক উন্নয়নে ব্যবহার করে, তাদের বিরুদ্ধে অংশীদাররা তাদের মুনাফা বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়ার ব্যাপারে গাফিলতির জন্য মামলা দায়ের করতে পারে)।

এর ফলে উদ্যোক্তাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে সামাজিক মাত্রা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমাজ ও সমাজ বিজ্ঞানের জন্য এটা মোটেই শুভ সূচনা নয়। উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে সামাজিক চিন্তাভাবনার ভূমিকা যৎসামান্য হলেও তার জন্য স্থানটা চিহ্নিত করে রাখতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এই ভূমিকা বাড়ানোর সম্ভাবনা সৃষ্টি করা যায়।

একজন মানুষের সামাজিক ধ্যানধারণা হল তার সেই গুণাবলি যেগুলো উপযুক্ত সামাজিক মূল্যবোধ তার মধ্যে জাগ্রত করে। আমাদের কাগজ-কলমের নকশায় যদি এই মূল্যবোধের জন্য আমরা কোনও স্থানই না রাখি তা হলে মূল্যবোধহীন অমানুষ তৈরির পথ প্রশস্ত হবে।

সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য বাজারের মাধ্যমে সম্পদ বন্টনের জন্য মজবুত নিয়মকানুন থাকা দরকার। মুনাফার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের মূলনীতিকে সম্প্রসারিত করে আমি সামাজিক লক্ষ্যগুলিকেও এর মধ্যে স্থান দিতে চাই। তখন এটা এরকম দাঁড়াবে: উদ্যোক্তা দু'টি পৃথক লক্ষ্যের যোগফলকে সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। তার মধ্যে একটা হবে মুনাফা। অন্যটি হবে সামাজিক মঙ্গল। শর্ত থাকবে যে কখনও মুনাফার পরিমাণ শূন্যের নীচে হতে পারবে না, অর্থাৎ লোকসান দেয়া যাবে না। লোকসান দিতে থাকলে বাজার থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। প্রকৃতপক্ষে দু'টোর কোনওটিই ঋণাত্মক হওয়া উচিত নয়। তবু আমি বিষয়টিকে প্রচলিত মুনাফাকেন্দ্রিক ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে সরল রাখার জন্য ওটা ওখানে যোগ করা থেকে বিরত থাকলাম।

বিনিয়োগের সমস্ত সিদ্ধান্ত বিভিন্ন বিকল্পের মধ্য থেকে বাছাই করতে হবে। এক প্রান্তে থাকবে শুধু মাত্র মুনাফার চিন্তা—কীভাবে তাকে উচ্চতম সীমায় নিয়ে যাওয়া এই চিন্তা। অন্য প্রান্তের বিকল্প হবে লোকসান না-দিয়ে কীভাবে ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের মঙ্গলকে সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে যাওয়া যায়। যে সমস্ত উদ্যোক্তা সামাজিক মঙ্গলকেই মুখ্য লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে ব্যবসায় নামবেন তাঁকে আমরা সামাজিক উদ্যোক্তা বা Social enterpreneur বলব।

একজন সামাজিক উদ্যোক্তা এমনভাবে বিনিয়োগ করবেন যাতে করে তাঁর বিনিয়োগ থেকে সামাজিক মঙ্গল সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে।

যেমন ধরুন, একজন সামাজিক উদ্যোক্তা স্বাস্থ্য-সেবায় বিনিয়োগ করতে চান। তিনি চিন্তা করে বের করবেন কী কাজ করলে গরিব মানুষ সব চাইতে সস্তায় নিশ্চিতভাবে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে, আবার এতে কোনও লোকসান বহন করতে না হয়। এরকম আরও বহু ব্যবসা হতে পারে। যেমন: গরিবের জন্য ক্ষুদ্র-ঋণ দেয়া, গরিবের জন্য সস্তায় পুষ্টিকর খাবার বিক্রি, গরিবের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নবায়নযোগ্য শক্তিকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার কাছে নিয়ে আসা, শহরে স্যানিটেশান ব্যবস্থা পরিচালনা, সম্পদের অপচয় রোধ করে সম্পদের পুনঃব্যবহার নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন, গরিবদের তৈরি সামগ্রী বাজারজাত করার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এই ধরনের সামাজিক উদ্যোক্তা কি পৃথিবীতে বিরল বলে মনে করেন? তাঁদের খুঁজে পাওয়া কি দুষ্কর হবে? মোটেই আমার তা মনে হয় না। আমরা সন্ধানে নামলেই তাঁদের খুঁজে পেতে আরম্ভ করব। যত বেশি তাঁদের সন্ধান করব, তত বেশি তাঁদের পাওয়া যাবে। খোঁজাখুঁজি করলেই এরকম সামাজিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবার জন্য অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি হবে।

আপনার কী মনে হয়? আপনি নিজে কি একজন সামাজিক উদ্যোক্তা হতে চান? কেন

www.pathagar.com

নয়? অথবা আপনি কি এমন একজন সামাজিক উদ্যোক্তার খোঁজ করছেন যিনি নিজেও একজন পার্টনার খুঁজছেন?

নিজের সঙ্গে বুঝে দেখুন।

* * *

সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে। একদিকে আছে পুঁজিপতিরা যারা কেবলই ব্যক্তিগত লাভের জন্য সদা সচেষ্ট। এরা শুধু নিজেদের জন্য মুনাফা বাড়াতে চায়। সমাজের দায়দায়িত্বের পরোয়া করে না। এমন বিনিয়োগেও তারা এগিয়ে আসবে যেখানে ব্যক্তিগত লাভ আছে বটে তবে সমাজের অমঙ্গল হয়।

অন্যদিকে রয়েছে সামাজিক উদ্যোক্তারা যাদের উদ্দীপনার উৎস হল সমাজ সচেতনতা। যে-উদ্যোগ সামাজিক কল্যাণ সাধন করবে সেখানেই তারা বিনিয়োগ করে, অবশ্যই নিজেদের অর্থনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচিয়ে।

এই দুই বিপরীতধর্মী দলের মাঝামাঝি, অধিকাংশ উদ্যোক্তা সংস্থা লাভ ও সামাজিক কর্তব্য এই উভয়ের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ আত্মপ্রশান্তি পাবার চেষ্টা করে। নানারকম সামাজিক স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান যেমন—পুরস্কার, সামাজিক ভূমিকার স্বীকৃতিপত্র, আনুষ্ঠানিক ভাবে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন—ইত্যাদি দ্বারা আরও সামাজিক উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, আরও বিনিয়োগকে সামাজিক চেতনা প্রণোদিত বিনিয়োগে পরিণত করতে পারে।

বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার মাধ্যমে এই ধরনের আরও বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত করা যায়। একই সঙ্গে একজন উদ্যোক্তার দু'ধরনের বিনিয়োগ থাকতে পারে। এক ব্যবসায় তিনি ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া অন্য কোনও বিষয় মাথায় স্থান দেন না। একই সঙ্গে তিনি আবার এমন ব্যবসাও চালাতে পারেন সামাজিক উপকারই যার মুখ্য কাজ।

আমাদের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ী প্রজন্মের সামনে আমি যে সম্ভাবনা তুলে ধরলাম তা তাদেরকে বাস্তব জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। এর ফলে সামাজিকভাবে এবং পরিবেশগতভাবে সকল মানুষের জন্য মঙ্গলময় আন্তর্জাতিক অর্থনীতি গড়ে উঠবে। জাতীয় অর্থনীতিতেও তার প্রতিফলন ঘটবে।

অর্থনীতি বিদ্যার প্রমাণ করা উচিত যে খোলা বাজার শুধু শোষণকারী পুঁজিপতিদের খেলার মাঠ নয়। প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য এটা সকল সমস্যার সমাধান সন্ধানের কর্মস্থল।

* * *

রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়ে গ্রামীণের স্থান কোথায়? ডান, বাম বা মধ্যপথে? গ্রামীণ চায় সরকারের আয়তন ক্ষুদ্র থাকুক। সে খোলা বাজারের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং উদ্যোগী ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। কেউ বলতে পারে এদিক থেকে সে দক্ষিণপন্থীর মতো।

অন্যদিকে গ্রামীণ সামাজিক সমস্যার সমাধানের কাজে দায়বদ্ধ। দারিদ্র দূরীকরণ, শিক্ষার সুযোগদান, স্বাস্থ্যরক্ষা, চাকুরির সুযোগ, নারীকে ক্ষমতার অধিকার দিয়ে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার প্রয়োগ, বৃদ্ধদের মর্যাদার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ—এই ধরনের নানা সামাজিক কর্তব্যে নিয়োজিত। গ্রামীণ দারিদ্রমুক্ত, অনুদানবর্জিত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে।

www.pathagar.com

গ্রামীণ প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো বিরোধী। লালসা ভিত্তিক উদ্যমের সঙ্গে তার কোনও রকম আপোস নেই। সমাজ-সচেতন উদ্যোগ সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ এদের সমকক্ষ হয়ে উঠে এই জাতীয় সংস্থাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে চায়।

নিম্নবিত্তের মানুষকে শোষণের মাধ্যমে উচ্চবিত্তের মানুষের সম্পদ বৃদ্ধিতে গ্রামীণ বিশ্বাসী নয়। সরকারি সহযোগিতায়, কিন্তু হস্তক্ষেপ ছাড়া গ্রামীণ সামাজিক কল্যাণ ও নানা সেবামূলক কাজ করতে আগ্রহী। সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী কাজ কারবার সেই পথে চালিত করে নীতি নির্ধারণের মধ্যে দিয়েই আসবে সামাজিক পরিবর্তন এটাই গ্রামীণের বিশ্বাস। সমাজ সচেতন প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি ও আত্মিক মূল্যবোধকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এদেরকে গ্রামীণ সর্বতোভাবে সাহায্য দেওয়ার পক্ষে।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সহজেই গ্রামীণকে রাজনৈতিকভাবে বামপন্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

* * *

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নিরিখে গ্রামীণকে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। গ্রামীণকে পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নেয়াও অসম্ভব। গ্রামীণ সরকারি ও বেসরকারি প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনকে সমর্থন করে না—গ্রামীণ সম্পূর্ণ নতুন এক প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সৃষ্টি করার পক্ষপাতী, যাকে আমি বলি সমাজ সচেতনতা দ্বারা অনুপ্রাণিত বেসরকারি উদ্যোগ।

কারা এ ব্যাপারে জড়িত হতে চায় বা হবার উপযুক্ত? সমাজ-সচেতন মানুষ। 'লোভ' নামক প্রবৃত্তি যেমন মানুষের মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে, তেমনই সামাজিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষও মানুষের মঙ্গল কামনায় উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্ত করতে ছোটে। হয়তো লালসার চেয়েও এই আকাঙ্ক্ষার শক্তি অনেক বেশি। এইসব মানুষকে কেন ব্যবসার ক্ষেত্রে সুযোগ করে দেওয়া হবে না? এর দ্বারা শুধু সামাজিক সমস্যারই সমাধান হবে তাই নয় মানুষের জীবন আরও উন্নত থেকে উন্নততর হবে। শান্তি, একতা ও সৃজনশীলতার দিকে এগিয়ে যাবে।

সরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত ব্যর্থ হয়ে যায়। অথবা এও বলা যায় আমাদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের সঙ্গে ভর্তুকি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গোঁজামিল এবং স্বচ্ছতার অভাব এই সরকারি উদ্যোগগুলিকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এটা হয়ে ওঠে দুর্নীতির প্রশস্ত খেলার মাঠ। শুভ উদ্দেশ্যে যার প্রতিষ্ঠা হয় তা ভুল পথে এগিয়ে যায়।

সরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার কথা মেনে নিলে বিশ্বের সামনে শুধু খোলা থাকে শুধু ব্যক্তিগত মুনাফা ভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দরজা। এটা মোটেই কোনও প্রেরণাদায়ক ভবিষ্যৎ নয়। খোলাবাজারে প্রতিযোগিতা, যতই ভয়ংকর হোক না কেন, একাই লাগামছাড়া লোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কিছু না হলেও এটুকু আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে সামান্য সুযোগ পেলেই লালসা ও দুর্নীতি পরস্পরের সঙ্গে জোট বেঁধে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হবে।

পৃথিবীকে লোভ ও দুর্নীতির কাছে আত্মবিসর্জন দেবার জন্য ছেড়ে দেবার আগে, সমাজ-সচেতনতার শক্তিকে সবার একবার পরীক্ষা করা উচিত। গ্রামীণ এরই পতাকাবাহী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

* * *

সমালোচকরা বলেন ক্ষুদ্র-ঋণ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোনও সাহায্যেই আসতে পারে না। এর অবদান যেটুকু আছে তা একেবারেই নগণ্য।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞাকে কী হিসেবে দেখা হবে তার উপরই সবটা নির্ভর করে। সেটা কি মাথাপিছু গড় আয়? অথবা মাথাপিছু ভোগ করবার ক্ষমতা? অথবা অন্য কোনও একটা গড় পরিসংখ্যান?

উন্নয়নের এই জাতীয় সংজ্ঞার সঙ্গে আমি কখনওই একমত হইনি। এই সংজ্ঞা উন্নয়নের মূল কথাটাই এড়িয়ে যায়। আমার বিবেচনায় নিম্নস্তরের ৫০ শতাংশ জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিই অগ্রগতির মান নির্ণয় করে। আরও খুঁটিয়ে বললে আমি উন্নতি বলতে চিহ্নিত করব নিম্নস্তরের ২৫ শতাংশ মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মানের হিসেবকে।

এখানেই প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতি দু'টি স্বতন্ত্র পথ ধরে চলতে থাকে। যারা মনে করে দুটি বিষয় সমার্থক, কিংবা একেবারে পুরোপুরি সমার্থক না-হলেও দুইটি একই গতিসম্পন্ন তাদের বিবেচনায় সমাজের অর্থনৈতিক স্তরগুলি রেলগাড়ির কামরার মতো একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। ইঞ্জিন চালু করলে এরা সবাই একসঙ্গে চলতে শুরু করবে। গোটা রেলগাড়ি একই গতি অর্জন করবে। মোটা দাগে চিন্তা করলেও কোনওভাবেই এটা সম্ভব নয়। সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের গতি কখনওই এক হতে পারে না। তাদের গতিপথই একমুখী হয় না যদি না পুরো পথে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

প্রবৃদ্ধি ছাড়া কোনও কিছুই এগোতে পারে না এটা সত্য। কিন্তু ট্রেন ও মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার যে তুলনা করা হয় তা মিথ্যা হয়ে যায় একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণে। সামনের দিকে ট্রেন চলে সামনে থেকে টানা ইঞ্জিনের শক্তিতে বা পিছনের দিকে লাগানো ইঞ্জিনের ঠেলায় বা উভয় শক্তিতেই। কিন্তু মানুষের সমাজে প্রতিটি অর্থনৈতিক অবস্থানের নিজস্ব ইঞ্জিন আছে—এদের সম্মিলিত শক্তিই অর্থনীতিকে টান দেয় বা ঠেলা মারে। সমাজের কিছু ইঞ্জিনকে ঠিকমতো চালিত করতে না পারার অর্থই হল সমাজ সেই স্তরের প্রতি উদাসীন—সেক্ষেত্রে সম্মিলিত অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

আরও ক্ষতিকারক হল সমাজের শেষ সারির ইঞ্জিনের বেহাল অবস্থা, যা সামনের দিকে টানার পরিবর্তে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে—তারা সমাজের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সকলেরই বিপর্যয়ের আশঙ্কা। এমনকী যাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তারাও এর কুফল ভোগ করতে বাধ্য।

ক্ষুদ্র-ঋণ সমাজের শেষ সারির অর্থনৈতিক ইঞ্জিনকে চালু রাখে—এই বিপর্যস্ত কামরা বা বগির নিজস্ব ইঞ্জিনকে চালু করে, এর ফলে ট্রেনের গতি স্তিমিত হতে পারে না, বরং তা বেড়েই চলে। আজকের চালু তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এই উদ্দেশ্য সাধনে পুরোপুরি ব্যর্থ।

অবশ্য রাস্তা, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা, বিমানবন্দর নির্মাণে বিনিয়োগ জাতীয় অর্থনীতির সামনের দিকের প্রথম শ্রেণীর কামরার ইঞ্জিন চালু করে। এটা ট্রেনের ইঞ্জিনের ক্ষমতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পরের কামরায় ইঞ্জিনগুলো চালু করতে বা তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এর ভূমিকা সীমিত।

ক্ষুদ্র-ঋণ কি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো তৈরি করতে কোনওভাবে সাহায্য করবে? সমাজের নিচুস্তরের পরিত্যক্ত অবহেলিত সমাজের ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক ইঞ্জিন ক্ষুদ্র-ঋণ চালু করে। একসঙ্গে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ইঞ্জিন চালু যদি করা সম্ভব হয়, তাহলে বড় ক্রিয়াকলাপের মঞ্চ

www.pathagar.com

তৈরি হতেই বা বাধা কোথায়?

ক্ষুদ্র-ঋণের গ্রহীতা ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী উভয়কেই সংগঠিত করে বড় উদ্যোগ চালু করা সম্ভব এমনকী পরিকাঠামো নির্মাণ সংস্থাও। আমরা অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান চালু করেছি। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রামের প্রক্রিয়া দ্রুততর করবার জন্য। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি বড় পরিকাঠামো নির্মাণ প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'গ্রামীণ ফোনের' কথা। এটা জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল টেলিফোন উদ্যোগ, যা আশা করা যায় আগামী ২০০৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলের ১০ লাখ গ্রাহকের সেবা করতে পারবে।

বাংলাদেশের গরিব তাঁতিদের বোনা 'গ্রামীণ চেক' জাতীয় বৃহত্তম সুতিবস্ত্রের প্রস্তুত কারক। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'গ্রামীণ চেক' সুতির কাপড়ের রপ্তানিকারকও বটে।

গ্রামীণ মৎস্যপ্রকল্প মৎস্যচাষের ব্যবসা চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে। গরিবেরাই এটা চালাবে, তারাই অংশীদার হিসেবে এর মালিক হবে।

'গ্রামীণ কম্যুনিকেশান্স' ইন্টারনেট সেবা দান করে। তা প্রত্যন্ত গ্রামেও সমগ্র পৃথিবীর কর্মদ্যোগের খবর পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। যাদের সুযোগ জোটে না এমন পরিবারের বহু মেধাবী ছেলে মেয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের সেরা শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। তাদের চাকরির জন্য শহরে ছুটতে হবে না—তারা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে থেকে আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের সুবিধা ভোগ করবে।

'গ্রামীণ শক্তি' বিদ্যুৎহীন গ্রামে সৌরশক্তি পৌঁছে দিচ্ছে যার সাহায্যে মোবাইল ফোন, বাতি, আলো, রেডিয়ো, টেলিভিশন, কম্পিউটার সবই চালানো সম্ভব হবে। গ্রামীণ শক্তি ক্ষুদ্রশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে যার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের ভার স্থানীয় গরিব মানুষেরই হাতে থাকবে।

প্রথাগত অগ্রগতির পরিকল্পনায়, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, টেলিকমিউনিকেশন এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর মালিক হয় দেশের সবচেয়ে ধনী মানুষ বা বহুজাতিক কোম্পানি, বা উভয়েই। তারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যই তা করে থাকে। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পথপ্রদর্শক। তারা অন্যভাবে কাজ করার স্বপ্ন দেখে, কাজ করে গরিবদের উপকারের উদ্দেশ্যে।

* * *

উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার মান পুরো একটি সমাজের গুণগত মানের মাপকাঠি হতে পারে না। একটি সমাজের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে দেখতে হবে সে সমাজের সবচাইতে নীচের স্তরের মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করে।

www.pathagar.com

২৮
স্বকর্মসংস্থান

প্রত্যেক আধুনিক সমাজেরই অভিশাপ হল বেকারত্ব। এমনকী শিল্পোন্নত দেশও সবাইকে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দান করতে পারে না।

আমেরিকার রাজ্য সরকার ও ইউরোপের রাজনীতিবিদরা বড় বড় কোম্পানিকে করের ছাড় ও নানা সুবিধার টোপ দেখিয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ভবিষ্যৎ প্রকল্প করানোর চেষ্টা করে। এইভাবে তারা কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করবার কথা ভাবে। কিন্তু শিল্পের ক্ষমতাও সীমিত। স্বকর্মসংস্থান বড় শিল্প স্থাপনে কোনও বাধা নয়। বড় শিল্প হতে থাকুক। কিন্তু পাশাপাশি স্বকর্মসংস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অপরের অধীনে চাকরির চেয়ে স্বকর্মসংস্থানের সুবিধা অনেকগুলি। (১) পারিবারিক সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজের সময় নির্ধারণ করা চলে। জরুরি অবস্থায় পূর্ণকাল ব্যবসা বাদ রেখে খণ্ডকালীন ব্যবসা করতে কোনও বাধা থাকে না। দরকার হলে কিছুদিনের জন্য ব্যবসা গুটিয়ে মাইনে করা কাজে নিযুক্ত হওয়াও সম্ভব।

(২) যারা চালাক চতুর এবং যাদের দক্ষতা সহজাত বা অর্জিত তাদের পক্ষে স্বকর্মসংস্থানে খুবই উপযুক্ত। এর অর্থ হল দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষ দুর্বলতার জন্য পিছিয়ে পড়ার পরিবর্তে তার সহজাত ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারে এই ব্যবস্থায়।

(৩) শখকে লাভজনক কাজে ব্যবহার করে তা আরও উপভোগ্য করে তোলার উপায় হল স্বকর্মসংস্থান।

(৪) যারা প্রথাগত শাসনব্যবস্থায় কাজ করতে অভ্যস্ত নয় তাদের নিজস্ব কর্মদক্ষতা দেখাবার জন্য এটা অত্যন্ত উপযোগী।

(৫) দয়াদাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে না থেকে, বা শুধুমাত্র বেতনের ক্রীতদাসত্ব না করে একটা দোকান খোলা বা কোনও উৎপাদনক্ষম ব্যবসা চালু করার সুযোগ করে দেয় স্বকর্মসংস্থান।

(৬) চাকরি থাকলেও যাদের দারিদ্র থেকে মুক্তি হয়নি তাদের জন্য এটা অত্যন্ত উপকারী।

(৭) চাকরি থেকে সদ্য বরখাস্ত হয়েছে যারা তাদের হতাশা বা একাকিত্ব সম্পূর্ণ গ্রাস করার আগে নতুন উদ্যম শুরু করার জন্য এই ব্যবস্থা তাদের মানসিক শক্তি জোগায়।

(৮) যারা বর্ণ বা জাতি বা সাম্প্রদায়িকতার কারণে চাকরির সুযোগ পায় না তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হল স্বকর্মসংস্থান।

(৯) একজন ব্যক্তির স্বকর্মসংস্থানের খরচের চেয়ে প্রথাগত মজুরিভিত্তিক একটি কর্ম সৃষ্টির ব্যয় ১০ গুণ এমনকী কখনও ৩০ গুণ বেশি।

www.pathagar.com

(১০) একজন পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ, গরিব মানুষকে ধাপে ধাপে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে এই ব্যবস্থা সাহায্য করে।

ক্ষুদ্র-ঋণের একটি প্রচলিত সমালোচনা হল এই বিশাল বাজার ও বিপুল উৎপাদনের যুগে স্বকর্মসংস্থানের অর্জিত লাভ স্বল্প এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের কোনও স্তরেই পৌঁছতে পারে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস কুটিরশিল্প একটি কারখানার সমান সামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম যদিও তা এক ছাদের নীচে ঘটে না বা পুরোপুরি বেতন নির্ভর নয়।

চাকরির সুযোগ সৃষ্টির চেয়ে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি হওয়া উচিত অনেক বিস্তৃত ও গভীর। মানুষ যখনই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হতে শুরু করে তখনই দারিদ্র দূরীকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়।

অতএব কাজের সুযোগই দরিদ্রদের একমাত্র পরিত্রাতা নয়, তাদের জন্য অন্য বিকল্প হল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি। পুঁজির জোগান দ্রুত দারিদ্র দূরীকরণে সক্ষম। করদাতার উপর তা অযথা বোঝা সৃষ্টি করে না এবং দরিদ্রদের নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করবার সুযোগ দেয়।

মাসিক কল্যাণভাতার পরিবর্তে যারা ব্যবসা শুরু করতে চায় তাদের প্রারম্ভিক মূলধন দেওয়া আমার মতে অনেক বেশি মঙ্গলজনক। যুক্তরাষ্ট্রে উদ্যোগ সহায়ক ভাতা প্রকল্প ৪৪ হাজার ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করেছিল, যাদেরকে ৮৬ শতাংশ তিন বছর বাদে আজও ঠিকঠাক চালু রয়েছে।

স্বকর্মসংস্থানের সীমিত ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই সেইসব মানুষদের ভাগ্য ফেরাতে সাহায্য করে যারা আমাদের অর্থনীতিতে প্রত্যাখ্যাত বা যাদেরকে করদাতারা কাঁধ থেকে নামাতে চায়।

* * *

মঞ্জিরা খাতুনের গল্প শোনা যাক। তাঁর বয়স ৩৯। চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার আওতাধীন নয়দিয়ারী গ্রামে তার জন্ম। তিনি এখনও সেখানেই বাস করেন।

মঞ্জিরা অত্যন্ত অধ্যবসায়ী ছাত্রী ছিলেন। তাঁর বিয়ে হয় ১৭ বছর বয়সে। তাঁর বাবা দীর্ঘ মামলা মকদ্দমার পর দেউলিয়া হয়ে যান ও নিজের সব জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। তাঁর স্বামীর চাকরি যায় এবং তৃতীয় সন্তান জন্মের পর তাঁর স্বামী এই সংসার ত্যাগ করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। অতিমাত্রায় দুর্বল ও রোগা হয়ে যাওয়ার জন্য মঞ্জিরা তাঁর ছোট ছেলে রুবেলকে বুকের দুধ পর্যন্ত খাওয়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর বাবা অত্যন্ত গরিব। ঘরে তাঁদের খাবার লোক ১৭ জন। মঞ্জিরার বড় দু'টি সন্তানকে বাপের বাড়ি নিয়ে আসার অনুমতি মিলল না। তিনি লোকের বাড়ি কাজ করে সামান্য আয় করতেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে এক দরজির কাছে কাজ শিখতেন। তাঁর ছোট্ট ছেলেটিও ছিল খুব দুর্বল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কালান্তক আন্ত্রিক রোগে সে মারা যায়। এতে মঞ্জিরা এত ভেঙে পড়েছিলেন যে তাঁর ছ' মাস লেগেছিল নিজেকে সামলাতে ও স্থানীয় দরজির কাছে কাজ খুঁজে নিতে।

এই কাজে মঞ্জিরা ও তাঁর দু'টি সন্তানের কোনওক্রমে পেট চলত। নিজস্ব একটি সেলাই মেশিন কিনে নিজে ব্যবসা শুরু করার স্বপ্ন দেখতেন।

১৯৮৯ সালে তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের কথা শুনলেন। তাঁর আব্বাকে পাঠালেন খবর জোগাড় করতে, কীভাবে গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দেওয়া যায়। আজ আমাদের ঋণের বদৌলতে তিনি একটি জমির মালিক যাতে আছে ২০টা পেয়ারা গাছ। তিনি একটি উচ্চ ফলনশীল ধানের জমি লিজ নিয়েছেন।

গ্রামীণ ব্যাংকের গৃহঋণের সুবাদে ইটের দেওয়াল ও টিনের চাল দেওয়া নিজের বাড়ি

www.pathagar.com

হয়েছে তাঁর। ঋণের টাকা দিয়ে তিনি কাপড় কিনে পোশাক সেলাই করেন, বাড়ি বসেই সেগুলো বেচতে পারেন।

তিনি বলেন—"যেদিন আমার বাড়ি তৈরি শুরু হল সে দিনটা আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন। আমার মা বাবা যা পারেনি গ্রামীণ ব্যাংক আমার জন্য তাই করেছে।" তাঁর ঋণের সাপ্তাহিক কিস্তি আড়াইশো টাকা। সহজেই তিনি কিস্তি শোধ করেন। তাঁর বক্তব্য—"গত দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি রোজ পেট ভরে খেতে পাচ্ছি। বুড়ো বাবা মার দেখাশোনাও করতে পারছি।"

১৯৯০ সালে তাঁর সহযোগীরা তাঁকে রাজশাহি অঞ্চল থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত করেছিল। বেলজিয়াম-এর রাজকীয় প্রাসাদে রাজা বঁদোয়ার কাছ থেকে তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে রাজা বঁদোয়া পুরস্কার গ্রহণ করেন, যা ১৯৮৯ সালে গ্রামীণ ব্যাংককে প্রদান করা হয়েছিল। একজন বোর্ড সদস্য হিসেবে তিনি সেখানে চমৎকার ভূমিকা পালন করেছিলেন। গ্রামীণ ব্যাংকের উপর ডেভিড বর্নস্টাইনের লেখা অসাধারণ বই *দা প্রাইস অফ এ ড্রিম** বইটিতে তাঁর সফরের সবিস্তার বর্ণনা আছে।

* D. Bornstein, *The Price of a Dream* : Simon & Schuster. New York. 1996.

www.pathagar.com

২৯
গরিবদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

দারিদ্র দূরীকরণের প্রথাগত প্রাথমিক প্রক্রিয়া আমরা অবলম্বন করি না। অর্থাৎ কোনও প্রশিক্ষণ না দিয়েই আমরা প্রথম ধার দিয়ে থাকি।

প্রথমে নগদ টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের সহজাত কিছু দক্ষতা আছেই। তাদের বেঁচে থাকার ক্ষমতাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাদের বেঁচে থাকার কলাকৌশল আমাদের শেখাতে হয় না। সুতরাং নতুনভাবে তাদের কিছু কর্মশিক্ষা দিয়ে সময় নষ্ট করা বৃথা। ঋণের সুযোগ তাদের সহজাত দক্ষতাকে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগাবার উপায় করে দেয়—যেমন তাঁত বোনা, ধান মাড়াই, পশুপালন, রিকশা চালানো। এইসব জীবিকার মাধ্যমে তারা যা রোজগার করে, তাই তাদের আরও সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে বিকশিত করবার সুযোগ করে দেয়।

সরকারি নীতি নির্ধারকরা, অনেক বেসরকারি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞমণ্ডলি দারিদ্র দূরীকরণের কাজ শুরু করেন এক বিস্তৃত প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে। এর তিনটি ব্যাখ্যা আছে। প্রথমত, তাঁদের বিবেচনায় দারিদ্রের কারণ হল কর্মদক্ষতার অভাব। দক্ষতা অর্জন করলে গরিব আর গরিব থাকবে না। দ্বিতীয়ত, প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে তাঁদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় অর্থাৎ তাঁরা বিশাল বাজেটের প্রকল্পের প্রচলন করতে পারেন যাতে কোনও নিশ্চিত ফলাফল দেখাতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা কিছুই না করেও বিশাল কিছু করবার ভান করা অতি সহজ। তৃতীয়ত, গরিবদের প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়া তাঁরা অন্য কোনও কিছু চিন্তা করতে জানেন না।

বিশ্বজুড়ে এক বিরাট ব্যবসার প্রচলন হয়েছে শুধুই প্রশিক্ষণের নামে। সাহায্যের স্রোত ও কল্যাণমূলক বাজেটকে সাধুবাদ। দারিদ্র দূরীকরণের বিশেষজ্ঞ ক্রমাগত জোরের সঙ্গে প্রচার করে যান যে দরিদ্রদের অর্থনীতির সিঁড়ি ভাঙতে সাহায্য করবার জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। তাঁরা দাবি করেন এটা এক প্রাথমিক চাহিদা।

কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হলেই বোঝা যায় যে, প্রশিক্ষণের অভাবে গরিব গরিব হয় না। শ্রমের বিনিময়ে তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না বলেই তারা গরিব। এর কারণ একেবারে স্বতঃসিদ্ধ, মূলধনের উপর তাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এই নিয়ন্ত্রণের অভাবই তাদের উন্নতির পথে বাধা। লাভ নির্লজ্জভাবে পুঁজির প্রতি পক্ষপাত দুষ্ট। উৎপাদন সম্পদের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে তাদের ঘরে আরও বেশি সম্পদ সৃষ্টি করার কাজেই নিয়োজিত হয় গরিব মানুষের শ্রম।

গরিব মানুষের কেন পুঁজির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না? উত্তরাধিকার সূত্রে তারা কোনও পুঁজি বা ঋণ পায় না, কেউ তাদের হাতে পুঁজি তুলেও দেয় না কারণ, আমাদের মনে বিশ্বাস

www.pathagar.com

গড়ে তোলা হয়েছে যে গরিব মানুষকে ঋণ দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না। তারা ঋণের উপযুক্ত নয়। অথচ যে ব্যাংক বলে গরিব মানুষ ঋণের উপযুক্ত নয় আমরা কোনওদিন প্রশ্ন তুলি না তারা মানুষের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কী না।

* * *

অনেক প্রশিক্ষণ প্রকল্প যে উদ্দেশ্যে নেওয়া হয় ফল হয় তার বিপরীত। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য গরিব মানুষকে উৎসাহস্বরূপ কিছু ভাতা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ-ভাতা হিসেবে কিছু তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করে তারা। কখনও কখনও অন্য সুবিধা (নগদ বা উপহার) ভোগের জন্য প্রশিক্ষণকে আবশ্যিক করা হয় । এই ব্যবস্থা গরিব মানুষকে আকর্ষণ করে, তারা প্রশিক্ষণে আগ্রহী হোক বা না হোক। প্রশিক্ষণ প্রকল্পগুলিতে গরিব মানুষের সহজাত ক্ষমতা উদ্ঘাটন করার চেষ্টার পরিবর্তে নতুন নতুন কর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষাদান পদ্ধতি এতই ভুলে ভরা যে গরিব মানুষের নিশ্চিত ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে তারা একেবারে নির্বোধ ও অজ্ঞ।

গ্রামীণ ব্যাংক-কে যদি ঋণ দেবার আগে গ্রহীতাদের ব্যবসা চালনার বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হত তবে অধিকাংশই ভয় পেয়ে চলে যেত। প্রথাগত জ্ঞানলাভ তাদের কাছে ভীতির ব্যাপার। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সহজাত শেখবার ক্ষমতার পর্যায়ক্রম রয়েছে। তা উপেক্ষা করে অন্য ধরনের জ্ঞান জোর করে তাদের উপর আরোপ করলে, তাদের সহজাত ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়, নতুন কোনও শিক্ষালাভ তো দূরের কথা। তারা হীনম্মন্যতায় ভোগে, নিজেদের বোকা ও অপদার্থ ভাবে। তার মানে এই নয় সব প্রশিক্ষণই ব্যর্থ। অর্থনৈতিক বাধাবিঘ্ন দ্রুত ও নিরাপদ ভাবে অতিক্রম করার জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। আসলে এতসব আমার বলার উদ্দেশ্য হল, গাড়িকে ঘোড়ার আগে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। মানুষের সহজাত ক্ষমতা নষ্ট হবার পরিবর্তে বিকশিত হবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শুধু শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিশাল প্রশিক্ষণ কর্মযজ্ঞ দিয়ে তা কখনও সম্ভব নয়। বিশেষ একটি জনগোষ্ঠীর দরকার ভেবে, তাদের উপর জোর করে প্রশিক্ষণ চাপিয়ে দেওয়া সঠিক পদক্ষেপ নয়। যখন তারা নিজেরা অনুভব করতে শুরু করবে যে তাদের প্রশিক্ষণ দরকার এবং তার সন্ধানে উদ্যত হবে ও তার জন্য টাকা লাগলে টাকা খরচ করতেও প্রস্তুত থাকবে, তখনই তাদের সহায়তা দেওয়া জরুরি। প্রশিক্ষণ তাদের দরকার মতো হলে টাকা সমস্যা হয়ে ওঠে না। কিন্তু বিপত্তি বাধে যখন দাতার খেয়াল খুশিমতো তাদেরকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

* * *

গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রহীতারাও প্রশিক্ষণের প্রত্যাশী। কখনও কখনও আমরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ করতে সাহায্য করি।

গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকরা তাঁদের "ষোলো সিদ্ধান্ত" সিদ্ধান্ত নিজেরা পড়তে চান। পাছে ভুলে যান, এগুলো সর্বদা মনে রাখার চেষ্টা করে যেতে হয়। কঠিনতম উপায়ে তাঁদের শিক্ষালাভ করতে হয়। একজন বার বার পড়ে যায়, তাই শুনে সকলে ১৬টি সিদ্ধান্ত মুখস্থ করে ফেলেন।

গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকেরা চান হিসেবনিকেশ বুঝতে, ব্যবসা সম্বন্ধে নতুন নতুন

www.pathagar.com

খবরাখবর জানতে, স্বাস্থ্য, পশুপালন, নতুন উপায়ে বীজ বপন, সংরক্ষণ ও প্রস্তুতিকল্পের বিষয় আধুনিক জ্ঞান অর্জনে তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী।

গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকেরা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। তারাই বাবা মাকে হিসেব রাখতে, নিয়মাবলিগুলি পড়তে এবং যা কিছুতে লেখাপড়ার দরকার তাতেই সাহায্য করে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তা যথেষ্ট নয়।

গ্রামীণ ব্যাংক তাঁদের জন্য নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসছে। সেলুলার ফোন, সৌরশক্তি, ইন্টারনেট। পাঁচ মিনিট স্থানীয় টেলিফোন কলের জন্য কত টাকা নেওয়া উচিত তা শেখবার দরকার তাঁরা অনুভব করতে থাকবেন। আমেরিকা, মালয়েশিয়া ও দুবাইতে ফোন করলে কত চার্জ করতে হবে তাও হিসাব করতে শিখতে চাইবেন।

* * *

ষোলো সিদ্ধান্তের একটি হল 'আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা শেখাব।' এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রতিটি গ্রাহক সচেতন। তাঁরা বুঝতে পারছেন শিক্ষালাভের মাধ্যমে, তাঁদের সন্তানরা আরও ভালভাবে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে। স্মরণাতীত কাল থেকে যে ভয়ংকর সমস্যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বিস্তার লাভ করছে তার থেকে কোনওদিন যেন নিস্তার পাবার আশা নেই। তাঁরা নিজেরা, তাঁদের বাবা, মা, দাদা, দাদী, কোনওদিন যে সুযোগ পায়নি, সন্তানদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে তাঁরা চান না। গ্রামীণ ব্যাংক এই সিদ্ধান্তের কার্যকরী প্রয়োগ সম্বন্ধে সদা সতর্ক। প্রতিটি সদস্যের সন্তানরা স্কুল যাচ্ছে কিনা সেদিকে কড়া নজর রাখা হয়।

গ্রাহকদের শিক্ষা নিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের কোনও পরিকল্পিত উদ্যোগ ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। অধিকাংশ সদস্যেরই কোনও প্রথাগত শিক্ষা নেই। প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রাহক নিরক্ষর। এর ফলে তাদের মূলধন থাকা সত্ত্বেও বৃহৎ উদ্যোগের ইচ্ছা সীমিত হয়ে যেতে বাধ্য। পড়তে লিখতে না জানলে ব্যবসার নতুন পদ্ধতি আয়ত্ত করা, ব্যবসা সংক্রান্ত নতুন তথ্যের বা বাণিজ্য প্রসারের নতুন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। ইউনেস্কোর প্রধান মি. ফ্রেডারিকো মাইয়ের ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে ১৯৯৪ সালে বক্তব্য পেশ করার সময় আমি নিম্নলিখিত আহ্বান জানিয়েছিলাম।

"গ্রামীণ ব্যাংক কাজ করছে তার গ্রাহকদের দারিদ্র থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে। আমাদের গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে ২০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। ২০০৫ সালের মধ্যে এই ২০ লক্ষ পরিবারকে দারিদ্রসীমা অতিক্রম করানোই আমাদের লক্ষ্য। তারপর আর তাদের পূর্ব অবস্থায় কোনওদিন ফিরে যেতে হবে না। গ্রামীণ ব্যাংক যা বিশ্বজুড়ে 'দরিদ্রদের ব্যাংক' বলে পরিচিত, তার তখন এক নতুন পরিচয় লাভ তখন সবাই তাকে চিনবে 'প্রাক্তন দরিদ্রদের ব্যাংক' হিসেবে। এটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ। আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা কঠিন পরিশ্রম করছি। এখন আমি আহ্বান করছি ইউনেস্কোকে আমাদের সহযোগী হতে, যাতে করে ২০১০ সালের মধ্যে সমস্ত গ্রামীণ পরিবার পূর্ণ সাক্ষরতা লাভ করে।" মি. মাইয়র, তক্ষুনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। তার পরের বছর বেজিং সম্মেলনে ইউনেস্কো ও গ্রামীণ ব্যাংক যুগ্মভাবে এক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে। দুই বছর কেটে গেছে। বাস্তবে কাজের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু ইউনেস্কো ও গ্রামীণ ব্যাংক কেউই তাদের প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হয়নি।

১৯৯৫ সালে আমরা ছোট্ট সূচনা করেছিলাম। আমরা কর্মমুখী গবেষণা শুরু করেছিলাম।

www.pathagar.com

আমরা একটি এন. জি. ও. সংস্থা, 'সেন্টার ফর মাস এডুকেশান ইন সায়েন্স'-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ঢাকা থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে জয়মন্টপ গ্রামে জীবনমুখী শিক্ষা কর্মশালা আয়োজনের জন্য। প্রতিটি বয়স্ক শিক্ষার্থীকে মাসে ২ টাকা করে দিতে হয়েছিল। যদিও হিসেব অনুযায়ী টাকার অঙ্ক নগণ্য, তবু তাদের পক্ষে ওই সামান্য টাকা দেওয়াও সহজ ছিল না।

এক বছরের মধ্যে ২৫টি কেন্দ্রে আমরা ১৬০০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছতে পেরেছিলাম। প্রতি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ। তাঁরা সকালে বা বিকেলে ক্লাসে যোগ দিতেন। পরের বছর একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা হল।

এর মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের এক নতুন সহযোগী প্রতিষ্ঠান চালু হল। নাম 'গ্রামীণ শিক্ষা'। গ্রামীণের পরিবার বা বাইরের বহু পরিবারকে এই প্রতিষ্ঠান দ্রুতগতিতে শিক্ষার প্রসার ঘটাবার পদ্ধতি ধীরে ধীরে উদ্ভাবন করবে। আমরা আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের চিন্তাভাবনা করছি—পারস্পরিক ছবি বিনিময়ও কথোপকথনের সুবিধাযুক্ত স্যাটেলাইট টি.ভি, রেডিয়ো এবং ইন্টারনেট—যাতে আমরা বহু সংখ্যক মানুষের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারি। এই ব্যাপারে 'ইউনেস্কো' ও 'ইনফোডেভ' আমাদের প্রযুক্তিগত সাহায্য করবে। নরওয়ের 'টেলিনর' ও 'ওয়ার্ল্ড ভিউ ইন্টারন্যাশানাল' গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, যাতে তথ্য প্রযুক্তি দ্বারা গণশিক্ষা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন বিস্তৃত ও ফলদায়ী পরিমণ্ডল। ক্ষুদ্র-ঋণ পরিবারের অর্থনৈতিক ইঞ্জিন চালু করে দেয়। কিন্তু অগ্রগতির জন্য ইঞ্জিনের নিয়মিত জ্বালানি সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষমতাবৃদ্ধি ও ভাল রাস্তা চাই। ক্ষুদ্র-ঋণ দিয়ে সহজেই অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়। আরও এগোবার জন্য দরকার উপযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়, শিক্ষা, অবসরভাতা পরিকল্পনা, যাতায়াতের সুব্যবস্থা ও বাজারের খবরাখবর, এই রকম সহায়ক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে না পারলে গ্রাহকদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি থেমে যেতে পারে। এমনকী তা পিছনদিকেও চলা শুরু করতে পারে।

www.pathagar.com

৩০
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রতিটি মানুষই এক একটি অনাবিষ্কৃত সম্পদ। প্রত্যেকেরই ক্ষমতা অসীম।

একথা ঠিক যে এই গ্রহে প্রতিটি মানুষ রসদের দাবিদার হয়ে পৃথিবীর সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু বিশ্বের কল্যাণের জন্য একজন মানুষের উৎপাদন সহযোগী হয়ে উঠবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

১৭৯৮ সালে থমাস ম্যালথাস ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশ্বের রসদ ভাণ্ডারের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে। ফল হবে দারিদ্র ও উপবাস। কিন্তু তা হয়নি। মানুষের অবস্থা দিন দিন উন্নততর হচ্ছে। ম্যালথাস শিল্প বিপ্লবের ফলাফল দেখতে পাননি। এর ফলে সভ্যতা হয়ে গেছে শহরকেন্দ্রিক ও পরিবার হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র।

যাঁরা জনসংখ্যা ঘটিত বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের কাছে বাংলাদেশ খুবই আকর্ষণীয়। সবসময় আমরা শুনে এসেছি আমরা দরিদ্র কারণ ছোট্ট দেশের তুলনায় জনসংখ্যা অত্যাধিক। বাংলাদেশ আয়তনে ফ্লোরিডার সমান অথচ ১২ কোটি মানুষের বাস এখানে। আমেরিকার অর্ধেক সংখ্যক মানুষ যদি ফ্লোরিডায় এসে বসবাস করেন তাঁদের জনসংখ্যার যা ঘনত্ব হবে তা এখন বর্তমান বাংলাদেশে বর্তমান। বিষয়টি অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। সারা বিশ্বের জনগণকে একত্র করে আমেরিকায় বাস করতে পাঠালে জনসংখ্যার যে ঘনত্ব হবে বাংলাদেশের বর্তমান জনঘনত্ব তার চেয়েও বেশি।

এসব কথা বাংলাদেশের কী উপকারে আসবে। আমরা ভয় পেয়ে বাংলাদেশে শিশুর জন্ম বেআইনি করে দেব? আমার বিবেচনায় পশ্চিম বিশ্বের দেশগুলি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলি জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে এক ভীতি চালু করেছে। আমরা তৃতীয় বিশ্বের জনগণ অন্ধভাবে সেই মতবাদেরই প্রতিধ্বনি করি। দেশের অভ্যন্তরে আরও বেশি ভীতির সঞ্চার ঘটে।

এই ভয় প্রদর্শনের নীতি অনুযায়ী বিশ্বাস করতে হবে যে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলে দারিদ্রও দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কিন্তু দেশের দারিদ্র অবশ্যই দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পায়নি। বরং ২৭ বছর আগের তুলনায় আমাদের অবস্থা এখন অনেক ভাল। এখনকার তুলনায় আগে আমাদের খাদ্যাভাব আরও প্রবল ছিল। দ্বিগুণ লোকসংখ্যা সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদনে এখন বাংলাদেশ প্রায় স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা বলবেন, "১৯৭১ সাল থেকে এই হারে জনসংখ্যা না বাড়লে এখনকার থেকে আরও দ্বিগুণ ভালভাবে আপনারা জীবন কাটাতে পারতেন।" হতে পারে আবার না হওয়াও সম্ভব। কেউ এ নিয়ে কল্পনায় নানা চিত্র তৈরি করতে পারেন ঠিকই।

কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিষয় হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিস্ফোরণের ফলে সেদিন ভয়ংকর অচলাবস্থার যে দৃশ্য ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আমার সন্দেহ হয় সরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি মানুষকে ভয় দেখিয়ে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যোগী করে তুলেছিল। মানুষের বিশেষত নীচের স্তরের অর্ধেক জনসংখ্যার অবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবর্তন এনেও জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বাগে আনা সম্ভব।

প্রতি মানুষেরই নিজের ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা আছে। যদি কোনও দম্পতি বুঝতে পারে যে পরিবার ছোট রাখলে তাদের মঙ্গল তাহলেই তারা সন্তান সংখ্যা সীমিত করার উদ্যোগ নিজেরাই নেবে (তাদের সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখার সুযোগগুলি অবশ্যই নাগালের মধ্যে থাকা প্রয়োজন)।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি পারে দরিদ্র নারীর আয়ের সুযোগ করে দিতে এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে। ভীতি প্রদর্শনমূলক বর্তমান প্রচেষ্টার চাইতে এটাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিহত করার উৎকৃষ্ট উপায়।

৪০টি উন্নয়নশীল দেশে ইউ. এন. সমীক্ষায় দেখা গেছে নারী সমানাধিকার পেলেই জন্মহার হ্রাস পেতে থাকে। এর অসংখ্য কারণ আছে। শিক্ষা লাভ করলে বিয়ে হতে দেরি হয়, সন্তানও আসে দেরিতে। শিক্ষিত মহিলা জন্মনিরোধক উপায় অবলম্বন করতে বেশি আগ্রহী। সন্তান পালন ছাড়াও তাদের জীবনে অনেক সময় কাটাবার উপায় আছে—উপার্জন তার মধ্যে অন্যতম।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনায় গ্রামীণ ব্যাংকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। গ্রামীণ ব্যাংক পরিবারের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার বাংলাদেশের জাতীয় হারের দ্বিগুণ। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কায়রো জনসংখ্যা সম্মেলনে গ্রামীণ ব্যাংকের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু গ্রামীণ পরিবারের জন্মহার অন্যদের তুলনায় অনেক কম।

ক্ষুদ্র-ঋণ যদি পরিবার পরিকল্পনার সচেতনার উন্মেষে সাহায্য করে থাকে তাহলে সরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কেন ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প চালু করতে তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না? এর জন্য কি নিজ নিজ সংস্থার পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতাই দায়ী? তা হলে সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন?

জনসংখ্যা হ্রাসের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরও জরুরি নীতি নির্ধারণের উদ্যোগ থেকে আমাদের মনোযোগ বিচ্যুত করে, যেগুলি নীতি হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষ নিজেই এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হতে পারবে। যত তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের আশু কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারব এই পৃথিবী ততই বর্তমান ও ভবিষ্যতে বসবাসের জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠবে।

www.pathagar.com

৩১
দারিদ্র: অর্থনীতির এক উপেক্ষিত অধ্যায়

সারা বিশ্ব দারিদ্র দূরীকরণের শ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে একমত—তা হল আরও বেশি সংখ্যক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

অর্থনীতি কিন্তু শুধু এক ধরনের কর্মসংস্থানের কথাই চিন্তা করে—বেতনভুক জীবিকা। স্বকর্মসংস্থানের কোনও উল্লেখই অর্থনীতির বইয়ের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থনীতিবিদগণ আমাদের সবসময় এমনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে যাতে আমাদের বাল্যকাল ও যৌবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করি সম্ভাব্য চাকরিদাতাদের জন্য নিজেদের আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার কাজে। প্রস্তুতি শেষ করে আমরা চাকরির বাজারে নিজেদের হাজির করি চাকরিদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। উপযুক্ত চাকরিদাতার সন্ধান না মিললে তখনই শুরু হয় সত্যিকারের বিপর্যয়। প্রগতিশীল শিল্পোন্নত অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে বাস করলে বেকার ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত জনকল্যাণ ভাতাদানকারী সংস্থার দ্বারস্থ হয়। অনগ্রসর অর্থনৈতিক অবস্থায় তাদের ভাগ্যে জোটে দারিদ্র ও অসম্মানের জীবনযাপন।

তরুণ যুবক ও যুবতী কঠিন পরিশ্রম করছে শুধুমাত্র উচ্চপদে চাকরি লাভের অভিলাষে এই চিন্তাই আমার বিতৃষ্ণা জাগায়। তখনি আমার প্রাচীন কালের কথা স্মরণে আসে যখন মায়েরা মেয়েদের পদে পদে শিক্ষা দিতেন কীভাবে যুবাপুরুষের সামনে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। উদ্দেশ্য—উপযুক্ত স্বামী সন্ধান। আমি মনে করি মানবজীবন শুধুমাত্র চাকরিদাতা খুঁজে বেড়াবার ও সমগ্র অস্তিত্ব চাকরিতে বিকিয়ে দেবার চেয়ে বেশি মূল্যবান।

আসলে চাকুরি খোঁজার এই রীতি মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে একটি সাম্প্রতিক বিচ্যুতি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ জন্মের পর থেকেই চাকরিজীবী হবার জন্য আত্ম উৎসর্গ করতেন না। এরকম হলে তাঁরা কবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন। আমরাও কখনও নিজেদের জীবন পেতাম না। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক ছিলেন। তাঁরা নিজেরাই বিভিন্ন কাজ খুঁজে নিতেন—শিকার, ফলমূল সংগ্রহ ও পরে কৃষিকাজ। তাঁরা ছিলেন স্বনিযুক্ত, স্বনির্ভর মানুষ।

অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে স্বকর্মসংস্থানের কোনও অধ্যায় নেই। বাস্তব জীবনে সেটাই এখন গণ্ডগোলের মূল কথা। পাঠ্যপুস্তকে এই কথাটি অদৃশ্য বলে নীতি নির্ধারণের সময় কথাটির উপর কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও নীতি নির্ধারণ নিঃসন্দেহে বেকারত্ব ও দারিদ্র দূরীকরণের শ্রেষ্ঠ উপায়।

www.pathagar.com

* * *

আজ যে ধরনের পৃথিবীতে আমরা বাস করি তা সৃষ্টিতে অর্থনীতি শাস্ত্রের বিরাট অবদান রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান হিসেবে এর ব্যর্থতার অভিযোগ অনায়াসে আনা যায়। আবহমানকালের অর্থনীতির সুচারু তত্ত্বগুলি আমাদের চারদিক ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার ব্যাপারে সাহায্য করে। কিন্তু তত্ত্বগুলি এককথায় গরিবদের পরিত্যাগ করে এগিয়ে গেছে। এই শাস্ত্রে দারিদ্র বিমোচন বিষয়ে কোনও কাঠামো তৈরি করা হয়নি।

অর্থনীতি জাতীয় সম্পদের পরিমাণ তার বৃদ্ধির ও কারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে। অর্থনীতি সর্বদা এই একই নিশানায় অনুসন্ধান চালিয়ে যায়। কিন্তু একজন মানুষ গরিব হয় কেন, এই সহজ প্রশ্নটি এড়িয়ে যায়।

তথাকথিত উন্নয়ন অর্থনীতি দারিদ্রের প্রতি সামান্য মনোযোগ দিয়েছে। কিন্তু আসলে উন্নয়ন অর্থনীতি নবগঠিত সদ্য সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত অর্থনীতির তত্ত্বের পুনর্বিন্যাস মাত্র ।

ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থনীতির তত্ত্বগুলি সমাজের জন্য ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করেছে। অর্থনীতির 'ঋণ' বিষয়ে বিচার বিবেচনা তাকে সমাজবিজ্ঞান দাবি করার অযোগ্য করে দেয়।

আশ্চর্যের বিষয়, অর্থনীতি কখনওই ঋণের সামাজিক ক্ষমতা অনুধাবন করতে সমর্থ হয়নি। অর্থনীতির তত্ত্বে, ঋণ একটি নির্দোষ পিচ্ছিল আস্তরণ মাত্র যা ব্যবসা বাণিজ্যে ও শিল্পোদ্যোগের চাকায় তেল দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে। ঋণ সম্পদ ভোগ বা ব্যবহার করার অধিকার প্রদান করে। এই সত্যটির কারণে ঋণের ভূমিকা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল হতে পারে অর্থনীতি শাস্ত্র এই জরুরি বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ঋণ অর্থনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করে, অতএব ঋণ সামাজিক শক্তিরও বাহক। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে প্রতিষ্ঠান স্থির করে কাকে, কতটা, কখন, কী শর্তে ঋণ দেওয়া যাবে, কে ঋণের উপযুক্ত, কে নয়।

ঋণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক। যে প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ধারণ করে কাকে ঋণ দেওয়া হবে ও কাকে দেওয়া হবে না, কখন ঋণ প্রদান করা হবে, কে কতটা ঋণ পাবে এবং কী শর্তে, স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক পটভূমিকায় সেই প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব অসীম। এই সংস্থাগুলি ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা সমাজের এক বিরাট অংশকে পক্ষপাত অথবা প্রত্যাখ্যানের দ্বারা সফল অথবা ধ্বংস করবার ক্ষমতা রাখে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই ক্ষমতা অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে যাচ্ছে।

ঋণদানকারী সংস্থাগুলি সমাজের একাংশের মানুষকে ঋণের অধিকার প্রদান করে— আরেক অংশ পুরোপুরি অবহেলিত থাকে। যারা সাহায্য পায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে, যারা পায় না তারা দারিদ্রের অতলে নিমজ্জিত হয়। ঋণদানকারী সংস্থার বিশ্বাস, তাদের কারবার হবে শুধু ধনীদের সঙ্গে। দরিদ্র ঋণের উপযোগী নয় এই বক্তব্য বা ফতোয়া জারি করে তারা এক কথায় দরিদ্রদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেয়। কেউ এ বিষয়ে প্রতিবাদ করে না কারণ অর্থনীতি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সামাজিক বিচার বিবেচনায় আলোচিত হবার মতো যোগ্যতা ঋণের নাই।

যখন ব্যাংক গরিবদের ঋণের অনুপযুক্ত বলে একটা চরম ক্ষতিকর এবং অবিশ্বাস্য একটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিল তখন কেন অর্থনীতিবিদরা এটা নীরবে মেনে নিলেন এটা বোঝা বড় মুশকিল। কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে বলে মনে হয় না। তাঁদের এই নীরবতা ও

www.pathagar.com

উদাসীনতা অর্থায়ন সংস্থাগুলিকে এক ধরনের অর্থনৈতিক বর্ণবৈষম্য সবার সামনে উন্মুক্তভাবে চালু রেখেও পার পেয়ে যেতে সুযোগ করে দিয়েছে।

অর্থনীতি যদি প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা পালন করত তা হলে অর্থনীতিবিদগণ নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারতেন ঋণ কত শক্তিশালী আর্থসামজিক হাতিয়ার। ঋণকে মানবাধিকার হিসেবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তার কথা তখনই তাদের মনে উদয় হত। তা হলে মানুষের এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা যাবতীয় আয়োজন তাঁদের শাস্ত্রে করে দিতেন। ঋণ কীভাবে সামাজিক পরিকাঠামো বদলে দিতে সক্ষম বা ঋণ কীভাবে সমাজকে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির কবল থেকে রক্ষা করে—এই সত্যের সন্ধান, সমাজবিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদগণ পেতে পারতেন। অর্থনীতিকে সত্যিকারের সমাজবিজ্ঞান হিসেবে নতুন রূপদান করতে পারলে তবেই দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী তৈরির প্রতি আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় হবে। মূল তত্ত্বে গলদগুলি বরাবরই বিনা চ্যালেঞ্জে চলে এসেছে। বিভিন্ন দিক থেকে এই গলদগুলি তৈরি হয়েছে। প্রথমত, মাইক্রো-ইকনমিক তত্ত্ব যা অর্থনীতির বিশ্লেষণ পরিকাঠামোয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, আমার বিবেচনায় তা অসম্পূর্ণ। এই তত্ত্বের কনজিউমার তত্ত্ব অংশে মানুষকে ভোক্তা হিসেবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে আবার উৎপাদন তত্ত্বে তাকে শ্রমিক হিসেবে বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে। উৎপাদন তত্ত্ব শুরু হয় উৎপাদন অপেক্ষক দিয়ে অর্থাৎ কীভাবে নির্দিষ্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রম ও পুঁজি খাটিয়ে একজন উদ্যোক্তা বিভিন্ন পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে পারে।

এর উপর ভিত্তি করে "ফার্মের" তত্ত্বটি রচিত হয়েছে।

এই ধারণা স্বকর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে সমূলে বিনাশ করে দেয়। উদ্যোক্তাদের একদল বিশেষ ক্ষমতাবান বা প্রতিভাবান মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমগ্র ব্যবস্থায় অনুমান হয় যেন বাকি জনগণ তাদের অধীনস্থ দাস হবার উদ্দেশ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে। অর্থনীতিতে এটা সম্ভবত এক নির্দোষ সরলীকরণ হিসেবে চালু করা হয়েছিল। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান হিসেবে অর্থনীতি শাস্ত্রকে গড়ে তোলার পথে এটা বিরাট ক্ষতি করে ফেলল। এর ফলে যে কোনও একজন মানুষের "উদ্যোক্তা" হবার সুযোগটুকু হারিয়ে গেল। বাঁধা মাইনের চাকরিই হয়ে ওঠে জীবিকার একমাত্র উপয়। যে স্বকর্মসংস্থান হওয়ার কথা ছিল পরম গৌরবের সেটা হয়ে দাঁড়াল দুর্বল অর্থনীতির পরিচিতি ফলক।

আমার মতে, একটি শাস্ত্রকে সমাজবিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেবার আগে দেখা উচিত সে শাস্ত্র মানুষকে কীভাবে দেখে। যে শাস্ত্রে মানুষকে তার অসীম সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে উৎসাহিত করে না, বরং মানুষকে চিহ্নিত করে এমন একটি প্রাণী হিসেবে যে সীমিত ক্ষমতা নিয়ে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেয়, সে-শাস্ত্রকে সমাজবিজ্ঞান হবার মর্যাদা দেয়া উচিত নয়।

স্বকর্মসংস্থানের সম্ভাবনায় ভরপুর, সৃজনশীলতার অপার সুযোগসমৃদ্ধ জগতকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা পালনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বরং এই শাস্ত্র দিনে দিনে গড়ে উঠেছে বাণিজ্যিক বিজ্ঞান হিসেবে।

স্বকর্মসংস্থান বাদ দিয়ে অর্থনীতি সমাজের আরেকটি বিশেষ দিককেও ধরতে অক্ষম হয়েছে, তা হল পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের নিয়ে গঠিত পরিবার। বৃহত্তর ও ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে সম্পর্কের সামাজিক গুরুত্বকে পুরোপুরি অবহেলা করে অর্থনীতি কীভাবে নিজেকে সমাজবিজ্ঞান হিসেবে দাবি করে ফেলল তা ভাবলে আমার বিস্ময় জাগে।

স্বকর্মসংস্থানকে মাইক্রো ইকনমিক তত্ত্বের অন্তর্গত করে অর্থনীতিবিদগণ সহজেই দারিদ্র

www.pathagar.com

দূরীকরণ, উন্নয়ন, পরিবার, জনসংখ্যা, স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার ইত্যাদি সমস্যার মোকাবিলা করতে পারতেন। একই সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রেও শক্তিশালী তত্ত্ব গড়ে তুলতে পারতেন। যেমন ব্যাংকিং এবং সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে।

তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশে বিশাল সংখ্যক জনগণ স্বকর্মসংস্থানের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থনীতির বিশ্লেষণী পরিকাঠামোতে এই বাস্তবকে কীভাবে অন্তর্গত করবে তা ঠিক করতে না পেরে, অর্থনীতিবিদগণ তাকে 'অনানুষ্ঠানিক খাত' নাম দিয়ে মূল কাঠামোর বাইরে রেখে দেয়া সংগত মনে করেছেন। এই বাস্তবের মোকাবিলায় তাঁদের কোনও বিশ্লেষণী হাতিয়ার নেই বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন যে এরকম বাস্তবতা কাম্য নয়। তাঁরা অভিমত দিলেন, এই দেশগুলি যত তাড়াতাড়ি এই 'অনানুষ্ঠানিক খাত' বাদ দিতে পারবে তত তাড়াতাড়ি আসবে তাদের কল্যাণময় জীবন। কী অসম্ভব লজ্জার কথা।

সক্ষম ও শক্তিশালী নীতি নির্ধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীলতা ও শক্তিকে সমর্থন জানানোর পরিবর্তে আমরা মানুষকে আমাদের মনগড়া প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখতে চাইছি। এই তথাকথিত অনানুষ্ঠানিক খাত (Informal sector) সাধারণ মানুষের নিজেদের জীবন সংগ্রামের জন্য তৈরি করা জগৎ। কোনও নীতি নির্ধারক বা অর্থনীতিবিদ তাদের জন্য এটা তৈরি করে দেয়নি। এ হল নিজের জীবিকা নিজে খুঁজে নেবার জন্য মানুষের অদম্য প্রচেষ্টারই নিদর্শন।

যাঁরা মানুষকে বা বড় অর্থে গোটা সমাজকে সামান্যতমও বোঝেন, তাঁরা আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে আসতেন বাস্তবে যা আছে তাকে স্বাগত জানিয়ে তাকে কী করে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করা। বাস্তবকে ছোট করে না দেখে, তাচ্ছিল্য না করে, তার পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে মানুষের হাতে গড়া এমন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সৃষ্টিকে 'অনানুষ্ঠানিক খাত' নাম দিয়ে অর্থনীতিবিদরা জানিয়ে দিয়েছেন যে এই বাস্তবতায় তাঁরা সন্তুষ্ট নন।

আমাদের দুর্ভাগ্য।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পর্ব

নতুন দিগন্ত

১৯৯০-১৯৯৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রামীণ ব্যাংকের গণ্ডি পেরিয়ে

গ্রামীণ ব্যাংক মজবুত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; গরিব মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে; পৃথিবীর নানাদেশে এর অনুকরণ শুরু হয়েছে। আমরা ভাবলাম গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা ও দর্শনকে পুঁজি করে আরও কিছু উদ্যোগ নিই যেগুলি গরিব মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে।

আমরা উদ্যোগ নিতে চাইলাম বাণিজ্যনির্ভর পদ্ধতিতে এমন সব ক্ষেত্রে সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নে যেসব ক্ষেত্রে এখনও কোনও উদ্যোগ নেয়া হয়নি, কিংবা হলেও সেসব উদ্যোগ দানা বেঁধে ওঠেনি।

এমন ধরনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করাও খুব সহজসাধ্য নয়। 'গ্রামীণ ব্যাংকের' গণ্ডি পেরিয়ে আমরা সমস্যার সমাধান খুঁজেছি।

ব্যাংকিং সেবা ও লাভের সঙ্গে সম্পর্কহীন বহু ব্যাপারে বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের বাইরে আমাদের কাজের প্রসার ঘটানো হয়েছে। এগুলির প্রত্যেকটাই আমাদের জন্য বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে। প্রত্যেকটা অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে রোমাঞ্চকর মনে হয়েছে।

ঋণের দ্বারা ঋণগ্রহীতাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আমরা সচেষ্ট। নলকূপ খনন, স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও গৃহ নির্মাণ কর্মসূচিকে ঋণের আওতায় আনা হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকদের স্বাস্থ্য, অবসরজীবন, শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করবে এমন ক্ষেত্রে মুনাফাভিত্তিক, কিংবা মুনাফাবিহীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করছি যার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে গোটা সমাজেরই কাজে লাগবে।

গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি আমরা তার নাম দিয়েছি 'উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ'। এর মূল উদ্দেশ্য হল ঋণের অঙ্ক বৃদ্ধি করে গ্রাহকদের তৈরি মালের বাজার সংগঠিত করা এবং বৃহত্তর যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা।

নতুন উদ্যোগগুলির মাত্র কয়েকটির উল্লেখ আমি বর্তমান পর্বে করব। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে এবং গ্রামীণের প্রেক্ষাপটে তাদের ভূমিকা আরও সম্প্রসারিত হবে।

www.pathagar.com

৩২
গৃহনির্মাণ ঋণ
সাফল্যের এক কাহিনী

১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। ঘোষণা করেছিল, তারা গ্রামের মানুষের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের জন্য অর্থসাহায্য দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এই বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করে গ্রামীণ ব্যাংকের তরফ থেকে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে আবেদন জানাই যে আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প চালু করতে চাই। আমরা তাদের জানাই যে গ্রামীণের গ্রাহকদের আর্থিক স্বচ্ছতার সঙ্গে সংগতি রেখে অল্প পরিমাণ টাকা ঋণ দেব। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বড় অঙ্কের টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করার সাধ্য তাদের নেই। আমাদের গ্রাহকেরা ৭৫ হাজার টাকা ঋণ নিতে পারবেন না। খুব বেশি হলেও আমরা পরিবার পিছু ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ গৃহনির্মাণ খাতে দিতে পারব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন। তার বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টাগণের মতে ৫ হাজার টাকা দিয়ে যা তৈরি হবে তাকে আর যাই হোক 'গৃহ' আখ্যা দেওয়া যায় না। 'গৃহের' আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা পূরণ করতে তা সক্ষম হবে না। বিশেষত তাঁদের বিবেচনায় দেশের বাসগৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে এই ধরনের ঘরকে ধরা যাবে না।

আমি প্রতিবাদ জানালাম। দেশের গৃহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে অবদান রাখার ব্যাপারে আমাদের মাথাব্যথা নেই। সদস্যদের জন্য মাথার উপর অটুট ছাদ ও বৃষ্টির পানি থেকে বাঁচিয়ে শুকনা মেঝের ব্যবস্থা করে দিতে পারলেই আমরা কৃতার্থ বোধ করব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপদেষ্টাদের যুক্তি দিয়ে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। এই সামান্যতম সাধারণ বাসস্থানটুকু তাদের বর্তমান মাথা গোঁজার আশ্রয় থেকে অনেক উৎকৃষ্ট হবে। কিন্তু সব আলোচনা ব্যর্থ হল। আমাদের আবেদন নাকচ করে দেওয়া হল। আমাদের সব চেষ্টা হতাশায় পর্যবসিত হল।

তখন আমার মাথায় আরেকটি পরিকল্পনা এল। তক্ষুনি আমরা দ্বিতীয় দফায় আবেদন জানালাম এই মর্মে যে, গ্রামীণ ব্যাংক তার প্রথম আবেদন প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এখন আমরা নতুনভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের গৃহনির্মাণ ঋণ চাই না। আমাদের দরখাস্ত 'আশ্রয় ঋণ'-এর (shelter loan) আশায় পেশ করা হল। আমাদের আশা 'আশ্রয়'-এর কোনও সংজ্ঞা বা পরিসংখ্যান নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমন কোনও আগ্রহ থাকবে না, যার জোরে আমাদের দরখাস্ত নাকচ হয়ে যাবে।

হতদরিদ্র গৃহহীনদের জন্য আশ্রয় নির্মাণের ব্যাপারে প্রকল্পের বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর কোনও

www.pathagar.com

আপত্তি ছিল না। তাঁরা রাজি হবার প্রাথমিক ইঙ্গিত দিলেন।

এই সময় অর্থনীতিবিদগণ বললেন যে গ্রামীণ ব্যাংক উৎপাদন ও উপার্জন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। কিন্তু গৃহ বা আশ্রয়ের সঙ্গে উপার্জনের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা ভোগের সামগ্রীর তালিকার আওতায় পড়ে। আমাদের গ্রাহকদের এমন কোনও ঋণ নেয়া উচিত হবে না যেটা উৎপাদনশীল কাজে ব্যয়িত হবে না। এমন উপার্জন বৃদ্ধির কাজে লাগবে না। কারণ শুধু উপার্জন বৃদ্ধি হলেই তারা ঋণ শোধ করতে পারবেন। তাঁরা আশ্রয় ঋণের বিপক্ষে অনেক তাত্ত্বিক কথা আমায় জানালেন।

বিশেষজ্ঞদের এইসব যুক্তি খণ্ডনের জন্য আমরা আর একটি উপায় স্থির করলাম। অত সহজে পিছু হটতে বা হার স্বীকার করতে আমরা চাইনি। আমরা ক্রমাগত তাদের কাছে দাবি জানিয়ে যেতে লাগলাম। এবার বলা হল আমরা, গ্রাহকদের 'কারখানা প্রকল্প'-এ ঋণ দিতে ইচ্ছুক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টারা বিরক্ত হলেন। "গৃহহীন মানুষের কারখানার প্রয়োজন কীসের?"

আমরা এর কারণ ব্যাখ্যা করলাম। যেহেতু আমাদের অধিকাংশ গ্রাহকই মহিলা, তাঁরা যেখানে বাস করেন সেখানেই তাঁদের কর্মসংস্থান হয়। তাঁরা সন্তানপালনের সঙ্গে সঙ্গে রোজগারের জন্য কাজ করেন। সব কাজকর্মই ঘরে বসে বসে করতে হয়। যেহেতু ঘরই তাঁদের কাজের স্থান তাই আমরা একে কারখানা বলছি।

আমরা তাঁদের আরও বুঝিয়ে বললাম, বাংলাদেশে বছরে ৫ মাসই ভরা বর্ষা। এই সময় আমাদের সদস্যদের কাজ করার উপায় থাকে না। কারণ তাদের মাথার উপর শক্তপোক্ত ছাদ নেই। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ও নিশ্চিন্তে কাজ করে যাবার জন্য এবং উপার্জনের জন্য তাঁদের বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা একান্ত দরকার।

এটাই হল আমাদের কারখানা নির্মাণের জন্য ঋণ চাইবার কারণ। সত্যি অর্থে এই কারখানার উপযোগিতা দ্বিমুখী। এটা তাদের বাড়ির অভাবও পূরণ করবে। সারা বছর কিছুটা অন্তত স্বস্তির সঙ্গে কাজ করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার গুরুত্ব অসীম।

উপদেষ্টাগণ আবার আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

* * *

অবশেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে আমি দেখা করলাম। আমাদের আবেদনের পক্ষে তাঁর কর্তৃত্ব আরোপ করতে তাঁকে ব্যক্তিগত আর্জি জানালাম।

"আপনি নিশ্চিত যে ঋণ পরিশোধ হবে?"

"হ্যাঁ অবশ্যই। গরিব সর্বদাই ঋণ পরিশোধের জন্য উন্মুখ। ধনীদের মতো তারা এ ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। জীবনে পাওয়া এই একমাত্র সুযোগ হতে তারা বঞ্চিত হতে রাজি নয়।"

গভর্নর আমার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, "আমি খুব দুঃখিত। আমার কর্মকর্তারা আপনাকে অসুবিধায় ফেলার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।"

তারপর বললেন, "ঠিক আছে। পরীক্ষামুলকভাবে আমি গ্রামীণ ব্যাংক-কে একটা সুযোগ দিতে চাই।"

অতএব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সক্রিয় হস্তক্ষেপের ফলে আমরা অনেক লড়াইয়ের পর 'গৃহঋণ প্রকল্প' চালু করতে পেরেছি ১৯৮৪ সালে।

www.pathagar.com

* * *

এর পর কেটে গেছে তেরোটা বছর। আজ অবধি আমরা ১৫ কোটি ১০ লক্ষ ডলার ঋণ দিয়েছি গৃহনির্মাণ খাতে। সাড়ে চার লক্ষ বাড়ি তৈরি হয়েছে। সাপ্তাহিক ঋণ পরিশোধের কিস্তির হার প্রায় নিখুঁত (১০০ শতাংশ)। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কী হাল হল জানেন? মনে হচ্ছে আপনারাও তা সঠিক অনুমান করেছেন। মাত্র কয়েকজন ছাড়া কেউ ঋণ শোধ করেননি। ফলে তিন বছরের মধ্যে প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের গৃহনির্মাণ প্রকল্প আজও চালু আছে এবং তার সম্প্রসারণ ঘটেছে।

১৯৮৯ সালে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় স্থপতিবৃন্দ দ্বারা গঠিত মাননীয় বিচারকমণ্ডলী যখন গ্রামীণ ব্যাংকের 'গৃহনির্মাণ প্রকল্প'কে 'আগা খান আন্তর্জাতিক আর্কিটেকচার পুরস্কারের' জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, তখন ১৯৮৪ সালে আমাদের বক্তব্যের গুরুত্ব প্রমাণিত হল। কায়রোতে সেই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট স্থপতিরা আমাকে ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন মাত্র ৩০০ ডলারের বাড়ির নকশা বানাল কে? এত চমৎকার পরিকল্পনা কার? ততদিনে আমাদের গৃহনির্মাণ ঋণের পরিমাণ বেড়ে ১২ হাজার টাকা হয়েছে।

আমাদের গ্রাহকদের বাড়ি কিন্তু কোনও পেশাদার স্থপতি নকশা করেননি। নকশা গ্রাহকদের একান্ত নিজস্ব। তারাই ভালবাসা উজাড় করে নিজেদের বাড়ি তৈরি করেছে। তারাই তাদের বাসগৃহের স্থপতি, ঠিক যেমন করে তারা নিজেদের ভাগ্য গড়ার স্থপতি।

www.pathagar.com

৩৩
স্বাস্থ্য এবং অবসর

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে উন্নত দেশগুলি এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। উদ্দেশ্য সৎ হলেও ফল হয়েছে মারাত্মক। এটা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় ধনী দেশগুলির বৃদ্ধাবাসগুলি পরিদর্শন করলে। বৃদ্ধ মানুষদের আমাদের সমাদরে দেখাশোনা করা উচিত। এইসব বৃদ্ধাবাসে তাদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান সম্পূর্ণভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছে।

বৃদ্ধেরা কেন কেবল জড়পদার্থের মতো জীবনযাপন করবেন? কেন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায় বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের অপেক্ষা করে যেতে হবে?

যদিও বা অবসরভাতা, সরকারি সাহায্য, সন্তান ও নাতি নাতনিদের সাহায্যে তাদের খরচ দিব্যি চলে যায় তবু তাঁরা কেন নিষ্কর্মার মতো দিন কাটাবেন? শুধু অর্থ থাকলেই বাঁচা যায় না। বেঁচে থাকার জন্য আর্থিক সঙ্গতি দরকার—একথা সত্য, কিন্তু সঙ্গে মানসিক ও আন্তরিক পরিবেশও থাকা চাই। বাধ্যতামূলক অলস দিনযাপন শুধু নিষ্ঠুরতাই নয় তা মানবিকতারও অসম্মান, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। এই অবস্থা শুধু ভুক্তভোগীদের পক্ষেই অসহনীয় তা নয়, গোটা সমাজের কলঙ্ক।

নিজের পছন্দসই সৃজনশীল কাজ করার মানবিক মর্যাদা অর্জন, নিজেকে অপ্রয়োজনীয় ভাবার গ্লানি থেকে মুক্তি দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে অনেক বৃদ্ধেরই কাজের ব্যাপারে অক্ষমতা থাকতে পারে, তাঁরা বসে বসে টেলিভিশন দেখা ছাড়া আর কোনও কাজ করতে চাইবেন না। কিন্তু যাঁদের কর্মদক্ষতা আছে, আমার বক্তব্য তাঁদের নিয়ে। কাজের ক্ষমতা যতই কম হোক না কেন, সুযোগ পেলে তাঁরাও সক্রিয়ভাবে কাজের সঙ্গে জড়িত থেকে আনন্দ পেতে চান।

* * *

এঁদের ব্যাপারে গতানুগতিক পুঁজিবাদ হাত গুটিয়ে নিয়েছে, সামাজিক সচেতনতা চালিত বয়োজ্যেষ্ঠদের রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা সংস্থা এবং ঋণদান প্রকল্প, বৃদ্ধদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলবার ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে পারে।

বর্তমানে সাধারণ কর্মী ও উচ্চপদস্থ অবসর নিতে বাধ্য হচ্ছেন সেই বয়সে, যখন তাঁদের কর্মক্ষমতা তুঙ্গে, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। ষাট বা পঁয়ষট্টি বছর বয়সে যখন আপনার কোম্পানি বলে দিচ্ছে আপনার আর প্রয়োজন নাই তখনই স্বকর্মসংস্থানের উপযুক্ত সময়।

বয়স বাড়া মানেই যে মানসিক ও আন্তরিক অনুভূতি সব বিসর্জন দেওয়ার পালা শুরু করতে হবে এমন নয়। অপর পক্ষে বয়োজ্যেষ্ঠদের অন্য সবার মতো নিরবচ্ছিন্ন মানসিক

www.pathagar.com

অধিকার উপভোগ করা উচিত। যদি তাঁরা কোনও বৃদ্ধাবাসে বা বয়স্ক মানুষদের উপযোগী কেন্দ্রে বসবাস করেন, তাহলেও সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত, যে যতদিন তাঁদের ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা আছে ততদিন তাঁদের সৃজনশীল কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া আমাদের সবার অবশ্যকর্তব্য। আবহমানকালব্যাপী চিরন্তন সমাজব্যবস্থা আধুনিক সমাজের চেয়ে এ কথা অনেক ভাল করে বুঝতে পারে। আমেরিকার মূল অধিবাসীদের মধ্যে বয়স্কদের আমি দেখেছি চমৎকার কারুকার্যময় পর্দা বানাতে। আফ্রিকার গ্রামের বৃদ্ধদের চমৎকার বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতে দেখেছি। বাংলাদেশের প্রতি পরিবারে তো আমরা এটা দেখছিই।

বেঁচে থাকার উৎসাহের জন্য বয়স্ক মানুষদের কিছু কাজের মধ্যে থাকা একান্ত জরুরি। পাশ্চাত্য দেশগুলি এই সত্যকে অস্বীকার করে তাদের বয়োবৃদ্ধ জনগণকে দ্রুত ঠেলে দিচ্ছে মানসিক বিপর্যয়ের দিকে। এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে মানুষ চূড়ান্তভাবে হতাশ হয়ে পড়ে, বিষাদগ্রস্ত হয়। নিজেকে অপদার্থ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না।

* * *

'প্রবীণ'দের কার্যকরী সৃজনশীলতাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। এবার আমাদের দৃষ্টি ফেরাই গ্রাহকদের প্রতি। আমাদের কাছে গ্রাহকদের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা অটুট রাখা অত্যন্ত জরুরি। এর উপরই নির্ভর করে 'গ্রামীণ' প্রক্রিয়ায় ঋণদানের সাফল্য। গ্রাহক বা তাঁদের পরিবারের সদস্য যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন তখন অবশ্য তার প্রতিকার আলাদা।

গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকদের নিয়ে স্বাধীনভাবে সমীক্ষা করে দেখা গেছে, এদের ২৫ শতাংশ দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে আশানুরূপ উন্নতিসাধনে অক্ষম।

* * *

বিশ্বজুড়ে জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলির সংকট চলছে। আমেরিকার 'খোলা বাজার' থেকে শুরু করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির জাতীয়করণ নীতিতে কোথাও মানুষের সুরক্ষার সুবন্দোবস্ত নেই। বাংলাদেশ সরকার অগাধ অর্থব্যয় করলেও দরিদ্রদের স্বাস্থ্য সেবা খুবই হতাশাজনক। এর মুখ্য কারণ সরকারি ডাক্তারগণ তাঁদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তব্যে অবহেলা করে থাকেন।

বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসার বাস্তব অর্থ হল যে ভাল চিকিৎসার সুযোগ পেতে হলে মানুষকে যেতে হবে ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিকগুলিতে। ধনীদের পক্ষে তো বটেই, মধ্যবিত্তদের পক্ষেও তা তবুও সম্ভব। কিন্তু দরিদ্ররা সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থা ছাড়া নিরুপায়।

এমন উপায় করতে হবে যাতে মানুষ তার উপার্জনের দ্বারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে পারে।

যতদিন না পর্যন্ত গরিব মানুষ সেই পরিমাণ উপার্জনের ক্ষমতা অর্জন করে, ততদিন পর্যন্ত তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবন্দোবস্ত করতে হবে। বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে সমাজসেবামূলক কাজ বা কোনও সামাজিক মূল্য গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

* * *

গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি গ্রাহকদের উপার্জন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের খরচও বেড়ে যেতে থাকে। অপুষ্টি, দৈনন্দিন রোগবালাই, মা ও শিশুমৃত্যু ও অন্যান্য স্বাস্থ্যঘটিত নানা বিপর্যয় সামাল দেবার জন্য তাদের দৈনন্দিন ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায়। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে অসংগতি থাকার ফলে, প্রকৃত হিসেবে তাদের উপার্জন হ্রাস পেতে থাকে। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির জন্য আমাদের গ্রাহকগণ ওঝা বা অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন। একজন মানুষ এক গ্লাস পানিতে ফুঁ দিয়ে মন্ত্র পড়ে দিল অমনি সেটা হয়ে গেল সর্বরোগহর মন্ত্রপূত পবিত্র পানি। উপায়ান্তর না থাকায় তাই বিশ্বাস করে মানুষ অলৌকিক চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে।

অবৈজ্ঞানিক অলৌকিক চিকিৎকদের দুয়ারে ভুক্তভোগী গ্রাহকেরা প্রায়শই অর্থ দণ্ড দেয়। সেই সমপরিমাণ টাকা গ্রামীণ ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত স্বাস্থ্যপ্রকল্পগুলিতে যদি তারা জমা রাখে তো সবরকম আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ফলদায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এই কাজ ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিটি সদস্য এবং গ্রামীণের অন্তর্ভুক্ত নন এমন গ্রামবাসীদের কাছে স্বাস্থ্যরক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি, যে ব্যবস্থায় তারা ব্যয়ভার বহন করবার জন্য নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করবে। গ্রাহকদের পরিবারপিছু বছরে দেড়শো টাকা করে স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের কিস্তি হিসেবে দিতে হয়। (গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য নন যাঁরা তাঁদের ক্ষেত্রে কিস্তির পরিমাণ বেশি, পুরো পরিবারের স্বাস্থ্যখাতে তিনশো টাকা বছরে নেওয়া হয় তাঁদের কাছ থেকে)। তা হলে ডাক্তারের কাছে তাঁরা নামমাত্র পারিশ্রমিকে, দেখানোর সুযোগ পাবেন। ঔষধ ও রোগ নির্ণয় সহায়তাকারী প্যাথোলজিকাল পরীক্ষা ও ওষুধের উপর বিশেষ ছাড়ের সুযোগ আছে।

প্রথম তিন বছর এই প্রকল্প চালু হবার পর, আমরা যাবতীয় খরচের ৬০ শতাংশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। আশা যে আগামী তিন বছরে এই উদ্ধারের হার হয়ে উঠবে ৯০ শতাংশ। এর জন্য জনগণকে আমাদের কাছ থেকে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে হবে, তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে। তার পরের চার বছরের মধ্যে বিনিয়োগের ১০০ শতাংশ পরিশোধ হয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

দারিদ্র দূরীকরণে সামাজিক পরিকাঠামোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সফল সামাজিক পরিকাঠামো নিজে থেকে সম্পদ সৃষ্টি করে না। তা দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রামের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

* * *

ভগ্নস্বাস্থ্য, জীবনের অনেক উজ্জ্বল সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট করে। স্বাস্থ্যের প্রতি তাই আমাদের সবিশেষ মনোযোগ।

১৯৮৯ সালে টেলিভিশনে মর্লি শেফারের 'সিক্সটি মিনিটস' অনুষ্ঠানে আমাদের এক গ্রাহিকা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছিল। পথের ভিক্ষুকের অবস্থা থেকে স্বীয় উত্তরণের জন্য গ্রামীণের ঋণের প্রতি তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন। এখন তিনি এক খণ্ড বড় জমি, আধুনিক পয়োপ্রণালীর ব্যবস্থাসহ নতুন বাড়ি, ৭টি গোরুর মালিক। স্বামী একটি অটো রিকশা চালান। তার বাচ্চারা সবাই স্কুলে যায় (এটা দারিদ্রের চক্র থেকে মুক্তির

www.pathagar.com

এক বিশাল পদক্ষেপ। হতদরিদ্র পরিবারের সন্তানদের বাড়ির যাবতীয় কাজে সাহায্য করতে হয়। নিয়মিত স্কুল যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব করে তোলা হয়েছে এইভাবে)।

মর্লি শেফার তাকে 'মানবিক সাফল্য ও পরিতুষ্টি'র প্রতীক বলে চিহ্নিত করেছিলেন। অথচ ১৯৯৬ সালে আমি যখন আবার সেই দম্পতির সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন তাদের চিনতেই পারছিলাম না। স্বামীটি পেটের কী এক কঠিন রোগে ভুগছে। ঠিকমতো রোগ নির্ণয় হচ্ছে না।

চিকিৎসার জন্য তারা ট্যাক্সি, জমি, গাই সব বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে। মহিলাটিকে খুব দুর্বল ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। নতুন করে ঋণ নেবার উদ্যমটুকুও তার অবশিষ্ট নেই। সে সময় তাদের সম্বল শুধু চারটি মুরগি।

আমাকে এর আগে কখনও এরকম দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী হতে হয়নি। তাদের সামনে ভবিষ্যতের সব আশা নিঃশেষ হয়ে গেছে। অলৌকিক কিছু ঘটবে আর তারা উদ্ধার পাবে—এই অপেক্ষায় যেন তারা হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছে। অথবা তাদের সামনে খোলা আছে আর একটি পথ—তা হল অবধারিত মৃত্যু।

আমার এই কাহিনী বিবৃত করার উদ্দেশ্য হল বোঝানো যে, আমাদের সামনের পথ এখনও কতখানি বন্ধুর, বিপদসংকুল। 'গ্রামীণ' শুধু একগুচ্ছ সাফল্যের কাহিনীই নয়। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যর্থতা আছে। এই ব্যর্থতাগুলি চিহ্নিতকরণ, তার সঠিক অনুসন্ধান ও বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করে দারিদ্র দূরীকরণের সংগ্রামে আমাদের সাফল্য লাভের ক্ষমতা। ভবিষ্যতে এ ধরনের ব্যর্থতা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রভূত সতর্কতার প্রয়োজন।

* * *

সমাজের সব সমস্যার সমাধান ক্ষুদ্র-ঋণের করায়ত্ত নয়। নিজেকে 'সর্বরোগহর' বলে ক্ষুদ্র-ঋণ কখনও বিভ্রান্তিকর প্রচার চালায়নি। সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা আমাদের স্বাস্থ্যপ্রকল্প চালু করতে চাই।

এটা শুধু বাংলাদেশের একার সংকট নয়। টোগোতে গ্রামীণ কর্মসূচির একজন পরিচালক আবু টল বলেছিলেন, আমরা শুধু পানির ঢল ঠেকানো বাঁধে একটি আঙুল রাখতে সক্ষম হয়েছি। অপুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সংক্রান্ত এত বহুবিধ সমস্যা রয়েছে যে, আমাদের উপর এইসব ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা বর্তাচ্ছে। এটা খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি। ক্ষুদ্র-ঋণদাতা ব্যাংক সবকিছুর সমাধান করতে পারে না। আমাদের উচিত সেইসব বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে একযোগে শলাপরামর্শ করে কাজ করা, যাঁরা সমাজের অন্যান্য সংকট সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় অবহিত আছেন।

গ্রামীণ কেন স্বাস্থ্য, অবসর, পেনশন, শিক্ষা ও দরিদ্রদের জীবনের নানা সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়াবে? কারণ অন্য কেউ বাণিজ্যনির্ভর পদ্ধতিতে সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য সচেষ্ট হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি উদ্ভাবনী উদ্যম প্রয়োজন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখন অবধি তেমনভাবে কেউ বা কোনও সংস্থা এগিয়ে আসছে না।

www.pathagar.com

৩৪
গ্রামীণ চেক—ফ্যাশানের দুনিয়ায় তাঁতিদের প্রত্যাবর্তন

বাংলাদেশে তাঁতে বুনে মিহি কাপড় বানানোর বহু প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। যুগ যুগ ধরে ইউরোপের বিভিন্ন রাজসভায় তা সমাদৃত হয়ে এসেছে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহ্যপূর্ণ হস্তশিল্প যুক্তরাজ্য ও অন্যত্র মেশিনে উৎপাদিত কাপড়ের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়।

মেশিনের তৈরি কাপড়ের বাজার তৈরির উদ্দেশ্যে আমাদের ঔপনিবেশিক শাসকগণ সর্বপ্রকার প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ করতে উদ্যোগী হলেন। আইন করে তাঁতিদের তাঁত বোনা বন্ধ করার ফরমান জারি হল। নিজেদের তৈরি মাল বাজারে চালু রাখার উদ্দেশ্যে তাঁরা অন্য সব উপায় নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট হলেন। যেসব তাঁতিরা ঔপনিবেশিক সরকারের আদেশ অমান্য করল তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হল। তাদের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলার হুকুম হল।

১৯৩০ সালে যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হল, তাদের একটি আন্দোলনের বিষয় ছিল ব্রিটিশ কাপড় বর্জন ও দেশের চরকায় কাটা সুতোয় বানানো কাপড়ের ব্যবহার। ক্ষমতার অন্যায় প্রয়োগ করে বিদেশি শাসকবর্গ দেশীয় অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করছিল।

ক্ষমতাবান বিদেশি শাসনের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও, দেশীয় তাঁতিরা অর্থনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তাদের শিল্প নৈপুণ্যের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০ লক্ষের উপর তাঁতি, তাঁদের বোনা কাপড় বিক্রির জন্য উপযুক্ত বাজারের সন্ধান করে চলেছে।

তাঁতিরা বহু শতাব্দী ধরে ধারাবাহিকভাবে দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত। তারা চমৎকার কাপড় বুনে অনন্যসাধারণ শাড়ি তৈরি করে। অথচ তাদের পরিবারের মহিলাদের সেসব শাড়ি পরার সৌভাগ্য কোনওদিনই হয় না। বাচ্চাদের পরনে জামা জোটে না।

গ্রামীণের ঋণগ্রহীতারা অনেকেই ছিলেন তাঁতি পরিবারের। বছরের একটা বিশেষ মাসে তাঁতিদের কাজের চাহিদা প্রায় থাকত না বললেই চলে। তাঁতিদের গ্রামে তখন ঋণ পরিশোধের সমস্যা দেখা দিত। এই মাসটা পড়ে দুই শস্যফলনের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের হাতে তখন কোনও ক্রয়ক্ষমতা থাকত না।

খালেদ শামস সর্বদা তাঁতি পরিবারের কিস্তি শোধের সংকট নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতেন। আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত তাঁতশিল্প নিয়ে তাঁর গর্বের শেষ ছিল না। তিনি চাইতেন

www.pathagar.com

এই শিল্প সঞ্জীবিত থাকুক। আমাদের দেশীয় অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করুক।

১৯৯০ সালের শেষ দিকে খালেদ শামস গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি একজন সফল ও প্রশংসিত সরকারি কর্মকর্তা, তিনি ছুটি নিয়ে মালয়েশিয়ায় কিছুদিন চাকরি করেন। ছুটি শেষে আবার দেশে সরকারি চাকরিতে প্রত্যাবর্তন করার কোনও ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। কুয়ালালামপুরে তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তিনি তখন আন্তঃ সরকারি উন্নয়ন সংস্থা, 'এশিয়া প্যাসিফিক ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে' কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশে ফিরে কী কাজে নিজেকে নিযুক্ত করলে ভাল হয় এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তাঁকে গ্রামীণ ব্যাংকে যোগদানের প্রস্তাব দিলাম। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন।

ফিরে এসে তিনি কথা রেখেছিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব, শুভানুধ্যায়ীরা সবাই অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাঁরা ভাবলেন মানুষটার মাথায় নিশ্চিত গোলমাল দেখা দিয়েছে। সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পদ বাংলাদেশে খুবই সম্মানীয়। পদমর্যাদা গুণে কর্মকর্তার অশেষ ক্ষমতা। এই চাকরির সবচেয়ে উচ্চশিখরে (অর্থাৎ কোনও মন্ত্রণালয়ের সচিব) ওঠার সম্ভাবনা হেলায় নস্যাৎ করে কী আশায় তিনি এমন লোভনীয় পদ থেকে ইস্তফা দিলেন।

খালেদ গ্রামীণ ব্যাংকে বহু পরিবর্তন আনলেন। এর কর্মপদ্ধতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করলেন। তাঁর জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে সরকার ও তার আমলাদের সম্পর্ক একেবারে বদলে গেল। আমরা পরস্পরের কাছাকাছি এলাম। বোঝাপড়ার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল।

খালেদ এমনই একজন মানুষ যাঁর কোনও শত্রু থাকা সম্ভব নয়। তাঁর মতামত এবং প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত দৃঢ় ও স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও তিনি সবার ভালবাসার পাত্র, একান্ত শ্রদ্ধেয় ও স্নেহভাজন।

* * *

তাঁতিদের সমস্যা সম্যক উপলব্ধি করার জন্য খালেদ তাদের সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করলেন। তাদের দৈনিক সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। এর জন্য তিনি এক সপ্তাহ ছুটি নিলেন। গ্রামীণ ব্যাংকের যে শাখায় তাঁতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই অঞ্চল বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তাদের সঙ্গে দিন কাটিয়ে, তাদের সমস্যার উৎসসন্ধানে পুরোপুরি নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

এর পর খালেদ আমাদের জানালেন, প্রথম সমস্যা হল তাঁতিরা উপযুক্ত দামে সুতো কিনতে পারছে না। এই সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। মন্ত্রীর দপ্তরে আবেদন জানিয়ে সরাসরি কারখানা থেকে সুতো কেনার অনুমোদন মিলল। কিন্তু কারখানা থেকে সেই সুতো সংগ্রহ হয়ে উঠল সত্যিকারের এক পর্ব। বাংলাদেশে সুতোর বাজারে কী দুর্নীতি চলছে সেই নির্লজ্জ সত্য আমাদের গোচরে এল। কীভাবে বস্ত্র বিভাগের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা ও জনাকয়েক পাইকার সুতোর দাম ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। খুব কাছে থেকে এই অনাচার দেখবার সুযোগ ঘটল আমাদের।

খালেদ আবিষ্কার করলেন যে বাংলাদেশ পোশাক বানাবার জন্য ভারত থেকে 'মাদ্রাজ চেক' নামক তাঁতের কাপড় আমদানি করছে। সে এক চরম হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা। অনেক তদন্তের পর জানা গেল আমদানির খরচ বছরে ১৫ কোটি ডলার। আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। যখন দেশীয় তাঁতিদের কাপড়ের আঞ্চলিক বাজার তৈরির জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তখন ১৫ কোটি ডলার খরচ করছি প্রতিবেশী ভারত থেকে তাঁতের কাপড় আমদানির জন্য।

www.pathagar.com

অনেকে বলল ভারতে তৈরি কাপড়ের মান অতি উৎকৃষ্ট। আমাদের তাঁতিদের বুনন তার ধারেকাছে যেতে পারবে না। এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করার দন্য খালেদ কাপড়ের নমুনা জোগাড় করতে উদ্যোগী হলেন।

নমুনা সংগ্রহ হয়ে উঠল এক বিরাট ব্যাপার। খালেদের কথায় কেউ কান দিতেই চায় না। খালেদও নাছোড়বান্দা। কাপড়ের নমুনা সংগ্রহ করে তবে ছাড়লেন। আমরা সবাই তা দেখলাম। আহামরি কিছু নয় সে কাপড়। আমাদের তাঁতিরা নিশ্চয়ই এরকম কাপড় বুনতে পারবে।

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি গ্রাম লুঙ্গির জন্য প্রসিদ্ধ। খালেদকে অনুরোধ করলাম সেখান থেকে কিছু নমুনা জোগাড় করতে।

নমুনা এসে গেল। আমরা তো সবাই আনন্দে আত্মহারা। এত চমৎকার বুনন। আমাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না।

তবু আমরা কাপড়ের মান নিজেরা সম্পূর্ণ বিচার না করে, ক্রেতাদের পেশাদারি মতামতের উপর ছেড়ে দিলাম। নিজেদের বোনা তাঁতের কাপড়ের নমুনা বহু পোশাকের কারখানায় ও দোকানে পাঠালাম। সবাই একবাক্যে বলল ভারত থেকে আমদানি করা কাপড়ের চেয়ে আমাদের বুনন ঢের বেশি ভাল।

অথচ আমাদের এই কাপড় কেনার জন্য ক্রেতাদের আগ্রহ কই? অনুসন্ধান করাতে লাগলাম। একটা ব্যাখ্যা আমাদের কর্ণগোচর হল। তাঁতিদের দরজায় দরজায় ঘুরে হাজার হাজার গজ কাপড় কেনা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা ভারতের তৈরি মাল সরবরাহকারীদের কাছে বিশাল অর্ডার দেয়—ঠিক সময়ে চাহিদা অনুযায়ী মাল তারা রপ্তানি করে।

দেশি তাঁতে বোনা কাপড় কিনে পোশাকের কারখানায় সরাসরি সরবরাহের জন্য খালেদ বেসরকারি উদ্যোগ সংগঠিত করতে চাইলেন। আগ্রহী কাউকে পাওয়া গেল না।

আমরা বিবেচনা করে স্থির করলাম কেউ যদি উৎসাহী না হয় তো আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নেব। আমরা এমন এক প্রতিষ্ঠান গঠন করব যেটা আড়তদার, অনুমোদিত প্রতিনিধি ও সরবরাহকারীর ভূমিকা পালন করবে। তারা রপ্তানিকারকদের কাছ থেকে অর্ডার সংগ্রহ করবে। কাপড়ের গুণগত মান ও সরবরাহের তারিখ সঠিক রাখার দায়িত্ব তাদের।

১৯৯৩ সালে আমরা এই উদ্দেশ্যে একটি লাভের উদ্দেশ্যহীন সংস্থার উদ্বোধন করলাম। নাম দেওয়া হল 'গ্রামীণ উদ্যোগ'। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হল প্রথাগত তাঁতিদের সঙ্গে রপ্তানিকেন্দ্রিক পোশাক কারখানার যোগাযোগ স্থাপন। তাঁতিরা আমাদের পছন্দমতো কাপড় বুনে দিল। বুননের উৎকৃষ্টতায় আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। রপ্তানি বাজারের জন্য কাজ করছে এটা তাঁতিদের পক্ষে হয়ে উঠল পরম গর্বের বিষয়। এই কাপড়ের নাম দেওয়া হল 'গ্রামীণ চেক'।

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের পথ একেবারেই সুগম নয়। বস্ত্র ব্যবসার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই বললেই হয়। খালেদ প্রাণপাত পরিশ্রম করে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন। এক কনসালটেন্ট ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করে খালেদ অতি দ্রুত বস্ত্র ব্যবসা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার জেনে ফেললেন। ধীরে ধীরে বিপণন চালু হল। প্রথম বছরে আমাদের মোট বিক্রি হল ২৫ লক্ষ ডলার। তিন বছরে তা বেড়ে দাঁড়াল ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার বছরে। বিক্রির হার হয়ে উঠল ক্রমবর্ধমান।

গ্রামীণ চেকের গুণগত মানের জন্য ভাল বাজার পাওয়া যাবে এটাই আমাদের ধারণা। ১০০ কাউন্টের সুতোয় হাতে বোনা কাপড়। পোশাকের জন্য তা খুবই আকর্ষণীয়। ১৯৯৬

www.pathagar.com

সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিসে ইউনেস্কোর সৌজন্যে গ্রামীণের ডিজাইন করা পোশাকের এক ফ্যাশন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। পোশাক ডিজাইন করলেন, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনা করলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত ডিজাইনার ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মডেলকন্যা বিবি রাসেল। এই কাজে তিনি খুবই সুদক্ষ ও সুনামের অধিকারী। প্যারিসের ফ্যাশন ব্যক্তিত্ব, পত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যম সঙ্গে সঙ্গে ডিজাইনগুলি সমাদরে গ্রহণ করল। ফ্যাশন জগতের শীর্ষস্থান প্যারিসে 'গ্রামীণ চেক' অভাবনীয় মর্যাদা লাভ করল।

বর্তমানে আট হাজার জন তাঁতি 'গ্রামীণ চেক' তৈরির কাজে নিযুক্ত আছে। আমরা এখন ইতালি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও জার্মানিতে 'গ্রামীণ চেক' বিক্রি করছি। আমেরিকান বাজারে চাহিদা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। দেশের তাবৎ বেকার তাঁতিকে কাজে লাগানো গেলে উৎপাদনের হার প্রতি সপ্তাহে ১০ লক্ষ মিটার পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। ইউরোপ ও আমেরিকার ক্রেতারা গ্রামীণ চেক ব্যবহারে আগ্রহী হন তবে আমাদের সুদক্ষ ও সুনিপুণ তাঁতিরা খুশি মনে উৎপাদন বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত হবে।

গ্রামীণ চেক প্রথম বাজারে চালু করার সময় ক্রেতারা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন ফ্লানেল কাপড়ে চেক তৈরি করা সম্ভব কিনা। ফ্লানেল সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞানই তখনও পর্যন্ত ছিল না। ক্রেতারাই হয়ে উঠল আমাদের শিক্ষক ও উপদেষ্টা। আমরা ফ্লানেল তৈরি করতে উদ্যোগী হলাম। ঢাকায় যে রেজিং মেশিন পাওয়া যেত তা খুবই নিম্নমানের। আমাদের চাই ভাল জাতের ঠাস বুননের ফ্লানেল। 'গ্রামীণ চেক'কে 'গ্রামীণ ফ্লানেলে' রূপান্তরিত করতে হলে আমাদের দরকার নিজস্ব উচ্চমানের মেশিন।

আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডা. জাফরুল্লা চৌধুরী স্বাস্থ্য বিষয়ক এন. জি. ও. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার। তাঁদের একটি ওষুধ তৈরির কারখানা আছে। আধুনিক বস্ত্র কারখানা নির্মাণের উদ্দেশ্যে আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে পরামর্শে বসলাম। ডা. জাফরুল্লার সংস্থা ইতিমধ্যেই একটি বস্ত্র কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কারখানার জন্য তাঁদের জমি পর্যন্ত কেনা হয়ে গেছে। তাই আমাদের বস্ত্র কারখানা চালু করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। উদ্যোগের নাম হল 'গণস্বাস্থ্য গ্রামীণ বস্ত্র কারখানা লিমিটেড'। এখানে উৎপাদন শুরু হল ১৯৯৮ সাল থেকে।

নানা ধরনের কাপড় উৎপাদন করতে সক্ষম বলে, বাজারে আমাদের বস্ত্রের চাহিদা বাড়বে, এই ছিল আমাদের আশা। তার সঙ্গেই আমাদের তাঁতিদের সাফল্য জড়িত। তবেই আমাদের নিজস্ব অসাধারণ শাশ্বত শিল্পকেও আমরা পুনরুজ্জীবিত করতে পারব। তাকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করে আরও শক্তিশালী করতে পারব, এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ।

এটা গ্রামীণের তৈরি কোনও রূপকথার গল্প নয়। আমরা তৈরি মালের যথাযথ প্রচার করছি, প্রয়োজনমতো অর্ডার নিচ্ছি—এক কথায় স্বনির্ভর দেশজ তাঁতিদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছি। চাহিদা অনুযায়ী কতটা পরিমাণ কাপড় বুনতে হবে সে কথা আমরা জানিয়ে দিচ্ছি তাঁতিদের। খুব ভাল জাতের সুতোর জোগান দিচ্ছি, যাতে পুঁজির অভাবে তাদের কাঁচামালের অভাবের মুখোমুখি না হতে হয়। নিশ্চিন্ত মনে তারা কাজ করে যেতে পারে। উৎপাদন শেষ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা পেলে তারা উৎকৃষ্ট মাল উৎপন্ন করতে পারে। অর্থাৎ কাঁচামালের সংগ্রহ বা তৈরি মালের বিক্রির ব্যাপারে তাদের অযথা দুশ্চিন্তা করতে হয় না। ২০ বছর আগে তেভাগা পরীক্ষামূলক তেভাগা খামার পরিচালনায় সময় আমি দেখেছি চাষিদের কাছে এইসব ব্যবস্থা কতখানি দুশ্চিন্তার হয়।

www.pathagar.com

* * *

গ্রামীণ চেকের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার খুঁজে বেড়াবার সময় আমরা দেশীয় বাজার থেকে আশাতীত সাড়া পেলাম। হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম গ্রামীণ চেকের নাম লোকের ঘরে ঘরে, মুখে মুখে ফিরছে। প্রতিটি কিশোর, কিশোরী, তরুণ, তরুণী গ্রামীণ চেকের পোশাক পরতে উৎসুক হয়ে উঠল। গ্রামীণ চেকের পোশাক হয়ে উঠল আভিজাত্যের, গর্বের বিষয়। শুধু তাই নয়, গ্রামীণ চেকের ব্যবহার সামাজিক দায়বদ্ধতা, দেশের হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজে সহযোগিতা সূচিত করল। আমাদের তাঁতি সম্প্রদায় দেশের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাঁদের জন্য আমাদের গর্বের শেষ নেই।

দেশীয় বাজারের চাহিদা সঠিক ও তৎপরভাবে মেটানোর জন্য আমাদের আর একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হল। নাম দেওয়া হল 'গ্রামীণ সামগ্রী'। এই সংস্থা গ্রামীণ চেক ছাড়াও অন্যান্য ধরনের বস্ত্র ও বাংলাদেশি কুটিরশিল্পের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে সচেষ্ট আছে। পাটের সঙ্গে তুলার সুতো মিশিয়ে এক ধরনের বস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। পাট স্বাভাবিক তন্তু—বাংলাদেশে এর প্রচুর ফলন। এখন থলে বানানোর জন্য বহুল পরিমাণে কৃত্রিম তন্তু ব্যবহার হয় বলে পাটের কদর কমে যাচ্ছে। পাটশিল্পের ব্যবহার আমরা নতুন করে প্রচলন করতে চাই, জনপ্রিয় পোশাকের কাপড় উৎপাদনে পাটকে কাজে লাগাতে চাই।

www.pathagar.com

৩৫
গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন

১৯৮৫ সালে মৎস্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছ থেকে আমি ফোন পেলাম, "ড. ইউনূস, আমাদের এখনও মুখোমুখি পরিচয় হয়নি। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি আপনার কাজের মধ্যে দিয়ে। আপনার সঙ্গে আমরা একটি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আপনি কি কখনও সিরাজগঞ্জ গেছেন?"

"হ্যাঁ গেছি, কিন্তু মাত্র কয়েকটা জায়গায়। বর্তমানে বগুড়ায় আমাদের কাজের প্রসার চলছে।"

"নিমগাছিতে মৎস্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পটি আপনাকে একবার পরিদর্শন করতে হবে। ওখানে আমাদের প্রায় হাজারটা বড় দিঘি আছে। সেগুলি খনন করা হয়েছিল পাল রাজাদের আমলে, আজ থেকে এক হাজার বছর আগে—জনগণের পানীয় জল ও রাজার গবাদি পশুদের পানি খাওয়াবার উদ্দেশ্যে। সেই মজে বুজে যাওয়া দিঘি আবার কাটিয়ে আমরা সেখানে মৎস্য চাষ করতে চাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সেই প্রকল্পের কী অবস্থা এখন?"

"সেটাই তো দুঃখের কথা, সেই জন্যই আপনাকে যোগাযোগ করা। সম্প্রতি আমি সে স্থান পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানকার দুর্নীতি, অব্যবস্থা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। ব্রিটিশ বৈদেশিক সাহায্য মন্ত্রণালয় ও. ডি. এ. আমাদের এই প্রকল্প চালু রাখার ব্যাপারে অনুদান দিতে রাজি হচ্ছে না। এখন আপনার কাছে আমার একটি আন্তরিক অনুরোধ আছে।"

"বলুন।"

"আমার অনুরোধ আপনি এই প্রকল্পের ভার নিন। আপনিই এটা চালান। এ ব্যাপারে যা করা উচিত মনে করেন, করুন। আমরা কোনওরকম হস্তক্ষেপ করব না।"

"এত দিঘি নিয়ে আমি কী করব?"

"দয়া করে আমার অনুরোধ ঠেলবেন না। অন্তত প্রকল্পের জায়গাটি একবার ঘুরে দেখে আসুন। দিঘিগুলো দেশের অতুলনীয় সম্পদ।

"আমরা ব্যাংক চালাই, মৎস্য চাষ সম্বন্ধে কিছু আমাদের জানা নেই।"

"হ্যাঁ, এ কথা আমার অজানা নয়। যদি আপনার দ্বারা মৎস্য প্রকল্প শুরু করা সম্ভব না হয়, অন্তত সেগুলির নিরাপদ সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করুন। যা দেখছি সরকারের অধীনে থাকলে দিঘিগুলোর আর কিছুই অবশিষ্ট রইবে না। আমাদের কর্মকর্তাদের কাছে দিঘি ও দিঘির পার সংলগ্ন অঞ্চল, তাদের উপরি আয়ের জন্য অত্যন্ত লোভনীয় এলাকা। তাদের লোভের আগুনে সবকিছু ছাই হয়ে যাবে। আপনি ভার নিলে অন্তত এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে

www.pathagar.com

যাবার হাত থেকে উদ্ধার পাবে।"

বুঝলাম এমুহূর্তে সচিব মহোদয় খুবই খারাপ মেজাজে আছেন। কতখানি বীতশ্রদ্ধ হলে সচিব স্বয়ং নিজের মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দুর্নীতির জন্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে আক্ষেপ করতে পারেন তা আমার বুঝতে দেরি হল না। রক্ষক যখন ভক্ষক হয়ে ওঠে তখন সেই মারাত্মক পরিস্থিতির কবল থেকে দেশের অমূল্য সম্পদ রক্ষা করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। যে ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই সে ব্যাপারে জড়িত হওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁকে সে কথা জানালাম।

তিনি খুবই নিরাশ হলেন। "অন্তত এ ব্যাপারে ভাবুন" বলে ফোন রেখে দেবার আগে আবার বললেন, "চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে না। প্রকল্পের অঞ্চলটি একবার পরিদর্শন না করে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন না।"

তাঁর এত অনুরোধ, আবেদন সত্ত্বেও তাঁর প্রস্তাবে রাজি হবার কোনও ইচ্ছে আমার শুরুতে ছিল না। তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতে রাজি হলাম। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে প্রসঙ্গটি আলোচনা করলাম। স্থির হল সরকার যদি সত্যিই এর অধিকার আমাদের অর্পণ করতে চায় তো তা আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

এক সপ্তাহ পরে আবার সচিবের ফোন পেলাম। আমি কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের নড়চড় করলাম না। তাঁকে বললাম, "দুঃখিত। আমার জবাব এখনও নেতিবাচক।"

তিনি বললেন, "আর একটি কারণে আপনাকে ফোন করছি। আমি মৎস্য মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্য একটি বৈঠক ডেকেছি। আমি আপনাকে সে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের নীতি নির্ধারণে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা চাই।"

"আমি উপস্থিত থাকলে আপনি আবার নিমগাছি প্রকল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন—এই প্রকল্প অধিগ্রহণের জন্য আমায় চাপ দেবেন", আমি বললাম।

"আমি কথা দিচ্ছি। সভায় নিমগাছির বিষয়ে কোনও আলোচনাই করব না।"

আমি হেসে ফেললাম। তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে পারলাম না। আমার হাসির কারণ হল, তিনি যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করবেন না, এ ব্যাপারে আমার আদৌ বিশ্বাস হল না। আমাকে না দেখা সত্ত্বেও আমার উপর মানুষটির গভীর আস্থা আমাকে বিস্মিত করেছিল। আমি রাজি হলাম।

সেই বৈঠকে অন্তত এক ডজন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তার অর্ধেক মৎস্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা। বাকি অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দু' ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলল। সচিব মহোদয় নিমগাছি প্রকল্পের ব্যাপারে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। আমি সন্তুষ্ট হলাম।

সভা প্রায় শেষ হতে চলেছে, এমন সময় তিনি আমার কানে ফিসফিস করে বললেন, "আপনি আর একটুক্ষণ সময় দিতে পারবেন? আমরা এক কাপ চা খেতে খেতে সামান্য একটু কথা সেরে নেব।"

সবাই চলে গেল। আমাদের জন্য চা নাস্তা এল। তিনি বললেন, "দেখলেন তো, আমি আমার কথা রেখেছি। সভায় আমি নিমগাছির কথা তুলিনি। এখন সভা শেষ। এখন তো ওই বিষয়ে আলোচনা চলতে পারে, নয় কি?"

আমি রাজি হওয়ায় তিনি খুব খুশি হলেন। তিনি প্রকল্পটির গোটা ইতিহাস আমাকে শোনালেন। কর্মীদের দুর্নীতি তাঁকে গ্রামীণ ব্যাংকের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল—প্রকল্পটি হস্তান্তরের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। প্রকল্প হস্তান্তরের ব্যাপারে আমাদের সব শর্তেই তিনি রাজি, এ কথাও জানালেন। আমার হাতে একগুচ্ছ রিপোর্ট ধরিয়ে দিলেন পড়ার জন্য,

www.pathagar.com

সবই প্রকল্প বিষয়ে নানা গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফল। আমায় আবার অনুরোধ জানালেন মনস্থির করতে।

অফিসে ফিরে স্থির করলাম আমি এই প্রস্তাব গ্রহণ করব। এই প্রথম একজন ব্যতিক্রমী সচিবকে দেখলাম যাঁর হৃদয়ে সর্বদা দেশের জন্য মঙ্গল চিন্তা বিরাজ করছে। দুর্নীতিগ্রস্ত স্বার্থান্বেষী আমলাদের হাত থেকে জনগণের সম্পত্তিকে বাঁচাবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তাঁকে সাহায্য করব না তো কাকে করব? সরকারের কাছ থেকে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করলে ক্ষতি কী? হয়তো আমাদের লাভ হবে না। কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা তো দেখছি না।

ফিরে এসে সচিবকে দীর্ঘ এক চিঠি লিখলাম। প্রকল্প অধিগ্রহণে আমার সম্মতির কথা জানিয়ে আমার শর্তগুলি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করলাম। বড় সহজ নয় সেগুলি। নামমাত্র বার্ষিক ভাড়ায় আমরা ওই সম্পত্তি ৯৯ বছরের জন্য লিজ নিতে চাই। প্রকল্প হস্তান্তর হয়ে গেলে সব সরকারি কর্মচারীকে প্রকল্প থেকে তুলে নিতে হবে। সরকারি কোনও কর্মকর্তা আর ওই প্রকল্পে কাজ করতে পারবে না। হস্তান্তরিত সম্পদের একটি বিস্তারিত তালিকাও চেয়ে পাঠালাম।

পরের দিনই চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। পাওয়ামাত্র সচিব আমায় ফোন করলেন এবং বললেন, "আপনার সব শর্ত আমরা মেনে নিলাম। আপনি রাজি হয়েছেন এতে আমার আনন্দের সীমা নেই। নিজেকে খুব ভারমুক্ত মনে হচ্ছে।"

অবাক কাণ্ড! গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতায় সরকারি দপ্তরে সর্বদা আমরা 'না' শুনতে অভ্যস্ত। বোধহয় এই প্রথম উচ্চপদস্থ একজন আমলার দেখা পেলাম যিনি যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন ও সরকারি সম্পত্তি হস্তান্তর কালে সব শর্ত মেনে নিলেন। এটা প্রচলিত রীতির বাইরে। আমরা যে সরকারি প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত, এ একেবারে তার বিপরীত চিত্র।

সচিব তাঁর সব প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেননি। বিশেষত সেই ৯৯ বছর লিজের বিষয়টি। সময়সীমা কমিয়ে ২৫ বছরে রফা হল। সরকারি কানুন পালটানো তাঁর ক্ষমতার অন্তর্গত ছিল না, কিন্তু তিনি বিদ্যুৎবেগে হস্তান্তরের আর সব কাজ সেরে ফেললেন। হস্তান্তর প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতির দরকার ছিল, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল। সর্বত্র আমলাতন্ত্রের জাল ছড়ানো অথচ মাত্র দুই মাসের মধ্যেই কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে গেল।

একজন সরকারি যদি সত্যিই একনিষ্ঠ কর্মযোগী হন তো তিনি ইচ্ছা করলে অসাধ্য সাধন করতে পারেন।

* * *

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশিদের সম্পর্কে একটা প্রবাদ চালু আছে—"মাছে ভাতে বাঙালি", আমাদের শরীরে প্রোটিনের জোগান দেয় মাছ। মাছ ধরে এ দেশের বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশে মানুষ বরাবর ভূমি ও জলের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা বজায় রেখে জীবনধারণ করছে, অস্তিত্ব রক্ষা করছে। প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরের পরিপূরক। একে অপরকে দেয় নির্ভরতা। বাংলাদেশের খাদ্যতালিকায় মাছ অত্যন্ত পছন্দসই পদ।

দেখলাম মৎস্যপ্রকল্প চালু হলে তা ভূমিহীন মানুষের সামনে রোজগারের বিরাট সুযোগ এনে দেবে। আশা করলাম পড়ে থাকা দিঘিগুলো ও মানুষের অব্যবহৃত কর্মক্ষমতা—এই দুয়ের মিলিত রসায়ন, তাদের জীবনের মান উন্নয়নের কাজে লাগবে। এই উদ্যোগ সফল

www.pathagar.com

হলে, তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানেরই শুধু সংস্থান হবে না, সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনে তারা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বা অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে তারা তাদের অধিকার অর্জন করবে। তাই আমরা সচিব মহোদয়ের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। মৎস্যপ্রকল্প আমাদের যৌথ উদ্যোগ নীতি ব্যাপক ভিত্তিতে প্রয়োগের সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। প্রকল্পটি নতুন মাত্রা পেল।

দরিদ্রদের সহায়তায় উদ্যোগী হলেই সরকার টাকা, জমি বা অন্যান্য সম্পত্তি বিনামূল্যে বিতরণ শুরু করেন। দুর্ভাগ্যবশত তা কখনও দরিদ্রদের হাতে পৌঁছয় না।

এই বিতরণ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য, সোজা কথায় ফয়দা লুটবার উদ্দেশ্যে সরকার ও দরিদ্রদের মধ্যে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বহু মানুষ। মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ন্যায্য পাওনা হাতে পায়। তাও তিনি যা পান তা দীর্ঘদিন নিজের অধিকারে রাখতে পারেন না। সে পুকুরই হোক বা মৎস্যপ্রকল্পই হোক। বিনা পয়সায় সামান্য একটা সরকারি কম্বল পর্যন্ত ঘরে রাখার ক্ষমতা তাদের নেই।

ঠিক করলাম বরাবরের জন্য এই রীতিকে পালটাতে হবে।

* * *

১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে সরকারের সঙ্গে আমাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। নিমগাছি প্রকল্প হস্তান্তরিত হল। নানা আকার ও আয়তনের ৭৮৩টি দিঘি এর অন্তর্ভুক্ত। সব মিলিয়ে মোট জলসম্পদ হল ১৬৬৬ একর যা পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় বিস্তৃত।

১৯৮৮ সালে সরকার আমাদের আরও দিঘি লিজ দিলেন—সব মিলিয়ে ৮০৮টি দিঘি হল। মৎস্যপ্রকল্পের মধ্যে দিয়ে নতুন পথে আমাদের যাত্রা শুরু হল। শীঘ্র বুঝতে পারলাম আমাদের এই নতুন উদ্যোগ উত্তাল সমুদ্রযাত্রার সমান।

১৯৮৭ সালে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক বন্যায় আমাদের মৎস্য খামারের প্রভূত ক্ষতি হল। এরই ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ংকর বন্যায় আক্রান্ত হল আমাদের দেশ। তালিকায় আরও নতুন নতুন ক্ষয়ক্ষতি সংযোজিত হল। পুকুরের কিছু ঘাতক মাছ অন্য ছোট মাছেদের খেয়ে ফেলছিল। আমরা এদের নির্মূল করার জন্য যখন আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি তখনই বন্যার পানির সঙ্গে নতুন আরও বহু ঘাতক মাছ দিঘিতে প্রবেশ করল।

নার্সারি বা পোনা চাষের পুকুর যা আমাদের ভাগ্যে জুটেছিল সেগুলো এতই দুরবস্থায় ছিল যে সদ্যোজাত চারা মাছ দিঘিতে ছাড়া ভিন্ন আমাদের উপায় ছিল না। ফলে বহু মাছ মারা পড়ল। দিঘির তল ছিল অসমতল, যার ফলে ঘোলা পানি, বর্ধিত অম্লতা, দূষিত জৈব পদার্থের থিতিয়ে পড়া ও অন্যান্য সমস্যার উদ্ভব হল। চুরি ভয়ানক বেড়ে গেল। বেআইনি মাছ ধরা চলতে লাগল, বিশেষত প্রত্যন্ত দুরবর্তী অঞ্চলে। যে হারে উৎপাদন হবে ভেবেছিলাম তার আশা ত্যাগ করতে হল।

কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চেয়েও মারাত্মক হয়ে উঠল মানুষের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ। স্থানীয় কিছু লোকজন আমাদের ক্ষমতাকে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালাতে লাগল। অতীতের আমলাতন্ত্র এবং আঞ্চলিক কায়েমি স্বার্থ, যার অবসান ঘটিয়ে আমরা বিকল্প প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তারা আমাদের উপস্থিতি একেবারেই সহ্য করতে পারছিল না। শুরু থেকেই আমাদের কর্মীদের নানা বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হল। এযাবৎ প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত আমলাগণ গ্রামীণকে প্রকল্প হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁদের স্বার্থ ও আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল। তাঁরা সমানে প্রচার করে যাচ্ছিলেন যে সিদ্ধান্তটি অতিশয় পক্ষপাতদুষ্ট—শুধু তাঁদের মর্যাদাহানি করার অজুহাত। তাঁদের আরও বক্তব্য ও অভিযোগ ছিল। ভাবখানা করলেন তাঁদের এত পরিশ্রমের দ্বারা যখন প্রকল্পটি স্বনির্ভর ও লাভজনক হয়ে উঠতে চলেছে, তখনই ষড়যন্ত্র করে প্রকল্পটির সঙ্গে তাঁদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার এটা চেষ্টা। এর বিরুদ্ধে তাঁরা সমানে বিক্ষোভ জানাচ্ছিলেন। যেন তাঁদের পরিশ্রমের ফলটুকু ভোগ করার জন্য গ্রামীণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গদিতে বসিয়ে দেওয়া হল।

এইভাবে সাধারণ মানুষের মনে গ্রামীণ বিরোধী মনোভাব জেগে উঠছিল। আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতারাও ছিলেন আমাদের বিপক্ষে। যাঁরা এলাকার ক্ষমতাধারী নেতা ছিলেন তাঁদেরই ক্ষতি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁরাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সক্রিয় বিরোধীপক্ষের ভূমিকা নিলেন। এর মধ্যে বামপন্থী নেতাদের যুক্তি ছিল উন্নয়ন হল সরকারের কাজ। কোনও বেসরকারি ব্যাংকের হস্তক্ষেপের প্রশ্নই ওঠে না। আসল কারণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতীতে তাঁরা মৎস্য প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের উপর অনেক বেশি প্রভাব খাটাতে পারতেন। নতুন ব্যবস্থায় সেই প্রভাব খাটাবার আর উপায় রইল না।

এক জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল তারাশে গ্রামীণ ব্যাংক বিরোধী এক বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করেছিলেন। নেতারা গ্রামবাসীদের বোঝাতে চাইছিলেন যে আমরা একটি বিদেশি সংগঠন, স্থানীয় লোকজনকে শোষণ করে আমাদের লভ্যাংশ বিদেশে পাচার করছি। চারিদিক গুজব রটে গেল যে গ্রামীণ ব্যাংক আমেরিকান সি. আই. এ-র হয়ে কাজ করছে—উদ্দেশ্য গরিব বাংলাদেশি জনগণের বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও উন্মাদনা সমূলে বিনাশ করে দেওয়া।

স্থানীয় মানুষজনের বিক্ষোভ ও বিদ্রূপ খোলাখুলি বিদ্রোহে রূপান্তরিত হল। এমন দিনও গেছে যখন আমাদের কর্মীরা স্থানীয় বিরোধিতার জন্য তাদের আবাসস্থলের বাইরে বেরোতে পারেননি। কিন্তু অতীতে আমাদের কর্মীরা এরকম বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তার সঙ্গে মোকাবিলা করে অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছেন। সেই জন্য আমাদের সতর্কতার ঘাটতি ছিল না, প্রবল অসহযোগিতার মধ্যেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পরিস্থিতি বদল করতে আমরা সক্ষম হবই এবং জনগণের বিশ্বাসও অর্জন করব একই সঙ্গে।

স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আমরা আলোচনায় বসলাম। তাদের সমর্থনের জন্য বিনীত আবেদন জানালাম, দিঘিগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ শুধু ভূমিহীন মানুষেরই নয়, গোটা সমাজেরই কল্যাণসাধন করবে—এ ব্যাপারে আমরা তাদের কথা দিলাম। তাদের শুভ বিশ্বাস অর্জনের জন্য আমরা চল্লিশটি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করলাম, দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। শীঘ্রই আমাদের কর্মীদের ধৈর্য ও একনিষ্ঠতার ফল দেখা গেল—প্রাথমিক বিরূপতা ও সন্দেহ কমতে শুরু করল।

কট্টর বামপন্থী দল, যাঁরা আমাদের অফিস জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, বন্দুকের নল পিঠে ঠেকিয়ে আমাদের কর্মীদের গ্রামছাড়া করেছিলেন, তাঁরা এলাকা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত মৎস্য উৎপাদনের কাজে একাগ্রভাবে মন দেওয়ার অবকাশ পেলাম।

কিন্তু আবার মুশকিল দেখা দিল। প্রকল্প চালাবার জন্য আমাদের প্রশিক্ষণ দরকার ছিল। কোনও সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ না থাকায় আমরা আমাদের কর্মীদের মৎস্য চাষের ব্যাপারে চটজলদি শিক্ষাক্রমে ভর্তি করে দিলাম। প্রথমে আয়ত্ত করতে হবে মৎস্যচাষের প্রযুক্তিগত বিদ্যা। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে সর্বপ্রকার সংশয়ের অবসান হলে আমরা দিঘির কাছে বসবাসকারীদের এ ব্যাপারে ডেকে নিলাম। বুঝেছিলাম যে মৎস্য চাষের প্রযুক্তিগত এবং

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনার ভিত্তি মজবুত করে দিঘিগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা এবং উৎপাদন বাড়ানো ছাড়া এর সুফল গরিবদের উপকারে আনা সম্ভব নয়।

খালেদ শামস বললেন, "একজন মানুষ আরেকজনকে কাঁধে করে কাদাপানি পার করতে গিয়ে দু'জনের একসঙ্গে ডুবে মরার সামিল হবে।"

মৎস্যচাষের প্রশিক্ষণ নেবার জন্য আমরা আমাদের কর্মীদের চিন দেশে পাঠালাম। হাতেকলমে কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁরা ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করলেন। এবার আমরা আমাদের প্রাথমিক সুবিশাল বিনিয়োগ ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবার ফল হাতে হাতে পেতে শুরু করলাম। আশেপাশের গরিব মানুষজনকে সংগঠিত করা হল আমাদের উদ্যোগের অংশীদার হবার জন্য। তারা শ্রম দান করল। মাছ চুরি বন্ধ করার জন্য পুকুর পাহারা দিতে শুরু করল। গ্রামীণের তরফ থেকে এর প্রযুক্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দিকটা দেখতে লাগল। মাছের ফলন আধাআধি ভাগ করা হল। এর থেকে আমাদের অংশীদারেরা বাৎসরিক ভাল আয় করতে লাগল এবং আমরা আমাদের বিনিয়োগের অর্থ পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হলাম।

উৎপাদন বাড়াবার জন্য আমরা একটি উৎসাহদান প্রকল্প চালু করলাম। লক্ষ্যমাত্রা থেকেও বেশি মাছ উৎপাদন হলে কর্মীদের পুরস্কৃত করা হত। সরকারি পরিচালনাধীন প্রকল্পে যে গরিব মানুষেরা মাছ চুরি করত (কারণ, সবাই তাই করে থাকে), লাভের অংশ ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ায় তারা নিজেদেরই স্বার্থে হয়ে উঠল সুদক্ষ মৎসচাষী, রক্ষক ও মাছগুলির প্রকৃত মালিক।

প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনের সমস্যাগুলি যত আমরা সমাধান করতে সক্ষম হচ্ছি ততই আশা করছি এই লাভজনক ছোট ছোট প্রকল্পের অংশীদার তাঁরাই হবেন, যাঁরা এখন আমাদের উৎপাদনে আধাআধি মালিকানার অধিকারী।

পরিচালনা ও মালিকানার এই দৃষ্টান্ত যদি সঠিকভাবে কার্যকরী হয় তাহলে আমরা বাংলাদেশের যে-কোনও প্রান্তে অব্যবহৃত দিঘিগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে সক্ষম হব এবং গরিবদের উপকারের জন্য সেগুলিকে উৎপাদনশীল করে তুলব। গরিবদের হাতেই তুলে দিতে পারব এগুলোর মালিকানা।

ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের সঙ্গে যদি পুকুর সংরক্ষণের কাজ আমরা মিলিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা এতকাল অবধি অব্যবহার্য বাংলাদেশের প্রাচুর্যময় দুটি বিশাল সম্পদভাণ্ডারকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারব। দরিদ্র জনগণের এক বিরাট অংশ ভূমিহীন। এদিকে ১৫ লক্ষ অব্যবহৃত মিঠা পানির দিঘি গ্রামে গ্রামে হেজে মজে পড়ে আছে।

মৎস্যচাষ নিয়ে গ্রামীণের অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে যে সামান্য ভিত থেকেই নতুন নতুন তৃণমূল প্রকল্পের সূচনা হতে পারে। এতে করে, ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে গরিব মানুষ আরও উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বড় বড় অর্থনৈতিক প্রকল্পেরও অংশীদার হয়ে উঠতে পারে। প্রযুক্তির প্রয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধির জরুরি অঙ্গ। কিন্তু বর্ধিত উৎপাদন কাদের হাতে যাবে তা প্রকল্প রচয়িতাদেরই স্থির করে দিতে হবে। নতুবা শুধুমাত্র ধনীর হাতেই তা গিয়ে পৌঁছবে।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার বিশাল। এই অগাধ ঐশ্বর্য নিয়ে এখানে মানুষের দরিদ্র থাকার কোনও কারণ নেই। সম্পদের অপ্রতুলতা নয়, আমাদের সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থার গলদই হল প্রকৃত সমস্যা। যথাযথ ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো তৈরি হলে নিজস্ব সম্পদই দারিদ্র সমস্যা সমাধানের হদিশ দেবে।

www.pathagar.com

৩৬
গ্রামীণ ফোন: দরিদ্রদের জন্য প্রযুক্তি

১৯৯৪ সালে একদিন খালেদ শামস আমার ঘরে এল। সঙ্গে ইকবাল, একজন বাংলাদেশি আমেরিকান নাগরিক। তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সে ওবারলিন কলেজের (Oberlin College) স্নাতক। সে জানাল, যখন ওই কলেজে আমি সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি গ্রহণ করতে গেছিলাম তখন সে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল।

খালেদ বললেন, "ইকবালের মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ও বলছে, বাংলাদেশে মোবাইল টেলিফোন কোম্পানি চালানোর লাইসেন্সের জন্য আমরা আবেদন করতে পারি। গ্রামে গঞ্জে আমরা মোবাইল ফোন সেবা চালু করতে পারি।"

পরিকল্পনাটি চমকপ্রদ। খুব রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। কিন্তু কীভাবে মোবাইল টেলিফোন কোম্পানি চালাতে হয় তার সম্যক ধারণা আমাদের ছিল না। কীভাবে আমরা এটাকে সম্ভব করে তুলব? বাংলাদেশের প্রয়োজন সম্বন্ধে নানা চিন্তাভাবনা নিয়ে বহু মানুষ আমার কাছে আসেন। আমি প্রায়শই সেইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁদের উৎসাহ দিই। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে তাঁদের আর আগ্রহ থাকে না। খুব দ্রুত তাঁরা হাত গুটিয়ে নেন।

ইকবাল দেখলাম সেই শ্রেণীভুক্ত নয়। সে প্রাথমিক পরিকল্পনা সেরে একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। তার সমগ্র চিন্তাভাবনার কথা গুছিয়ে বলল। তার কথার কতটা গুরুত্ব দেওয়া যায়? আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। তবে তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ফানুস বলে তার পরিকল্পনা আমি বাতিল করলাম না। তাকে আমি সময় দিলাম। সে যে একজন তৎপর উদ্যোক্তা, তাকে তার প্রমাণ দিতে হবে।

* * *

মোবাইল ফোন সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ ধাপে ধাপে বাড়ল। সম্পূর্ণ উদ্যোগ গড়ে তুলতে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হল আমাদের। খালেদের ধৈর্য অসীম। পাহাড়ের খাদে গড়িয়ে পড়ার মতো অবস্থা হলেও তিনি আশা ছাড়লেন না।

১৯৯৬ সাল। বাংলাদেশ সরকার অবশেষে তিনটি মোবাইল ফোনের লাইসেন্স দিলেন। তাদের একটা হল আমাদের নামে। ১৯৯৬ সালের ১১ নভেম্বর আমরা চুক্তিপত্রে সাক্ষর করলাম। আমি সাংবাদিক বৈঠকে জানালাম: ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে আমাদের স্বাধীনতা দিবসে আমরা আমাদের ফোন উদ্বোধন করতে চলেছি। এই সেবা গোটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে, এমনকী হতদরিদ্রদের কাছে প্রযুক্তি পৌঁছে দেবার প্রথম প্রতিশ্রুতি।

www.pathagar.com

দু'টি স্বাধীন সংস্থা গঠন করা হল—একটি লাভজনক সংস্থা (গ্রামীণ ফোন) আর একটি লাভের উদ্দেশ্যবিহীন (গ্রামীণ টেলিকম)। গ্রামীণ ফোন একটি যৌথ কোম্পানি, যার চারজন অংশীদার আছেন—নরওয়ের 'টেলিনর' (৫১%), 'গ্রামীণ টেলিকম' (৩৫%), জাপানের মারুবেনি' (৯.৫%) এবং 'গণফোন ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি' (৪.৫%)। লাইসেন্স হল গ্রামীণ ফোনের নামে। জাতীয় স্তরে সারা দেশ জুড়ে তারা মোবাইল-এর নেটওয়ার্ক তৈরি করে, লাইসেন্স গ্রাহকদের শহরাঞ্চলে সেবা দান করবে। 'গ্রামীণ টেলিকম', 'গ্রামীণ ফোন'-এর কাছ থেকে পাইকারি দামে টেলিফোন সার্ভিস সময় ক্রয় করবে এবং সেই সেবা গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেবে বাংলাদেশের গ্রামগুলি জুড়ে। ৬৮ হাজার গ্রামের প্রতিটিতে একজন করে 'টেলিফোন লেডি' থাকবেন। তিনি সারা গ্রামে সেবা বিক্রয় করে রোজগার করবেন। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি হবে তাঁর আয়ের উপায়। এইভাবে এক হতদরিদ্র মহিলার মাধ্যমে প্রত্যন্ত বাংলাদেশের এক অনামী ও অখ্যাত গ্রামের সঙ্গে সারা বিশ্বের সংযোগ স্থাপিত হবে। অত্যাধুনিক যোগাযোগের পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি নিজের জীবনের উন্নতি সাধন করবেন।

১৯৯৭ সালের ২৬ মার্চ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামীণ ফোন চালু হল। কাজটা খুব সহজ ছিল না। নির্দিষ্ট দিনটিতে কাজ শুরু করার জন্য সংস্থার সবাই দিন রাত ২৪ ঘণ্টা জেগে অমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রামীণ ফোনের মাধ্যমে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তখন নরওয়ের উত্তরাঞ্চলের এক শহরে ছুটি কাটাচ্ছিলেন।

এদিক থেকে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "ওদিকের আবহাওয়া কেমন?"

উত্তর এল, "ভয়ংকর শীত, তাপমাত্রা মাইনাস ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস চলছে।"

"এই ঠান্ডায় আপনি কেমন করে ছুটি উপভোগ করছেন? আমাদের ঢাকায় তাপমাত্রা বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস।"

এই আন্তর্জাতিক ফোনের পর দেশের অভ্যন্তর থেকে একটি ফোন বাজল প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। ঢাকার উত্তরে পাতিরা গ্রাম থেকে লাইলি বেগম তাঁর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। লাইলি বেগম বাংলাদেশের প্রথম 'টেলিফোন লেডি'। সেই থেকে তিনি পয়সার বিনিময়ে তাঁর ফোন গ্রামবাসীদের ব্যবহার করতে দিয়ে উপার্জন করছেন।

১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে টেলিফোন ব্যবহারের আনুপাতিক হার ছিল সবচেয়ে কম। তিনশো জনসংখ্যা পিছু একটি করে ফোন। যে-দেশের জনসংখ্যা ১২ কোটি, সে দেশে টেলিফোন সেটের সংখ্যা ছিল মাত্র চার লক্ষ। সেগুলি সবই শহরাঞ্চলে, প্রধানত ঢাকায় ব্যবহার করা হত। এবং অধিকাংশ সময়ই অনেক ফোন অচল হয়ে থাকত।

অতএব বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন বাংলাদেশে একটি চালু ফোন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতীক। ফোনের যোগাযোগ পাবার জন্য মানুষকে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। অথচ কতিপয় ভাগ্যবান একাধিক ফোনের অধিকারী। দপ্তরে যাঁর ডেস্কে যত বেশি সংখ্যক ফোন তাঁর তত বেশি পদমর্যাদা। কারুর মোবাইল ফোন থাকলে সবাই ধরে নেবে যে সে অগাধ টাকার মালিক। বিগত সাত বছর ধরে একটি মোবাইল ফোন কোম্পানি বাংলাদেশে কারবার করছিল। কিন্তু এদের সেবার বাজারদর ছিল আকাশ ছোঁওয়া—সাধারণের নাগালের বাইরে।

আগামী চার বছরের মধ্যে গ্রামীণ ফোন আরও চার লক্ষ নতুন ফোন সংযোগ দেবার কথা

www.pathagar.com

বিবেচনা করছে। এর ভাড়া যুক্তিসংগত রাখা হয়েছে। যাতে অতি নিম্নবিত্তের মানুষও এই সেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। ব্যস্ত সময়ে, অর্থাৎ যখন ফোন ব্যবহার অধিক হয় তখন খরচ মিনিটে মাত্র চার টাকা এবং অন্য সময়ে আরও কম।

বাংলাদেশের বহু গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। সেইসব গ্রামে মোবাইল ফোনের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন। বাংলাদেশে সূর্যালোকের অভাব নেই। সেসব অঞ্চলে সৌর শক্তির কথা বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা আবার শক্তির বিকল্প উৎসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি। এই কাজ সফল করে তোলার জন্য স্থাপন করা হয়েছে 'গ্রামীণ শক্তি' নামক প্রতিষ্ঠান।

এই প্রতিষ্ঠানটি লাভের উদ্দেশ্যহীন। সবরকমের নবায়নযোগ্য শক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি অঙ্গীকারবদ্ধ। এর মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি খুবই সুবিধাজনক। ক্রেতারা এর ফলে এককালীন বিশাল অর্থব্যয় অর্থাৎ অর্থ জমা দেবার হাত থেকে অব্যাহতি পায়।

বর্তমানে 'গ্রামীণ শক্তি' বাড়ি বাড়ি সৌরশক্তি পৌঁছে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে বায়ুচালিত টারবাইন ও গ্যাসিফায়ার। গ্যাসিফায়ার কাঠ বা কৃষিজাত বর্জ্য পদার্থকে বায়বীয় পদার্থে রূপান্তরিত করে যা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

* * *

আমরা আমাদের 'গ্রামীণ ফোনের' মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে ইন্টারনেট-সেবা পৌঁছে দেবার আশা রাখি। ইন্টারনেট সেবা প্রতিষ্ঠান গরিব মানুষের সন্তানদের জন্য আন্তর্জাতিক কাজের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার আশা রাখে। গ্রামের বাড়ি বা ইন্টারনেট কেন্দ্র থেকে বিশ্বজুড়ে তারা নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কোম্পানির কাজ করে দিতে পারবে। গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট নিয়ে যেতে পারলে সেইসব বিচ্ছিন্ন অনধিগম্য গ্রামীণ এলাকাতেও বহু শ্রমঘন উদ্যোগ স্থাপন করা যাবে। যেমন, ডাটা এনট্রি, ডাটা ব্যবস্থাপনা, টেলিফোন আনসারিং সার্ভিস, ট্রাসক্রিপশান সার্ভিস, হিসাবরক্ষণ সার্ভিস সিকুরিটি সার্ভিস, ইত্যাদি। ইন্টারনেটের কাছে দূরত্বের ব্যাপারটা অর্থহীন। সুতরাং এই সব সার্ভিস পৃথিবীর যে কোনও স্থানে, যে কোনও প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেওয়া যায়।

'গ্রামীণ কমিউনিকেশনস' নামক প্রতিষ্ঠানটি মাধ্যমে গ্রামে ইন্টারনেট নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এই সবে প্রদান সম্পূর্ণভাবেই লাভের উদ্দেশ্যবিহীন।

* * *

গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকেরা সরাসরি অতি আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। মাঝখানে এতদিনের প্রচলিত প্রযুক্তিগুলো (যেগুলি থেকে বর্তমান নিত্য নতুন উদ্ভাবনের সূত্রপাত) আয়ত্তে আনবার জন্য যে সময় ও অর্থের অপচয় হত তার আর প্রয়োজন হচ্ছে না। আমি সেই নৈরাশ্যবাদীদের দলে নেই, যাঁরা মনে করেন যে প্রযুক্তি অর্থবান ও গরিবদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রচনা করবে। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে প্রযুক্তি গঠনমূলক বা পরিকাঠামোগত বাধা, দূরত্ব ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান দূর করতে সক্ষম। তা একই সাথে গরিবদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনে সহায়তা করতে পারবে।

অর্থ উপার্জন বা সম্পদ সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম হওয়া ছাড়াও দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন সাধনে তথ্য প্রযুক্তির জুড়ি নেই। বিশ্বের সর্বত্র মহিলারা অনেকেই অন্যায় ও সামাজিক

www.pathagar.com

শোষণের শিকার, কারণ তারা ঐক্যবদ্ধ নয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুধু গ্রামের মেয়েদের মধ্যেই সংযোগ স্থাপন হবে তাই নয়, হঠাৎ করে নিখিল বিশ্বের দুয়ার তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বঞ্চিতা নিপীড়িতা নারী সমাজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে তারা। বহু দূরের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু যারা তাদের সমব্যথী ও প্রতিকূলতায় সাহায্য দানে সত্যিই আগ্রহী, তারাও চলে আসবে অনেক কাছে।

নিন্দুক ও সমালোচকদের মতে, আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পের উচ্চমানের প্রযুক্তি আমাদের গ্রাহকদের হাতে পৌঁছলে তা হবে বিরাট অপচয়। কারণ অগ্রগতির নিরিখে তারা এখনও প্রস্তর যুগে পড়ে আছে। প্রকৃতক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাচ্ছি। টেলিফোন ছাড়া দূরের প্রিয়জনের খবর নেবার প্রচেষ্টায় গ্রামের মানুষের বহু সময়, চেষ্টা ও অর্থের অপচয় হত। মায়ের গুরুতর অসুস্থতার কারণে ঢাকাবাসী ভাই বা বোনকে বাড়ি আসতে বলার জন্য, পরিবারে কোনও জন্ম বা বিবাহের সংবাদ জানানোর জন্য তাদের লোক পাঠাতে হত। বার্তাবাহককে পড়াশুনো বা কাজ বন্ধ রেখে ট্রেন, বাস বা রিকশায় করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছোতে হত। খবর দিতে সময়ও লেগে যেত ক'দিন। ফোনের অভাবে অর্থব্যয়ও হত অনেক বেশি। এখন সৌরশক্তি চালিত ফোন যে-কোনও গ্রামে এমনকী যে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি সেখানেও, মুহূর্তের মধ্যে যে-কোনও প্রান্তের খবর ইচ্ছামতো পৌঁছে দিচ্ছে এবং উত্তরও এসে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

অনেকের মতে, গ্রামের গরিব মানুষদের ফোনের বিলাসিতা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়— এ সম্বন্ধে প্রায়ই আমাদের সমালোচনা শুনতে হয়। ফোন হল ধনীদের একচ্ছত্র অধিকার, মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্তদের জীবন-যাপনের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু আমাদের 'টেলিফোন লেডি'-র কাছে, 'টেলিফোন' রোজগারের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ উপায়, একটি গরুর বা একটি নিজস্ব রিকশার অধিকারী হওয়ার মতোই সত্য ঘটনা।

এ ছাড়া গ্রামীণ গ্রাহকদের নানা তথ্য সরবরাহ করতে টেলিফোনের ভূমিকা অসীম। কাঁচামাল ও নিজেদের তৈরি মাল ক্রয়-বিক্রয়ের হালচাল সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল রাখে এবং কারবারের উন্নতিসাধনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। ফোন চালু হবার আগে কাঁচামালের বাজারদর ও প্রয়োজনীয় রসদের জোগানের তারিখ জানবার জন্য ঋণগ্রহীতাকে লোক পাঠাতে হত। দু'-তিন জন বিভিন্ন জোগানদারের সঙ্গে দেখা করতে হত সেই বার্তাবাহককে। কয়েক দিন সময় নষ্ট হত। অপ্রয়োজনীয় খরচও হত প্রচুর। বর্তমানে মোবাইল ফোনের সাহায্যে ঋণগ্রহীতা আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্ডার দিয়ে দিতে পারে। এইভাবে কারবারে লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যায় তাড়াতাড়ি।

ফোন ভাড়া খাটিয়ে উপার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না গ্রামীণ ফোনের ভবিষ্যৎ। শক্তি ও প্রযুক্তির নানা উপায় উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্স ও ই-মেল আদান-প্রদান করার সুযোগ সুবিধাও নিয়ে আসবে গ্রামীণ ফোন। ঘরে ঘরে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠবে সে। একদিন হয়তো তার দ্বারা যোগাযোগের এমন উপায় আবিষ্কৃত হবে যা মানুষ এখন অবধি কল্পনাও করতে পারে না। বাংলাদেশে টেলিফোনের সংখ্যা যখন অগণিত হয়ে যাবে সেদিন হয়তো সে অর্থে আর প্রয়োজন হবে না। অথবা কম প্রয়োজন হবে। ততদিনে টেলিফোন লেডি অন্যরকম প্রযুক্তি ব্যবসায় নিযুক্ত হবে। এ ধরনের এক ব্যবসা থেকে অন্য ব্যবসায় উত্তরণ এটা সব ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা শুধু গ্রামীণ ফোনই নয়, যে-কোনও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

৩৭
গ্রামীণ ট্রাস্ট

বিশ্বজুড়ে গ্রামীণ ব্যাংকের যত পরিচিতি বাড়তে লাগল, ততই আমাদের কাছে উৎসুক মানুষজনের চিঠি আসতে লাগল। যাঁরা জানতে ইচ্ছুক, গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যাপারে গবেষণায় আগ্রহী, তাঁরা কেউ কেউ এসে দেখাও করলেন। নিজের দেশে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প চালু করতে চান এমন মানুষের সংখ্যাও ছিল প্রচুর।

তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সাহায্যের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ১৯৮৯ সালে 'গ্রামীণ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করলাম এইসব মানুষদেরই জন্য।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর নানা স্থানে বহু কর্মসূচি সংস্থা চালু হয়ে গেছে। এদের কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। গ্রামীণ ট্রাস্টের মাধ্যমে আমরা প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করলাম। প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে আমরা এক পদ্ধতি অবলম্বন করলাম। নাম দিলাম 'আন্তর্জাতিক সংলাপ প্রকল্প'। এই পদ্ধতি অনুসারে গ্রামীণ কর্মসূচির প্রধান কার্যনির্বাহককে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখাগুলিতে বারো দিন কাটাতে হবে। উদ্দেশ্য, খুব কাছে থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের কাজকর্ম খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ। দারিদ্রের বাস্তব চেহারা তাদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে এবং প্রতিটি গ্রাহকের ব্যক্তিগত জীবনে ঋণের ভূমিকা অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে।

এই 'ডায়ালগ প্রকল্প'-র শেষে দেখা যেত যে অনেক শিক্ষার্থী, যাঁরা নিজের দেশে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প চালু করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে কাজটি শুরু করতে পারছেন না। যেসব ঋণদাতা বা অনুদান প্রদানকারী সংস্থার কাছে তাঁরা আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁরা কোনওরকম উৎসাহ দেখাননি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি যে দাতারা দানমূলক প্রকল্পগুলিতে—যেমন খাদ্য বিতরণ প্রকল্প, শিক্ষা প্রকল্প বা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে টাকা দিতে উৎসাহী। কিন্তু যে-মুহূর্তে কোনও ঋণ প্রকল্পে অর্থ সাহায্যের প্রশ্ন ওঠে, দাতা-সংস্থা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। অথবা গ্রামীণ কর্মসূচিকে পরিশীলিত করার জন্য তারা তাদের ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগায় এবং সেখানেই কাহিনীর ইতি ঘটে। প্রক্রিয়াটি জটিল হয়ে যায় অবশেষে বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী আর সে ব্যাপারে অগ্রসর না হওয়াই সমীচীন বিবেচনা করা হয়।

আমাদের কাছে অনুরোধের পর অনুরোধ আসতে লাগল। এই মর্মে—"শুরু করার জন্য তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে আপনাদের সহৃদয় সাহায্য চাই। পরিচিত দাতা-সংস্থার সঙ্গে আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি। কিন্তু কোনওমতেই কাজ হচ্ছে না।"

১৯৯১ সালে শিকাগোতে মহিলাদের স্বকর্মসংস্থান প্রকল্প WSEP (Women's Self Employment Project) পরিদর্শন করার জন্য আমি আমন্ত্রণ পেলাম। তাদের গ্রহীতাদের

www.pathagar.com

সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা সভার পর তাঁরা গ্রামীণ ব্যাংকের বিষয়ে অনিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখবার জন্য আমায় অনুরোধ করলেন। সেই সভায় জনা পঞ্চাশ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কে সে সম্পর্কে আমার কিছুই ধারণা ছিল না। শুধু এটুকু বুঝেছিলাম যে তাঁরা গ্রামীণের বিষয়ে আগ্রহী। প্রশ্নোত্তরের বৈঠকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন এল। প্রকল্প শুরুর জন্য তহবিল সংগ্রহ কতখানি কঠিন কাজ তা সবিস্তারে বুঝিয়ে বললাম। এও বললাম এ ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাকেও খুবই হতাশ করেছে। 'ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প' ক্ষুদ্র, জটিল ও ব্যয়বহুল বলে যদি তাঁরা এই প্রকল্পে তহবিল প্রদানে নিরুৎসাহী থাকেন বা ঝঞ্ঝাটের আশঙ্কা করেন, তো আমি তাঁদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। জানালাম, তাঁদের হয়ে আমি গ্রামীণ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠার ভার নেব, তাঁরা শুধু তাঁদের টাকাটা একসঙ্গে গ্রামীণ ট্রাস্টকে দিয়ে দেবেন। এ টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে বাকি সব দায় দায়িত্ব আমাদের। যদি প্রথমবার দেয়া তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গ্রামীণ ট্রাস্টের কাজ তাদের কাছে সন্তোষজনক তাঁরা আরও টাকা আমাদের তহবিলে জমা দিতে পারেন। যদি আমাদের কাজ তাঁদের সন্তোষজনক মনে না হয়, তাঁরা যে-কোনও সময় তাঁদের অনুদান প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। অন্তত একজন দাতাকে আমাদের উপর ভরসা করা যায় কিনা যাচাই করে দেখবার জন্য অনুরোধ জানালাম।

বৈঠক চলতে থাকল। একজন শ্রোতার কাছ থেকে একটি চিরকুট পেলাম। "এই আলোচনার পর আপনার হাতে দু'-চার মিনিট সময় হবে কী? আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমি আগ্রহী।"

আমি চিরকুটটি ডবলিউ. এস. ই. পি-এর কার্যনির্বাহী পরিচালক কনি ইভানস-এর হাতে দিলাম। আমার ঠিক পাশেই ছিল তার আসন। অনুরোধকারী ব্যক্তির সঙ্গে অল্পক্ষণের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে তাঁকে অনুরোধ করলাম।

বক্তৃতার পরই উদ্যোক্তারা আমাকে একটি ছোট্ট ঘরে নিয়ে এলেন। সেখানে এক মহিলা অপেক্ষা করছিলেন। তিনিই আমার সঙ্গে বাক্যালাপে আগ্রহী বলে লিখে জানিয়েছিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, গ্রামীণ কর্মসূচিতে অর্থ সংস্থানে আন্দাজ কত টাকা দরকার বলে আপনার অনুমান?"

"লাখ দুয়েক ডলার হলে ভালভাবে শুরু করা যায়।" আমি জবাব দিলাম।

"গ্রামীণ কর্মসূচি খুঁজে পেতে আপনার অসুবিধা হবে কি?

"একদম না। বহু আগ্রহী মানুষ টাকার অপেক্ষায় দিন গুণছেন। একবার টাকা দিতে শুরু করলে আরও অনেকেই সাহায্যের আশায় এগিয়ে আসবেন।"

"কতদিন আপনি শিকাগোতে থাকবেন?"

"আর দু'দিন। তারপর যাব ওয়াশিংটন।"

"আপনি যাবার আগে আমি ওই পরিমাণ টাকার চেক আপনাকে দেবার চেষ্টা করব। অনুগ্রহ করে এই সন্ধ্যায় আপনি কি একবার আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসবেন? তা হলে আমার কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। আমাদের কাজটাও এতে অনেকখানি এগিয়ে যাবে।"

কনির দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সময় করা যাবে?"

কনি আনন্দের উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে গেছিল। "এডেল সিমন্স আপনাকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তা ছাড়া তিনি আপনাকে অনুদান দিতে চান। কী করে এমন দুঃসাহস আমার হবে যে আপনাকে যেতে বাধা দিই।"

সেই সন্ধ্যাটা এডেল সাইমন্সের বাড়িতে কাটালাম। কনি ও মেরি হুটন আমার সঙ্গে ছিল।

www.pathagar.com

এডেল ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশানের প্রেসিডেন্ট। তাঁর তিনজন সহকর্মীকেও তিনি আমন্ত্রণ করেছিলেন। এই সান্ধ্য-আসরে তিনি অনুদানের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত পাকা করলেন।

এখন দরকার প্রকল্প প্রস্তাব। পরের দু'টো দিন দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। প্রকল্প তৈরি করার সময় হবে না। কিন্তু তহবিল অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পেশ করা আবশ্যিক। এডেল অবশ্য তাতে বিচলিত হলেন না। তিনি তাঁর সহযোগী কবিতাকে নির্দেশ দিলেন আগামী দু'দিন সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে। সত্যি সত্যি দু'দিন ধরে কবিতা আমার সঙ্গে কাটাল। আমার বক্তব্য, আমার চিন্তা জানার চেষ্টা করল। এমনকী ট্যাক্সিতে পর্যন্ত কবিতা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরল। দুপুর ও রাতের খাওয়ার সময়টুকুও বাদ দিল না। সুযোগ পেলে কবিতা সময়ের সদ্ব্যবহার করে আমাকে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে যেতে লাগল। উত্তরগুলো থেকেই সে প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করে ফেলল।

এডেল সিমন্সের আস্থা অর্জন ও গ্রামীণ ট্রাস্টে তাঁর তহবিল প্রদানের সিদ্ধান্তই গ্রামীণ কর্মসূচিতে অর্থায়নের ব্যাপারে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা চিরদিন মনে থাকবে।

* * *

ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের অনুদান পাবার পর 'গ্রামীণ ট্রাস্ট' বিশ্বব্যাপী অনুগামী সংস্থাগুলিকে আর্থিক সাহায্যদানের কাজে সিরিয়াসলি জড়িয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে যথাযথ কার্যপ্রণালী ও পদ্ধতি দাঁড় করানো হল।

এরপর দিনে দিনে ট্রাস্টের টাকার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকল। রকফেলার ফাউন্ডেশানের প্রেসিডেন্ট পিটার গোলমার্কের সঙ্গে আমি এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার অনুমোদন করলেন। পিটার ছিলেন গ্রামীণ ব্যাংকের একজন মহৎ বন্ধু ও গুণগ্রাহী। তিনি নিজে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মযজ্ঞ পরিদর্শন করছেন। শুধু তাতেই ক্ষান্ত হলেন না। এরপর থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ফাউন্ডেশন ও বেসরকারি দাতা সংস্থাগুলির প্রেসিডেন্টদের আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন। তিনি এদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে আরম্ভ করলেন। এইরকম এক সফরে আরও অনেকের সঙ্গে এলেন ক্যালভার্ট ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা ওয়েন সিলবি। বাণিজ্যিক জগতের যে নেতারা সামাজিক বিনিয়োগের ভাবধারা আমেরিকায় প্রয়োগ করে এক জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, ওয়েন তাঁদের অন্যতম।

প্রথম গ্রামীণ ব্যাংক সফরের পর, পিটার নিউ ইয়র্কে স্যোশাল ভেনচার ফান্ড ম্যানেজারদের এক সভায় বক্তৃতা দেবার সময় গ্রামীণ ব্যাংক প্রসঙ্গে বললেন, "লক্ষ করছিলাম গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে কেমনভাবে প্রাচীন কুসংস্কার ভেঙে যাচ্ছে। প্রথা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে 'ধ্বংসাত্মক' প্রত্যক্ষ করলাম। যা ধ্বংস হতে দেখলাম তা হচ্ছে:

—এমন একটি বিশ্বাস যা মনে করে গরিব মানুষকে অসহায়।

—এমন একটি বিশ্বাস যা মনে করে মহিলারা অসহায়।

—এমন একটি বিশ্বাস যা মনে করে হতদরিদ্র ভূমিহীন মানুষদের ঋণদান খুব বিপজ্জনক।

—এমন একটি বিশ্বাস যা মনে করে গরিব মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে না, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে পারে না, নিজেদের ভালমন্দের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, ঋণের ঝক্কি সামলাতে পারে না।

www.pathagar.com

—এমন একটি বিশ্বাস যা মনে করে উৎকৃষ্ট মানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে বোঝায় সরকারের তত্ত্বাবধানে বিশাল প্রকল্প।

প্রাচীন এই ধ্যানধারণাগুলি যদি মৃৎপাত্রের সঙ্গে তুলনীয় হত, তাহলে গ্রামীণ ব্যাংকে মেঝেতে তাদের ভেঙেচুরে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা যেত।

'গ্রামীণ ট্রাস্ট' চালু হবার পর থেকে আমরা লক্ষ্য করছি দেশে গ্রামীণ প্রকল্প চালু করার প্রবণতা জন্মাচ্ছে। এই অভূতপূর্ব আগ্রহে গ্রামীণ ট্রাস্ট অত্যন্ত আনন্দিত। কিন্তু গ্রামীণ ট্রাস্টের টাকা সকল উদ্যোক্তার দাবি পুরোপুরি মেটাবার জন্য যথেষ্ট ছিল না। আরও অনেক প্রকল্প আমাদের অনুদানের আশায় আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তাদের দেবার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য আমাদের ছিল না। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠল, তহবিল কোনও দাতা-সংস্থা এই চাহিদা পূরণের জন্য এগিয়ে আসতে চাইছিলেন না।

আগামী পাঁচ বছরে সকল গ্রামীণ প্রকল্প অর্থ সংস্থানের জন্য আন্দাজ কত টাকার দরকার হতে পারে তার একটা মোটামুটি হিসেব কষে দেখলাম যে একশো মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। এই তহবিল থেকে আমরা পৃথিবীর যে-কোনও স্থানে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প সূচনা করার জন্য ছোট প্রকল্পকে সম্প্রসারণ করার জন্য অর্থসাহায্য দিতে সক্ষম হব। এমনটি হলে, আমাদের বিশ্বাস যে তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশগুলিতে 'ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প' চালু হতে পারবে। নানান দেশে আমাদের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে, তা প্রত্যক্ষ করে দাতা-সংস্থাগুলির দ্বিধা সংশয় দূর হয়ে যাবে। তারা পূর্ণ সমর্থন সহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

আমাদের একশো মিলিয়ন ডলার চাহিদার প্রস্তাব দাতা সংস্থাদের কাছে জানিয়ে রাখলাম। কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না। "রেজাল্টস" নামক নাগরিক গোষ্ঠী আমেরিকা, কানাডা, জাপান, জার্মানি ও ইংল্যান্ডে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। এই সব দেশের আন্তর্জাতিক সাহায্য-বিভাগের উচ্চপদস্থ আমলাদের সঙ্গে আমি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ গ্রহণ করতে থাকলাম। তাঁরা একবাক্যে 'গ্রামীণ ব্যাংক' ও 'গ্রামীণ ট্রাস্টের' ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কিন্তু সবারই বক্তব্য একই। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ অন্যান্য দেশে ঋণদান প্রকল্প ঋণ দেবে তার জন্য তাদের দাতা সংস্থা অর্থ বরাদ্দ করতে পারবে না। তারা অর্থ বরাদ্দ করে যে-দেশে টাকা ব্যয় হবে শুধু সে দেশের জন্য। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানকে অন্য দেশে টাকা দেবার জন্য টাকা দেয়াটা হবে তাদের জন্য নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ। তাদের সংস্থার দেশভিত্তিক ডেস্ক আছে। এক একজন কর্মকর্তা এক বা একাধিক দেশের জন্য অর্থ বরাদ্দের দায়িত্বে আছে। গ্রামীণ ট্রাস্টের কাছে কিছুতেই এই দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া যাবে না।

আমলাতন্ত্রের জটিল পদ্ধতিই যদি 'গ্রামীণ ট্রাস্ট'-এর আবেদন অগ্রাহ্য করার একমাত্র কারণ হয় তা হলে আমার বিবেচনায় অবিলম্বে সেই পদ্ধতিসমূহ সংস্কার করে তাদের উচিত পথ প্রশস্ত করা। একথা বার বার বিভিন্ন বৈঠকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম।

অবশেষে ১৯৯৪ সালে একটি ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেল কেবল মাত্র 'ইউ. এস. এইড'-এর কাছ থেকে। গ্রামীণ ট্রাস্টকে তারা ২০ লাখ ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিল। তারপর এগিয়ে এল জাতিসংঘের মূলধন উন্নয়ন তহবিল। আমরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। মনে আশা জাগল অবশেষে আমলাতান্ত্রিক নিয়মের খেয়াল অতিক্রান্ত হবার পর অন্যান্য দাতা-সংস্থাও পিছিয়ে থাকবে না।

দুর্বার আশা হৃদয়ে নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বসে বসেই কাল কাটল। কিছুই তেমন ঘটতে দেখলাম না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সপ্তম পর্ব

নতুন বিশ্ব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৩৮

হত-দরিদ্রদের সাহায্যে আগ্রহী নতুন পৃথিবী

১৯৯৩ সালের এক সন্ধ্যায় আমি বিশ্বব্যাংকের ওয়াশিংটন অফিস থেকে ফোন পেলাম। ফোনের অপর প্রান্তে ছিলেন বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাইল সেরাগেলদীন। বিশ্বব্যাংকের যে মানুষটির সঙ্গে মত বিনিময় করতে আমার কোনওদিন সমস্যা হয়নি তিনি হলেন ইসমাইল। তিনি ছিলেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রকৃত গুণগ্রাহী। জেনেভাতে আগা খান ফাউন্ডেশনের বোর্ড মেম্বার হিসেবে বহুদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। বিশ্বব্যাংকের উচ্চপদের অধিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি দরিদ্রদের জন্য মমতা ও সহানুভূতি হারাননি।

"কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? কোনও ব্যাপারে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলতে দ্বিধা করবেন না।" ইসমাইল কথা শুরু করলেন।

"ঠিক বলতে পারব না। বিশ্বব্যাংক শুধুই সরকারের জন্য কাজ করে। আপনি কি আমাদের জন্য কিছু করতে পারবেন?"

"অবশ্যই। আমরা আপনাদের জন্য কিছু করতে সবিশেষ আগ্রহী। আপনি মনে হয় আমাদের অর্থ গ্রহণ করতে চান না।"

"আপনাদের টাকায় আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের সমস্যা আমরাই সামাল দিতে পারব।"

"গ্রামীণ ট্রাস্টের জন্য প্রয়োজনীয় ১০০ মিলিয়ন ডলারের জন্য যে আবেদন করেছেন তাতে কেমন সাড়া পাচ্ছেন?"

"খুবই হতাশাব্যঞ্জক, ইউ. এস. এইড-এর দুই মিলিয়ন ডলার ছাড়া কেউই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেননি।"

"বিশ্বব্যাংকে কি এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন?"

"না পাঠাইনি। অনুমান ছিল আপনারা আগ্রহী হবেন না।"

"আগামী কালই এক কপি আমাকে ফ্যাক্স করে পাঠাতে পারবেন? আপনাদের সহায়তা করার জন্য আমি সবিশেষ আগ্রহী।"

পরের দিনই ইসমাইলকে প্রস্তাবের একটি কপি ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিলাম। সপ্তাহখানেক বাদে তিনি আমায় ফোন করলেন। তাঁর গলায় খুশির সুর। বললেন, "আপনাদের প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করে দেখেছি। সুখবর আছে। বাকি ৯৮ মিলিয়ন ডলার বিশ্বব্যাংক আপনাদের দিতে প্রস্তুত।"

"অত্যন্ত আনন্দের কথা। এ টাকা পাবার চিন্তা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত। কিন্তু সরকারকে এড়িয়ে কোন পথে এ কাজ সম্ভব? বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে ও টাকা আমাদের হাতে পৌঁছনো সহজ হবে না।

www.pathagar.com

"চিন্তা করবেন না। তাও আমরা আলোচনা করেছি। একটা উপায় বার হবেই।"

হঠাৎ আমার মনে শঙ্কার উদ্রেক হল। এ টাকা দেবার কথা ঋণের প্রস্তাব নয় তো? বিশ্বব্যাংকে অনুদান দেবার প্রথা নেই। ঋণ দিলে ট্রাস্ট কীভাবে তা পরিশোধ করবে?

আমি বললাম—"একটা বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার ইসমাইল—আপনি কি আমাদের ঋণ দিচ্ছেন, নাকি পুরোপুরি অনুদান?" ইসমাইল বললন—"৯৮ মিলিয়ন ডলারের ঋণ।"

"কিন্তু ইসমাইল, ট্রাস্ট এ টাকা কোনওদিন শোধ করতে পারবে না।"

"এই ঋণের শর্ত খুবই সহজ। সুদ তো নামমাত্র। শোধ দেবার সময়সীমাও পর্যাপ্ত। এটা অনুদানেরই নামান্তর মাত্র।" ইসমাইল বিশদভাবে বোঝাতে চাইলেন।

"কিন্তু এর কর্মপ্রক্রিয়া আমার সম্পূর্ণ জানা আছে। শীঘ্রই আপনাদের আমলারা ঋণের জন্য সরকারকে জামিনদার করতে বলবেন। অন্য দেশের প্রকল্পের স্বার্থে আমাদের সরকার কী জন্য গ্রামীণ ট্রাস্টের জামিনদার হতে রাজি হবে? একশো শতাংশ ঋণ পরিশোধ হলেও ট্রাস্ট মূল পুঁজি কখনওই উদ্ধার করতে সক্ষম হবে না। আমরা নির্দিষ্ট দেশের প্রকল্প নির্মাণ করে দিই তাদের ঋণপ্রাপ্ত অর্থের দেশীয় মূল্যমানের ভিত্তিতে। তারাও তাদের দেশীয় মুদ্রায় ঋণশোধ করে। মুদ্রার মূল্যের ওঠা নামার জন্য ট্রাস্ট ডলারের হিসেবে অনেক কম ফেরত পাবে। সহজ শর্তে ঋণ হলেও তা গ্রহণ করার কোনও উপায়ই দেখছি না।"

"আপনার যুক্তি অকাট্য। মুদ্রা বিনিময়ের হারের হ্রাস-বৃদ্ধি সত্যিই খুব সমস্যা সৃষ্টি করে।" ইসমাইল বললেন।

কিন্তু ইসমাইল অত সহজে হার মানবার পাত্র নন। তক্ষুনি বললেন, "আমরা অবিলম্বে পুরো টাকাটা আপনাকে হাতে হাতে দিয়ে দিচ্ছি। শীঘ্র বিনিয়োগ করলে আপনার আয় ভবিষ্যতের মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিপূরণ করে দিতে পারবে।"

"আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার লেনদেনের অভিজ্ঞতা আমার নেই। আমি এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।" আমি বললাম, "আপনি অভিজ্ঞ একজনকে বিশ্লেষণের ভার দিন। তিনি আমাদের বাণিজ্য পরিকল্পনা স্থির করতে সাহায্য করবেন—যাতে ট্রাস্ট ও বিশ্বব্যাংকের উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল।"

ইসমাইল কথা দিলেন। কিন্তু তাঁর বিশেষজ্ঞ বা আমার উপদেষ্টা কেউই আস্থাসূচক বা উৎসাহব্যঞ্জক তথ্য সরবরাহ করতে পারল না।

ইসমাইল আবার ফোন করলেন। "বন্ধু, আমি হাল ছাড়ছি না। এখনকার মতো আপনাকে ২ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিচ্ছি। এরপর যাতে আপনার চাহিদা মতো ১০০ মিলিয়ন ডলার দেওয়া যায় তার উপায় ঠিক খুঁজে বার করব।"

ব্যাপারটা অনেক সরল ও সহজ হয়ে গেল। সরকারি জামিনের প্রয়োজন হল না—ঋণ পরিশোধের ঝামেলাও চুকে গেল।

"আমার ধারণা ছিল বিশ্বব্যাংকে অনুদান প্রথা নেই। আপনি কীভাবে তা সম্ভব করে তুললেন?"

"বন্ধু, আমাদের কাজই হল আপনাদের কাজকে সহজ করে দেয়া। বিশ্বব্যাংকের ঋণ-তহবিল থেকে এই অনুদান দেওয়া হচ্ছে না। ব্যাংকের লাভের অংশ থেকে এই অনুদানের ব্যবস্থা করা হল। আসলে এই অনুদানের অনুমোদন করা হয়েছে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে।"

১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্ব ব্যাংকে অনুষ্ঠিত 'ক্ষুধা সম্মেলনে' বিশ্বব্যাংকের সভাপতি লুই প্রেস্টন গ্রামীণ ট্রাস্টকে এই দুই মিলিয়ন ডলার অনুদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

www.pathagar.com

* * *

যুক্তরাষ্ট্রের ‘রেজাল্টস’ প্রায়ই তার স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রামীণ ব্যাংক পরিদর্শনের জন্য নিয়ে আসে বাংলাদেশে। ঢাকায় ‘গ্রামীণ ট্রাস্ট’-এর ‘আন্তর্জাতিক ডায়ালগ প্রকল্প’-এর আওতায় এই সব সফর সংগঠিত করা হয়।

১৯৯৫ সালে এইরকম সফরের শেষ দিনে আমি ‘রেজাল্টস’-এর ২৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে ‘ক্ষুদ্র-ঋণ’ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলছিলাম। বিশ্বজুড়ে দাতা সংস্থাগুলির আমলাতন্ত্র সংক্রান্ত নানা সমস্যা ও সে ব্যাপারে আমাদের হতাশার কথা ব্যক্ত করছিলাম। ‘ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প’ চালু করতে উৎসাহীদের অনুদান ও সারা পৃথিবীতে তার বিস্তার সাধন করার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ১০০ মিলিয়ন ডলার চাহিদার আবেদনে তাদের চরম নিরাসক্তির কথাও জানালাম। তারপর বললাম,

“কেন আমাদের সর্বদা সরকারি দয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে? নাগরিক শক্তির তাহলে মূল্য কোথায়? নাগরিকদের নিজস্ব মতামত আছে, অর্থও আছে। ১ মিলিয়ন নাগরিকের প্রত্যেকে ১০০ ডলার করে দান করলে আমাদের প্রয়োজনীয় ১০০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহে বাধা কোথায়? এই ১০০ মিলিয়ন ডলার চক্রাকারে বহু সংখ্যক অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।”

আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ হতেই টেবিলের এক প্রান্তে একটি হাত উঠতে দেখা গেল। আমি তাঁকে তাঁর বক্তব্য রাখতে আহ্বান করলাম।

তিনি বললেন, “আপনার তহবিল গড়ে তোলার পরিকল্পনা আমার খুব ভাল লেগেছে। ছোট ছোট পদক্ষেপের যোগফলেই বিশাল কর্মযজ্ঞ গড়ে ওঠে। আপনার তহবিলের জন্য এই নিন আমার ১০০ ডলার।”

তাঁর হাতে চেক। আমাকে সেটা দেবার সময় করতালিতে ঘর যেন ফেটে পড়ল। আর একজন হাত তুললেন। আরেকটি চেক আরেকটি চেক। পর পর চেক আসতেই থাকল আমার হাতে। সবার কাছে চেকবই ছিল না। তাঁরা অন্যদের কাছে ধার করলেন। দেখতে দেখতে আমার কাছে জমা পড়ল মোট ২৩টি চেক। সেদিনের সংগৃহীত ২৩০০ ডলার আগামী ১০০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহের শুভ সূচনা করল।

আমি বললাম, “তহবিলের নাম হোক ‘গণ-তহবিল’। আমরা ১ মিলিয়ন আগ্রহী মানুষের সন্ধানে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাব। আমার বিবেচনায় তাদের সন্ধান পাওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়।”

ধীরে ধীরে পরিকল্পনাটি রূপায়িত হতে লাগল। ‘রেজাল্টস’-এর কর্মীদের প্রথম চেকটি দক্ষিণ ডাকোটার ডেইভ এলিসের। তিনি আমেরিকায় প্রথম বর্ষের কলেজ ছাত্রদের পাঠ্য সহায়িকা পুস্তক লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁর নিজস্ব ফাউন্ডেশন আছে। পরিকল্পনাটি ডেইভের পছন্দসই হয়েছিল। আমেরিকায় ফিরে গিয়ে তিনি পেশাদার প্রচাকরদের দিয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এক আকর্ষণীয় প্রচার-প্রকল্প প্রস্তুত করলেন। উদ্দেশ্য আমাদের ‘গণ তহবিল’-এর জন্য একশো মিলিয়ন ডলার অর্থ সংগ্রহ। এই তহবিল সূচনা করার জন্য কর-মুক্ত সংগঠনের প্রয়োজন ছিল। সেটি গড়ে তুললেন রিড ওপেনহাইমার। তিনি গায়ক ও ‘রেজাল্টস’-এর সেই ২৩ জন স্বেচ্ছাসেবকের একজন, যাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৯৫ সালে। তিনি ওকলাহামাতে ‘গ্রামীণ ফাউন্ডেশান’-নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তাকে কর-মুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি অনুমোদন নিয়ে নিলেন। আমাদের এক ঋণ গ্রহীতার সংগ্রামে প্রত্যক্ষদর্শী রিড এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তার সম্বন্ধে একটি

www.pathagar.com

গান রচনা করে বাজারে ছাড়েন। গানের নাম দেন 'নূরজাহান'। গানটি তিনি পরে সিডি-তে রেকর্ড করেন।

ফুলব্রাইট বৃত্তিধারী অ্যালেক্স কাউন্টস গ্রামীণ ব্যাংক-কে আরও ভালভাবে জানবার জন্য বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ বছর কাটান। আমেরিকায় ফিরে গেলে তিনি গ্রামীণ ফাউন্ডেশানের প্রধান কার্যনির্বাহী হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে ফাউন্ডেশানের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অ্যালেক্স গ্রামীণ ব্যাংক বিষয়ে একটি বই *গিভ আস ক্রেডিট* লিখেছিলেন, ১৯৯৬ সালে। র‍্যানডম হাউস প্রকাশনা সংস্থা এই বই প্রকাশ করে। এতে তিনি বাংলাদেশের একটি গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংকের ও শিকাগোতে ডবলিউ. এস. ই. পি-র গ্রাহকদের জীবনকাহিনী লিখেছেন। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হল এইসব মানুষদের কাহিনী পড়বার সময় কাহিনীর পটভূমিকা কোন দেশের তা খেয়াল থাকে না। এত মিল এদের বাস্তব জীবন চিত্রে।

* * *

বিশ্বব্যাংক ও ইউ. এস. এইড-এর প্রত্যেকের কাছে ২ মিলিয়ন লক্ষ ডলার ও রকফেলার ফাউন্ডেশানের কাছ থেকে ৫ লক্ষ ডলার অনুদান পেয়েছে গ্রামীণ ট্রাস্ট। এখনও আমাদের ঘাটতি ৯৫.৫ মিলিয়ন ডলার।

ইসমাইল তাঁর প্রচেষ্টা অক্লান্তভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের জন্য যে সমস্ত দেশ ইতিমধ্যেই অনুদান, ঋণ বা অর্থ সাহায্য দেওয়া শুরু করেছে এবং যে সব দেশ এ ব্যাপারে আগ্রহী তাঁদের একত্র করে তিনি এক কনসাল্ট্যাটিভ গ্রুপ গঠনের চেষ্টা শুরু করলেন।

এই পরিকল্পনা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হল। কোনও কোনও দাতাদেশ সংস্থা মনে করলেন তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারের উপর এটা বিশ্বব্যাংকের অনধিকার হস্তক্ষেপ। বার বার বৈঠকের পর ইসমাইল স্বপক্ষে সমর্থন বাড়াতে সক্ষম হলেন। ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব ১০০ মিলিয়ন ডলার অর্থ সংগ্রহ ছিল তাঁর লক্ষ্য।

আমি সর্বদাই জোরের সঙ্গে বলেছি যা করা সম্ভব সবই হবে দরিদ্রতমদের উদ্দেশ্যে। ব্যবহার করা হয় যে সমাজে যথেষ্ট সচ্ছল মানুষকেও প্রায়ই 'দরিদ্র' বলে চালিয়ে দেয়া যায়। ইসমাইল আমার এই শঙ্কাকে খুব গুরুত্ব দিল। যখন কনসাল্ট্যাটিভ গ্রুপ গঠন করা হল তখন সবাইকে বুঝিয়ে ইসমাইল এর নাম রাখল সি. জি. এ. পি. (CGAP—Consultative Group to Assist the Poorest)। পুরো 'দরিদ্রতম' কথাটির অন্তর্ভুক্তি আমাকে বিশেষভাবে আনন্দ দিয়েছিল। আমার মনে আশা জাগল এর ফলে ভবিষ্যতে অপ্রয়োজনীয় মতবিরোধের সম্ভাবনা থাকবে না।

সি. জি. এ. পি.-র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের স্থান নির্বাচনে দাতা সংস্থাগুলি, প্যারিস, রোম ইফাদ এবং ওয়াশিংটনের বিশ্বব্যাংকের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে চাইলেন। তিনটি স্থানই প্রথম বিশ্বের। ব্যাপারটি আমায় খুবই ব্যথিত করল। আমি বোঝাতে চাইলাম, প্রধান কার্যালয় হওয়া উচিত ঢাকা, কাঠমাণ্ডু, ম্যানিলা অথবা লা-পাজ এইরকম চরম দারিদ্রে নিমজ্জিত স্থানগুলির মধ্যে একটিতে।

দাতা-সংস্থাগুলি যুক্তি দিলেন, উপরোক্ত স্থানগুলিতে সংস্থা স্থাপনের উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। আমি তাদের সঙ্গে একেবারেই একমত হতে পারলাম না। তবুও প্রস্তাবিত তিনটি শহরের মধ্যে রোম বা প্যারিসের তুলনায় আমি ওয়াশিংটনের বিশ্বব্যাংক-কে নির্বাচন সমর্থন করলাম। আমার আশা হল, সেখানে কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপিত

www.pathagar.com

হলে, বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিকে দারিদ্র সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত করানো যাবে। তাদের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনও সম্ভব হবে।

ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে ১৯৯৫ সালে সি. জি. এ. পি.-র উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদান আমার কাছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এ যাবৎ 'অনুদান' প্রদানের জন্য এক তৃতীয় দুয়ার উন্মুক্ত করার জন্য বিশ্বব্যাংকের কাছে আমার সব আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়েছে। আমার প্রস্তাব কোনও গুরুত্বই পায়নি। এখন সি. জি. এ. পি. জন্ম নিয়েছে—অর্থাৎ এতদিনের প্রয়াস ভিন্ন একরূপে সফল হতে চলেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিশ্বব্যাংকে সি. জি. এ. পি. দারিদ্র দূরীকরণের এক স্থায়ী সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে। শুধু কৌশলগত ভঙ্গিমা প্রদর্শন না করে বিশ্বব্যাংক এবার হয়তো প্রকৃত কোনও কাজের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে।

www.pathagar.com

৩৯
বিশ্ব ক্ষুদ্র-ঋণ শীর্ষ সম্মেলন
২০০৫ সালের গন্তব্য ১০ কোটি গরিব পরিবার

'রেজাল্টস'-এর মুখ্য কার্যনির্বাহক স্যাম ড্যালি হ্যারিস, ইউ. এস. কংগ্রেসের কাছে প্রতিবছর স্বল্প টাকার জন্য আর্জি জানাতে জানাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। 'দারিদ্র' নামক সমস্যা যখন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং উত্তরোত্তর তার অবনতি ঘটছে, তখন শুধু সমস্যার বহিরাবরণে টোকা মেরে তাকে নির্মূল করার আশা দুরাশা।

একটা নাটকীয় কিছু ঘটা দরকার। ১৯৯০ সালে শিশু শীর্ষ সম্মেলনে, ইউনিসেফের মুখ্য কার্যনির্বাহক জিম গ্রান্টের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে স্যামের সম্যক ধারণা জন্মেছে। ওই-সময় নিউইয়র্ক সিটিতে বিশ্বের নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়েছিলেন। অবিশ্বাস্য সব লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে অঙ্গীকার স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

স্যাম ক্ষুদ্র-ঋণ শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে ওই ধরনের এক বিশাল ঘটনা ঘটাতে চাইছিলেন। আলোচ্য শীর্ষ সম্মেলনের একটা যুক্তিসংগত লক্ষ্য স্থির করার জন্য আমাদের মতামত নিচ্ছিলেন। 'ফিনকা' সংস্থার জন হ্যাচ ১৯৯৫ সালে স্যামের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—বিষয় ছিল ২০ কোটি দরিদ্রতম পরিবারের কাছে ক্ষুদ্র-ঋণের দ্বার উন্মুক্ত করার উপায় সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাভাবনা। আগামী ১০ বছরের মধ্যে বিশ্বের সব দরিদ্রতম পরিবার ক্ষুদ্র-ঋণের আওতায় আসবে। আমার বিবেচনায় সেটা অসম্ভব। এ ধরনের অবাস্তব, গগনচুম্বী লক্ষ্য কখনওই মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারে না।

আমি নিবন্ধটি সংশোধন করে লিখলাম—আগামী ১০ বছরের মধ্যে ১০ কোটি দরিদ্রতম পরিবারকে ক্ষুদ্র-ঋণের সুযোগ দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। ঠিক হল আমরা এই লক্ষ্য ভিত্তিক এক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করব। পরিকল্পনাটি অবশ্য প্রথম স্যামের মাথায় আসে।

প্রথমে আমরা ৫০০ মানুষকে এক জায়গায় সমবেত করার কথা ভেবেছিলাম। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল আমন্ত্রিতের সংখ্যা ১০০০ ছুঁতে চলেছে।

সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রস্তুত করা হয়ে উঠল খুবই দুরূহ। এ নিয়ে এতটা উত্তেজনার সৃষ্টি হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে ঘোষণা করতে চান। শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতির শুরুতে এমন মতবিরোধের পরিস্থিতি দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। স্যাম বেচারি খুবই হতাশ হয়ে পড়ল। তাকে চাঙ্গা করার জন্য সাহস দিয়ে বললাম: "ঘাবড়িও না আমাদেরকে সকল রকম দার্শনিক, প্রাতিষ্ঠানিক, শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির দূরত্বের মোকাবিলা করতে হচ্ছে—একটু উত্তেজনা তো হবেই। তবে শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

সব ঠিক হয়ে যাবে।" এটা বলা যতটা সহজ কাজটা ততটাই কঠিন। আমি তো সুন্দর সুন্দর কথা বলে হুট করে ঢাকায় চলে গিয়ে সব কিছু ভুলে যেতে পারি। কিন্তু যত ঝড়-ঝাপটা সামাল দিতে হচ্ছে স্যামকে। তার পালাবার উপায় নেই।

শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ স্থির করা অত্যন্ত জরুরি। ১৯৯৬ সালেই তা অনুষ্ঠিত করার ইচ্ছা আমাদের সকলেরই। সম্মেলন হবে একটি হোটেলে। পছন্দসই হোটেল নির্বাচন করতে হবে। সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হল অংশগ্রহণকারীর প্রকৃত সংখ্যা আনুমানিক কতজন হবে? প্রত্যেকেই মতামত জানালেন। আমার অনুমান ৩০০০ জনের কাছাকাছি মানুষ অংশগ্রহণ করবেন। শুনে সবাই বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে গেলেন।

"আপনি ঠাট্টা করছেন।" সবাই সমস্বরে বলে উঠল। "না, একেবারেই ঠাট্টা নয়", আমি জবাব দিলাম, "গ্রামীণ ব্যাংক সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। অতএব ৩০০০ জনের আয়োজন রাখতেই হবে। না হলে সুষ্ঠুভাবে সম্মেলন চালানো যাবে না। সব মিলিয়ে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।"

স্যাম তৎপর হলেন, ওয়াশিংটন শহরের সব হোটেলে ফোন করে খোঁজ নেওয়া হল। ৩০০০ মানুষের উপযোগী স্থান সংকুলান কোথায় কোথায় আছে। সেখানে অন্তত ৫০টি সেমিনার রুম থাকা আবশ্যিক।

একটির খোঁজ পাওয়া গেল। আমরা ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে বরাদ্দ চাই শুনে কর্তৃপক্ষ জানালেন ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সে হোটেলে সব কামরা আগে থেকে সংরক্ষিত আছে। এখন উপায়! ঘাবড়ে গেলাম। শীর্ষ সম্মেলনের জন্য ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। খুব দেরি হয়ে যাবে।

আমাদের অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত মনোভাব হোটেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়াল না। তাঁরা জানালেন ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কনফারেন্স হল খালি আছে। ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে সাধারণত কেউ সম্মেলনের আয়োজন করতে চায় না—ওই সময়টুকু তাই খালি আছে। আমরা তক্ষুনি ওই সময়টা সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সংরক্ষণের বন্দোবস্ত পাকা করার জন্য অগ্রিম টাকা জমা দেওয়া আবশ্যিক। স্যামের উপর টাকা জোগাড়ের দায়িত্ব পড়ল।

সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়নি। তাড়াহুড়োর মধ্যে প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত হল। কিন্তু আমি তাজ্জব বনে গেলাম বিশ্বজুড়ে ক্ষুদ্র-ঋণের অভূতপূর্ব সমর্থন দেখে। অবশেষে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ফেব্রুয়ারি মাসের ২ থেকে ৪ তারিখ পর্যন্ত। বিশ্বের দরবারে আমাদের আবেদন এত অভাবনীয় সাড়া জাগানো সাফল্য নিয়ে আসবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ১৩৭টি দেশ থেকে তিন হাজার মানুষ ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে সমবেত হয়েছিলেন।

এই শীর্ষ সম্মেলনে তিনজন সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। আমেরিকার ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিন্টন, স্পেনের রানি সোফিয়া ও জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. সুতোমু হাতা। সবাই বলিষ্ঠ অথচ আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন।

এই সমাবেশকে হিলারি ক্লিন্টন 'আজকের পৃথিবীর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ' বলে ভূষিত করলেন। তিনি বললেন,

"ক্ষুদ্র-ঋণ ব্যক্তি মানুষকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সুযোগই দেয় না। গোটা সমাজের কাছে এর উপযোগিতা অসীম। ক্ষুদ্র-ঋণ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকের পৃথিবীতে আমরা কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে। ডেনভার বা ওয়াশিংটনে খোরপোষ ভাতার গ্রহীতারা

www.pathagar.com

অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের এবং আমাদের সকলের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশ বা ভারতের মানুষকে দারিদ্রের কবল থেকে উদ্ধার করলে গোটা সমাজ তার সুফল ভোগ করবে। ক্ষুদ্র-ঋণ এই সত্য আমাদের সামনে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। এর ফলে গণতন্ত্রের উর্বর জমি তৈরি হয়, যেখানে মানুষ বাঁচতে পারে, উন্নতি করতে পারে কারণ এই অবস্থায় মানুষের সামনে রয়েছে ভবিষ্যতের আশার আলো। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী সমাবেশের সভাপতি হয়েছিলেন। মঞ্চে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মালির রাষ্ট্রপতি আলফা উমর কোনারে, উগান্ডার রাষ্ট্রপতি ওয়াই. কে. মুসেবেনি, মোজাম্বিকের প্রধান মন্ত্রী পি. এম. মোকামবি, পেরুর রাষ্ট্রপতি আলবার্তো ফুজিমোরি, স্পেনের রানি সোফিয়া, জাপানের ড. সুতোমু হাতা, মালয়েশিয়ার ফার্স্ট লেডি ড. সিটি হাসমা ও আমি।

বিদ্যুৎ চমকের মতো সূচনা হল পৃথিবীর এক অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনার। শীর্ষ সম্মেলনে দাতাসংস্থার কাউন্সিল, করপোরেশনের কাউন্সিল, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিল, ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি পরিচালকদের কাউন্সিল, সরকারি প্রতিনিধিদের কাউন্সিল, পার্লামেন্ট সদস্যদের কাউন্সিল, এন জি ও কাউন্সিল, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কাউন্সিল, ইত্যাদি পৃথক পৃথক বিশেষ বিশেষ বিষয়ের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষুদ্র-ঋণের ইতিহাসে এ এক মহাকাণ্ড। ওই তিন দিনে, এক স্থানে বলতে গেলে সারা পৃথিবীর মিলন ঘটেছিল। বিভিন্ন নেতা ও ক্ষুদ্র-ঋণের প্রবক্তাদের বক্তৃতা শুনে, বহু বন্ধু, সহকর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয়েছিল তা দেখে আনন্দে আমার দু' চোখ ভরে পানি এসে গেল। আমাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই জাতীয় শক্তি বা উদ্যম যদি আগামী ন' বছর সঞ্জীবিত রাখা যায়, তাহলে সম্মেলনে যে লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে শুধু পৌঁছবই না, তা পেরিয়েও চলে যেতে পারি আমরা।

আমেরিকান অর্থ মন্ত্রী রবার্ট রুবিন, বিশ্বব্যাংকের সভাপতি জেমস উলফেনসন, ইউ. এন. ডি. পি.-র প্রশাসক গাস স্পেথ, ইউ. এন. এফ. পি.-এর মুখ্য কার্যনির্বাহক ড. নাফিস সাদিক, ইউনিসেফের মুখ্য কার্যনির্বাহক ক্যারল বেলামি, ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ফেডরিকো মেয়র, কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি হিউগেট লাবেল, ইউ. এস. এ. আই. ডি.-র প্রশাসক ব্রায়ান অ্যাটউড, ইফাদের প্রেসিডেন্ট ফৌজি আল সুলতান—প্রত্যেকে প্ল্যানারি অধিবেশনে অসাধারণ বক্তৃতা দিলেন।

প্রতিটি বক্তার বক্তৃতার সারমর্ম ছিল এক। ক্ষুদ্র-ঋণের মাধ্যমে দারিদ্রের সঙ্গে মোকাবিলা ও তা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে আপসহীন অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করলেন সবাই।

সমর্থকদের কাউন্সিলের সভাপতি বেলা আবজুগ সকলকে মাতোয়ারা করে দিলেন। তিনি বললেন, "আজ আমরা এখানে যে কাজের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছি তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম। পথ যতই খাড়াই হোক, পদক্ষেপ যতই কষ্টসাধ্য হোক, যাত্রা যতই হতাশাব্যঞ্জক হোক, আমাদের হাল ছেড়ে দিলে, ভেঙে পড়লে চলবে না।"

প্রতিনিধিরা সমবেত করতালিতে তাঁকে সোৎসাহ সমর্থন জানালেন। বোঝা গেল লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত তাঁরা পরাজয় স্বীকার করবেন না বা উদ্যম হারাবেন না।

সম্মেলনে বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল কাজ। বিশ্বজুড়ে সব ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচিগুলির সামনে তখন বিরাট কর্মযজ্ঞ। কর্ণধাররা তারই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন।

'ক্ষুদ্র-ঋণ' এতকাল ছিল কয়েকজন মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সম্মেলন তাকে সেই গণ্ডির বাইরে নিয়ে এল। ক্ষুদ্র-ঋণ হয়ে উঠল সারা বিশ্বের আলোচ্য

www.pathagar.com

বিষয়। এক কথায় ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প এক নতুন মাত্রা পেল। নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এটা হয়ে দাঁড়াল সারা বিশ্বের একটা সুদৃঢ় কর্মসূচি।

* * *

ভাবলে বিস্ময় জাগে—জীবন আমাদের কী রহস্যময় গন্তব্যের নিশানায় পরিচালিত করে। আমাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত ক্ষমতার চরম বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে, যা ছিল আমাদের একান্ত অগোচর। স্বপ্নেও যার কল্পনা করা যায় না। ক্ষুদ্র-ঋণের ঋণগ্রহীতারা জন্ম থেকে নিজেদের অপদার্থ, অস্তিত্বহীন বলে মেনে নিয়েছিল। এই সম্মেলন তাদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান করে দিল। বিশ্বের সার্বিক উন্নয়নের সংগ্রামে তাদের বীরাঙ্গনার ভূমিকায় বরণ করল। বক্তার পর বক্তা তাদের অসীম ধৈর্য ও কর্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। সামান্যতম পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে সম্মানীয় জীবন যাপনের অনমনীয় মনোবলের জয়গান করা হল। যে কঠিন অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় তার সঙ্গে লড়বার সাহস ইতিহাসের যে কোনও খ্যাতনামা বীরের সঙ্গে তুলনীয়।

অর্থনীতির অধ্যাপনা করতে গিয়ে টাকা সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞানার্জন হয়েছে। বর্তমানে একটি ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে আমি টাকা ধার দিয়ে থাকি। কতকগুলি দলা পাকানো টাকার নোট আমাদের দরিদ্র সদস্যদের হাতে পৌঁছে দেবার উপর নির্ভর করে আমাদের সাফল্য। দুর্ভাগ্যবশত টাকার দ্বারা ও টাকার জন্য চারিদিকে যে অসংখ্য 'ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্প' গড়ে উঠেছে তার আসল উদ্দেশ্য টাকার সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই প্রকল্পের গোড়ার কথা হল মানুষকে নিজের সুপ্ত ক্ষমতা আবিষ্কারের সুযোগ করে দেওয়া। নগদ পুঁজি এর সম্বল নয়—এর শক্তির উৎস হল মানবিক শক্তির অনন্ত ভাণ্ডার। মানুষের স্বপ্নের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করতে টাকা সামান্য যন্ত্র মাত্র। এই গ্রহের অসংখ্য দরিদ্রতম ও ভাগ্য নিপীড়িত মানুষের হৃত ও লুণ্ঠিত আত্মসম্মান ও জীবনের অর্থ খুঁজে বার করতে যতটুকু দরকার ততটুকু ভূমিকাই টাকা পালন করে থাকে।

আমরা একটি ব্যাংক চালাই। ওটা আমাদের উসিলা বা ভান যা খুশি বলতে পারেন। আত্মসম্মান, আনন্দ ও সার্থকতা অর্জন করতে, অর্থপূর্ণ জীবন গড়ে নিতে দরিদ্রতম মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াই আমাদের ঋণ দানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এই সব অধিকার তারা নিজেরাই অর্জন করে নিজেদের শ্রম, উদ্যম ও স্বপ্ন দিয়ে। নিম্নশ্রেণীভুক্ত এদের, এতকাল মনুষ্য পদবাচ্য বলে গণ্য করা হত না। সামাজিক পরিকাঠামোর গলদই এর জন্য দায়ী। তা নির্মূল করা আমাদের লক্ষ্য। তারা তাদের পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করলে পৃথিবী সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যাবে। শুধুমাত্র দারিদ্রের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে তাই নয়—গতকাল অবধিও যারা ফুটপাতে শুয়ে থাকত, ভিক্ষাবৃত্তি করত, বা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভবঘুরের মতো আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত, তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দ্বারা ঘটবে বিশ্বের পুনর্নবীকরণ।

দারিদ্র পৃথিবীর প্রাচীনতম সমস্যা। এত যুগ পর এই তৃতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে এর সমাধান নিয়ে কিছু করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে কেন? কেন ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পের শীর্ষ সম্মেলন নামক সক্রিয় এবং সুদৃঢ় কর্মযজ্ঞের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে হাই স্কুলের একজন সংগীত শিক্ষক স্যাম ও তার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে? যেসব রাজনৈতিক দল তাঁদের আলোচ্য বিষয়সূচিতে এই জাতীয় প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেবেন, আমরা কেন তাঁদের নির্বাচিত করি না?

www.pathagar.com

* * *

শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে যখন আমার বক্তব্য রাখার পালা এল আমার মনে পড়ল জোবরা গ্রাম ও আমার প্রথম ঋণগ্রহীতাদের কথা। কীভাবে তারা আমার মতো উড়ন্তপাখির-চোখে-দেখতে-অভ্যস্ত অর্থনীতিবিদের চোখকে, যিনি এতদিন ক্লাসে শুধু অর্থনীতির সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি ছাত্রদের পড়িয়ে এসেছেন, তাঁর দৃষ্টিকে মাটির উপরে ঘুরে বেড়ায় এমন পোকার চোখকে পরিণত করে দিল তা বুঝতেই পারিনি।এর ফলে হয়তো পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা হয়ে উঠল এমন যা মানুষের জীবনে সত্যিকারের চিরস্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক হতে পারে। আমার স্মৃতিতে অনেক কথাই একসঙ্গে ভেসে উঠেছিল।

অন্তরের অন্তঃস্থলে গভীর আবেগ অনুভব করলাম। একটা বিরাট সম্ভাবনার বীজ বপনের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে এই মুহূর্তে, ওয়াশিংটন ডি. সি.-র বলরুমে আমরা যথেষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্বকে একত্র করতে সক্ষম হয়েছি যা বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। লক্ষ কোটি দরিদ্র মানুষ উন্মুখ হয়ে রয়েছে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটার জন্য যার ফলে তারা স্বনির্ভর হয়ে সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারবে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বলতে শুরু করলাম—

"আজ আমরা যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছি তাঁদের সবার কাছে আমার প্রশ্ন হল, ক্ষুদ্র-ঋণ বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন কেন? এটা কি নিছক ওয়াশিংটন শহরে অনুষ্ঠিত আরেকটি মহা-সম্মেলন মাত্র?

এই সম্মেলন আমার কাছে একটি অত্যন্ত আবেগবিহ্বল ঘটনা। আমার বিশ্বাস এখানে উপস্থিত অনেকেরই মনোভাব এইরকম। আমরা বহুদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই দিনটি প্রস্তুত করেছি। অবশেষে আমাদের প্রয়াস সার্থকতা লাভ করেছে। আমি সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাব আমাদের লক্ষ লক্ষ গ্রাহকদের এবং আমাদের হাজার হাজার কর্মীদের। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতির যে বিরাট ভুলের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসহনীয় মানবিক যন্ত্রণার ইতিহাস, যা সহজেই এড়ানো সম্ভব ছিল, সেই ভুল শোধরাবার আন্তরিক আশায় এই কর্মীরা প্রতিদিন হাড়ভাঙা খাটুনি করে যাচ্ছে।

আজকের দিনটি আমার কাছে উৎসবের দিন। জামানতের ক্রীতদাসত্ব থেকে ঋণকে মুক্ত করার উৎসব এটা। অর্থনৈতিক বর্ণবৈষম্যদের যুগকে বিদায় ঘোষণার জন্যই এই শীর্ষ সম্মেলন এই সম্মেলনের মুখ্য ঘোষণা: অন্নের মতো ঋণ মানুষের অধিকার। ঋণ বাণিজ্যের চাইতেও বড় জিনিস।

এই সম্মেলনের লক্ষ্য হবে এমন পৃথিবী প্রতিষ্ঠা যেখানে দরিদ্র মানুষ তার সৃজনশীলতা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টাকে বিকশিত করার সুযোগ পাবে। এই শীর্ষ সম্মেলন প্রতিটি মানুষকে নিজ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার সাহস জোগাবে। নিশ্চয়তা দেবে।

লক্ষ লক্ষ দৃঢ়সংকল্প মহিলা ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পে প্রবেশ করে চরম দারিদ্রময় জীবনকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে নতুন জীবন তৈরি করতে সক্ষম করেছেন—জীবনে স্বনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সম্মেলন তাদেরই বিজয় ঘোষণা করার মাঙ্গলিক উৎসব।

এই বিজয়ী মহিলাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও ১০ কোটি দরিদ্রতম মহিলার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করাই হবে এই শীর্ষ সম্মেলনের সার্থকতা।

তহবিল সংগ্রহ এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য নয়। আবার পুনরাবৃত্তি করি, তহবিল সংগ্রহ করার জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়নি। বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা যে শুভ সংবাদসমূহ সৃষ্টি করেছি সেগুলি একত্র গেঁথে সারা দুনিয়াকে অনুপ্রাণিত করার জন্যই এই

www.pathagar.com

শীর্ষ সম্মেলন। ইচ্ছাশক্তি ও সৃজনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে পৃথিবী থেকে দারিদ্রের অবসান ঘটানোর প্রস্তুতি নেয়াই হল এই সম্লেন।

আজ থেকে মাত্র একশো বছর আগেও মানুষ আকাশে উড়বার উপায় আবিষ্কারের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। তখন অনেকেরই ধারণা ছিল মানুষের পক্ষে উড়া একেবারেই অসম্ভব। যাঁরা এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা করতেন তাঁদের সবাই 'পাগল' আখ্যা দিত। ১৯০৩ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম এরোপ্লেন ওড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। মাত্র ১২ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়েছিল সে উড়ান। হ্যাঁ, মাত্র ১২ সেকেন্ড। দূরত্ব অতিক্রম করেছিল মাত্র ১২০ ফুট। কিন্তু সেই মুহূর্তে পৃথিবীতে নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল। এই ঘটনার মাত্র ৬৫ বছর বাদে মানুষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করেছে, চাঁদের পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে পৃথিবীতে। টেলিভিশনের পর্দায় সারা পৃথিবী সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের ছবি প্রত্যক্ষ করেছে।

ক্ষুদ্র-ঋণের ক্ষেত্রে আমরা এখন রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো প্রথম বারের এরোপ্লেন ওড়াবার চেষ্টা করছি—কোথাও ১২০ ফুট, কোথাও বা ৫০০ ফুট। কেউ বা আমাদের বিমানে নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছেন। কেউ বলছেন আমাদের বিমান বিতিকিচ্ছি। কেউ বলছেন এরকম বিমান দিয়ে কোনও কাজ হবে না। আমরা আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন আপনাদেরকে আমাদের বোয়িং এবং আমাদের কনকর্ডে চড়াতে পারব। আমাদের বুস্টার রকেট আপনাদেরকে মহাশূন্যে নিয়ে যাবে।

সভ্য মানব সমাজে দারিদ্রের আর কোনও স্থান থাকবে না। দারিদ্রের নমুনা বা চিহ্নগুলি তখন থেকে জাদুঘরে শোভা পাবে। সেই উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন।

যেদিন রাইট ভ্রাতৃদ্বয় মাত্র ১২ সেকেন্ড উড়তে পেরেছিলেন তার থেকে ৬৫ বছর পর মানুষ চাঁদে অবতরণ করতে পেরেছিল। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে, এই সম্মেলনের ৬৫ বছর পর আমরাও চাঁদে পৌঁছাব। আমাদের চাঁদ হবে দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করা। আমরা সেখানে অবশ্যই পৌঁছাব।

আমাদের চন্দ্রযাত্রা সফল হবে। আমাদের গন্তব্য হল দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী।

আজ এই সম্মেলন কক্ষে যে মহাশক্তির সঞ্চার হয়েছে তা আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারছি। যদিও আমার গন্তব্য এখনও বহুদূরে, তবুও আমার আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়, আসুন আমরা সবাই মিলে সেই পৃথিবী গড়ার কাজে লেগে যাই। ধন্যবাদ।"

আমার বক্তব্য শেষ করে আমি সমবেত শ্রোতাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। উপলব্ধি করছিলাম প্রচণ্ড করতালির ধ্বনিতে ঘর ভরে গেছে। কিন্তু আমার কানে সেই শব্দ পৌঁছতে পারছিল না। শুধু অন্তরের গভীরে ধ্বনিত হচ্ছিল বিশ্বের লক্ষ লক্ষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানবাত্মার সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, "আমরা পারব। এই অসম্ভব ও পাগলপ্রমাণ উচ্চাশা ও অচিন্ত্যনীয় স্বপ্ন আমরা সফল করে তুলব। দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী আমরা সৃষ্টি করবই।"

www.pathagar.com

৪০
দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী : কখন? কীভাবে?

আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীর কেমন চেহারা হবে?

'আগামী শতাব্দী' শব্দটি আমরা এমনভাবে উচ্চারণ করলাম যেন তা শুধুমাত্র ভবিষ্যতের দশ-বিশ বছরের কথা। ভুললে চলবে না একশত বছর নিয়ে হয় একটি শতাব্দী। আগামী ১০০ বছরে পৃথিবী বা মানুষের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে তা নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতা কারুর নেই। পৃথিবী পালটে যাচ্ছে। সময়ের তালে তালে পৃথিবী অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যাবে। এই পরিবর্তনের গতি কখনই শ্লথ হবে না, বরং দ্রুত থেকে দ্রুততর হবে একথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের সব আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও জ্ঞানকে একত্র করলে যা দাঁড়ায় তার তুলনায় আগামী ৫০ বছরের মধ্যে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের আয়তন কয়েকগুণ বড় হয়ে যাবে। এই জাতীয় অবিশ্বাস্য গতি ও পরিবর্তনের পথেই এগোচ্ছি আমরা।

বর্তমান সময়কে যদি কোনওক্রমে একশো বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারি, মনে হবে আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ পরিক্রমা করছি।

২৫ বছর পরে পৃথিবীর রূপ কল্পনা করতে গেলেও আমাদের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচনা করা ছাড়া উপায় নেই।

পরিবর্তনের গতিবেগ ত্বরান্বিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অজানাকে জানবার আকণ্ঠ পিপাসা, বাণিজ্যক্ষেত্রে নবতম প্রযুক্তি প্রয়োগের উদ্যোগ, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামরিক অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা—সব কিছু এই পরিবর্তনের গতিকে দ্রুত থেকে দ্রুততর করছে। আসল প্রশ্ন হল এই পরিবর্তনগুলি মানবজাতিকে আশানুরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিতে পারবে কি? নাকি গন্তব্যে পৌঁছানোকে আরও দুর্গম করে তুলবে?

উত্তর সন্দেহাতীত। আমরা যদি সবাই নিজেদেরকে 'পৃথিবী' নামক এক মহাকাশযানের যাত্রী বলে বিবেচনা করি তা হলে দেখতে পাব, আমাদের চালক নেই, পথনির্দেশক নেই। যাত্রা আমাদের লক্ষ্যহীন। যদি নিজেরাই চালকের আসন গ্রহণ করি ও এই যানকে নির্দিষ্ট আর্থসামাজিক গন্তব্যে পৌঁছে দিতে দৃঢ়সংকল্প হই, তাহলে আমাদের যাত্রা সফল হবেই। পথে নানা ভুলভ্রান্তি ঘটতে পারে, এমনকী পথ পরিবর্তন করতে হতে পারে, তবুও আমরা কখনই লক্ষ্যচ্যুত হব না।

গন্তব্য একেবারে স্পষ্টরূপে বা নির্ভুলভাবে না জানলেও অন্তত মোটামুটিভাবে জানা খুবই জরুরি। নির্দিষ্ট গন্তব্যের অবিরত অনুসন্ধানের কাজে ব্রতী হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গড়ে তুলতে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

গন্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হলে অনেক কিছুর প্রবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা

www.pathagar.com

সম্ভব। তা হবে আমাদের যাত্রাপথের সহায়ক। কোনও কিছু সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার আগে সে সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখতে শিখতে হবে আমাদের। আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখার অর্থই হল আমাদের গন্তব্যের ঠিকানা রচনা করা।

* * *

২০৫০ সালে পৃথিবীর চেহারা কেমন হবে সেটা বড় প্রশ্ন নয়, বড় প্রশ্ন হচ্ছে ২০৫০ সাল নাগাদ আমরা পৃথিবীকে কোথায় নিয়ে যেতে চাই সেটা স্পষ্টভাবে জানা।

আমার স্বপ্ন হল, এই সাল আসার আগেই পৃথিবীকে দারিদ্রমুক্ত করা। এরপর কখনও একজন মানুষকেও 'গরিব' বলে চিহ্নিত করতে না হয়। ২০৫০ সালের পর যেন 'দারিদ্র' কথাটি হয় সম্পূর্ণ অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক। শুধু অতীতের প্রসঙ্গ আলোচনার সময় শব্দটির উল্লেখ হতে পারে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দারিদ্রকে প্রত্যক্ষ করবে জাদুঘরে।

কোনও সভ্য মানব সমাজে দারিদ্রের স্থান থাকা অত্যন্ত লজ্জাজনক। জাদুঘরই এর প্রকৃত স্থান বলে গণ্য হওয়া উচিত। স্কুলের ছাত্ররা যখন শিক্ষকদের সাথে দারিদ্রের জাদুঘর পরিদর্শনে যাবে, তখন তারা মানুষের যন্ত্রণা ও অসম্মানের দৃষ্টান্ত দেখে শঙ্কায় বিহ্বল হয়ে যাবে। একুশ শতকের প্রথম অর্ধেকাংশ পর্যন্ত বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর এই অমানবিক যন্ত্রণাময় অবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে দেবার জন্য, এই অবস্থা পরিবর্তনে নিশ্চেষ্ট থাকার জন্য, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ধিক্কার দেবে।

* * *

দারিদ্র দূরীকরণের পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার সর্বদাই মনে হয়েছে সবচেয়ে উপযুক্ত পথের নিশানা লুকিয়ে রয়েছে মানুষের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে। বর্তমান কালেও আমরা দারিদ্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিই না, যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে আমরা এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত নই। আমরা দরিদ্র নই। অতএব এই সংকট থেকে আমরা সযতনে গা বাঁচিয়ে চলি। নিজেদেরকে বিবেক দংশনের জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমরা নানা যুক্তি খাড়া করে রাখি। আমরা এই ভেবে আশ্বস্ত বোধ করি যে গরিব মানুষ আরও পরিশ্রম করলে আর গরিব থাকত না।

আমাদের কাছে গরিবদের সাহায্য করার অর্থ হল তাদের প্রতি দয়া বা দাক্ষিণ্য দেখানো। সমস্যাকে সম্যকভাবে এড়িয়ে চলতে চাই বলে আমরা দাক্ষিণ্যের পন্থা অবলম্বন করি। দাক্ষিণ্য হতভাগ্য মানুষগুলি সম্পর্কে আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করে নিজেদের দৈনন্দিন কাজ নিয়ে থাকার পথকে মসৃণ করে দেয়। দাক্ষিণ্য আমাদের বিবেকের আঘাত প্রশমিত করে। অশান্তি দূর করে।

দারিদ্র নিরসনে দাক্ষিণ্য আসল বিষয় নয়, আসল বিষয় হল সবার জন্য সমতল খেলার মাঠ তৈরি করা। প্রত্যেক মানুষকে সমান সুযোগ করে দেওয়া।

* * *

সমাজ সবাইকে সমান সুযোগ দেবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে কিন্তু 'দারিদ্র' নামক সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। গরিবদের অবস্থা এখনও অসহায়—মূলত রাষ্ট্রের দয়ার

www.pathagar.com

উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র তৈরি করেছে বিশাল আমলাতন্ত্র, দরিদ্রদের সমস্যা দেখাশুনা করার জন্য। বিচিত্র তাদের নিয়ম ও কর্ম পদ্ধতি। করদাতাদের করের সিংহভাগ বরাদ্দ থাকে দরিদ্র মানুষের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত কর্মসূচিতে ব্যয় করার জন্য।

রাষ্ট্রের যতই সদিচ্ছা থাকুক তা কখনওই সব মানুষের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। কল্যাণ ভাতাপ্রাপ্ত পরিবারের সন্তানরা কল্যাণ ভাতার দাক্ষিণ্যে বেড়ে ওঠে। তাদের জীবন কাটে করুণার দানের উপর নির্ভর করে।

পরিবর্তন হল নিরলস প্রচেষ্টার ফসল। পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে উদ্যমের তীব্রতা ও নিষ্ঠা। প্রলোভনভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিবর্তনও হবে প্রলোভন-চালিত। অর্থাৎ সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটবে না। সমাজের যা প্রয়োজন তা ব্যক্তিস্বার্থ লালসা চরিতার্থ করার পক্ষে আকর্ষণীয় নাও হতে পারে।

এই জন্যই প্রয়োজন সমাজ সচেতন সংগঠনের। রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের উচিত এই সব সংগঠনকে সবরকমভাবে সাহায্য করা, অর্থ ও অন্যান্য রসদের সরবরাহ অটুট রাখা।

নতুন কিছু প্রবর্তনে, প্রযুক্তিগত অভিযোজনে ও উন্নয়নে উদ্যোগী হবে। এই প্রতিষ্ঠান সমূহকে নজর রাখতে হবে প্রলোভনতাড়িত অর্থনীতিতে প্রযুক্তিতে যে বিবর্তন আসবে সেটা যেন সমাজকে ভুলপথে ঠেলে না-দেয়।

* * *

প্রযুক্তিক্ষেত্রে যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে নতুন একটি প্রযুক্তি দুনিয়াকে খুব দ্রুত মৌলিকভাবে পরিবর্তিত করে দেবে শিগগিরই। পৃথিবীর ইতিহাসে এর সঙ্গে তুলনা চলে এরকম কিছু কখনও ঘটেনি। এই প্রযুক্তিকে মোটামুটিভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই প্রযুক্তির সম্প্রসারণের গতি বিস্ময়কর।

ইন্টারনেটের কথা ধরা যাক। এর প্রসার ঘটছে বিদ্যুৎ-গতিতে। এই গতি অব্যাহত থাকলে শিগগিরই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের একটি করে ই. মেল ঠিকানা থাকবে।

তথ্য ও যোগাযোগের এই প্রযুক্তির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল এই সেবা কারও নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল নয়। সরকার, বাণিজ্যিক মহল বা অন্য কোনও শক্তিরই ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের পথ অবরোধের ক্ষমতা নেই। আরও ইতিবাচক সংবাদ হল, দিন দিন এর ব্যবহারের খরচ কমে যাচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগের প্রযুক্তির সম্প্রচার আমাদের মনে আশা জাগাচ্ছে যে ধীরে ধীরে পৃথিবী, ক্ষমতা ও তথাকথিত জ্ঞানের দালালদের খপ্পর থেকে মুক্ত হতে চলেছে। এখন থেকে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছার দাম দেওয়া হবে। মানুষ হয়ে উঠবে সম্পূর্ণভাবে নিজেরই আজ্ঞাবহ। কোনও কর্তৃপক্ষ মাথার উপর ছড়ি ঘোরাতে পারবে না। সুবিধাবঞ্চিত ও সংখ্যালঘু মানুষগুলির কাছে এ খবর অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ও আশাব্যঞ্জক।

তথ্যের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ রাখার যুগ শেষ। ক্ষমতা এখন বিভাজিত হতে শুরু করেছে। একজন সরকার প্রধানের কাছে যত তথ্য থাকবে এখন একজন সাধারণ মানুষের কাছেও সে পরিমাণ তথ্য থাকা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তথ্যের কেরামতি দেখিয়ে এখন কেউ নেতা হতে পারবে না। নেতা হবে দূরদর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে।

www.pathagar.com

* * *

আমার মতে তথ্য ও যোগাযোগের প্রযুক্তির লক্ষ্য কোন দিকে হওয়া উচিত?

আমার বিবেচনায় সব তথ্য সব মানুষের কাছে সমানভাবে প্রাপ্য উচিত। নিরক্ষর, দরিদ্রতম, অজ্ঞ, ক্ষমতাহীন মানুষ যিনি যত দূরেই থাকুক না কেন, সর্বদা প্রায় নিখরচায় এই সুযোগের অধিকার পাওয়া উচিত।

পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে দূরবর্তী দু'টি মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার এত উন্নতি হওয়া উচিত যাতে করে মনে হয় দুই বন্ধু পার্কের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে গল্পগুজব করছে।

শিক্ষা ও সামাজিক সকল প্রতিষ্ঠানকে জ্ঞান ও তথ্যকে দূর দূরান্তে সম্প্রচারিত করার কেন্দ্রে রূপান্তরিত হতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ মূলমন্ত্র হওয়া উচিত প্রতিটি পদক্ষেপে বিশ্বজনীন এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে করে প্রতিটি মানুষের সীমাহীন, উদ্ভাবনশক্তি বুদ্ধি ও উৎপাদন ক্ষমতা বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

ব্যক্তিগত আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী যে-কোনও মানুষ যে-কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে এমন সুযোগ থাকা আবশ্যিক। তার পারিবারিক বা শৈশব পটভূমি, নিবাস বা অর্থনৈতিক অবস্থা বা বাসস্থানের দূরত্ব যেন এই পথে কোনও বাধা সৃষ্টি না করতে পারে।

তথ্য প্রযুক্তির কারণে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ পালটে যাবে এর কারণে চিন, ইথিওপিয়া বা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের কোনও গরিব ঘরের সৃজনশীল মেধাবী ছাত্র, যে কখনও কোনও শহর পর্যন্ত দেখবার সুযোগ পায়নি, তার গ্রাম ত্যাগ না-করেই পৃথিবীর অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো চালিয়ে করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

* * *

ক্ষুদ্র ঋণের নিশ্চিত সুযোগ প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তের দরিদ্রতম পুরুষ নারীর নিকট তথ্যপ্রযুক্তির সার্বিক সুবিধা পৌঁছানোই হবে দারিদ্রকে হঠানোর দ্রুততম ও উৎকৃষ্টতম উপায়। দরিদ্রদের কাছে ঋণ বা তথ্যপ্রযুক্তি পৌঁছে দেবার উপর জোর দেবার অর্থ এই নয় যে অন্য সকল উদ্যোগ ও বিনিয়োগ বন্ধ করে দিতে হবে। এগুলো সবই পরিপূরক কর্মপন্থা, কখনওই একে অপরের বিকল্প নয়।

* * *

আমার বিবেচনায় আরও একটি প্রাপ্তি অত্যন্ত জরুরি। তা হল গরিব মানুষের এবং গরিব দেশের মুক্ত বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার। গরিব দেশের বাজারে প্রবেশ করার ক্ষেত্রেও যে বাধা ও কড়াকড়ি রয়েছে তা দূর হওয়া দরকার।

গরিবদের নাম করে প্রতি দেশে আমদানি বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়। অথচ তার সত্যিকার উপকার ভোগ করে ধনী ও সুবিধাবাদী সম্প্রদায়। প্রতিবন্ধকতার দেয়ালগুলিকে কীভাবে নিজের পক্ষে সুবিধাজনক ভাবে ব্যবহার করতে হয় এ কৌশল তাদের নখদর্পণে।

সুরক্ষিত ছোট্ট বাজারের চেয়ে বৃহত্তর বিশ্ব বাজারে গরিবদের সুযোগ-সুবিধা অনেক

www.pathagar.com

বেশি। পণ্য, অর্থ ও মানুষের গতিবিধি অবাধ প্রতিবন্ধকতার পর্ব ডিঙিয়ে মুক্ত অর্থনীতিতে প্রবেশকালটা বড় কঠিন পরীক্ষার সময়। উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে না-ঢুকলে হিতে বিপরীত হতে পারে। শুধু গরিবই নয়, সবারই উপকার।

দেশের চারিদিকে উঁচু প্রাচীর তুলে দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না। এক শতাব্দী আগে পাসপোর্ট বা ভিসার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। এসবই বিংশ শতাব্দীর সংযোজন। যে শতাব্দীতে এসবের উদ্ভাবন হয়েছে, সেখানেই তাদের ফেলে আসা উচিত। সব পরিচয়ের উর্ধ্বে থাকুক মানুষ হিসেবে আমাদের পরিচয়। এই পরিচয়েই যেন আমরা গর্বিত থাকতে পারি। তা বলে আমাদের নিজের দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে কোনও বাধা নেই। প্রাদেশিক, আঞ্চলিক, জাতীয়, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পালন করতেও কোনও বাধা নেই। কিন্তু তা করতে গিয়ে অন্যদের অমর্যাদা করা, দুর্বলের উপর সবলের অধিকার কায়েমের অভিসন্ধি অবশ্যই অত্যন্ত অন্যায়। সমগ্র মানবজাতির একতার জয়গান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধুত্বের সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করে তুলবে।

অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং তথ্যপ্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসার সীমান্তবিহীন ও দূরত্ববিহীন এক বিশ্বের সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। আমাদের উচিত অতি সমাদরে সেই বিশ্বকে স্বাগত জানানো।

বর্তমানে ইউরোপীয় জাতিরা নিজেদেরকে একত্র করে একটি অবাধ ও পরস্পরের বাধানিষেধমুক্ত একটা বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে অন্যান্য আঞ্চলিক বাণিজ্য এলাকায় এই দৃষ্টান্ত অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। আমরা যদি একে অন্যের সঙ্গে আদানপ্রদান ও অবাধ যাতায়াতে স্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করি তখন একটা অঞ্চল থেকে আন্তর-অঞ্চলে, এবং ক্রমশ সারা বিশ্বে বিস্তৃত হতে পারে। বিশ্বের যে-কোনও স্থানের মানুষ অন্য যে-কোনও স্থানে অবাধে বিচরণ করতে পারবে, অর্থ, পণ্য ও সেবা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিনা বাধায় চলাচল করতে পারবে।

নতুন অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত বাস্তবতায়, এর সঙ্গে একজন ব্যক্তি-মানুষের এবং তার তৈরি স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় "জাতীয় সরকার" বলতে আমরা কী বুঝব সেটা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। মুক্ত মানুষ দেশের রাজনৈতিক সীমানা পার হয়ে নিজের দোসর এবং বন্ধুগোষ্ঠী সৃষ্টি করবে অবলীলাক্রমে। তারা কেউ চাইবে না কোনও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বাধ সাধুক।

www.pathagar.com

৪১

দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী কেমন চেহারা নেবে

দারিদ্রহীন পৃথিবী!

যাঁদের ক্ষুদ্র-ঋণের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাঁদের কাছে যখন এই শব্দ দু'টি উচ্চারণ করি, তখন তাঁদের মুখে যে-হাসি ফুটে ওঠে, তাতে সন্দেহ বা বিদ্রূপের মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে। এমনকী ক্ষুদ্র-ঋণের সমর্থকরাও কখনও কখনও ভাবেন আমাদের এই 'অসম্ভব স্বপ্নের' রূপকল্প কেবলমাত্র নিজেদের ও কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে রাখার জন্য।

সত্যিই কি কেউ পারবে দারিদ্রমুক্ত পৃথিবীর সূচনা করতে?

কেমন হবে সে পৃথিবী?

সত্যিই কী এই কল্পনা কখনও বাস্তবায়িত হবে?

আমার কাছে "দারিদ্রহীন পৃথিবী" মানে এমন পৃথিবী যেখানে প্রতিটি মানুষ তার জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলি নিজেই মেটাতে সক্ষম এরকম পৃথিবীতে কারওর অনাহারে মৃত্যু ঘটবে না। কেউ অপুষ্টিতে ভুগবে না। দীর্ঘদিন থেকে পৃথিবীর তাবৎ নেতৃবৃন্দ এই লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার কোনও নির্দিষ্ট রূপরেখা তাঁরা আঁকতে পারেননি।

বর্তমান পৃথিবীতে অপুষ্টিজনিত রোগে প্রতিদিন চল্লিশ হাজার শিশু মৃত্যুবরণ করে। দারিদ্রমুক্ত পৃথিবীতে কোনও শিশু এভাবে প্রাণ হারাবে না।

পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মানুষ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ পাবে। তারা তা গ্রহণ করার অর্থনৈতিক ক্ষমতা বা যোগ্যতা অর্জন করবে। ক্রয়ক্ষমতার অভাবের কারণে রাষ্ট্রকে বিনামূল্যে শিক্ষা বা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে না, যা বর্তমান পৃথিবীতে চালু আছে।

যে-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে দরিদ্রদের সেবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির আর দরকার হবে না। সেসব উদ্যোগ বন্ধ করে দিতে হবে। জাতীয় বা আঞ্চলিক স্তরে, আর কোনও দরিদ্রদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত সংস্থার প্রয়োজন হবে না। সহায়ক গোষ্ঠী, লঙ্গরখানা ও খাদ্য জোগানদায়ী কুপনেরও প্রয়োজন ফুরোবে। অবৈতনিক বিদ্যালয়, বিনামূল্যে হাসপাতালে চিকিৎসা—এসবের অবসান ঘটবে। রাস্তায় রাস্তায় আর ভিক্ষুকের দেখা পাওয়া যাবে না।

রাষ্ট্রায়ত্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির অস্তিত্ব হয়ে উঠবে অর্থহীন, কারণ তখন বাঁচবার

www.pathagar.com

জন্য আর কারওর দয়াদাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে না। রাষ্ট্র চালিত রোজগার সহায়ক প্রকল্প ইত্যাদি কোনও কিছুরই আর দরকার হবে না।

দারিদ্রমুক্ত পৃথিবীর সামাজিক পরিকাঠামো বর্তমান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। কিন্তু প্রধান পার্থক্য হবে যে এই নতুন পৃথিবীতে কেউ আর পরের দয়ার উপর নির্ভরশীল থাকবে না। এই পৃথিবী দারিদ্র-জর্জরিত, সে পৃথিবী হবে দারিদ্রশূন্য।

দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী অর্থনৈতিক ভাবে বর্তমান পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হবে।

আজকের পৃথিবীতে পর্বতপ্রমাণ দারিদ্রের মধ্যে নিমজ্জমান এক পঞ্চমাংশ জনগণ তাঁরা সবাই রোজগার করে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবেন। শুধু তাই নয় তাঁরা বাজার অর্থনীতিতে অতিরিক্ত চাহিদা করবেন। যা পরোক্ষভাবে বিশ্ব অর্থনীতির উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করবে। তারা তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন ক্ষমতা নিয়ে নেমে আসবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য। তারা বিশ্বের উৎপাদনক্ষমতা বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেবে।

যেহেতু সীমিত অস্থায়ী পরিস্থিতি ব্যতিরেকে কেউ আর গরিব থাকবে না। তাই অর্থনীতির জগতে আর টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি হবে না। আমরা অর্থনৈতিক উত্থান পতনের আবর্তন অনেকাংশে এড়াতে সক্ষম হব। মানুষের নিজের সৃষ্ট বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

* * *

যদিও দারিদ্রমুক্ত পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ নিজের ও পরিবারের দায়-দায়িত্ব নিতে, চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। তবু আপদকালীন পরিস্থিতির কারণে কিছু মানুষ কিছু সময়ের জন্য বিপদগ্রস্ত ও অসহায় হয়ে যেতে পারে। দুর্যোগ আসতে পারে, দুর্ভাগ্যের শিকার হতে পারে, ব্যবসায় দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে, স্বাস্থ্যহানির কারণে সব কিছু হারিয়ে ফেলতে পারে, ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে একটি পরিবার বা একটি অঞ্চল পারে। যেমন: বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, দাঙ্গা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, ইত্যাদি। প্রথমে তাৎক্ষণিক সাহায্য, এবং পরে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সকল সাময়িক সমস্যা সমাধান করা যাবে। তার জন্য বীমা জাতীয় কর্মসূচি থাকবে, সমাজ-চেতনা-নির্ভর আর্থিকভাবে মজবুত উদ্যোগ থাকবে। ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হলে যেমন ব্যাংকের দেউলিয়া অবস্থা, বাণিজ্যিক ব্যর্থতা, ব্যক্তিগত কঠিন অসুখ বা অন্য শোচনীয় বিপর্যয়ের জন্য 'অস্থায়ী দারিদ্রের অবস্থা' এড়ানো সম্ভব হবে না।

নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার প্রভেদ অবশ্যই থাকবে। কিন্তু তা হবে সাধারণ শ্রেণী ও বিলাসবহুল শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যের সমতুল। এখনকার ইউরোপে ট্রেনে কেবলমাত্র দুই শ্রেণীর কামরা থাকে। প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী। কিন্তু উনিশ শতকে ট্রেনে তৃতীয় এমনকী চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কামরা ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ ছিল খুব কষ্টসাধ্য। প্রায়শই সেই কামরাগুলিতে জানালা থাকত না। মেঝেতে খড় বিছিয়ে শুতে হত যাত্রীদের।

* * *

সত্যি কি আমরা দারিদ্রমুক্ত পৃথিবীর রূপকার হতে পারব? সেই পৃথিবী যেখানে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণী থাকবে না—থাকবে না কোনও অভুক্ত, নিরক্ষর, বস্ত্রহীন অভাবী মানুষ?

www.pathagar.com

অবশ্যই পারি। ঠিক যেভাবে আমরা সার্বভৌম রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, খোলা বাজারি অর্থনীতি গড়ে তুলেছি ঠিক সেইভাবে গঠিত হবে দারিদ্রমুক্ত বিশ্বের ভবিষ্যৎ।

দারিদ্রমুক্ত বিশ্বের রূপ একেবারে নিখুঁত হবে না। কিন্তু আদর্শ চেহারার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারি।

ক্রীতদাসত্বের মতো নিষ্ঠুর প্রথা, পোলিওর মতো ভয়াবহ ব্যাধি, বর্ণবৈষম্যের মতো অমানবিক আচরণ আমরা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে পেরেছি। অবশ্য এসব লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেয়েও দারিদ্রমুক্ত পৃথিবীর দুয়ারে পৌঁছে যাওয়া অনেক বেশি কঠিন। তবে একাজে সফল হলে আগের সফলতাগুলি আরও অনেক বেশি মজবুত হবে। দারিদ্রমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা এবং তাকে স্থায়িত্ব দান করা অনেক অনেক বিরাট সাফল্য। মানুষ হিসেবে এরকম একটি পৃথিবীতে বাস করা আমাদের জন্য হবে বিরাট এক গর্বের বিষয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

২০০৩ সালের মাঝামাঝিতে গ্রামীণ ব্যাংক

এই বই লেখা হয়েছিল ১৯৯৬-৯৭ সালে। তখনকার তথ্য দেয়া আছে এই বইতে। এরপর ৬ বছর পার হয়ে গেছে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা হল। সদস্যদের বাড়িঘর ভাসিয়ে নিলে গেল। সম্পদ, ব্যবসা, জীবিকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল। ২০০০ সালের মাঝামাঝি থেকে গ্রামীণ ব্যাংক তার কর্মপদ্ধতিতে অনেক সংযোজন শুরু করল। সে প্রক্রিয়া সমাপ্ত হল ২০০২ সালের শেষভাগে। আমরা এই পর্যায়ের গ্রামীণ ব্যাংকের নাম দিয়েছি দ্বিতীয় অঙ্কের গ্রামীণ ব্যাংক। ২০০২ সালে আমরা দ্বিতীয় অঙ্কে প্রবেশ সমাপ্ত করেছি। দ্বিতীয় অঙ্কের গ্রামীণ ব্যাংক গরিবের সেবায় আরও দক্ষ এবং লক্ষ্য অর্জনে নিশ্চিত হতে পেরেছে বলে আমার মনে হয়।

১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগ হিসেবে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে শুরু করেছিলাম। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক এটাকে নিজেদের প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৮৩ সালে একটি আইন পাশের মাধ্যমে ওই প্রকল্প ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়। এর ঋণগ্রহীতারা এই ব্যাংকের মালিক। এই ব্যাংক সম্পূর্ণরূপে গরিবদের জন্য কাজ করে। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের মালিকানার ৯৩% ব্যাংকের ঋণীদের। অবশিষ্ট ৭% এর মালিকানা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক ও সরকারের। ২০০৩ সালের জুন অবধি গ্রামীণ ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার ২১ কোটি (৩.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) টাকা। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে ৪২ জন লোকের মাঝে ৮৫৬ টাকা (২৭ ডলার) ঋণ বিতরণের মাধ্যমে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, প্রায় সাড়ে আঠারো বছর পর ১৯৯৪ সালের মে মাসে গ্রামীণ ব্যাংক ১ বিলিয়ন ডলার ঋণ বিতরণের মাইল ফলক অতিক্রম করে। প্রথম বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করতে সময় লাগে ২১১ মাস। দ্বিতীয় বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে গ্রামীণ ব্যাংক সময় নেয় মাত্র ৩৭ মাস, ১৯৯৭ সালের জুনে। তৃতীয় বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, এতে সময় লাগে মাত্র ৩২ মাস। পরবর্তী ৪১ মাস পর আমরা চতুর্থ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করলাম ২০০৩ সালের জুলাই মাসে। অর্থাৎ ১ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করার পর গড়ে ৩৭ মাস অন্তর অন্তর নতুন বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে এসেছে গ্রামীণ ব্যাংক। ব্যাংকের ঋণ আদায়ের হার ৯৯%।

গ্রামীণ ব্যাংক প্রতি বছর মোট যে পরিমাণ ঋণ বিতরণ করে তা বাংলাদেশের অন্য সকল ব্যাংক কর্তৃক গ্রাম এলাকায় বিতরণকৃত ঋণের মোট সমষ্টির চেয়েও বেশি।

জুন ২০০৩ পর্যন্ত ৪২ হাজার ৬১১টি গ্রামের প্রায় ২৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ঋণীর দোরগোড়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের ১১৮২টি শাখা সেবা প্রদান করছে। গ্রামীণ ব্যাংকে প্রায় ১২

www.pathagar.com

হাজার কর্মী কর্মরত আছে। যে-কোনও কর্ম দিবসে কিস্তি বাবদ গ্রামীণ ব্যাংকের আদায়ের পরিমাণ গড়ে ১.৫ মিলিয়ন ডলার।

গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীরা তাদের সদস্যদের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে দৈনিক যে পরিমাণ পথ চলাচল করে তার সমষ্টি পৃথিবীকে চারিদিকে কয়েকবার প্রদক্ষিণের দূরত্বের সমান। কিস্তি নিয়ে ফেরার সময় তারা সমষ্টিগত ভাবে প্রতিদিন ১.৫ মিলিয়ন ডলার কোনও প্রকার ছিনতাই হবার ভয় ছাড়াই বহন করে থাকে।

২০০৩ সালের মাঝামাঝিতে গ্রামীণ ব্যাংকের সার্বিক অবস্থানটি নিম্নলিখিত তথ্য থেকে বোঝা যাবে:

৩০ জুন, ২০০৩ তারিখের তথ্য

ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এমন গ্রামের সংখ্যা	৪২,৬১১
কেন্দ্রের সংখ্যা	৭২,৮৫২
শাখার সংখ্যা	১,১৮২
কর্মী সংখ্যা	১১,৫৭০
সদস্য সংখ্যা:	
মহিলা	২,৬৫৭,১০৫
পুরুষ	১২৯,৬৪৩
মোট সদস্য সংখ্যা	২,৭৮৬,৭৪৮
গৃহ নির্মাণ ঋণ দ্বারা নির্মিত বাড়ির সংখ্যা	৫৬৯,৬৯০

বিবরণ	মিলিয়ন টাকায়	বিলিয়ন ডলারে
জুন ২০০৩ পর্যন্ত ঋণ বিতরণের পরিমাণ	১৮০,২০৯.৩০	৩,৯৮৭.৬৭
জুন ২০০৩ মাসে ঋণ বিতরণের পরিমাণ	২,০১৮.১৩	৩৪.৮৬
জুন ২০০৩ পর্যন্ত গৃহ বিতরণের পরিমাণ	৭,৭৮৯.৭০	১৯১.৭৫
জুন ২০০৩ মাসে ঋণ বিতরণের পরিমাণ	১৩.৪৪	০.২৩
জুন ২০০৩ এ ঋণীদের আমানতের ব্যালেন্স	৮,৪৩৮.৩৯	১৪৫.৭৪
জুন ২০০৩ এ মোট আমানতের ব্যালেন্স	১০৬২০.৭৮	১৮৩.৪৩

অর্থ সংস্থান

গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম থেকে টাকার সংস্থান কীভাবে হয়েছিল? শুরুতে নিজের পকেট থেকে সামান্য টাকা দিয়েছি। তারপর ব্যাংকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে জামিনদার হয়ে টাকা নিয়েছি। তারপর বাংলাদেশে ব্যাংকের একটি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ব্যাংক থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছি।

গ্রামীণ ব্যাংক সর্বপ্রথম ১৯৮২ সালে দাতাসংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এই তহবিল আসে IFAD থেকে, ১% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে। IFAD এই তহবিল বাংলাদেশ সরকারকে ৫০ বৎসর মেয়াদে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকার এই অর্থ গ্রামীণ

www.pathagar.com

ব্যাংক-কে ১৫ বৎসর মেয়াদে ৩% সুদে ঋণ দেয়। ব্যাংক এর পর ঋণ এবং অনুদান হিসেবে NORAD (নরওয়ের সাহায্য সংস্থা), SIDA (সুইডিস সাহায্য সংস্থা), KFW ও GTZ (জার্মান সাহায্য সংস্থা), CIDA (কানাডিয়ান সাহায্য সংস্থা), OECF (জাপানি সাহায্য সংস্থা), IFAD (জাতিসংঘ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা), FORD Foundation এবং নেদারল্যান্ড সরকারের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে। নীচের টেবিলে দাতাসংস্থা থেকে গৃহীত তহবিল সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে।

দাতাসংস্থা থেকে প্রাপ্ত তহবিল

(মিলিয়ন ইউ এস ডলারে)

তহবিলের প্রকৃতি	ঋণ কার্যক্রমের জন্য	উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য	মোট
ঋণ:			
ইফাদ (IFAD)	৪২.৬১	৫.২০	৪৭. ৮১
সিডা (SIDA)	৬.২৫	১.২১	৭.৪৬
নোরাদ (NORAD)	৬.৬১	১.৭৬	৮.৩৭
ও ই সি এফ (OECF)	২৫.২৯	-	২৫.২৯
ডাচ লোন	১.৩৯	-	১.৩৯
ফোর্ড ফাউন্ডেশন	-	২.০৭	২.০৭
উপ মোট:	৮২.১৫	১০.২৪	৯২.৩৯
অনুদান:			
সিডা (SIDA)	৩৫.৯৩	৬.১৪	৪২.০৭
নোরাদ (NORAD)	৪২.২৬	১২.২৫	৫৪.৫১
জে টি জেড (JTZ)	-	১৩.১৫	১৩.১৫
কে এফ ডব্লিউ (KFW)	২৬.৫৭	১.৯৪	২৮.৫১
সিডা (CIDA)	৭.৫১	২.৪৭	৯.৯৮
উপ মোট:	১১২.২৭	৩৫.৯৫	১৪৮.২২
সর্বমোট:	১৯৪.৪২	৪৬.১৯	২৪০.৬১

গ্রামীণ ব্যাংক নতুন অনুদান এবং স্বল্প সুদে নতুন ঋণ গ্রহণ ১৯৯৫ সাল হতে বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক উৎস ও আমানত সংগ্রহ হতে প্রাপ্ত তহবিলের উপর নির্ভর করে এর কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ১৯৯৬ সালের পূর্বে সম্পাদিত চুক্তির অধীনে অনুদান এবং স্বল্প ঋণ প্রাপ্তি ১৯৯৬-১৯৯৮ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এটার পরিসমাপ্তি ঘটে জুন ১৯৯৮ সালে।

গ্রামীণ ব্যাংকের একটি নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা এসেছিল ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরে, যখন বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে ৬৫০ কোটি টাকা (১৬০.৭৫ মিলিয়ন ডলার) দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে সংগ্রহ করে। এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে সহায়তা করেছিল এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানযোগ্য তহবিল সৃষ্টিতেও সহায়তা করেছিল। এ ছাড়া ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর পরই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঋণীদের নতুন ঋণ বিতরণের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ব্যাংক হতে ঋণ হিসেবে এক শত কোটি টাকা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে বন্ড বিক্রির মাধ্যমে দুই শত কোটি টাকা গ্রহণ করে। বন্যার দ্বারা সৃষ্ট দুর্যোগ থেকে সদস্যদের রক্ষা করার জন্য নেয়া এ সমস্ত ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ হয়েছে। এ ছাড়াও অন্য যে সমস্ত ঋণ পরিশোধযোগ্য হয়েছিল সেগুলোও ব্যাংক যথারীতি পরিশোধ করেছে।

দাতাদের নিকট থেকে অতীতে নেয়া কম সুদের অর্থের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা হয়েছে। ১৯৯৩ এর সালতামামিতে এই ধরনের বিনিময়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ছিল মোট আদায়যোগ্য ঋণের ৩৯%। বর্তমানে এটা কমে ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এটি সম্ভব হয়েছে ২০০০ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের আমানত কর্মসূচি জোরদার করার কারণে। এখন থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের বর্ধিত আমানত ব্যাংকের কার্যাবলি পরিচালনা, বর্তমান ঋণ পরিশোধ এবং ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্ট হবে। জানুয়ারি ২০০৪ হতে ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল এবং আমানত হতে শতকরা একশত ভাগ আদায়যোগ্য ঋণের অর্থ সংস্থান করতে পারবে। জুন ২০০৩ মাসে ব্যাংকের আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪২৫ কোটি টাকা। ভবিষ্যতে আর কোনওদিন গ্রামীণ ব্যাংককে ঋণ করে এনে ঋণ দিতে হবে না। নিজের সংগৃহীত অর্থেই তার সম্পূর্ণ ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে।

অর্থ সংস্থান ব্যয়

বিনিময়যোগ্য তহবিল পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের প্রবৃত্তির গতি হয়েছে বেগবান। ফলে প্রতি টাকা বছরে গড়ে ৬ বার ঋণ হিসেবে আবর্তিত হয়েছে সদস্যদের হাতে হাতে। এই ব্যবস্থা ঋণ প্রদানযোগ্য ফান্ডের সর্বোত্তম ব্যবহার, একটি বৃহৎ গরিব জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং ঋণীদের সঞ্চয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৯৯৩ সালের পর অর্থ সংস্থান ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ইস্যুকৃত বন্ডের উপর ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে যথাক্রমে ৫.৭৬% ও ৪.৮৭% হারে সুদ প্রদান করতে হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে ও ১৯৯৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের মোট সুদ ব্যয়ের যথাক্রমে ৩৩% ও ৩৯% ছিল শুধুমাত্র বন্ডের উপর দেয় সুদ। ১৯৯৬ সালের তহবিল ব্যয়ের বড় অংশটা ছিল ঋণীদের আমানতের জন্য যার পরিমাণ মোট তহবিল ব্যয়ের ৪৯%। এটা ১৯৯৫ সালে ছিল ৪৩% এবং ১৯৯৪ সালে মাত্র ৩৪%। ঋণীদের আমাতনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ২০০২ সালে মোট সুদ ব্যয়ের অর্ধেকের বেশি (৬০%) হয়েছে ঋণীদের আমানতের জন্য। গ্রামীণ ব্যাংক আমানতের উপর ন্যূনতম ৮.৫০% হারে সুদ প্রদান করে। যা দেশের যে কোনও ব্যাংকের চেয়ে সর্বোচ্চ। গ্রামীণ ব্যাংক সর্বোচ্চ ১২% পর্যন্ত সুদ দেয়।

নীচের টেবিলে ১৯৯৩ হতে ২০০২ পর্যন্ত সময়কালীন তহবিলের উৎস সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৯৩ থেকে ২০০২ পর্যন্ত সময়কালীন তহবিলের উৎস (মিলিয়ন ইউ এস ডলারে)

উৎস	১৯৯৩		১৯৯৪		১৯৯৫		১৯৯৬		১৯৯৭	
	এ পর্যন্ত	হ্রাস/বৃদ্ধি	এ পর্যন্ত	হ্রাস/বৃদ্ধি	এ পর্যন্ত	হ্রাস/বৃদ্ধি	এ পর্যন্ত	হ্রাস/বৃদ্ধি	এ পর্যন্ত	হ্রাস/বৃদ্ধি
বাংলাদেশ ব্যাংক	১০৯.৩৮	১০৯.৩৮	৯৩.৭৫	-১৫.৬৩		-৯৩.৭৫				
ইফাদ (IFAD)	৪২.২৬	২.৯৬	৪২.২৬		৪১.৭৫	-০.৫১	৪০.৭১	-১.০৪	৩৮.৯৫	-১.৭৬
নোরাদ (NORAD)	৮.৩৭		৮.৩৭		৮.৩৭		৮.৩৭		৮.৩৭	
সিডা (SIDA)	৭.৪৬		৭.৪৬		৭.৪৬		৭.৪৬		৭.৪৬	
ফোর্ড ফাউন্ডেশন	২.০৬		২.০৭	০.০১	২.০৭		২.০৭		২.০৭	
ডাচ লোন	১.৩৯		১.২৫	০.১৪	১.২৫		১.২৫		১.২৫	
অন্যান্য ব্যাংক		০.১০	০.৫০	০.৫০	৩.০৯	২.৫৯	১০.২৫	৭.১৬	৫.০৯	-৫.১৬
বন্ড এবং ডিবেঞ্চার			৮০.৭৫	৮০.৭৫	১৬০.৭৫	৮০.০০	১৬২.৫০	১.৭৫	১৪১.০০	-২১.৫০
ওইসিএফ (OECF)							৯.২৬	৯.২৬	১৮.৫৮	৯.৩২
গ্রামীণ কল্যাণ							৯১.২৮	৯১.২৮	৯১.২৮	
সদস্য তহবিল	৯৮.৪৪	৩০.৪৪	১২৩.০১	২৪.৫৭	১৩৮.৮৭	১৫.৮৬	১৪৯.৫৩	১০.৬৬	১৬২.৫৬	১৩.০৩
রিভলভিং ফান্ড	৮৮.৩৮	১৩.৮৯	৯৪.৯১	৬.৫৩	১০৪.৪৭	৯.৫৬	০.০৯	-১০৪.৩৮	২২.৩০	২২.২১
পরিশোধিত মূলধন	৪.৬৯	০.০১	৬.৩৫	১.৬৬	৬.৬১	০.২৬	৬.৭২	০.১১	৭.০২	০.৩০
রিজার্ভ	১.৫৬	০.৮৬	২.০৭	০.৫১	২.৫১	০.৪৪	৩.০২	০.৫১	৩.৪৭	০.৪৫
অন্যান্য	১৯.৬৫	১১.০৯	২৫.১৭	৫.৫২	২১.২০	-৩.৯৭	২৬.৭০	৫.৫০	৩৪.৭৮	৮.০৮
সর্বমোট	৩৮৩.৬৪	১৬৮.৫৩	৪৮৭.৯২	১০৪.২৮	৪৯৮.৪০	১০.৪৮	৫১৯.২১	২০.৮১	৫৪৪.১৮	২৪.৯৭

পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

উৎস	১৯৯৮		১৯৯৯		২০০০		২০০১		২০০২	
	এ পর্যন্ত	হ্রাস/বৃদ্ধি	এ পর্যন্ত	হ্রাস/বৃদ্ধি	এ পর্যন্ত	হ্রাস/বৃদ্ধি	এ পর্যন্ত	হ্রাস/বৃদ্ধি	এ পর্যন্ত	হ্রাস/বৃদ্ধি
বাংলাদেশ ব্যাংক	২০.৬২	-১৮.৩৩	১৯.৬১	-১.০১	১৮.৫২	-১.০৯		-১৮.৫২		
ইফাদ (IFAD)	২৪.০৭	১৫.৭০	২০.৮৪	-৩.২৩	১৭.৪৫	-৩.৩৯	১৪.১২	-৩.৩৩	১১.২৫	-২.৮৭
নোরাদ (NORAD)	৫.৫২	-১.৯৪	৫.২৫	-০.২৭	৪.৯৬	০.২৯	৪.৭০	-০.২৬	৪.৬৩	-০.০৭
সিডা (SIDA)	৪.৯২	২.৮৫	৪.৬৮	-০.২৪	৪.৪২	-০.২৬	৪.১৯	-০.২৩	৪.১২	-০.০৭
ফোর্ড ফাউন্ডেশন	০.৭১	-০.৫৪	০.৬৭	-০.০৪	০.৬৩	-০.০৪	০.৬০	-০.০৩	০.৫৯	-০.০১
ডাচ লোন	০.৯১	-৪.১৮	০.৮৭	-০.০৪	০.৮২	-০.০৫	০.৭৮	-০.০৪	০.৭৬	-০.০২
অন্যান্য ব্যাংক	৫.৮০	১.৭১	৮.৮২	২.০২	৫.৭৬	-৩.০৬	১১.০৯	৫.৩৩	—	-১১.০৯
বন্ড এবং ডিবেঞ্চার	৮০.৮২	৬০.১৮	৯০.৫৯	৯.৭৭	৭১.৩০	-১৯.২৯	৬৭.৫৪	-৩.৭৬	৩১.৯৫	-৩৫.৫৯
ওইসিএফ (OECF)	২২.৭২	-৪.১৪	২১.৬১	-১.২০	২০.৪১	-১.২০	১৯.৩৪	-১.০৭	১৯.০৪	-০.৩০
গ্রামীণ কল্যাণ	৫৬.৩১	-৩৪.৯৭	৫৪.১০	-২.২১	৫১.১৭	-২০.৯৩	৪৮.৭০	-২.৪৭	৪৮.১৬	-০.৫৪
গ্রামীণ ফান্ড			১.১৮	১.১৮	১.৩৯	০.২১	০.৫৩	-০.৮৬	—	-০.৫৩
সদস্য তহবিল	৯২.৭৪	-৬৯.৮২	৯০.৮৮	-১.৮৬	৮৩.২৪	২.৩৬	১০৮.৬১	২৫.৩৭	১২৬.১৭	১৭.৫৬
রিভলভিং ফান্ড		-২২.৩০								
পরিশোধিত মূলধন	৫.৩২	-১.৭০	৫.১৮	-০.১৪	৪.৯৯	-০.১৯	৪. ৭১	-০.২১	৪.৭৭	-০.০১
রিজার্ভ	৩৯.৩৫	৩৫.৮৮	৩৪.৫৯	-৪.৭৬	৩২.৬৭	-১.৯২	৩০.৯৫	-১.৭২	৩০.৪৭	-০.৪৮
অন্যান্য	১৩.৫৬	-২১.২২	১৫.৫২	১.৯৬	৭.৪০	-৮.১২	৩.৬৫	-৩.৭৫	—	-৩. ৬৫
সর্বমোট	৩৭৪.৩৭	-৬২.৮২	৩৭৪.৩৯	-০.০৭	৩২৫.১৩	-৩৯.২৬	৩১৯.৫৮	-৫.৫৫	২৮১.৯১	-৩৭.৬৭

দ্রষ্টব্য: সংশ্লিষ্ট বৎসরগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন বিনিময় হার প্রয়োগের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত টেবিলের হ্রাস/বৃদ্ধি কলামে প্রদর্শিত পরিমাণের সহিত স্থিতিপত্রের পরিমাণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখাবে।

www.pathagar.com

লাভ লোকসান হিসাব (৩১শে ডিসেম্বর)

(মিলিয়ন ইউ এস ডলার)

	১৯৯৩	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	*২০০২
বাৎসরিক গড় ডলার হার	৩৯.১৪	৪০.০০	৪০.২০	৪০.৮৬	৪৫.৪৫	৪৮.৫০	৫১.০০	৫৪.০০	৫৭.০০	৫৭.৯০
আয়										
ঋণ কার্যক্রম	২৬.৯৭	৪১.১৬	৪৯.১৫	৪২.৯৬	৩০.৯৬	৩৯.৪৪	৪০.২৩	৩৩.২৮	৪৪.৬০	৪০.২৯
স্থায়ী আমানতের উপর সুদ	৪.২৩	৬.৫৫	৪.৮৮	১০.৪৭	১১.৩২	৫.৬৪	৮.২৮	৯.৩৭	৮.৬১	৭.০৭
অন্যান্য আয়	২.৬৬	২.৭৫	২.৭৮	৩.২০	৩.৩৮	১.৮২	১.০৫	১.৫০	২.৩৬	৫.১৫
মোট আয়	৩৩.৮৬	৫০.৪৬	৫৬.৮১	৫৬.৬৩	৪৫.৬৬	৪৬.৯০	৪৯.৫৬	৪৪.১৫	৫৫.৫৭	৫২.৫১
খরচ										
সুদ ব্যয়	৯.৯০	১৯.৮০	২১.০২	১৯.৮০	১৯.২৬	১৮.১৪	২০.০১	১৮.১৪	১৮.০০	১৫.৪৩
প্রশাসনিক এবং অন্যান্য ব্যয়	২৩.৭১	৩০.১২	৩৫.৪২	৩৬.৩৭	২৬.০৯	২৬.৬১	২৮.০৫	২৫.৮১	৩৬.৫৪	৩৬.০৫
মোট খরচ	৩৩.৬১	৪৯.৯২	৫৬.৪৪	৫৬.১৭	৪৫.৩৫	৪৪.৭৫	৪৮.০৬	৪৩.৯৫	৫৪.৫৪	৫১.৪৮
মুনাফা	০.২৫	০.৫৪	০.৩৭	০.৪৬	০.৩১	২.১৫	১.৫০	০.২০	১.০৩	১.০৩

নোট: অন্যান্য আয় = জমা টাকার উপর প্রাপ্ত সুদ + অন্যান্য আয়।

www.pathagar.com

স্থিতি পত্র (৩১ শে ডিসেম্বর)

	১৯৯৩	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭
গড় টাকা/ডলারের হার	৩৯.১৪	৪০.০০	৪০.২০	৪০.৮৬	৪৫.৪৫
সম্পত্তি এবং সম্পদ (ইউ এস ডলার)					
হাতে নগদ	১৪৮৭	২৫০৬	৬৭৩	৯৮৪৯	১৪৮৭৮১
অন্যান্য ব্যাংকে জমা	৮৬৮৫১৯১	৮২২১৩৬৯	১০৬৭২৩২৫	৯৪০৪৬৩৩	৮১১২৫২৪
বিনিয়োগ ক্রয়মূল্যে	৪৪৫৭৯০৭৫	৮০০৪৬৪৮৫	৯০৯০৬৯৫৩	১৪৮৩৪৮৩৯২	১০১২১৫৮৯৮
ঋণ ও অগ্রিম	২২৩৯০৩১৮৭	২৭৬৩২৩৬৪২	২৭৮০১৪৭৩৪	২৬৮০৭৭৮০৬	২৭৬৯৮৭৭০০
স্থায়ী সম্পদ-ক্রয়মূল্য বাদ অবচয় সঞ্চিতি	১২৬৬৯৪৮০	১৩৭৭৮৮৫৪	১৪৭১১১৫৫	১৬৬৮২৯৬৫	১৬৫৪১৩০০
অন্যান্য সম্পত্তি	২৩৭৮৯৮১৬	৩৫৯৭৯৬৭৪	৪৭১৭৪৫২৬	৩৬৪৯৭৪৯৯	৩২১৩৫২৬৬
মোট	**৩১৩৬২৮২৩৬**	**৪১৪৩৫২৫৩০**	**৪৪১৪৮০৩৬৬**	**৪৭৯০২১১৪৪**	**৪৩৫১৪১৪৬৯**
মূলধন ও দায় শেয়ার মূলধন:					
অনুমোদিত	৬৩৮৭৩২৮	১২৫০০০০০	১২৪৩৭৮১১	১২২৩৬৯০৭	১১০০১১০০
পরিশোধিত	৩৮৩২৩৯৭	৫৪১২৯১৩	৫৬৪৭০৭৭	৫৬৭৬৬৭৬	৫৪০৯৮৩৫
সাধারণ ও অন্যান্য সঞ্চিতি	১২৭৪১৫৬	১৭৫৯০৫৩	২১৯১১৮৪	২৬৭৯৭৮১	২৭৪৩২৯৭
রিভলভিং ফান্ড	৭২২৪৭৮৫২	৭৭২৩১৭০০	৮৬৩৬৪৪১৫	৬৪৯১৩	২২২৭৪৬৫৪
আমানত ও অন্যান্য তহবিল	৮০৪৮৫৭১৯	১০৩৩১৪০৪৩	১১৮৫৮৭১৮৩	১২৭৫৭২৩৭৭	১২৭৭০৮৫১৮
ব্যাংক ও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ	১৩৯৭৫৩৯৩৯	২০৫৩৯২৫৩৪	২১১৫০৬১২৯	৩২০৪৫৩৪৩৫	২৪৮৪৭৩৯১০
অন্যান্য দায়	১৬০৬৪১৭৩	২১২৪২২২৮৭	১৭১৮৪৩৭৮	২২৫৭৩৯৬২	২৮৫৩১২৫৫
মোট	**৩১৩৬৫৮২৩৬**	**৪১৪৩৫২৫৩০**	**৪৪১৪৮০৩৬৬**	**৪৭৯০২১১৪৪**	**৪৩৫১৪১৪৬৯**

পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	*২০০২
গড় টাকা/ডলারের হার	৪৮.৫০	৫১.০০	৫৪.০০	৫৭.০০	৫৭.৯০
সম্পত্তি এবং সম্পদ (ইউ এস ডলার)					
হাতে নগদ	১৬৬৯৯২	১৮২৯৮	৯২৪৩২	১২৭২৩৬	৮৬২২৬
অন্যান্য ব্যাংকে জমা	৯৫২৮২৪৪	৭৯১০৪৯৫	৪৩৮১০৪৮	৭১৬৬১৬১	৭৫২৭১৬৫
বিনিয়োগ ক্রয়মূল্যে	৩৭২৫২৪০৩	৯৩৮৬৯৩৫৭	৯৬৮৩১৫৩৬	৯০২৩২৯২৬	৬৯৪৬২৭৭৯
ঋণ ও অগ্রিম	২৯২৮২৮৬৮৩	২৩৯৩৬৩৩২৫	২০১৮৯৯২৭১	১৯২৬০০২৮৮	১৯৬৫৯৭৪৫২
স্থায়ী সম্পদ-ক্রয়মূল্য বাদ অবচয় সঞ্চিতি	১৮১২৬৭৮০	১৯৩৪০৫৫৪	১৭৮২৯১১৮	১৬৫৭৯৩০৩	১৫৯০৬৭১৩
অন্যান্য সম্পত্তি	৩৫১৭২৭১৪	৪০৯৪৬৯৮২	৪৩৩০৫৪৮৪	৪০৩২৮৪২৮	৩৬৬৩১৪১০
মোট	৩৯৩০৭৫৮১৬	৪০১৪৪৯০১১	৩৬৪৩৩৮৮৮৯	৩৪৭০৩৪৩৪২	৩২৬২১১৭৪৫
মূলধন ও দায় শেয়ার মূলধন:					
অনুমোদিত	১০৩০৯২৭৮	৯৮০৩৯২২	৯৫৫৯২৫৯	৮৭৭১৯৩০	৮৬৩৫৫৭৯
পরিশোধিত	৫৩২১৩৩৪	৫১৮৭৫৫৯	৪৯৯১০৬৩	৪৭৭৫৭৭৭	৪৭৬৬৬৩৫
সাধারণ ও অন্যান্য সঞ্চিতি	৩৯৩৪৫৪৪৭	৩৪৫৮৭৩৩৭	৩২৬৬৫৮১৮	৩০৯৪৬৫৬৪	৩০৪৬৫৫৩০
রিভলভিং ফান্ড					
আমানত ও অন্যান্য তহবিল	১১১৪৩১৯৯৩	১১১৯১৪০৭৩	১২২৪৪১৬৫৫	১৩৬০৬৩১৬১	১৬৯৫৯৯৬০৪
ব্যাংক ও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ	২২৩৪১২৫৫৪	২২৮২৩৭৮৪০	১৯৬৮৪১২৩৯	১৭১৫৯৭৭১৩	১২০৫১৪২০৬
অন্যান্য দায়	১৩৫৬৪৪৮৮	১৫৫২২২০২	৭৩৯৯১১৪	৩৬৫১২২৭	৮৬৫৭৭০
মোট	৩৯৩০৭৫৮১৬	৪০১৪৪৯০১১	৩৬৪৩৩৮৮৮৯	৩৪৭০৩৪৪৩৪২	৩২৬২১১৭৪৫

www.pathagar.com

স্বল্প সুদ

উপার্জন সৃষ্টিকারী ঋণ হতে গ্রামীণ ব্যাংক শতকরা বার্ষিক ২০%, গৃহ নির্মাণ ঋণ হতে শতকরা বার্ষিক ৮% এবং শিক্ষা ঋণ হতে শতকরা বার্ষিক ৫% সুদ আদায় করে। দুঃস্থ সদস্যদেরকে সম্পূর্ণ বিনাসুদে ঋণ দেয়া হয়। সকল ভিক্ষুককে গ্রামীণ ব্যাংক কর্মসূচির আওতায় আনার একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এঁদেরকে বিনা সুদে ঋণ দেয়া হয়। দীর্ঘমেয়াদি ঋণের আওতায় এঁদেরকে গৃহঋণ দেয়া হয় এবং লেপ ও মশারি সরবরাহ করা হয়। সমস্ত সুদই সরল সুদ যা ক্রমহ্রাসমান মূল ঋণের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। এটার অর্থ দাঁড়ায় যে, যদি কোনও একজন ঋণী উপার্জন সৃষ্টির কাজে ১,০০০ টাকা ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সাপ্তাহিক কিস্তিতে তা এক বছরে পরিশোধ করেন তবে তিনি সর্বমোট প্রদান করবেন ১,১০০ টাকা অর্থাৎ ১,০০০ টাকা মূল ঋণ এবং সারা বছরের সুদ বাবদ ১০০ টাকা।

বৃত্তি

শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও ভাল করার উৎসাহ সৃষ্টির জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের ছেলেমেয়েদের প্রতি বছর বৃত্তি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মেয়েদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। স্কুল শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে প্রতি বছর পাঁচ হাজার ছেলেমেয়েকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়।

শিক্ষা ঋণ

সদস্যদের ছেলে মেয়ে যারা ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদের উচ্চ শিক্ষার ঋণ প্রদান করা হয়। শিক্ষাকালীন সময়ের যাবতীয় ব্যয় শিক্ষাঋণ থেকে বহন করা হয়। জুন ২০০৩ পর্যন্ত ৭০৬ জন শিক্ষার্থীর (ছাত্র/ছাত্রী) জন্য শিক্ষা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। তার মধ্যে ৫৭১ জন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৩৩ জন মেডিকেল কলেজ, ৪২ জন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে এবং ৬০ জন বিভিন্ন পেশাগত ইনস্টিটিউশনে অধ্যয়ন করছে।

ঋণবীমা

একজন সদস্য মারা গেলে তাঁর বকেয়া ঋণ বীমা তহবিল থেকে পরিশোধ করে দেওয়া হয়। অধিকন্তু ঋণ বীমা সঞ্চয় তহবিলে ঋণীর জমাকৃত সমুদয় টাকাও উত্তরাধিকারীরা ফেরত পান।

জুন ৩০, ২০০৩ পর্যন্ত ঋণবীমা সঞ্চয় তহবিলে জমা হয়েছে ৩৫.৪১ কোটি (ইউ এস ডলার ৬.১২ মিলিয়ন) টাকা। উক্ত তারিখ পর্যন্ত ৫,৬৬৩ জন ঋণী মৃত্যুবরণ করেছেন। এঁরা ঋণ এবং সুদ বাবদ ৩.৮৪ কোটি টাকা বকেয়া রেখে গিয়েছিলেন; ব্যাংক এই বীমা কর্মসূচির আওতায় সে টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

টেলিফোন-লেডি

জুন ২০০৩ পর্যন্ত মোবাইল ফোন ক্রয়ের জন্য ২৯ হাজার ৩৪৬ জন সদস্যকে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করেছে। বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন যেখানে পূর্বে এই ধরনের সেবার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। ব্যাংকের এই কর্মসূচি মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আয় বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। গ্রামাঞ্চলে গরিব মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই সমস্ত ফোনের মাধ্যমে মহিলারা লাভজনক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জীবন বীমা

গ্রামীণ ব্যাংকের কোনও সদস্য মারা গেলে তাঁর পরিবার তাৎক্ষণিকভাবে একটি অনুদান পান। এই অনুদানের পরিমাণ সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা। এর উদ্দেশ্য সদস্যের মৃত্যুর পর যেন তাঁর পরিবারের সদস্যদের দাফন-কাফনের ব্যয়ের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয়। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতি বছর এ খাতে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয় করে। এ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ৬৪ হাজার ৫৭ জন ঋণীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা সমষ্টিগতভাবে ১২.৮৯ কোটি টাকা পেয়েছেন। ঋণীদেরকে জীবন বীমার জন্য কোনও প্রকার প্রিমিয়াম দিতে হয় না। ব্যাংকের একজন শেয়ার মালিক হিসেবে তিনি এই বীমার আওতায় এসে যান।

সফলতা অর্জনের জন্য তারকা

গ্রামীণ ব্যাংকের শাখাগুলোকে একটি নির্দিষ্ট কর্মে সফলতা অর্জনের জন্য তারকা প্রদান করা হয়। একটি শাখার ৫টি তারকা প্রাপ্তিকে সফলতার সর্বোচ্চ স্তরকে বোঝায়। ৩১শে ডিসেম্বর ২০০২ এর শেষে শাখাগুলোর তারকা প্রাপ্তি ছিল নিম্নরূপ:

১১৭৮টি শাখার মধ্য হতে ৬৯৬টি শাখা তাদের বিতরণকৃত ঋণের একশত ভাগ আদায়ের জন্য সবুজ তারকা লাভ করেছে।

৪৩৭টি শাখা মুনাফা অর্জনের জন্য নীল তারকা পেয়েছে। শাখা প্রধান কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তহবিলের উপর ১২ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করে মুনাফা করেছে। ২১৩টি শাখা তাদের আদায়যোগ্য ঋণের অতিরিক্ত আমানত সংগ্রহের সফলতা অর্জনের জন্য বেগুনি তারকা লাভ করেছে। এই সমস্ত শাখাগুলো শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব তহবিল দিয়েই ব্যবসা পরিচালনা করছে না, অধিকন্তু যে সমস্ত শাখায় তহবিলের ঘাটতি রয়েছে তাদেরকে নিজেদের উদ্বৃত্ত তহবিল দিয়ে তা পূরণেও ভূমিকা রাখছে।

৬১টি শাখা গ্রামীণ পরিবারের ১০০% ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষারত আছে অথবা শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে ঘোষণা করে বাদামি তারকা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছে। যাচাই প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর তাদের তারকা প্রাপ্তি চূড়ান্ত করা হবে। ২১টি শাখা লাল তারকা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছে। যে সমস্ত শাখা তাদের ১০০% ঋণী পরিবারদিগকে দারিদ্রসীমার উর্ধ্বে নিয়ে যেতে সমর্থ হয় তারাই লাল তারকা পায়।

প্রতি মাসেই শাখাগুলো নতুন নতুন তারকা অর্জনের দিকে এগিয়ে আসছে। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীরা ব্যাংকের সমস্ত শাখাকে পাঁচ তারকা বিশিষ্ট শাখায় রূপান্তরের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

অনাদায়ি ঋণের বিপরীতে সঞ্চিতি ব্যবস্থা

আমাদের সদস্যদের যথার্থ প্রয়াস সত্ত্বেও অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবসৃষ্ট বিপদের কারণে ব্যাংকের ঋণ যথাসময়ে পরিশোধে তাঁরা ব্যর্থ হন। এই বাস্তবতা অনুধাবন করে এবং মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতায় পরিণত হবে মনে করে সম্ভাব্য ঋণ ক্ষতির জন্য সঞ্চিতির সৃষ্টি করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংক সকল মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ ও সুদের জন্য ১০০% সঞ্চিতি রাখে। সকল চুক্তিঋণের ক্ষেত্রে প্রথম বছর আদায়যোগ্য ঋণ ও সুদের ব্যালেন্সের ৫০% থেকে ৭৫ % পর্যন্ত এবং দুই বছর উত্তীর্ণ হলে ইহার অনাদায়ী ঋণ ও সুদের ব্যালেন্সের ১০০% সঞ্চিতি রাখে। তিন বছর পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে চুক্তিঋণের আদায়যোগ্য ঋণ ও সুদ অবলোপন করে দেয়া হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক সকল বিতরণকৃত গৃহ ঋণের ৫% এবং গৃহ ঋণের বকেয়া সুদের ১০% সমপরিমাণ সঞ্চিতি রাখে। গ্রামীণ ব্যাংকের শক্তিশালী এই সঞ্চিতি নীতি ব্যাংকের আর্থিক ভিত সুদৃঢ়করণে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

অতীতে মোট ঋণ অবলোপনের পরিমাণ যত ছিল তা সংশ্লিষ্ট হিসাব বছর পর্যন্ত যে পরিমাণ ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল তার ১.২৫% এর চেয়েও কম ছিল। ১০০% ঋণ সঞ্চিতি রাখার দিন থেকে আরও এক বছর পার হয়ে যাবার পর যে পরিমাণ ঋণ ও সুদ অনাদায়ি থাকে তা অবলোপন করে দেওয়া হয়।

মুনাফা অর্জন

ব্যাংকের আয় হতে এটা দেখা যায় যে, সার্বিক খরচ বৃদ্ধির পরেও বিগত বছরগুলোতে গ্রামীণ ব্যাংক মুনাফা অর্জন করেছে। ব্যাংক প্রতিবছরই তার নিরীক্ষিত লাভ-লোকসান হিসাব ও স্থিতিপত্র প্রকাশ করে যা আন্তর্জাতিক সুনাম সম্পন্ন দুইটি অডিট ফার্মের দ্বারা নিরীক্ষিত হয়। ১৯৯৩ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সময়কালের লাভ-লোকসান হিসাব ও স্থিতিপত্র পর পর দেওয়া হল।

ঋণ গ্রহীতা

গ্রামীণ ব্যাংকের উপর বাহিরের গবেষকগণ কর্তৃক সকল গবেষণার উপসংহার এই যে, আমাদের ঋণীগণ ক্রমাগতভাবে অর্থনৈতিক সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করছে। আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা হল যে, আমাদের ঋণীদিগকে সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখা যাতে তাদের ক্রমোন্নতি হতে থাকে। আমরা মনে করি গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সার্থক হবে যেদিন "গরিবের ব্যাংক" নামে বহুলভাবে পরিচিত এই ব্যাংকটিকে সবাই "প্রাক্তন গরিবের ব্যাংক" হিসেবে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ এই ব্যাংকের সকল সদস্য দারিদ্রসীমা অতিক্রম করে আসবে।

আমাদের সদস্যরা দারিদ্রসীমা পার হয়ে আসছেই ক্রমাগতভাবে। আমাদের চোখের সামনেই এটা ঘটছে। সম্প্রতি গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণীদের এক বৈঠকে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁতি। গ্রামীণ ব্যাংক হতে নেওয়া ঋণ তাঁদের জীবনে কোনও উন্নতি সাধন করছে কি না এ বিষয়ে আলাপ শুরু করা মাত্রই একজন সদস্য আমাকে বললেন যে, আমার প্রথম নেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ১,০০০ টাকা যা নিতে গিয়ে আমি খুব

www.pathagar.com

ভয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। অথচ আজ ১১ বছর পর আমি ব্যাংকের সাপ্তাহিক কিস্তিই দিই ১,১০০ টাকা।

আমি হতচকিত হয়ে নিজেই যখন জিজ্ঞেস করি, আপনাদের মধ্যে আর কতজন ১,০০০ (২৫ ডলার) টাকার উপরে কিস্তি প্রদান করেন? তখন ৩ জন মহিলা হাত তুললেন। অতঃপর যখন তাঁদের জিজ্ঞেস করি কতজন ৮৫০ টাকা হতে ১,০০০ টাকার মধ্যে কিস্তি প্রদান করেন, তখন ৫ জন হাত তুললেন। আমি যখন ৫০০ টাকার কিস্তির কথা জিজ্ঞেস করি তখন প্রায় ২০ জন বা কেন্দ্রের অর্ধেক সদস্য হাত তুলেন।

এটা সত্যি চমৎকার। আমি আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁদের জানাই, আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন ঋণ প্রদান করতাম মাত্র ৩০০ টাকা এবং কোনও কোনও সময় মাত্র ৫০০ টাকা। একদিন ৩০ টাকারও (৫ সেন্ট) একটি ঋণ বিতরণ করি। তাঁদের ঋণের পরিমাণটা স্থির হত তাদের সাহসের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে। ৫০০ টাকা নিতে সাহস হত এমন সদস্যের সংখ্যা ছিল কম। এই ক্ষুদ্র পরিমাণ একদিন এমন হবে যে তাঁরা সপ্তাহে হাজার টাকা কিস্তি দেবেন এটা তখন আমি ভাবতেই পারিনি। আমি আজ খুবই আনন্দিত আপনাদের জন্য এবং ব্যাংকের জন্য।

আমি আশপাশের অন্যান্য কেন্দ্রেও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁরাও একই ধরনের উত্তর দিয়েছিলেন।

সাম্প্রতিক এক আভ্যন্তরীণ সমীক্ষাতে দেখা যায় যে, গ্রামীণ ঋণীদের ৪২% পরিবার দারিদ্রসীমা অতিক্রম করেছে। অবশিষ্ট পরিবারবর্গ দারিদ্রসীমার নীচ হতে দারিদ্রসীমা অতিক্রমের জন্য দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

আমাদের প্রধান কার্যালয়ে দুই ধরনের মতবাদ ছিল। একদল যুক্তি দেখান ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি সময়ের দাবি এবং ঋণীদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা জরুরি। আরেক দল এটাকে মূর্খের সাহস হিসেবে চিহ্নিত করে যুক্তি দেখান যে, এর ফলে ঋণীরা অধিক ঋণে ভারাক্রান্ত হবে যা তাঁদেরকে বিপদে ঠেলে দেয়ার সামিল। এখন এই বিতর্কের অবসান হয়েছে। আমরা এখন ঋণীদের বড় ঋণ দিতে আগ্রহী। যারা বড় বিনিয়োগ করতে সমর্থ তাদেরকে যে-কোনও বড় অঙ্কের টাকা দিতে আমরা প্রস্তুত। এক লাখ, দুই লাখ, পাঁচ লাখ টাকার ঋণও এখন সদস্যরা নিচ্ছেন। একজন সদস্য সর্বোচ্চ ঋণ নিয়েছেন দশ লাখ টাকা। মিনি ট্রাক কেনার জন্য। এ সমস্ত বিনিয়োগের অভিজ্ঞতাও ভাল। এরকম বড় বিনিয়োগের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।

২০০৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংক এক নতুন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এটা একটা শক্তিশালী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। তার সঙ্গে সদস্যরাও আর্থিক দিক থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা এখন ব্যাংকের পেনশন ফান্ডে টাকা জমাচ্ছেন। দশ বছর পর এটা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বুড়ো বয়সে তাঁদেরকে অন্যের আয়ের উপর ভরসা করে বসে থাকতে হবে না। তাঁরা নিজের সঞ্চিত অর্থে নিজের বার্ধক্যের মোকাবেলা করতে পারবেন। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে। তারা পরিবারের উপার্জনে ভূমিকা রাখার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরিবারের সকল সদস্য মিলে বড় বিনিয়োগে হাত দেবার কথা ভাবতে পারছেন না।

দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক আরও দৃঢ়তর প্রত্যয় নিয়ে এখন ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছে।

www.pathagar.com

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কয়েকটি ঋণের বিশ্লেষণ

২০০২: সদস্যদের গৃহীত ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী প্রধান ২৫টি ঋণের খাত

('০০০ ইউ এস ডলার অংকে)

ক্রমিক নং	খাত	ঋণ সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ (হাজার টাকা অংকে)	ইউ এস ডলারের হিসাবে ৫৭.৮৯ (গড়)
১	গাভী পালন	৩১১৮৩১	২৩২৯৭২২.৫২	৪০২৪৩.৯৫
২	গরু মোটাতাজাকরণ	৪২০৯১৫	১৯১১২০৭.২০	৩৩০১৪.৪৬
৩	মুদি দোকান	১৩১৯৩৫	৯৬০৩৬২.৪৭	১৬৫৮৯.৪৪
৪	ধান ভানা	১৩৭৪০৩	৮৫১৭২৫.৬৪	১৪৭১২.৮৩
৫	ধান/চালের ব্যবসা	১১৬৭১৪	৭৯৪৮৬৭.০৫	১৩৭৩০.৬৫
৬	বাঁশের কাজ	৮৯৫৭৭	৭২৩২৭১.৬৪	১২৪৯৩.৯০
৭	জমি লিজ	৭২৬৯৮	৫৫৮৩৫৬.৭৪	৯৬৪৫.১৩
৮	বলদ ক্রয়	৫৩১৭২	৩৮৬৪১৮.৩০	৬৬৭৫.০৪
৯	ধান চাষ	৪৬৩১১	৩০৫৯৮৭.৬০	৫২৮৫.৬৭
১০	কাপড়ের ব্যবসা	২৯২০৮	২৫৩৭৮৩.৭২	৪৩৮৩.৯০
১১	মনোহারি দোকান	৩২০৭৯	২৪৯৫৮৬.৭৩	৪৩১১.৪০
১২	শাক সবজির ব্যবসা	৩৩৮৩১	২৩৬৯৭৪.০২	৪০৯৩.৫২
১৩	শাক সবজির চাষ	২৩৫৯৩	২০৫০৭৪.৫২	৩৫৪২.৪৯
১৪	পান চাষ	২৫২৩৮	২০১৩৩০.৪৯	৩৪৭৭.৮১
১৫	জমি চাষাবাদ	১৭৯৫৯	১৭০০৭৭.১১	২৯৩৭.৯৪
১৬	মৎস্য চাষ	২০৩১২	১৬৫১০৪.৩৩	২৮৫২.০৪
১৭	রিকশা ক্রয়	২৬০২২	১৬৪৪৬৭.৮৪	২৮৪১.০৪
১৮	মাছের ব্যবসা	২১৯০২	১৫৯৪৮০.১৪	২৭ ৫৪.৮৮
১৯	বেতের কাজ	১৭৫১০	১৪৬৮৫৭.০৯	২৫৩৬.৮৩
২০	ডালের ব্যবসা	১৪৫১১	১২৩৪০৩.২৪	২১৩১.৬৮
২১	হাঁস মুরগি পালন	২৪৬৫৪	১০৯১৮৭.১৪	১৮৮৬.১১
২২	মনোহারি দ্রব্যাদি	১৯৪৪১	১০৬৬৪৬.৮৭	১৮৪২.২৩
২৩	কাঠের ব্যবসা	১৩৯৮৭	১০২১৫৮.৮০	১৭৬৪.৭১
২৪	মুড়ি তৈরি	১৫২৫২	৯৯২৪২.৭৩	১৭১৪.৩৩
২৫	বিড়ি তৈরি	২০৩৯২	৯৮১২৭.৯৯	১৬৬৫.০৮

www.pathagar.com

সদস্যদের ব্যবসা কার্যক্রমের মূল খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণের তালিকা (শুরু থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত)

কার্যক্রমের শ্রেণী বিন্যাস	মোট		
	ঋণ সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০০২)	ঋণের পরিমাণ (হাজার টাকার অঙ্কে)	ঋণের পরিমাণ (হাজার ইউ.এস. ডলারের অঙ্কে)
পশুপালন ও মৎস্য	১১,৮১৩,৮৩২	৫০,৬৬৮,৩৪৯.৬৬	১,১৩৬,০৬১.৬৫
প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎসপান	৬,৬৮৫,৬৪৬	২৭,০৫০,৯৬৪.৮০	৬০৬,৫২৩.৮৭
কৃষি ও বন	১১,৮১৪,৫৫৯	৪২,৮৪১,৯৯৯.৪০	৯৬০,৫৮২.৯৪
ব্যবসা	৫,৭৫৬,২৭৭	২৫,৭২৬,৩৬৯.৪০	৫৭৬,৮২৪.৪৩
দোকানদারি	২,০৩০,৩১৭	৯,৭০৪,৬৭২.৪৮	২১৭,৫৯৩.৫৫
সার্ভিসেস	৫৬৫,৯০৯	৩,০০৯,৫১০.৩৫	৬৭,৪৭৭.৮১
ফেরি	৩৬৩,৯৪৬	১,৫৪৯,৭৯১.৮৩	৩৪,৭৪৮.৭০
মোট	৩৯,০৩০,৪৮৬	১৬০,৫৫১,৬৫৭.৫৫	৩,৫৯৯,৮১২.৯৫

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অক্সফোর্ড ১৭৬
অ্যাড্রিয়েন জারমেন ১৩৬
অ্যালেক্স কাউন্টেস ২৫৮

আগা খান আন্তর্জাতিক আর্কিটেকচার পুরস্কার ২২৮
আগা খান ফাউন্ডেশন, জেনেভা ২৫৫
আগা হিলালি ৫১
আনিসুজ্জামান ১১৪, ১১৯
আন্তর্জাতিক গ্রামীণ ডায়ালগ (সংলাপ) প্রকল্প ১৬৯, ২৪৮, ২৫৭
আফরোজী ১৩১
আবু টেল ১৭০
আবুল ফজল ৫৭, ৫৮
আমানা ইখতিয়ার মালয়েশিয়া ১৭৩
আয়ুব খান ৪
আর ডি আই প্রকল্প ১৭৪
আলবার্তো ফুজিমোরি (পেরু) ২৬২
আলফা উমর কোনারে ২৬২
আশ্রয় ঋণ ২২৬

ইউচেং প্রকল্প ১৭৪
ইউনিসেফ ২৬০, ২৬২
ইউনেস্কো ২১৫-১৬
ইকো অসুশ্রহা ১৮১
ইনফোডেভ ২১৬
ইফাদ ১৩, ১৪, ১৩৬, ২৬২, ২৭৬-৭৭
ইশিয়ান প্রকল্প ১৭৪
ইসমাইল সেরাগেলদীন ২৫৫-৫৬, ২৫৮

উইলিমা ম্যানকিলার, চিফ ১৯৪
উওমেনস এমপ্লয়মেন্ট এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ট্রেনিং ইউনিট ১৭৮

এ. এম. এ. মুহিত ৪৯, ১৫৬, ১৬০, ১৬২-৬৩
এ. এস. এইচ. আই ১৭৩
এ. ডি. আই. ই. ১৭৯, ১৮০
এ. ডি. বি. (এশিয়ান ডেভলেপমেন্ট ব্যাঙ্ক) ১৪
এক্সিয়ন ১৭৪
এডেল সাইমন্স ২৪৯, ২৫০
এনায়েত করিম ৪৬-৪৯, ৫১
এফ. এ. এ. আর. এফ ১৭০
এফ. সি. এফ. ১৮৪-৮৬
এরশাদ, জেনারেল ১৫৬, ১৬৪
এরিকসন ১৮১
এশিয়া প্যাসিফিক উন্নয়ন কেন্দ্র ১৭৩
এস্টন পুনর্বিনিয়োগ সংস্থা ১৭৮

ওয়াই কে মুসেবেনি ২৬২
ওয়েন সিলবি ২৫০
ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ১৭৬
ওয়ার্টন স্কুল অব বিজনেস ১৭৬
ওয়ার্ল্ড ভিউ ইন্টারন্যাশনাল ২১৬

কনি ইভান্স ১৮৪, ২৪৯
কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় ৩৮, ৩৯, ৪৪, ১৬৪
কাজি সিরাজুল হক ৩৫-৩৬
কামাল হোসেন, ড. ১৫৮, ১৬৪
কোনাবেল বারবার ১৩
ক্যাটালিসিস ১৭৫
ক্যাপিটল হিল ৪৭-৪৯, ৫২
'ক্যাম্পার' ১৭৩
ক্যারল বেলামি ২৬২
ক্যালামিডো ফাউন্ডেশন ১৭৫
ক্যাশপর ১৭৩
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি (প্রকল্প) ১২, ১৪, ২৩, ২৪, ১৪১, ১৪৩, ১৭৩, ২৪৯, ২৫৭, ২৬২

খালেদ শামস ২৩৩-৩৪, ২৪৩-৪৪

(শ্রী) গঙ্গোপাধ্যায় ১২৮, ১৩৫

www.pathagar.com

গাস স্পেথ ২৬২
'গিভ আস ক্রেডিট' ২৫৮
গুড ফেইথ ফান্ড ১৯৩-৯৪
গৃহনির্মাণ প্রকল্প ২২৮
গ্রামীণ
কমিউনিকেশনস ২৪৬
চেক ২৩৫-৩৭
টেলিকম ২৪৫
ট্রাস্ট ২৩, ২৪৮, ২৫০-৫১, ২৫৭-৫৮
তহবিল ১৯৩
ফাউন্ডেশান ২৫৭
ফোন ২৪৫-৪৬
বস্ত্র কারখানা লিমিটেড ২৩৬
শক্তি ২৪৬
সামগ্রী ২৩৭
গ্রেশাম ল ৬৭

চট্টগ্রাম
কলেজ ৩৭, ৩৯, ৪৮
কলেজিয়েট স্কুল ৩৫
বিশ্ববিদ্যালয় ৪, ৬, ৫৮, ৫৯, ৬৯, ১২৯
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প ৬১

জন হ্যাচ (ফিনকা) ২৬০
জনতা ব্যাংক ৬৮-৭৫, ১১৫
জান পিয়ারসি ১৮৯
জাতিসঙ্ঘের নারী সম্মেলন ১৬৩
জাফরুল্লা চৌধুরী, ডা. ২৩৬
জাম্বুরি (Jamboree) ৩৫, ৩৮
জিম গ্রান্ট ২৬০
জিল্লুর, ড. ৪৫-৪৭
জুলিয়া ভিন্দোসিয়াস ১৯৩
জেফ্রি অ্যাশ১৭৬
জে. পি. মরগ্যান ১৭৬
জেফ্রি অ্যাশ ১৭৬
জেমস ডি. উলফেনসন ২৪, ২৫, ২৬২
জেরাল্ড শেরমন ১৯৪
জোবরা ৪, ৫, ১০, ৫৬-৫৭, ৬০, ৬২, ৬৭, ৭২, ১০৪, ১১৫, ১২৭, ১২৯-৩১, ১৩৫, ১৫৮, ২৬৪

টি. এস. পি. আই ১৭৩, ১৮০
টেলিনর, নরওয়ে ২১৬, ২৪৫
টেলিফোন লেডি ২৪৭

ডবলিউ. এস. ই. পি. ১৮৫, ১৮৬
ডুংগানন ১৪
ডেইভ এলিস ২৫৭
ডেভিড এস গিবনস ১৭২-৭৩
ডেভিড বর্নস্টাইন ২১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭, ৫৪

থমাস ম্যালথাস ২১৭
থেটফোর্ড ১৭৯

'দা প্রাইস অফ এ ড্রিম' ২১২
দিলওয়ার ১৭৬
দু শাওশান ১৭৪
দুলা মিয়া (আব্বা) ২৭, ৩০-৩৮, ৫৫, ১২০-২১
নবযুগ তেভাগা খামার ৬২
নানঝাও প্রকল্প ১৭৪
নাফিস সাদিক ২৬২
নিউহ্যাম বাঙালি গোষ্ঠী ১৭৯
নিকোলাস জর্জেস্কু রোগেন ৪১-৪২, ২০১
'নিরিবিলি' ১২০
নির্বাসিত সরকার ৫০
নুরুল ইসলাম ৫৪

পাকিস্তান আন্দোলন ৩০
পিটার গোলমার্ক ২৫০
পূর্ণবৃত্ত তহবিল ১৮৪
প্যারিসিয়ান চ্যারিটি ১৭৮
প্যাট্রিসিয়া ইয়ং ১৩
প্রজেক্ট ডুনগানন ১৭৩

ফিনকা ১৭৫
ফিনানশিয়াল টাইমস ১৭৬
ফুন্ডুস মাইক্রো ১৭৭
ফুল সার্কেল ফান্ড ১৭৮
ফোর্ড ফাউন্ডেশন ১৮৩
ফৌজি আল সুলতান ২৬২
ফ্রেডরিকো মাইয়ের ২১৫, ২৬২

বঁদোয়া, রাজা ২১২

www.pathagar.com

বাংলাদেশ
তথ্যকেন্দ্র ৪২
নাগরিক সমিতি ৪৫
নিউজ লেটার ৫২
বান্ধব সমিতি ৫২
লিগ অব আমেরিকা ৫২
শিল্প ব্যাংক ১১২-১১৩
বিবি রাসেল ২৩৬
বিল ক্লিন্টন ১৮৯-৯০, ১৯৩-৯৪
বিল ফুলার ১৩৬
বিশ্ব
ক্ষুধা সম্মেলন ১২, ২৩, ২৫৬
খাদ্য পুরস্কার ৫৭
মানবাধিকার সনদ ৯
বিষাদ সিন্ধু ২৮
বোদিল মাল ১৮০
ব্রায়ান অ্যাটউড ২৬২

ভিরা ফোরোস্টেনকো ৪৩-৪৪, ১২২-২৩
ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় ৪১, ৪৩, ২০১

মহিউদ্দিন আলমগীর, ড. ৪৮-৪৯
মহিলাদের স্বকর্ম সংস্থান প্রকল্প (ডাবলু. এস. ই. পি.) ১৭৯, ১৮৪-৮৭, ২৪৮-৪৯, ২৫৮
মর্লি শেফার ১৯৮, ২৩১-৩২
মাওলানা ভাসানী ৫১
মারিয়া নোওয়াক, ড. ১৭০-৭১, ১৭৯
মারুবেনি ব্যাংক (জাপান) ২৪৫
মার্টিন কোনেল ১৭৫
মায়ামি স্কুল ১৯৭
মেরি হুটন ১৮৩, ১৮৯, ১৯৩, ২৪৯
ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশন ২৫০
ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ১৩১

রকফেলার ফাউন্ডেশন ২৫৮
রবার্ট রুবিন ২৬২
রসিকলাল বণিক, ডা. ৩০
রিড ওপেনহাইমার ২৫৭
রেজাল্টস ১৯৬-৯৭
রোজালিন্ড কোপিসারো ১৭৬-৭৭
রোনাল্ড গ্রেজিউইনস্কি ১৮৩, ১৮৯-৯০
রোলিং স্টোন ১৯৩

শক্তি ফাউন্ডেশন ১৮০
শামসুল বারি ৪৮, ৫০, ৫২
শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ১৭৫, ১৭৯
শিল্প ও সমবায় মালিকানা তহবিল ১৭৮
শুকতারা ২৯
শুকুর কাসিম ১৭২
শেখ মুজিবর রহমান ৪৫, ৪৭, ১৫৮
শেখ হাসিনা ২৪৫, ২৬২

সমবায় পুঁজির অংশীদার সংস্থা ১৭৮
সমাজের বিনিয়োগকারী সংস্থা ১৭৮
সম্মিলিত ছাত্র প্রগতি সঙ্ঘ ৩৯
সাইদুজ্জামান, ১৫৭, ১৬৩-৬৪
সাউথ শো'র ব্যাংক ১৮৯
সি. ইউ. আর. ডি. পি. ৬১
সি. এ. আর. ডি. ১৭৩
সিটি হাসমা, ড. ২৬২
সিসিল ক্যাসটিলো ১৩
'সিক্সটি মিনিটস' ১৯৭
সুতোমু হাতা ২৬১-৬২
সুফিয়া খাতুন (আম্মা) ২৭-২৯, ৩১-৩৩, ৫৫, ১২১
সুসান ম্যাটিউসি ১৮৪
সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স ২১৬
সোফিয়া (স্পেন) ২৬১-৬২
স্টিফেন বিগস ১৩৬
স্থানীয় বিনিয়োগ তহবিল ১৭৮
স্যাম ভ্যালি হ্যারিস ১৯৭, ২৬০
স্যু উপজাতি ১৭৫, ১৯৪

লতিফী, অধ্যাপক ৫-৬, ৯, ৫৬
লাকোটা তহবিল ১৯৪
লিঙ্কন চেন ১৩৬
লুই প্রেস্টন ১২, ১৭, ২৫৬

হাসান চৌধুরী ৪৮, ৫১-৫২
হিউগেট লাবেল ২৬২
হিলারি রডাম ক্লিন্টন ১৮৯-৯০, ২৬১

ADIE 179
ASHI 173
CARD 173
Cashpar 173

www.pathagar.com

CGAP 24, 67, 258-59
CIDA 277
FAARF 170
FCF 184
Ford Foundation 277
Fundus Micro 177
GTZ 277
KFW 277
NORAD 277
OECF 277
PAG 24
TSPI 173
USAID 127, 251, 262
WSEP 184-86

---

www.pathagar.com

১২ বছর বয়সে। ১৯৫২।

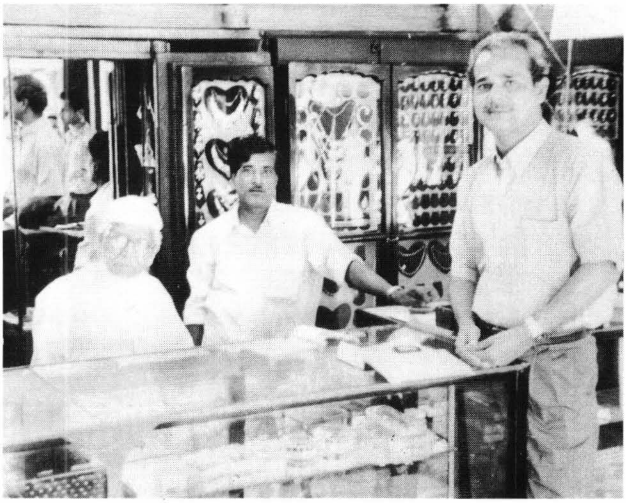

বক্সিরহাটে আমার আব্বা তাঁর দোকানে। এই দোকানের উপর তলায় আমরা বড় হয়েছি। ডান পাশে আমার ভাই মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর।

ছাত্রাবস্থায় ন্যাশভিলে আমার প্রথম অ্যাপার্টমেন্ট। ১৯৬৬।

www.pathagar.com

আমার মেয়ে মনিকার সঙ্গে। ১৯৯০।

আমি ও আমার স্ত্রী আফরোজী। বৌ-ভাতের অনুষ্ঠানে। এপ্রিল, ১৯৮০।

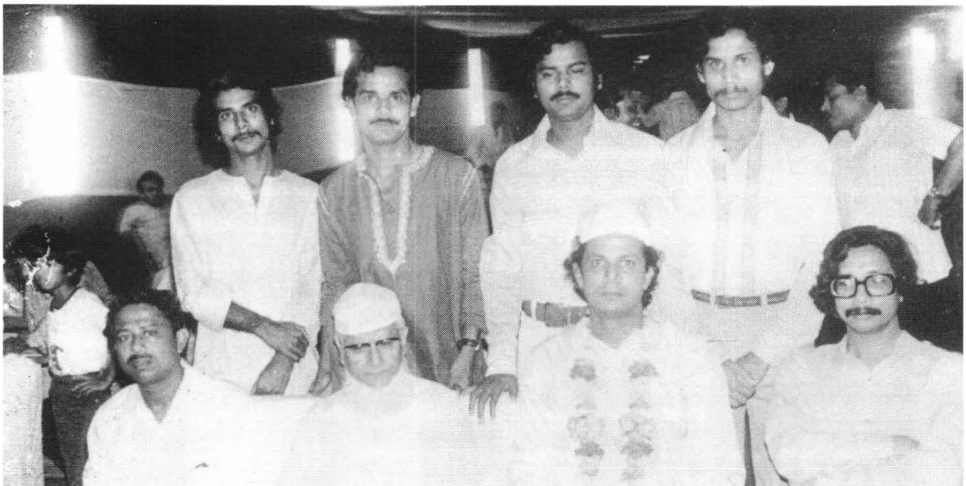

আমার বিয়েতে আব্বা এবং আমার ভাইয়েরা। বাম থেকে ডানে, সামনের সারি: বড়দা সালাম, আব্বা, আমি, ইব্রাহীম। পেছনের সারি: মঈনু, জাহাঙ্গীর, আজম, ও আইয়ুব। এপ্রিল, ১৯৮০।

www.pathagar.com

আমাদের পরিবারের তিন প্রজন্ম; ১৯৯৩: বাম থেকে ডানে, পেছনের সারি: তানি (মঈনুর স্ত্রী), রওশন (আইয়ুবের স্ত্রী), বড়বোন মমতাজ, জাহাঙ্গীর, আফরোজী, আমি, হুদা (টুনুর স্বামী), আমার বোন টুনু, বড়দা সালাম, আজম, বীথি (টুনুর মেয়ে), ইব্রাহীম, আইয়ুব; মাঝের সারি, বাম থেকে ডানে: কান্তা (টুনুর মেয়ে), শাওন (টুনুর ছেলে), কুশল (ইব্রাহীমের ছেলে), আব্বা, জীয়ন (আজমের ছেলে), তিষা (আজমের মেয়ে), শান্তা (টুনুর মেয়ে); সামনের সারি, বাম থেকে ডানে: রিদয় (মঈনুর ছেলে), ঈমন (টুনুর ছেলে), নাজিয়া (আইয়ুবের মেয়ে), আমার মেয়ে দীনা, উজল (ইব্রাহীমের ছেলে)।

আব্বার সঙ্গে আফরোজী, দীনা ও আমি। ১৯৯৮।

www.pathagar.com

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণের টাকায় তৈরি একটি বাড়ি।

ঋণের টাকায় কেনা গাভী।

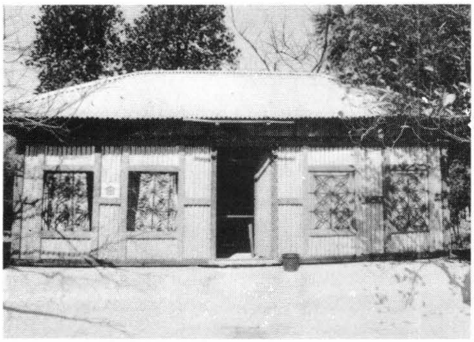

গৃহঋণের টাকায় তৈরি বাড়ি।

সদস্যা ও তার শবজি বাগান।

ধানভানায় বিনিয়োগ আমাদের সদস্যদের জন্য আয়ের একটি অতি-পরিচিত পথ।

www.pathagar.com

গ্রামীণ ব্যাংকের একজন সদস্যের নতুন বাড়িতে। গৃহঋণের টাকায় এই বাড়ি তৈরি হয়েছে।

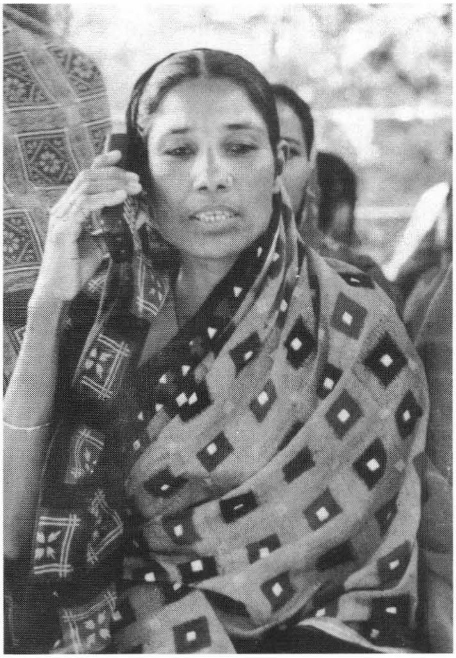

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণে মোবাইল ফোন কিনে টেলিফোন সার্ভিস দেয়ার ব্যবসা করছেন 'টেলিফোন-লেডি' আনোয়ারা বেগম।

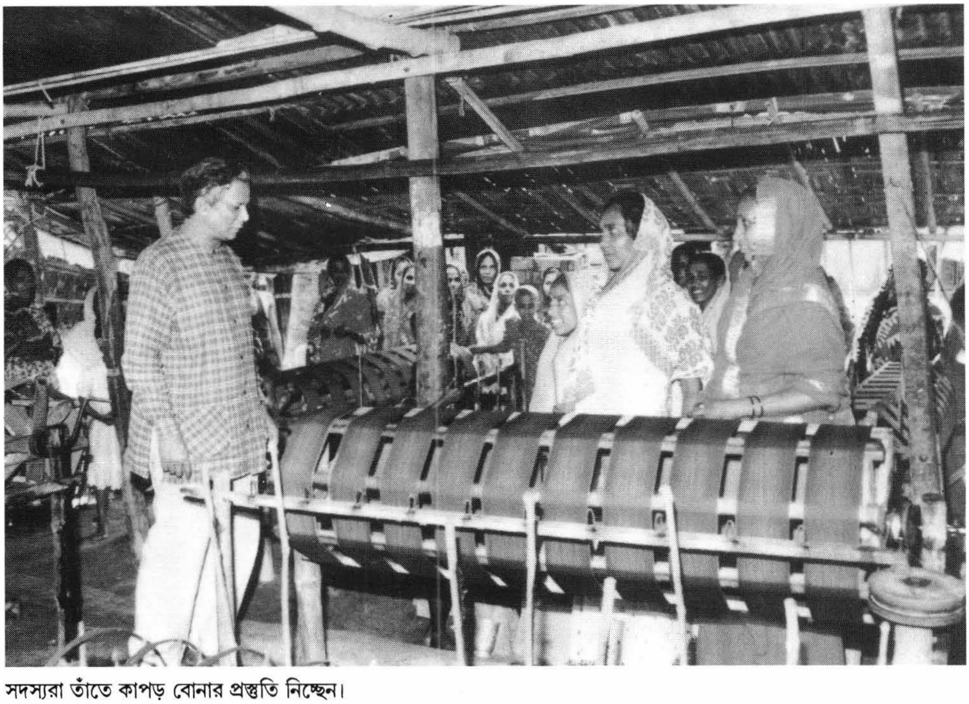

সদস্যরা তাঁতে কাপড় বোনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডি ময়েন, আইওয়া শহরে 'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ' গ্রহণ করার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সঙ্গে আফরোজী, দীনা ও আমি।

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যার সঙ্গে হিলারী এবং চেলসি ক্লিনটন। সঙ্গে নূরজাহান, গোলক ও আমি। ১৯৯৫।

www.pathagar.com

ইংল্যান্ডের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারী ডক্টরেট অব ল' ডিগ্রি গ্রহণের পর কভেনট্রির লর্ড মেয়র সংবর্ধনা জানাচ্ছেন। সঙ্গে আফরোজী ও দীনা।

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে (বাম থেকে ডানে) বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম উলফেনসন, আমি, মিসেস উলফেনসন, মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, প্রতিমন্ত্রী এ. কে. ফয়জুল হক। ১৯৯৭।

www.pathagar.com

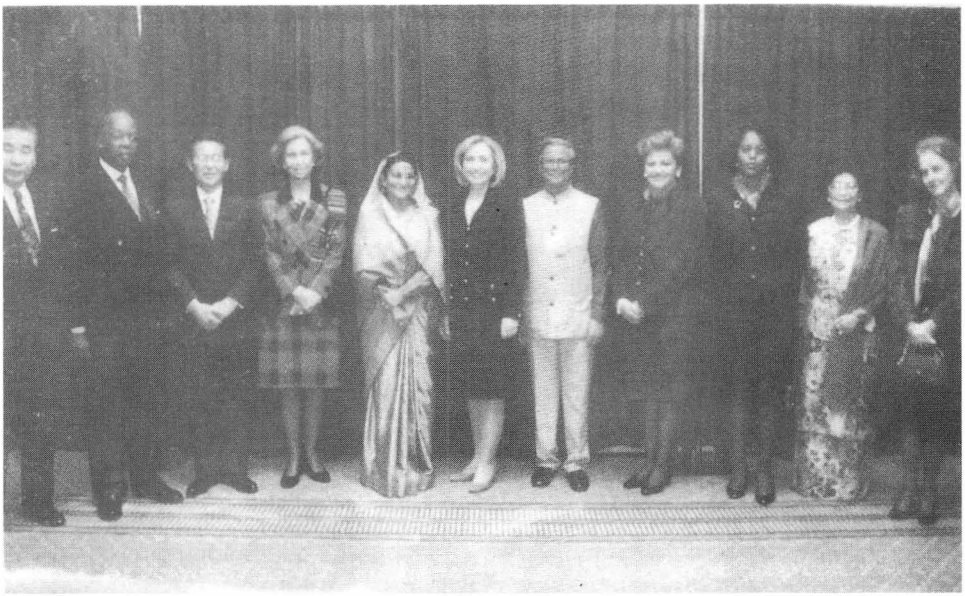

প্রথম মাইক্রোক্রেডিট সামিট, ফেব্রুয়ারি ২-৪, ১৯৯৭। বাম থেকে ডানে: জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সুতুমো হাতা, মোজাম্বিকের প্রধানমন্ত্রী পাসকোল এম মোকাম্বি, পেরুর প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফুজিমোরি, স্পেনের রানী সুফিয়া, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি হিলারী রডহাম ক্লিনটন, আমি, আল সালভাদরের ফার্স্ট লেডি এলিজাবেথ দ্য ক্যালডেরোঁ সল, এংগোলার ফার্স্ট লেডি আনা পলা সানতোস, মালয়েশিয়ার ফার্স্ট লেডি ডঃ সিতি হাসমাহ, বেলজিয়ামের রানী ফাবিওলা।

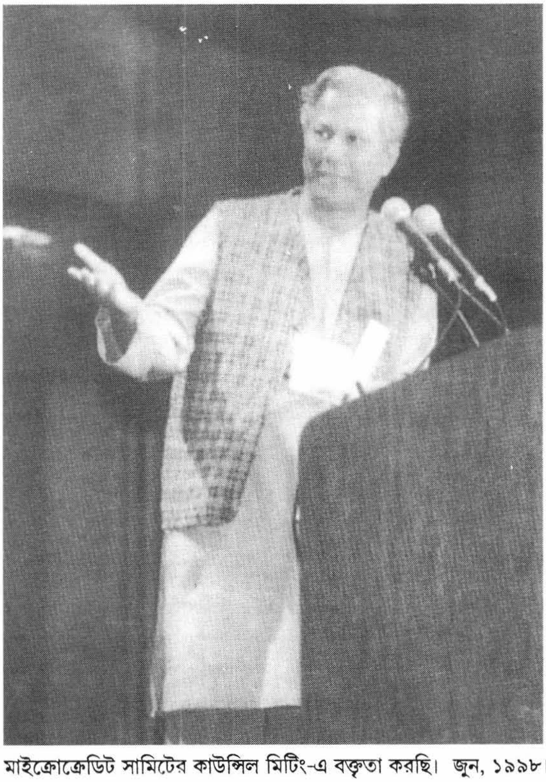

মাইক্রোক্রেডিট সামিটের কাউন্সিল মিটিং-এ বক্তৃতা করছি। জুন, ১৯৯৮।

www.pathagar.com

'ক্ষুদ্রঋণ' পদ্ধতির উদ্ভাবক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের জন্ম (১৯৪০) চট্টগ্রামে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করার সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জোবরা গ্রামে ১৯৭৭ সালে 'গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প' শুরু করেন। এখন ক্ষুদ্রঋণের জন্য 'গ্রামীণ ব্যাংক মডেল' এবং মুহাম্মদ ইউনূস আন্তর্জাতিকভাবে একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। সম্ভবত বর্তমানে বিশ্ব অঙ্গনে বাংলাদেশের সবচেয়ে সুপরিচিত মানুষ তিনিই।
'গ্রামীণ ব্যাংক'-এর সাফল্য তাঁকে বিশ্বজোড়া পরিচিতি এনে দিয়েছে। এ পর্যন্ত ম্যাগসাইসাইসহ (১৯৮৪) পনেরোটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তেরোটি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিও তিনি পেয়েছেন। তিনি 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' (১৯৮৭)-এ সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৯৬ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।
অধ্যাপক ইউনূস 'ইউ এন ফাউন্ডেশন'সহ অন্তত দশটি আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সদস্য বা উপদেষ্টা। সম্প্রতি তিনি জাতিসংঘের UNAIDS-এর 'ইন্টারন্যাশনাল গুডউইল অ্যাম্বাসাডর'-এর সম্মান লাভ করেন।
'গ্রামীণ ব্যাংক' ছাড়াও বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি আরো বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

www.pathagar.com

অধ্যাপক ইউনূস বিশ্বাস করেন
দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাবার ভাগ্য
নিয়ে কেউ আসলে জন্মগ্রহণ করে না,
মানুষকে দরিদ্র করে রাখা হয়। তিনি আরও
বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে
সীমাহীন সৃজনশীলতা, অপার সম্ভাবনা। অপেক্ষা
কেবল তাকে আবিষ্কার করার, বিকাশের পথ
করে দেবার। আর এই প্রতীতীই তাঁর
দারিদ্র্যবিরোধী সংগ্রামের পেছনে মূল প্রেরণা
হিসেবে কাজ করেছে। সেই দারিদ্র্যবিরোধী
সংগ্রামেরই স্মৃতি-আলেখ্য এই বইটি।

ISBN 984 410 407-6
9 789844 104074

www.pathagar.com